ছোটদের
বিশ্বকোষ
ষষ্ঠ খণ্ড
সম্ভার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭৩

ষষ্ঠ খণ্ড

সম্পাদক
অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ন ভট্টাচার্য্য, বি. এ.
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র, ১৩৯৩
মূল্য : চল্লিশ টাকা

মুদ্রক :
প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

আমাদের পূর্বপরিকল্পনা মত 'ছোটদের বিশ্বকোষ' পাঁচটি খণ্ডে আমরা শেষ করেছিলাম। কিন্তু এই ধরনের একখানা বই ছোটদের উপযোগী যাবতীয় তথ্য দিয়ে শেষ করতে হলে আরও অনেকগুলি খণ্ডের প্রয়োজন। কিন্তু তা হলে এ বইএর সম্পূর্ণ সেটের দামও অনেক বেড়ে যায়—যা সাধারণ মধ্যবিত্ত পাঠকের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আশঙ্কা থাকে। অথচ বইখানির চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ায় যে সব তথ্য আমরা সবটা দিতে পারি নি কিংবা যে সব তথ্যে একেবারেই হাত দেওয়া যায় নি তার থেকে কিছু কিছু বেছে নিয়ে আর একটি সংযোজনী খণ্ড প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনেক দিন থেকেই উপলব্ধি করছিলাম। সেই কথা ভেবেই এই নতুন ষষ্ঠ খণ্ডটি প্রকাশ করা হ'ল। বলা বাহুল্য, যে সব অতিরিক্ত তথ্য থাকা একান্তই প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছিল সেইগুলিই শুধু এতে সন্নিবেশিত হ'ল। তবুও মনে হয় আরও অনেক কিছুই দেবার ছিল। ভবিষ্যতে প্রয়োজন মনে হলে এবং সম্ভব হলে আবার তা অবশ্যই বিবেচনা করা হবে।

প্রায় দু'হাজার পৃষ্ঠার কাছাকাছি এমন একটি বিরাট গ্রন্থে একটা বর্ণানুক্রমিক সূচী থাকা প্রয়োজন—এটাও আমরা উপলব্ধি করেছি,—যদিও প্রত্যেকটি খণ্ডে যে বিস্তারিত সূচীপত্র দেওয়া হয়েছে তাতে প্রত্যেকটি বিষয়ের শিরোনামের সঙ্গে শাখা-শিরোনামেরও উল্লেখ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে পৃথক্ একটি ছোট খণ্ডে সবগুলি খণ্ডের একটা পুরো বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রকাশ করার ইচ্ছেও আমাদের আছে।

অন্যান্য খণ্ডের মত এই ষষ্ঠ খণ্ডটিও পাঠকদের সমান ভাবে মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

দোল পূর্ণিমা, ১৩৯৩

ষষ্ঠ খণ্ডের লেখক-পরিচিতি

আবিষ্কার ও অভিযানের কথা
জীবনীবিচিত্রা (আংশিক)
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা (আংশিক)
দেশবিদেশের রূপকথা (আংশিক)
দেশবিদেশের কথা

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম. এস-সি

প্রখ্যাত কিশোর-মাসিক পত্র রামধনু পত্রিকার সম্পাদক ও শিশুসাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক। কলকাতা আশুতোষ কলেজ, যোগমায়া দেবী কলেজ ও বি. ই. এস্. কলেজের প্রাক্তন রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ছোটদের বহু গ্রন্থ-প্রণেতা, সরল ও সরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প-উপন্যাস রচনায় বিশেষ খ্যাতিমান্। দীর্ঘকাল শিশুসাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কৃষ্ণনগর ও জলপাইগুড়ি অধিবেশনে শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতি। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে ও বর্দ্ধমান অধিবেশনে শিশুসাহিত্য শাখার উদ্বোধক ও সভাপতি। নিখিল ভারত শিশুসাহিত্য সম্মেলনে একাধিকবার সভাপতি। শিশুসাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য রণজিৎ-স্মৃতি পুরস্কার, ভুবনেশ্বরী পদক, ফটিক-স্মৃতি পদক, আনন্দবিচিত্রা পদক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যাসাগর পুরস্কারপ্রাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সদস্য। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম রাজশেখর বসু-স্মৃতি বক্তা।

বাংলা সাহিত্যের কথা

৺অধ্যাপিকা ডক্টর সুচেতা মিত্র, এম. এ, পি-এইচ. ডি

বাংলা সাহিত্যে কবি ও গদ্যলেখিকা হিসেবে সুপরিচিতা। 'জীবনানন্দ' কবিতা পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদিকা। প্রখ্যাত কিশোর-মাসিক পত্র রামধনুর সহযোগী সম্পাদিকা। উলুবেড়িয়া কলেজ ও কলকাতা যোগমায়া দেবী কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপিকা। শিশুসাহিত্যের খ্যাতনামা কবি ও লেখিকা। লোকসংস্কৃতির ওপর গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট। কয়েকখানি বিশিষ্ট কবিতা-গ্রন্থ ও বাংলা কবিতার ওপর গবেষণামূলক গ্রন্থরচয়িত্রী। সম্প্রতি অকালে পরলোকগতা।

জীবনীবিচিত্রা (আংশিক)

শ্রীহরতোষ চক্রবর্তী, এম. এ, বি. এল

ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় সুদক্ষ। ছোটদের সাময়িক পত্রের লেখক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত থেকে বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা (আংশিক)

শ্রীরেবন্ত গোস্বামী, বি. এস-সি

বাংলা শিশুসাহিত্যের খ্যাতনামা কবি ও লেখক। ছোটদের বহু গ্রন্থের প্রণেতা। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনার জন্য শিশুসাহিত্য পরিষদ-প্রদত্ত ফটিক-স্মৃতি পদকপ্রাপ্ত। কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থায় দায়িত্বশীল পদে কর্মরত।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা (আংশিক)

শ্রীরঞ্জন চক্রবর্তী, বি. ই

শিশুসাময়িক পত্রে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য ও খেলাধূলার সুপরিচিত লেখক। খ্যাতনামা এঞ্জিনীয়ার। গেস্টকিন উইলিয়াম্‌স্ এঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত।

টাকাপয়সার গল্প

৺অমলেন্দু সেন, এম. এ, বি. এল

শিশুসাহিত্যের সুপরিচিত লেখক ও গ্রন্থপ্রণেতা। গ্রন্থ সম্পাদনায়ও বিশেষজ্ঞ। সদ্যসাক্ষরদের জন্য গ্রন্থ রচনায় তিনবার ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। অর্থনীতিতে এম. এ। কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। সম্প্রতি পরলোকগত।

যে গল্প চিরকালের (আংশিক)

শ্রীরত্নাবলী চক্রবর্তী, এম্. এ.

শিশুসাহিত্যের কবি ও লেখিকা হিসেবে সুপরিচিতা। যোগমায়া দেবী কলেজের ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপিকা।

যে গল্প চিরকালের (আংশিক)
চিত্রশিল্পের কথা

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী। ভারত সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র-পুস্তকের রচয়িতা ও শিল্পী হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্ত। শিশুসাহিত্যলেখক হিসেবেও খ্যাতিমান্। শিশুসাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ও বহু ছোটদের গ্রন্থপ্রণেতা। শিশুসাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ভুবনেশ্বরী পদক ও ফটিক-স্মৃতি পদকপ্রাপ্ত।

ইতিহাসের কথা

শ্রীঅর্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য, বি. এ, এল্. এল্. বি, আই. আর. এ. এস্

বড়দের ও ছোটদের সাহিত্যে সুপরিচিত কবি ও লেখক। ঐতিহাসিক রচনায় দক্ষ। কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের শরীরের কথা

ডাঃ ননীগোপাল মজুমদার, এম্. বি (কলকাতা) ডি. সি. এইচ. (লণ্ডন), সি. এ. পি.

খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশুচিকিৎসক। কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের শিশুচিকিৎসা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক। বয়স্কাউট-মুখপত্র 'যাত্রী' ও ইন্‌স্টিটিউট অব চাইল্ড ওয়েলফেয়ারের মুখপত্র 'শিশুকল্যাণের' প্রাক্তন সম্পাদক, 'শিশুবিচিত্রা' বার্ষিকীর অন্যতম সম্পাদক। ছোটদের বহু গ্রন্থের রচয়িতা। শিশুসাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক ও প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ। শিশুসাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ভুবনেশ্বরী পদকপ্রাপ্ত।

এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা

শ্রীঅমিতাভ ঘোষাল, বি. ই, এম্. ই. আই. ই (ইণ্ডিয়া) এম্. আই. স্ট্রাক্ট. ই (লণ্ডন), এম্. আই. সি. ই (লণ্ডন)

ব্রেথওয়েট বার্ন ও জেসপ কন্স্ট্রাক্শন প্রতিষ্ঠানের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এঞ্জিনীয়ার। বহু এঞ্জিনীয়ারিং প্রবন্ধের লেখক। ১৯৫৭ সাল থেকে বিভিন্ন ধরনের এঞ্জিনীয়ারিং প্রকল্পে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

দেশবিদেশের রূপকথা (আংশিক)

মহাশূন্যের পথে

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস. সি, এ. আই. সি

বাংলা শিশুসাহিত্যের ও বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক। কেন্দ্রীয় পাট গবেষণাগারের ভূতপূর্ব গবেষক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-সংগ্রহশালার (ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম) প্রাক্তন অধ্যক্ষ। শিশুসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ পুস্তক রচনার জন্য ফাটিক-স্মৃতি পদকপ্রাপ্ত। শিশুসাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক।

রঙ্গালয়ের কথা

অধ্যাপক ডক্টর পলাশ মিত্র, এম্. এ., পি-এইচ. ডি।

কলকাতা দেশবন্ধু কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। খ্যাতনামা কবি, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক। লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত গবেষণায় সুপরিচিত। 'জীবনানন্দ' কবিতা-পত্রিকার সম্পাদক। শিশুসাহিত্যের সুপরিচিত কবি ও লেখক। বহু শিশুসাহিত্য-পুস্তকের প্রণেতা ও সম্পাদক। শিশুসাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক।

আইনকানুনের কথা

শ্রীসুনীলকুমার মিত্র, এম্. এ., এল্. এল. বি

সুপরিচিত আইনবিদ্ ও আইনসংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত। সদস্য, ইণ্ডিয়ান্ ল ইন্স্টিটিউট, ইণ্ডিয়ান্ ইন্স্টিটিউট অব্ পাব্লিক অ্যাডমিনস্ট্রেশন।

ষষ্ঠ খণ্ডের শিল্পী-পরিচিতি

শিল্পসম্পাদক

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী। ভারত সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র-পুস্তকের রচয়িতা ও শিল্পী হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্ত। শিশুপাঠ্য বহু গ্রন্থের রচয়িতা ও আলঙ্কারিক। ছোটদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে ফটিক-স্মৃতিপদক ও শিশুসাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ভুবনেশ্বরী পদক-প্রাপ্ত। শিশুসাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি।

সহকারী চিত্রশিল্পী

শ্রীরবীন্দ্র হালদার

বিশিষ্ট চিত্রকর।

শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত

বিশিষ্ট চিত্রকর।
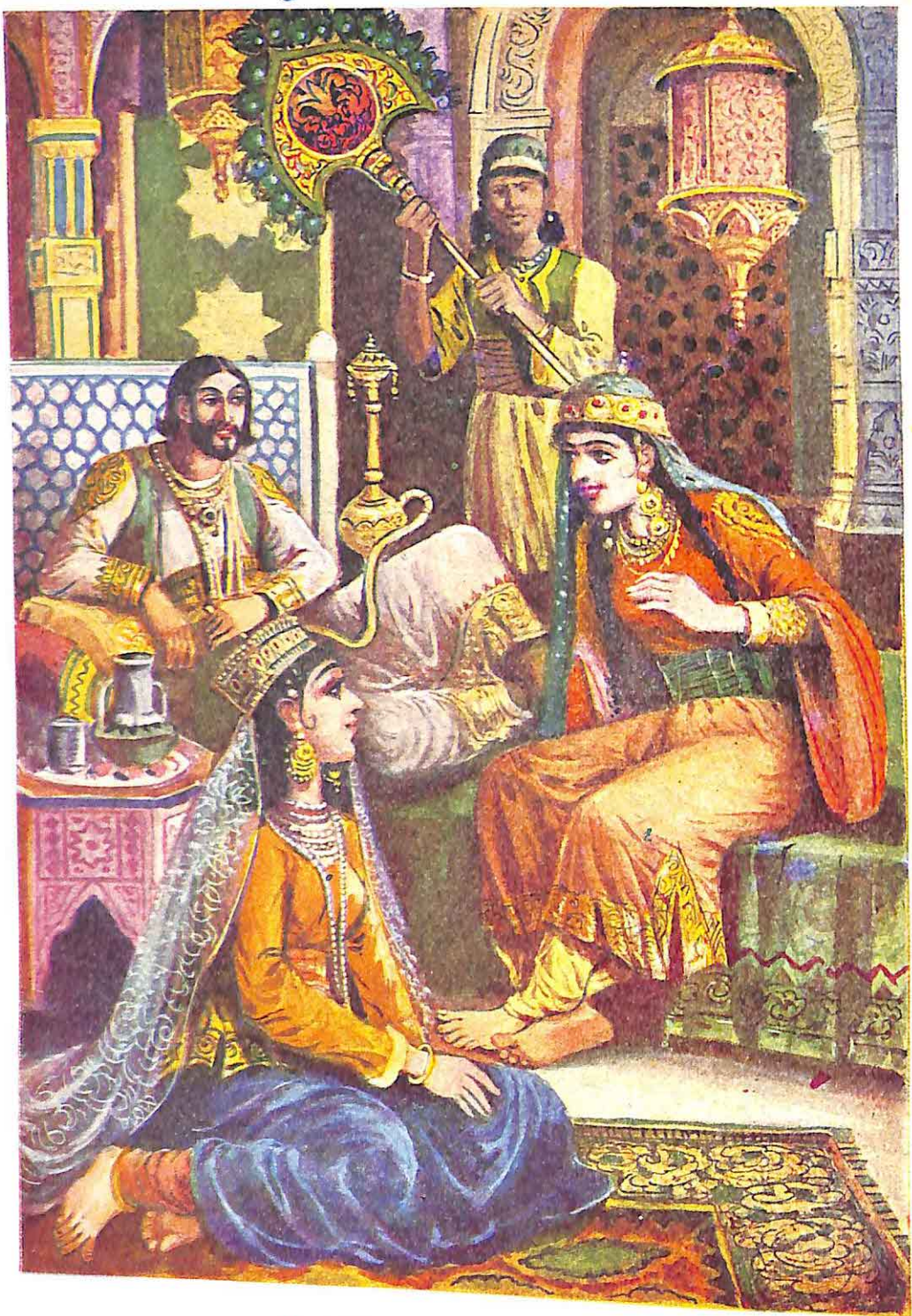
রাতের পর রাত বসতে লাগল গল্পের আসর

(আরব্য উপন্যাস : পৃঃ ১৬৩৪)
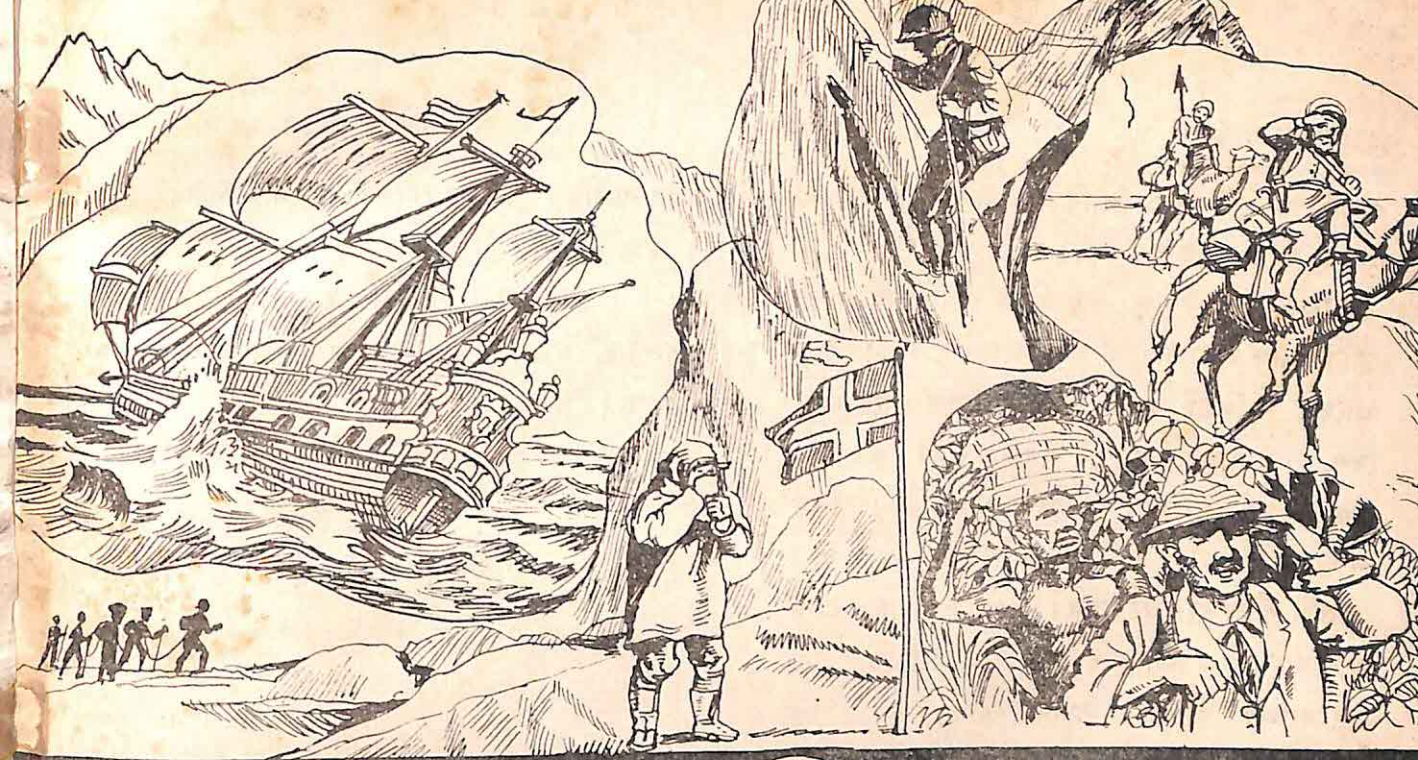
আবিষ্কার ও অভিযানের কথা

আবিষ্কার কাকে বলে

আবিষ্কার কথাটির হু'টি অর্থ হতে পারে। এক,—যে জিনিস ছিল বা এখনও আছে কিন্তু আমাদের তা জানা নেই, তাকে খুঁজে বার করা আর তুই,—যা কোনদিনই ছিল না তা মাথা খাটিয়ে উদ্ভাবন করা। যেমন ধরা যাক, মহেঞ্জোদড়োয় বা হরাপ্পায় মাটির নীচে একটা প্রাচীন সভ্যতার নানা চিহ্ন চাপা পড়ে গিয়েছিল, সেটার কথা আমরা জানতামই না, সেটা খুঁজে বার করা হ'ল। আমরা বলব, মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কার করা হয়েছে কিংবা, আরো ভালো করে বললে, ওখানে প্রাচীন সভ্যতা—যার নাম সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কার করা হয়েছে। এটা হ'ল প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার। এ রকম বিজ্ঞানের আবিষ্কারও অনেক হয়েছে। বলতে গেলে আবিষ্কার বলতে আমাদের বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কথাই আগে মনে পড়ে। একটা আপেল গাছ থেকে একটা আপেল পেকে গিয়ে ঝুপ্ করে মাটিতে পড়ল। মাটিতে না পড়ে সেটা ওপর দিকে উঠে গেল না কেন? কারণ পৃথিবীর একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যাকে বলা হয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আদিকাল থেকেই ছিল কিন্তু আমরা তা জানতাম না। মহাবিজ্ঞানী নিউটন এই সত্যটি খুঁজে বার করলেন, নানা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করলেন। এটা হ'ল একটা বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। আবার, মানুষের কণ্ঠস্বরকে যে যন্ত্রে ধরে রাখা যায় এবং আবার তা বার করে আনা যায় এডিসন সাহেব তাঁর ফনোগ্রাফ্ যন্ত্রে তা দেখিয়েছিলেন। এটাও একটা বড় আবিষ্কার, কিন্তু নিউটনের ধরনের নয়। এটাকে আমরা বলব উদ্ভাবন। এই দ্বিতীয় ধরনের নানা আবিষ্কার আরও অনেক বড় বড় পণ্ডিত করেছেন। যেমন মর্স্ করেছিলেন টেলিগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার, গ্রেহাম বেল

করেছিলেন টেলিফোন আবিষ্কার, মার্কনি করেছিলেন বেতার যন্ত্র আবিষ্কার ইত্যাদি।

কিন্তু এ ছাড়াও এক রকম আবিষ্কার আছে যেটার সঙ্গে মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কারের কিছুটা মিল আছে। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে নানা দেশ, নানা সাগর, নদী, হ্রদ পর্বত ইত্যাদি কত কি! অন্য দেশের লোকেরা সে কথা জানত না। কিছু অসমসাহসী বীর নানা বিপদ্‌-আপদ্‌ তুচ্ছ করে সেগুলি খুঁজে বার করেছেন। একেও আমরা বলব আবিষ্কার। এ আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নয়, ভৌগোলিক আবিষ্কার, আর এ আবিষ্কারের জন্য দরকার মনে প্রচণ্ড সাহস, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবার জন্য অটুট মনোবল আর অদম্য অধ্যবসায়। এজন্য আবিষ্কারককে নানা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নিজের দেশ থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়; জলপথে, স্থলপথে, এবং বর্তমান যুগে আকাশপথেও নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়,—যাকে ভালো বাংলায় বলা হয় অভিযান। এই অভিযানের ভিতর দিয়েই সফল হয় ভৌগোলিক আবিষ্কার।

বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের কথা আমরা ইতি-পূর্বেই কিছু কিছু বলেছি, এবার এই ভৌগোলিক আবিষ্কারের কথা কিছু শোনাব। বহু দেশের বহু বীর এ সব আবিষ্কারে অংশ নিয়েছেন এবং তা ঘটেছে বিভিন্ন যুগে। সবগুলির কথা তো বলা সম্ভব নয়, তাই আমরা বেছে বেছে কিছু কিছু এই রকম আবিষ্কারের কাহিনী তোমাদের শোনাচ্ছি।

পৃথিবীটা সত্যিই গোল

পৃথিবীর চেহারা সম্বন্ধে সেকালকার পণ্ডিতদেরও কি রকম অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা ছিল সে কথা আমরা এর আগে বলেছি। বিভিন্ন দেশের পুরাণে পৃথিবীর যে সব কাল্পনিক চিত্র পাওয়া যায় তা তো আরও মজাদার। মোট কথা, পৃথিবীটা যে চ্যাপ্টা নয়, চতুষ্কোণও নয়, গোলকের মত গোল এ ধারণা অনেক পরে এসেছে।

ম্যাগেলান

কিন্তু হাতে-কলমে পরীক্ষা করে পৃথিবী গোল কিনা তা যিনি পরখ করে দেখতে চেয়েছিলেন তাঁর নাম ম্যাগেলান। ম্যাগেলান ছিলেন পর্তুগীজ, কিন্তু থাকতেন স্পেনে। তিনি ভাবলেন, পৃথিবী যদি সত্যিই গোল হয় তবে তার কোন একটা জায়গা থেকে জাহাজে চড়ে সমুদ্রপথে একই দিকে মুখ করে ক্রমাগত চলতে থাকলে একদিন তো সেই জায়গাটাতেই ফিরে আসা যাবে।

কথাটা শুনতে ভালো, কিন্তু কাজে করা বড়

সহজ নয়। অজানা সমুদ্রে ও-ভাবে দিনের পর দিন ভেসে চলা শুধু বিপজ্জনকই নয়, প্রচুর ব্যয়বহুলও বটে। ম্যাগেলান স্পেনের রাজার সাহায্য চাইলেন। স্পেনের রাজা তখন ছিলেন ৫ম চার্ল্‌স্। তিনিও উৎসাহ দিলেন। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দের এক সূর্যোজ্জ্বল
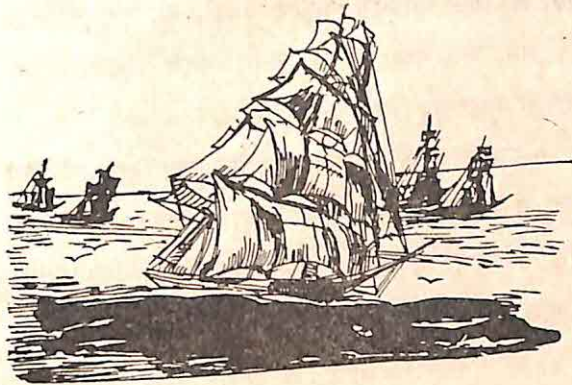
পাঁচখানি জাহাজ নিয়ে ম্যাগেলানের যাত্রা শুরু হ'ল।

প্রভাতে স্পেনের সেভিল বন্দর থেকে পাঁচখানা জাহাজ আর ২৭০ জন সঙ্গী নাবিক সঙ্গে নিয়ে শুরু হ'ল ম্যাগেলানের যাত্রা। কিন্তু যাত্রাটা বোধ হয় শুভযাত্রা ছিল না। পথে কত রকম অজানা বিপদ্ এসে তাঁদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল, কিন্তু ম্যাগেলান লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে রাজী ন'ন। বিপদ্ চরমে উঠল যখন তাঁরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এসে পৌঁছলেন। সেখানকার আদিম অধিবাসীরা বিদেশীদের সহ্য করতে রাজী হ'ল না। বাধল প্রচণ্ড যুদ্ধ। দু'পক্ষেরই বহু লোক হতাহত হ'ল কিন্তু সবচেয়ে মর্মান্তিক হ'ল এই যে অভিযানের নেতা ম্যাগেলানও রেহাই পেলেন না। তাঁকেও প্রাণ দিতে হ'ল দ্বীপের বাসিন্দাদের হাতে।

যে সব সঙ্গীরা বেঁচে রইলেন তাঁরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিযান বন্ধ করতে পারলেন না। পাঁচটি জাহাজের মধ্যে চারটিকেই খুইয়ে এবং ২৭০ জনের মধ্যে মাত্র জীবিত ১৮ জন নাবিককে নিয়ে অবশেষে জাহাজ একদিন সত্যি সত্যিই সেভিল বন্দরে ফিরে এল পৃথিবী চক্কর দিয়ে।

ম্যাগেলান নিজে ফিরতে পারলেন না বটে কিন্তু তাঁর সেই অসমসাহসিক অভিযান নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করল যে পৃথিবী সত্যিই গোল। ম্যাগেলানের নাম তাই অভিযানের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

এই অভিযান শেষ করতে সময় লেগেছিল তিন বছরেরও বারো দিন বেশি।

মার্কো পোলো

জলপথে না হলেও স্থলপথে কিন্তু পৃথিবীর এক দেশের সঙ্গে অন্যান্য কিছু কিছু দূর দেশের যোগাযোগ হয়েছিল বহুদিন আগেই। মিশর, আরব, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশের মধ্যে বাণিজ্যের আদান-প্রদান খুব প্রাচীন কাল থেকেই ছিল বলে জানা গেছে এবং এ সব দেশের মধ্যে যাতায়াত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ডাঙ্গার ওপর দিয়েই হ'ত।

এই সব যোগাযোগের জন্য যে সব ভ্রমণকারীর নাম বিশেষ করে মনে আসছে তাদের একজন হচ্ছেন মার্কো পোলো।

মার্কো পোলোর বাড়ি ছিল ইটালির বিখ্যাত ভেনিস শহরে। আজ থেকে প্রায় সাতশ' বছর আগে, যখন তিনি বয়সে প্রায় কিশোরই বলা চলে, তখন তিনি তাঁর বাবা আর কাকার সঙ্গে একদিন রওনা হলেন,—উদ্দেশ্য চীন দেশে যাওয়া।

ভেনিস থেকে চীন! রাস্তা তো কমখানি নয়, তাও আবার যেতে হবে স্থলপথে। মার্কো পোলোর বাবা আর কাকা দেশভ্রমণে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু এত দীর্ঘ পথ কখনও পার হন নি। এ রকম যাত্রা যে কি রকম বিপজ্জনক তাও হয়তো তাঁরা আগে কল্পনা করেন নি।

কিন্তু তবু তাঁরা দমলেন না। পথে কত বার তাঁদের বড় বড় পাহাড় ডিঙ্গোতে হ'ল, পার হতে হ'ল বিরাট বিরাট মরুভূমি, আবার কখনও বা গহন অরণ্য। কখনও অসম্ভব গরমে তৃষ্ণায় তাঁদের প্রাণ

মার্কো পোলো

ওষ্ঠাগত হ'ল, কখনও দারুণ শীতে তাঁদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে এল। কতবার দস্যুতস্করের খপ্পরে পড়ে মরতে মরতে তাঁরা বেঁচে গেলেন তার আর হিসেব নেই। যাই হোক, অবশেষে দীর্ঘদিনের যাত্রা শেষ হ'ল, মার্কো পোলো চীন দেশে এসে পৌঁছলেন।

চীনে তখন রাজত্ব করছেন কুবলাই খাঁ। মার্কো পোলো বয়সে তরুণ হলে কি হবে, লোকটি ছিলেন ভারি চালাক-চতুর। সম্রাটের রাজসভায় অচিরেই তিনি একটা জায়গা করে নিলেন এবং দেখতে দেখতে চীন-সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। তাঁর একটা মস্ত গুণ ছিল, তিনি অনেকগুলো দেশের ভাষা শিখে ফেলেছিলেন। এরই দৌলতে কুবলাই খাঁ তাঁকে নানা দেশে তাঁর দূত করেও পাঠিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা অঞ্চলে যাবার তাঁর সুযোগ হয়। এমন কি ভারতবর্ষেও তিনি ঘুরে গিয়েছিলেন।

দীর্ঘ তেইশ বছর এইভাবে বিদেশে কাটিয়ে অবশেষে মার্কো পোলো ফিরে এলেন নিজের দেশে।

কিন্তু এমনি অদৃষ্ট, দেশে আসার পরেই তাঁকে একটা লড়াইএ জড়িয়ে পড়তে হ'ল এবং, শুধু জড়িয়ে পড়া নয়, শত্রুপক্ষ তাঁকে বন্দী করে জেলে পুরে রাখলেন যুদ্ধবন্দী হিসেবে।

এ হয়তো এক পক্ষে শাপে বর বলা যেতে পারে। কারণ কারাগারে বন্দী না থাকলে আমরা হয়তো তাঁর বিচিত্র জীবনের কাহিনী কোনদিনই অমন বিশদভাবে জানতে পারতাম না।

মার্কো পোলোর জীবনে অভিজ্ঞতা বড় কম হয় নি। নানা দেশ ঘুরে, নানা জাতের লোকের সঙ্গে মিশে যে বিরাট অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন কারাগারে বসে তিনি তারই বিস্তৃত বিবরণ এক সঙ্গীর সাহায্যে লিখে ফেললেন। তাঁর সেই মূল্যবান্ ডাইরী থেকে সে যুগের বিভিন্ন দেশের অবস্থা, তাদের বাসিন্দাদের হালচাল, রীতিনীতি অনেক কিছুই জানতে পারা গেছে। পৃথিবীতে যত ভ্রমণকাহিনী লেখা হয়েছে তার মধ্যে এটি একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, তথ্যবহুল বিবরণ বলে মনে করা হয়। এই সব বিবরণের মধ্যে অনেক মজার মজার কাহিনীও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে— যাতে ভ্রমণকাহিনীটি আরও সরস হয়ে উঠেছে।

আমেরিকা অভিযান : ভাইকিংদের ভূমিকা

আমেরিকা এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী দেশগুলির একটি এবং শ্রেষ্ঠ ধনীদের দেশও বলা যায়। কিন্তু শ' পাঁচেক বছর আগেও পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশগুলি এ দেশটির সম্বন্ধে কিছুই জানত না,

এমন কি এর নামও শোনে নি। অবশ্য চীনের পুরোনো পুঁথিপত্রে নাকি আছে যে প্রায় দু' হাজার বছর আগেই চীনেরা পাল-তোলা জাহাজ নিয়ে পূবদিকের এক মস্ত বড় দেশে গিয়ে হাজির হয়েছিল। মনে হয় হয়তো সে দেশটা আমেরিকারই কোন অংশ হতে পারে। যাই হোক, এ নিয়ে পরে আর তাদের কোন উচ্চবাচ্যের কথা শোনা যায় নি।

নরওয়ে অঞ্চলে এক জাতের দুর্দ্ধর্ষ মানুষ ছিল। তাদের বলা হত ভাইকিং। যেমন ছিল তাদের দুর্জয় সাহস তেমনি ছিল তাদের জাহাজ চালাবার ক্ষমতা। কাঠের তৈরি ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে তারা সমুদ্রে ভেসে বেড়াত,—অজানা, অপরিচিত জায়গায় গিয়ে হানা দিত। আসলে অবশ্য তাদের বৃত্তি ছিল জলদস্যুর বৃত্তি। সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে লুঠপাট করতে যুড়ি ছিল না তাদের। কিন্তু তবু তারাই পৃথিবীকে অনেক অজানা দেশের সন্ধান দিয়ে গেছে—যে জন্য তাদের শত দোষ ক্ষমা করে অন্যান্য দেশের লোকেরাও সম্মান জানাতে দ্বিধা করে নি। এই ভাইকিংদেরই একজন,—বিয়র্ন হারজুল্‌ফ্‌সন প্রায় হাজার খানেক বছর আগে একবার আমেরিকায় পৌছেছিল।

হারজুল্‌ফ্‌সন যে আমেরিকার খোঁজে গিয়ে ঐ দেশটা আবিষ্কার করেছিল সে কথা মনে করলে ভুল হবে। আসলে সেও ছিল এক দুঃসাহসী জলদস্যু। সমুদ্রে জাহাজ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সে একবার ঝড়ের মুখে পড়ে যায়, আর তার অজান্‌তেই জাহাজটা ভেসে চলে উত্তর-পশ্চিম দিকে। ভাসতে ভাসতে জাহাজটা গিয়ে ঠেকে এক নতুন দেশে। হারজুল্‌ফ্‌সন ভেবেছিল ওটা বুঝি গ্রীনল্যাণ্ড, কারণ এর আগেও একবার সে গ্রীনল্যাণ্ডে এসেছিল। কিন্তু দেশে ফিরে সে ও-দেশটার যে বর্ণনা দেয় তাতে মনে হয় ওটা গ্রীনল্যাণ্ড
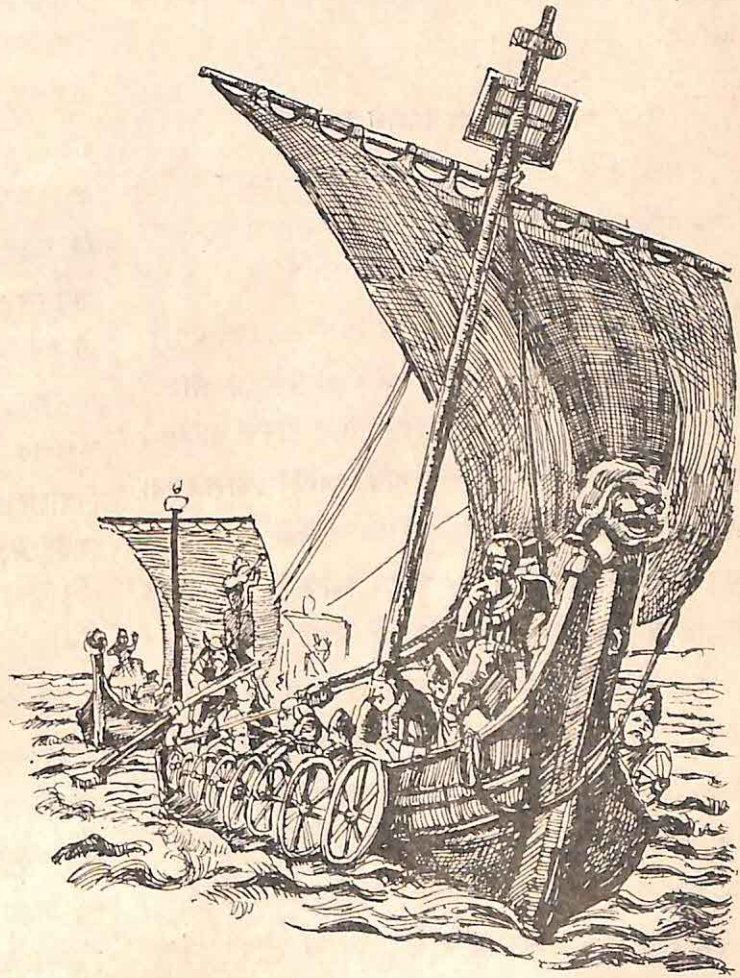
অজানা সমুদ্রে ভেসে চলেছে ভাইকিংদের জাহাজ।

নয়, ওটাই আমেরিকা,—যদিও আমেরিকা নামটা দেওয়া হয়েছে অনেক পরে। এরও বছর পনেরো পরে আর একজন ভাইকিং, তার নাম লীফ এরিক্সন, ঘুরতে ঘুরতে আমেরিকার আর এক প্রান্তে এসে পৌঁছয়। এরিক্সন দেখল সেখানে অনেক আঙ্গুর গাছ। তাই দেখে নিজেই দেশটার নাম দিল ভাইনল্যাণ্ড কিনা আঙ্গুরের দেশ।

এইভাবে ঘটনাচক্রে ভাইকিংদের আরও কেউ কেউ আমেরিকায় গিয়ে উঠেছিল বলে শোনা যায়, কিন্তু তাদের সে যাওয়াকে সত্যিকার দেশ আবিষ্কারের অভিযান বলা চলে না।

আবিষ্কার করলেন কলম্বস

সত্যিকার আমেরিকা আবিষ্কারক হিসেবে যাঁর নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে তাঁর নাম ক্রিস্টোফর কলম্বস।

কলম্বসের জন্ম হয়েছিল ইটালির জেনোয়ায়, ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশ' বছর আগে। তিনিও ছিলেন এক সুদক্ষ নাবিক। যে সময় ম্যাগেলান পৃথিবী সত্যি সত্যি গোল কিনা পরীক্ষার জন্য মেতে উঠেছিলেন ইনিও তার কিছু আগে অনুরূপ আর একটি পরীক্ষার জন্য মেতে উঠেছিলেন। ব্যাপারটা ছিল এই রকম: ইয়োরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসতে হলে তখন সকলকেই পূর্ব মুখে পারস্যদেশের (এখন যাকে বলা হয় ইরান) ভিতর দিয়ে আসতে হ'ত। কলম্বস ভাবলেন, পৃথিবী যদি সত্যি গোল হয় তবে তো পূর্বমুখে না গিয়ে ক্রমাগত পশ্চিম মুখে চললেও একদিন ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষের কাছাকাছি কোথাও পৌঁছনো যাবে। কিন্তু তাঁর ধারণা ঠিক কিনা প্রমাণ করতে হলে তো হাতে-নাতে পরীক্ষা করবার জন্য জলে জাহাজ ভাসাতে হবে। কিন্তু তিনি গরীব লোক, জাহাজই বা কোথায় পাবেন, আর মাঝিমাল্লা—সঙ্গী-সাথীই বা কোথায় পাবেন? তিনি তখন ইয়োরোপের নানা দেশের ধনী লোকদের দুয়ারে ধর্ণা দিতে শুরু করলেন।

শেষে পর্তুগালের রাজার কাছে আসতেই রাজার মনে হ'ল, এ পরীক্ষাটা তো মন্দ নয়। তিনি তাঁর মন্ত্রীদের ওপর ব্যাপারটা বিবেচনার ভার দিলেন। মন্ত্রীরা ছিলেন অত্যন্ত চতুর। তাঁরা ভাবলেন, এমন একটা আবিষ্কার যদি সম্ভবই হয় আর পর্তুগালের রাজকোষ থেকে তার জন্য টাকা ঢালা হয় তা হলে একজন বিদেশীকে কেন সে গৌরবটা দেওয়া হবে? এ গৌরব তো তাঁরাই নিতে পাবেন। কিন্তু কলম্বস এ বিষয়ে বহুদিন থেকে ভাবনা-চিন্তা করে আসছেন। হিসেবপত্র, নক্সাটক্সা সব তাঁর তৈরি। প্রয়োজন শুধু কিছু অর্থসাহায্যের। মন্ত্রীরা কলম্বসকে ডেকে ঐ সব নক্সা, হিসেবপত্র দাখিল করতে বললেন,—বললেন, ওগুলো আগে আমরা পরীক্ষা করে দেখি, তারপর তোমাকে জানাব কি হয়। কলম্বস সরল বিশ্বাসে সেগুলো তাঁদের হাতে তুলে দিলেন। মন্ত্রীরা সেটা দেখেশুনে, কলম্বসকে না জানিয়ে, কয়েকজন পর্তুগীজ নাবিককে সেগুলো দিয়ে রওনা করিয়ে দিলেন পশ্চিম দিকে। কিন্তু তাঁদের সে কুমতলব হাসিল হ'ল না। পর্তুগীজ নাবিকরা যাত্রা করার কয়েকদিনের মধ্যেই সমুদ্রে শুরু হ'ল প্রচণ্ড ঝড়-তুফান, জাহাজ নিয়ে এগোয় কার সাধ্যি? তারা বহু কষ্টে ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় জাহাজগুলিকে নিয়ে পর্তুগালে ফিরে এল।

খবরটা কিন্তু কলম্বসের কাছে অজানা রইল না। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এমন নামকরা একটা

দেশের কর্তারা এমন বিশ্বাসঘাতক! এ দেশে আর একদিনও থাকা নয়।

কলম্বস চলে এলেন স্পেনে। স্পেনের রাজা তখন ফার্ডিনাণ্ড। কলম্বস এবার তাঁর সাহায্যপ্রার্থী

স্পেনের রাণী ইজাবেলা ও কলম্বস।

হলেন। দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চলতে লাগল। অবশেষে সাত বছর পরে তাঁর আগ্রহ দেখে রাণী ইজাবেলার কেমন দয়া হ'ল। তিনি রাজাকে বলে তিনটি জাহাজের ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই সঙ্গে রাহাখরচের সমস্ত টাকাও দিলেন আর ঠিক করে দিলেন কারা হবে তাঁর মাঝিমাল্লা, কারা হবে সঙ্গী-সাথী। অবশ্য তারাও রাজার কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা পেল এবং সেই সঙ্গে হুকুমও পেল কলম্বসের সঙ্গে যাবার।

ঐ তিনখানা জাহাজ—পিণ্টা, সাণ্টামেরিয়া আর নিনা এবং ১২০ জন মাঝিমাল্লা-সঙ্গী নিয়ে কলম্বস অজানা সমুদ্রের পথে রওনা দিলেন ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে।

জাহাজ ভেসে চলেছে, চলছে ক্রমাগত পশ্চিম দিকে মুখ করে, কিন্তু পথ আর ফুরোয় না। ক্রমাগত ৭০ দিন জাহাজ চালিয়েও কোন ডাঙ্গার সন্ধান পাওয়া গেল না। আসলে কলম্বস হিসেবে মস্ত একটা ভুল করেছিলেন। পৃথিবীর আয়তনটা যত বড় তিনি সেটাকে তার এক-তৃতীয়াংশ মনে করেছিলেন। কাজেই যে সময়ের মধ্যে তাঁর যাত্রা সম্পূর্ণ হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন তার কিছুই হ'ল না। শেষে তাঁরা এমন একটা জায়গায় এসে পড়লেন যেখানে এত অজস্র মোটা মোটা জলজ গাছ জলের মধ্যে ভিড় করে আছে যে তাদের কাটিয়ে জাহাজ চালানোই প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠল।

কলম্বসের সঙ্গীসাথীরাও ইতিমধ্যে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। দেশের রাজার হুকুমে আর মোটা টাকা মজুরীর লোভে তারা রওনা হয়েছিল, কিন্তু এমন যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে তা তারা কোনদিন ভাবে নি। শেষে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে বলে ঠিক করল। কেউ কেউ বলল, না, শুধু বিদ্রোহ করলেই হবে না, কলম্বসকেও মেরে ফেলতে হবে। ঐ লোকটার জন্যই তো আমাদের আজ এই দুর্দশা!

কলম্বস তাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে ক্রমাগত আশ্বাস দিতে লাগলেন—ভয় নেই, আর দেরী হবে না। আমার হিসেবে ভুল হতে পারে না। ২।৪ দিনের মধ্যেই আমরা ভারতবর্ষের ডাঙ্গা নিশ্চয়ই দেখতে পাব।

আর সত্যিই তাই হ'ল। পরদিনই দেখা গেল আকাশে কতকগুলি পাখি উড়ে যাচ্ছে, সম্ভবত সী-গাল্ পাখি, যারা সমুদ্রের তীরে তীরে উড়ে বেড়ায়। শুধু তাই নয়, জলের দিকে তাকিয়ে দেখা গেল এমন কতকগুলি জিনিস জলে ভেসে আসছে যা ডাঙ্গায় ছাড়া দেখা যায় না। যেমন কতকগুলি গাছের ডাল, কয়েকটা ফুল, এমন কি একটা লাঠি, যার গায়ে মানুষের হাতের খোদাই করা কারুকাজ রয়েছে। কলম্বস বললেন, দেখ, নিশ্চয়ই সামনে ডাঙ্গা আছে, এবং সেখানে মানুষের বসতিও আছে। নইলে এ সব চিহ্ন কি করে দেখা যেতে পারে? এ সবই তো ডাঙ্গার চিহ্ন!

নাবিকেরা বিদ্রোহ করবে ঠিক করল।

৭১ দিনের মাথায় সত্যিই কলম্বসের তিনখানা জাহাজ একটা দ্বীপে এসে নোঙর করল। কলম্বস ভাবলেন তাঁরা ভারতবর্ষে পৌঁছে গেছেন, দ্বীপটি ভারতেরই সংলগ্ন কোন দ্বীপ। আসলে কিন্তু তাঁরা নেমেছিলেন বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কাছে।

দ্বীপে নামতেই ওখানকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে দেখা। তারা তো কখনও সাদা চামড়ার মানুষ দেখে নি, আর এত জাঁকজমকওয়ালা পোশাক বা অত বড় বড় জাহাজও কোনদিন দেখে নি। তারা ধরে নিল এরা নিশ্চয়ই দেবতা, খোদ স্বর্গ থেকেই ওদের দ্বীপে নেমে এসেছেন ওদের ধন্য করতে। তখন কি খাতিরটাই না পেলেন কলম্বস আর তাঁর সঙ্গীরা!

কিছুদিন ওখানে কাটিয়ে পাশাপাশি আরও কয়েকটা দ্বীপ ঘুরে কলম্বস সেবারের মত স্পেনে ফিরে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন প্রচুর ধনরত্ন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে তিনি ভারতেই (ইণ্ডিয়া, বা ওঁদের ভাষায় ইণ্ডিজ্) গিয়েছিলেন, যদিও তখনও কিন্তু তিনি খাস আমেরিকার মাটিতে পা দেন নি। তবু তিনি ঐ লোকগুলিকেই ইণ্ডিয়ান (ভারতবাসী) বলে মনে করলেন। আসলে যে ও-দেশটা ভারতবর্ষ নয়, ভারত থেকে অনেক দূরে, সে কথা আজ আমরা সবাই জানি। কিন্তু সেই থেকে ইয়োরোপের লোকের কাছে ওখানকার আদিবাসীরা ইণ্ডিয়ান নামেই পরিচিত হয়ে রইল, আর ঐ দ্বীপগুলোর নামও হয়ে রইল ইণ্ডিজ্। পরবর্তী কালে যখন সত্য কথাটা ধরা পড়ল তখন ইণ্ডিয়ান নামটা আর বদলানো হ'ল না, শুধু, ওদেশের লোকের গায়ের রঙটা একটু লালচে অর্থাৎ তামাটে বলে, তার আগে একটা রেড (লাল) শব্দ যুড়ে দেওয়া হ'ল। এখনও ওদের বলা হয় রেড ইণ্ডিয়ান। আর ঐ দ্বীপগুলোও তো পূর্বদেশের নয়—
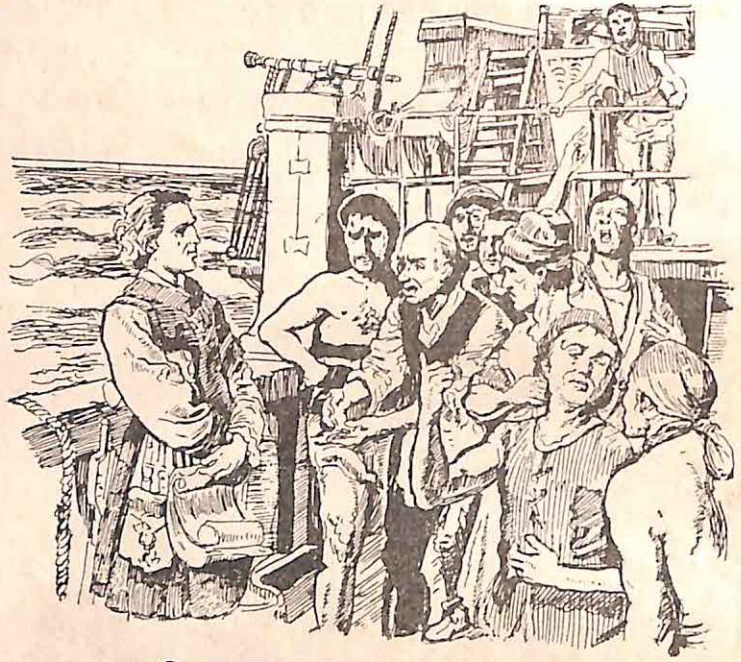
পশ্চিম দেশের। তাই ওগুলির নাম দেওয়া হ'ল ওয়েস্ট (পশ্চিম) ইণ্ডিজ্। সে নাম যে এখনও বহাল আছে তা তো তোমরা জানই, অন্তত ওদেশের দুর্দান্ত ক্রিকেট-খেলোয়াড়দের দৌলতে।

কলম্বস কিন্তু ঐ একবারই ভারতবর্ষ আবিষ্কারে বেরোন নি, আরও দু' দু' বার ঐ অঞ্চলে অভিযান চালিয়েছিলেন এবং শেষবার সত্যিই আমেরিকার মাটিতে নেমে বুঝতে পেরেছিলেন তিনি একটা বিরাট নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

কলম্বসের শেষজীবন কিন্তু তেমন সুখের হয় নি,—অনেক শত্রু জুটেছিল তাঁর নানা কারণে। এরা কেউই নিষ্ক্রিয় ছিল না, কলম্বসকে বিপদে ফেলবার জন্য রাজার কাছে ক্রমাগত তাঁর নামে সত্য-মিথ্যা নানারকম নালিশ জানাতে লাগল। শেষে রাজাও তাদের কথায় বিশ্বাস করে কলম্বসকে ধরে আনতে হুকুম দিলেন। রাজার লোকেরা তো ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে! কলম্বসকেও তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাজদরবারে নিয়ে এল। বেশ কিছুদিন কারাগারে কাটাতে হ'ল কলম্বসকে। শেষে, তাঁর বৃদ্ধ বয়স দেখে, রাজা তাঁকে ছেড়ে দেবার আদেশ দিলেন। কিন্তু কলম্বস এ অপমানের গ্লানি কোন দিনই আর ভুলতে পারেন নি। অত্যন্ত দারিদ্র্য আর মনোবেদনার মধ্যেই জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

আমেরিকা নাম কেন হ'ল

কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করলেন, তা হলে দেশটার নতুন নামকরণ তো তাঁর নাম দিয়েই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা তো হয় নি! তা হলে আমেরিকা নামটা কি করে এল? ওটা কি তবে ও-দেশের আদিবাসীদের দেওয়া নাম? না, তাও নয়। তা হলে?

আমেরিকার নামকরণ হয়েছে আমেরিগো ভেসপুচি নামে আর এক নাবিকের নাম থেকে। ইনিও কলম্বসের সমসাময়িক এবং, যতদূর জানা যায়, ইনি নাকি কলম্বসের জাহাজে মালপত্র সরবরাহ করতেন। অর্থাৎ আমরা যাদেরকে বলি ঠিকাদার, তাই আর কি! কিন্তু তাই বলে তাঁকে খাটো করে দেখলে চলবে না। ইনিও ছিলেন এক দুঃসাহসী নাবিক এবং কলম্বসের মতই ইনিও জাহাজ নিয়ে অজানা সাগরে পাড়ি দিতে ভয় পান নি। অবশ্য তার পুরস্কারও পেয়েছেন। দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলায় পৌঁছে তিনি সমুদ্রের তীর ধরে ধরে অনেক দূর ঘুরে বেড়ান এবং তখনই বুঝতে পারেন যে এটা ভারতবর্ষ নয়, একটা সম্পূর্ণ নতুন অজানা মহাদেশ। তাঁর এই ঘোষণার ফলেই বোধ হয় তাঁরই নাম দিয়ে মহাদেশটির নাম দেওয়া হয় আমেরিকা।

আমেরিগো ভেসপুচি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একখানা বই বার করেন। এর ফলেও তাঁর সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে অবশ্য দেখা যায় তাঁর সে-সব বর্ণনার সবগুলোই বিশ্বাসযোগ্য নয়, অনেক কাল্পনিক খোসগল্পও তিনি সত্যি বলে ঢুকিয়ে দিয়েছেন তাঁর বইএ। তবু বইটার যে কিছুটা মূল্য আছে তা মেনে নিতেই হবে।

এর পর আরো নানা লোক আমেরিকার নানা অঞ্চল নতুন করে আবিষ্কার করে গেছেন। দেশটা তো কম বড় নয়,—একটা মহাদেশ, তাও আবার দু'টো বড় বড় ভাগে ভাগ করা। ম্যাপ দেখলে মনে হয় যেন একটার গায়ে একটা ঝুলছে। এই সব আবিষ্কারকদের মধ্যে ক্যাবটের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উঁর

আমেরিকা, বিশেষ করে এখন যেটাকে ইউ. এস্. এ. বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বলা হয়, তার অনেকখানি আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁকেই দেওয়া যায়। তবে এ ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরী তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। ক্যাবটের পর তাঁর ছেলেও এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছিলেন।

প্রায় ঐ একই সময়ে দক্ষিণ আমেরিকার নানা অঞ্চলও একে একে আবিষ্কৃত হতে থাকে। তার মধ্যে যেটাকে বলা হয় ব্রেজিল সেটা আবিষ্কারে প্রধান ভূমিকা নেন পিঁজোঁ নামে এক স্প্যানিশ নাবিক। শোনা যায়, কলম্বসের অভিযানেও এই পিঁজোঁ ছিলেন তাঁর একজন সঙ্গী।

আফ্রিকা অভিযান

পৃথিবীর মহাদেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় এশিয়া, তারপর আমেরিকা (উত্তর আর দক্ষিণ), এবং তার পর তৃতীয় স্থান হচ্ছে আফ্রিকার।

দেশ তো নয়, মহাদেশ। আমাদের ভারতবর্ষের মত গোটা ১৪।১৫ দেশ বোধ হয় স্বচ্ছন্দে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু হলে কি হবে, এই সেদিন পর্যন্ত,—বছর চল্লিশ-পঞ্চাশ আগেও এই মহাদেশটি ছিল সবচেয়ে পিছিয়ে-পড়া অঞ্চল। লোকে তাই ওর নাম দিয়েছিল ডার্ক কন্টিনেন্ট —"তিমিরাচ্ছন্ন মহাদেশ"।

নাম শুনে কিন্তু মনে ক'রে ব'স না যে এই মহাদেশটায় সূর্যের আলো ঢুকত না,—তিমির অর্থাৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল এই দেশ! বরং ঠিক তার উল্টো। সূর্যের আলো খুব বেশি রকমই ছিল। এত বেশি যে মানুষের গায়ের চামড়া যাতে পুড়ে না যায় সেজন্য ওখানকার মানুষের গায়ের রঙ হ'ত ঘোরতর কালো। চামড়ার তলায় কালো কালো দানা থাকাতে তা সূর্যতাপ থেকে চামড়াকে অনেকটা রক্ষা করে, আর এই কালো দানাগুলোর জন্যই ওদেশের লোকেদের মধ্যে ফর্সা অর্থাৎ সাদা চামড়ার মানুষ দেখা যেত না। সাদা রঙের তো সূর্যের আলো সহ্য করার মত অত ক্ষমতা নেই! আসলে সভ্যতার আলো ছিল না বলেই ঐ নাম।

শুধু কি সূর্যের তাপ? দেশটাও ছিল অদ্ভুত। যেমন অরণ্যসঙ্কুল, তেমনি দুর্গম। হয়তো হাজার হাজার মাইল জায়গা যুড়ে ছড়িয়ে আছে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। এত ঘন সেই জঙ্গল যে তার তলায় হয়তো সূর্যের আলো পৌঁছতেই পারত না। বিষাক্ত বাতাস, বিষাক্ত রোগের জীবাণুতে ভরা ছিল সে-সব জঙ্গল। কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষে সেখানে টিকে থাকা সম্ভব হ'ত না। আবার কোথাও-বা ছিল বিরাট বিরাট মরুভূমি। হাজার হাজার মাইল যুড়ে শুধু বালি আর বালি আর বালি। এক ফোঁটা জল নেই, একটা গাছ নেই, একটা জীবন্ত প্রাণী পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া ভার! কোথাও-বা দু'-একটা খেজুর গাছ বা কাঁটাঝোপ কচিৎ কখনও দেখা যেত।

তাই বলে নদী, নালা, হ্রদও যে ছিল না ও-দেশে তা নয়, কোন কোন জায়গায় তা এত বেশি পরিমাণে ছিল যে সমস্ত জায়গাটাকেই মনে হ'ত একটা বিরাট জলাভূমি। এই সব হ্রদে, নদী-নালায় বাস করত বড় বড় হিংস্র কুমীর, কোথাও বা হিপোপটেমাস্ বা ঐ রকম কোন জলজন্তু। ডাঙ্গায়—মাঠে, জঙ্গলে এত বিচিত্র রকমের প্রাণী ঘুরে বেড়াত যাদের পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যেত না। সিংহ, গণ্ডার, বুনো মোষ, গরিলা, শিম্পাঞ্জী, বেবুন, জেব্রা, জিরাফ,

নীলগাই, হাতি, ন্যু, নানা জাতের হরিণ—কী না ছিল সেখানে? এদেরই মধ্যে বাস করত যে-সব মানুষ, স্বভাবতই তাদের স্বভাবও ছিল ঐ রকম বুনো। দুনিয়ার কোন সভ্য জাতের সংস্পর্শে না আসায় তাদের হালচালও ছিল অনেকটা আদিম জাতের মানুষের মত। কেউ কেউ তো মানুষের মাংস খেতেও ছিল সমান পটু!

কিন্তু পৃথিবীতে এমন একটা বিরাট ভূখণ্ড থাকবে অথচ সভ্য মানুষ তার কথা ভালো করে জানবে না, এ তো হয় না! তাই গত কয়েক শতাব্দী ধরেই একদল অসমসাহসী মানুষ ও-দেশে গিয়ে জায়গাটা ভালো করে চিনতে, ওখানকার নানা জায়গা আবিষ্কার করতে উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছিলেন। এঁদের সকলেরই যে একমাত্র উদ্দেশ্য স্রেফ নতুন নতুন রাজ্য আবিষ্কার করে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার বাড়ানো তা মনে করলে অবশ্য ভুল হবে। দেশটা ছিল নানা প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ। সেগুলোকে উদ্ধার করে নিজেদের ভোগে লাগানো, সেখানকার অর্ধ-সভ্য লোকদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো এবং বিশেষ করে বুনো লোকদের মধ্যেও খৃষ্টধর্মের মহিমাপ্রচার ছিল এই সব অভিযাত্রীদের অনেকেরই অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু এ-সব করতে গিয়েও তাঁরা পদে পদে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে সভ্য জগৎকে যে সব তথ্য যোগাড় করে দিয়ে গেছেন তার জন্য তাঁরা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আজ আফ্রিকা ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে। যারা ছিল অসভ্য বা অর্ধ-সভ্য, তাদের বংশধররাও আজ শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শক্তিশালী শত্রুদের সঙ্গে সমানে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। নানা দিকে প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু ঐ সব অভিযাত্রীরা যদি এগিয়ে না আসতেন তা হলে এর কতটা সম্ভব হ'ত বলা কঠিন। এঁদেরই কয়েকজনের কথা এবার শোনাব।

মাঙ্গো পার্ক

আজ থেকে প্রায় দু'শ' বছরের কাছাকাছি একটি ঘটনা নিয়ে আমার কাহিনী শুরু করছি। সালটা হচ্ছে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ, এবং স্থানটি হচ্ছে আফ্রিকার এক গহন অরণ্য—যার কথা একটু আগেই বলেছি।

মাথার ওপর আধখানা চাঁদের আলো; চারদিক্ নীরব--নিস্তব্ধ। শুধু অনেক দূর থেকে মাঝে মাঝে দু'-একটা বুনো জানোয়ারের কর্কশ শব্দ হাওয়ায়

মাঙ্গো পার্ক

ভেসে আসছে। এই পরিবেশের মধ্যে একটি বছর চব্বিশ বয়সের যুবক নিঃসঙ্গ অবস্থায় ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছেন। যুবকটির চেহারা দেখলেই বোঝা যায় তিনি এদেশের লোক ন'ন, ইয়োরোপের কোন অঞ্চল থেকে এসেছেন। তাঁর গায়ের রং দিব্যি সাদা—এখানকার লোকদের মত কালো নয় মোটেই। পরনে শুধু একটা প্যাণ্ট, তাও শতছিন্ন। গা একদম

খালি। সমস্ত শরীর ধুলো-কাদায় ছেয়ে গেছে। দেখলেই বোঝা যায় দীর্ঘ সময়—হয়তো দীর্ঘ কয়েক দিন ধরেই তিনি একটানা হেঁটে চলেছেন। চোখে-মুখে দারুণ ক্লান্তি, কিন্তু তবু তাঁর হঁ টার বিরাম নেই।

যুবকটির নাম মাঙ্গো পার্ক, বাড়ি স্কটল্যাণ্ডে। আসলে তিনি একজন ডাক্তার—জাহাজের ডাক্তার। দেশভ্রমণ তাঁর একটা নেশা আর এই নেশাই তাঁকে টেনে এনেছে এই বিপদ্‌সঙ্কুল গহন অরণ্যে। অবশ্য তাঁকে বেছে বেছে এ জায়গায় পাঠিয়েছে বিলেতেরই "আফ্রিকান অ্যাসোসিয়েশন" নামে একটি সমিতি। তিনি ঐ সমিতির সভ্য। তাঁর ওপর ভার পড়েছে নাইগার নদী আর তার আশপাশের দেশগুলি সম্বন্ধে সব রকম তথ্য সংগ্রহ করা।

আফ্রিকার গহন অরণ্যে নিঃসঙ্গ মাঙ্গো পার্ক

প্রথমটা অবশ্য তিনি একা রওনা হন নি। আফ্রিকায় পৌঁছেও গোড়ার দিকে এক ইংরেজ পাদরির অতিথি হয়েছিলেন। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে, আশপাশের লোকদের ভাষা কিছুটা শিখে নিতে হয়েছিল তাঁকে। তারপর একদিন দিনক্ষণ দেখে, সঙ্গে কিছু দরকারী সরঞ্জাম এবং নানারকম উপহার-সামগ্রী নিয়ে রওনা হয়েছিলেন কয়েকজন কাফ্রী সঙ্গীকে সঙ্গে করে।

প্রথম প্রথম ভালোই লাগছিল। বিচিত্র দেশ, বিচিত্র পরিবেশ আর বিচিত্র সেখানকার অধিবাসীদের হালচাল। মাঙ্গো পার্ক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেগুলো জেনে নিচ্ছিলেন। সেখানকার লোকগুলোও মাঙ্গো পার্ককে দেখে কম অবাক্ হয় নি। অনেক বুনো জন্তু তারা হামেশাই দেখে আসছে, কিন্তু এ রকম সাদা রঙের মানুষ তারা কখনও দেখে নি। তাদের কেউ কেউ কাছে এসে তাঁর গায়ের রঙ আসল না নকল পরীক্ষা করবার জন্য ঘষে ঘষে প্রায় চামড়া তুলে ফেলবার যোগাড় করছিল। কেউ কেউ ভাবছিল, এ তো মানুষ নয়, নিশ্চয়ই কোন দেবতা। এ দেবতার পূজো না করলে হয়তো ইনি রেগেমেগে তাদের সর্বনাশ করে ছাড়বেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে এক আজব প্রাণী ভেবে নানারকম অনিষ্ট করবার চেষ্টা করতেও ছাড়ে নি। মাঙ্গো পার্ক তাঁর আনা নানা উপহার দিয়ে তাদের খুশি করতে লাগলেন। উপহারের মধ্যে ছিল রঙিন পুতুল, তামাক, সুগন্ধি, বিলিতী মদ, রঙিন জামা—এই সব। এ-সব জিনিস তো তারা কোনদিন দেখে নি, কাজেই পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। তাদেরও কেউ কেউ তাঁকে পাল্টা উপহার দিল হাতির দাঁত, সোনা-দানা,—ইয়োরোপে যা অসাধারণ দামী বলে গণ্য হয়। এক গ্রামের সর্দার রাজা তো তাঁকে প্রথমটা খুবই খাতির-যত্ন করলেন। কিন্তু একটু পরেই তাঁর টুপি, ছাতা আর কোটটি দেখে রাজা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। সেগুলি

সব কেড়ে নিয়ে তাঁকে দূর্ দূর্ করে তাড়িয়ে দিলেন।

আফ্রিকার প্রখর রোদে সে দেশের লোকেরাই ত্রাহি ত্রাহি করে, শীতের দেশের লোক মাঙ্গো পার্কের অবস্থা যে সহজেই কাহিল হয়ে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি? তার ওপর মাথার টুপি, ছাতা, গায়ের জামা সবই খোয়া গেছে। তবু মাঙ্গো পার্ক তাঁর ওপর ন্যস্ত কাজ হাসিল করবার জন্য কোন বাধাই মানতে চাইলেন না।

ক্রমে ক্রমে বিপদ্ আরও বাড়তে লাগল। দুরন্ত দস্যুতস্করেরা এসে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাও লুঠ-পাট করে নিল। আর একবার একদল মূর দস্যু এসে তাঁকে তো প্রাণে মারবারই আয়োজন করে ফেলেছিল। দৈবক্রমে সে যাত্রা রক্ষা পেলেন তিনি। আর একদল মূর দস্যু এসে ঐ মূরদেরই শিবির আক্রমণ করায় সেই সুযোগে পালিয়ে পার পেয়ে গেলেন তিনি। ফলে এবার থেকে পার্ককে যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করে চলতে হ'ল। ঠিক হ'ল, দিনের বেলা কোন জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে কেবল রাতের বেলা পথ চলা হবে।

কিন্তু রাতে আবার হিংস্র জন্তুদের উৎপাতের ভয় আছে। কিন্তু পার্কের সঙ্গের একজন কাফ্রী সঙ্গী ছিল খুবই বিশ্বাসী, সে নানা বিপদের মধ্যেও পার্কের সঙ্গ ছাড়ল না।

এবার পথ আরও দুর্গম। একফোঁটা জল নেই, নেই এক টুক্‌রো খাবার। গাছের পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে জল আর খাদ্যের অভাব মিটিয়ে তাঁরা চলতে লাগলেন। এইভাবে নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে একদিন মাঙ্গো পার্ক সত্যি সত্যি নাইগার নদীর ধারে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন, যেদিকে নদী বইছে বলে তাঁদের ধারণা ছিল, তা ভুল। নদীর পাড় ধরে সত্তর মাইল পথ অতিক্রম করলেন তিনি। কিন্তু তারপর আর হাঁটা সম্ভব হ'ল না। দুরন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন তিনি। সেবারের মত কোন রকমে পার্ক ফিরে এলেন দেশে।

কিন্তু মন পড়ে আছে তাঁর আফ্রিকার অর্ধসমাপ্ত আবিষ্কারের দিকে। ভ্রমণের নেশাও কমে নি এক-রত্তি। আট বছর বাদে আবার একটা সুযোগ এল, আবার নতুন করে নাইগারের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন পার্ক।

যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করে চলতে হ'ল।

আবার তেমনি পদে পদে বিপদ্। কখনও বুনো জানোয়ারদের হাতে, কখনও জংলী মানুষ-খেকো কাফ্রীদের হাতে, আবার কখনও বা দুরন্ত রোগের সঙ্গে জীবন-মরণ লড়াই করতে করতে আবার একদিন তিনি নাইগারের বুকে নৌকো ভাসালেন মাত্র ১২ জন

সঙ্গীকে নিয়ে। ৪৫ জন সঙ্গী নিয়ে রওনা হয়েছিলেন তিনি, ৩৩ জন পথেই মারা পড়েছিল।

২৩০০ মাইল লম্বা নদী। পার্কের ইচ্ছে তার সবটাই পার হবেন। ১১০০ মাইল যাবার পর দেখা গেল বারো জন সঙ্গীর মধ্যে আরও পাঁচজন কমে গেছে। চারজন নৌকোর মধ্যেই, আর একজন কুমীরের পেটে প্রাণ দিয়েছে।

পার্ক তবু হাল ছাড়লেন না। কিন্তু এক অশুভ মুহূর্তে একটা ডুবো পাথরের সঙ্গে লাগল নৌকোর ধাক্কা, নৌকো ভেঙ্গে গেল। সেটাকে কোন রকমে পাড়ে তুলে মেরামত করতে চেষ্টা করছেন, ঠিক এমনি সময়ে একদল জংলী কাফ্রী এসে তাঁদের অতর্কিতে আক্রমণ করে বসল। আচম্‌কা আক্রান্ত হয়ে তাঁরা সে আক্রমণ ঠেকাতে পারলেন না। আহত হয়ে নদীর জলে পড়ে গেলেন পার্ক।

এইভাবে যে যাত্রা জীবিতাবস্থায় মাঙ্গো পার্ক শুরু করেছিলেন, তাঁর মৃতদেহ ভাসতে ভাসতে সে যাত্রা শেষ করল আর সেই সঙ্গে অভিযানের ইতিহাসে তাঁর নামটাও অমর অক্ষরে লিখে রেখে গেল।

ডেভিড লিভিংস্টোন

আফ্রিকা অভিযান এবং আবিষ্কারের জন্য সবচেয়ে বেশি কাজ করে গেছেন ডেভিড লিভিংস্টোন। ইনিও ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের লোক। জন্ম হয়েছিল ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু জীবনের পুরো তিরিশ বছরেরও বেশি সময় তাঁর কেটেছিল আফ্রিকার অনাবিষ্কৃত বিভিন্ন অঞ্চলে।

প্রথম জীবনটা, যাকে আমরা বলি বাল্যকাল,—লিভিংস্টোনকে কাজ করতে হয়েছিল কাপড়ের কলে। দিনে কম করে পনেরো ঘণ্টা কাজ করতে হ'ত তাঁকে সেখানে। তারই ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু তাঁর ছিল বই পড়ার অদম্য নেশা। এর পর নিজের চেষ্টায়
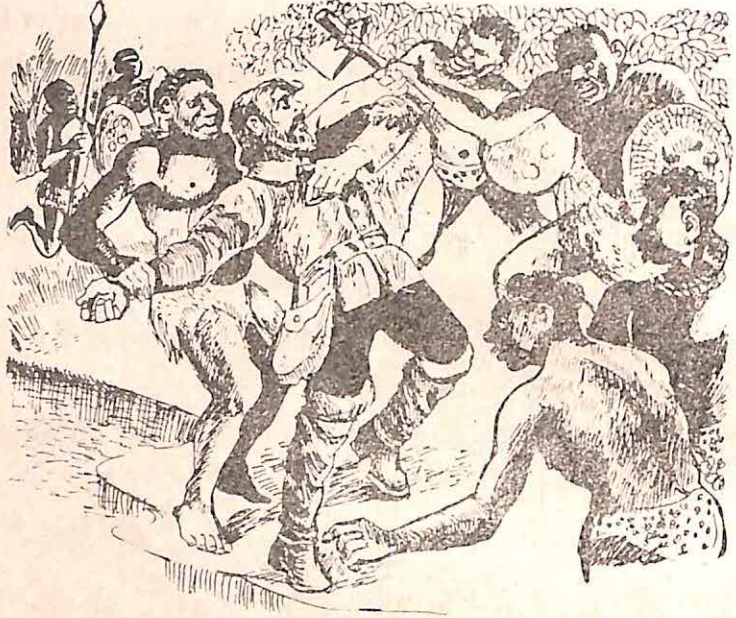
অতর্কিতে আক্রমণ করে বসল…

তিনি কলেজে ঢুকলেন এবং ২৭ বছর বয়সে গ্লাসগো থেকে ডাক্তারী ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

লিভিংস্টোন মিশনারী দলে যোগ দিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল চীনদেশে গিয়ে কাজ করবেন, কিন্তু মিশনের কর্তারা তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন আফ্রিকায়। তা ভালোই করেছিলেন, কারণ এই যোগাযোগ না ঘটলে আফ্রিকার আসল পরিচয় জানতে সভ্য জগৎকে হয়তো আরও বহুদিন অপেক্ষা করতে হ'ত।

আফ্রিকায় মিশনারীদের আস্তানায় পৌঁছে কিন্তু লিভিংস্টোনের প্রথম অভিজ্ঞতা তেমন মধুর হ'ল

না,—ধর্মপ্রচারের নাম করে ওঁরা সেখানে যা শুরু করেছিলেন তা আর কহতব্য নয়। এর ওপর ছিল নিজেদের মধ্যে দলাদলি। ব্যাপারস্থাপার দেখে লিভিংস্টোন ওঁদের আস্তানা ছেড়ে সোজা চলে এলেন বেচুয়ানাল্যাণ্ডের কুরুমানে, যেখানে ছিল ডাঃ মোফাটের আশ্রম। ডাঃ মোফাট তখন ইংল্যাণ্ডে, অগত্যা লিভিংস্টোনের কাজ হ'ল আশপাশের কাফ্রী গ্রামগুলো ঘুরে দেখা, তাদের ভাষা কিছু কিছু শিখে নেওয়া, আর তাদের চালচলন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া।

ডেভিড লিভিংস্টোন

দরাজ ছিল তাঁর দিল আর ডাক্তারি শাস্ত্রে ছিল তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। ফলে অল্পদিনেই ওঁর ওপর স্থানীয় লোকদের একটা অগাধ বিশ্বাস জন্মে গেল, বন্ধুত্বও হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কেউ কেউ হ'ল পরম ভক্তও। লিভিংস্টোন নিজেকে সাদা চামড়ার মানুষ বলে কোন রকম উন্নাসিক ভাব দেখাতেন না—তাঁর স্বভাবই ছিল না সে রকম। তিনি ওদের সঙ্গে একই ভাবে মিশতেন, একই রকম ঘরে থাকতেন, একই রকম খাবার খেতেন। এক কথায়, কি করে লোকের মন জয় করতে হয় সে গুণটি ছিল তাঁর অস্থিমজ্জার সঙ্গে মেশানো। বিপদে-আপদে তারা তাঁর সাহায্যের জন্য ছুটে আসত; লিভিংস্টোনও তাদেরই একজন হয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করতেন তাদের দুঃখকষ্ট দূর করতে। এর পর ইংরেজ সরকারের অনুমতি নিয়ে তিনি নিজেই কুরুমানের উত্তর-পূর্বদিকে মোবাট্সা প্রান্তরে একটা আশ্রম গড়ে তুললেন। এর পর ডাঃ মোফাটের মেয়ে মেরীকে বিয়ে করে তিনি ঐ আফ্রিকাতেই ঘর বাঁধলেন।

ঘর বাঁধলেন কথাটা বললে হয়তো ঠিক বলা হবে না। ধর্মপ্রচারের চেয়ে দেশটার ভৌগোলিক আবিষ্কারের দিকেই তাঁর আগ্রহটা যেন ছিল বেশি। এজন্য তিনি কী না করেছেন? দুস্তর মরুভূমি পার হয়েছেন, নতুন নতুন হ্রদ, নতুন নতুন নদী আবিষ্কার করেছেন। শুধু আবিষ্কার করা নয়, নদী কোথা থেকে বেরিয়ে কোথায় গেছে, কোন্ কোন্ নদী তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে—এ-সবও বার করেছেন। এক কথায়, গোটা আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভাগই তিনি চষে বেড়িয়েছেন,—একদিকে কেপ্ টাউন থেকে বিষুব-রেখা অঞ্চল, আবার আর একদিকে আটলান্টিক থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত। তাড়াহুড়ো করে নয়,—ধীরেসুস্থে, পথের যাবতীয় উল্লেখযোগ্য স্থান দেখতে দেখতে, তার ম্যাপ তৈরি করতে করতে এবং ভৌগোলিক বিবরণ লিখে লিখে পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে যেতে সাহায্য করেছেন তিনি। ওখানকার অধিবাসীদের রীতিনীতি, জীবনযাত্রার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে যেতেও ছাড়েন নি। এজন্য

তাঁকে কতবার কত ভীষণ বিপদে পড়তে হয়েছে, জলকষ্টে, খাদ্যাভাবে কাতর হ'তে হয়েছে, নাম-না-জানা রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হতে হয়েছে, কিন্তু তবু সুস্থ হয়ে আবার প্রচণ্ড মনোবল নিয়ে শুরু হয়েছে তাঁর অসমসাহসিক অভিযান। এইভাবে তিনি জাম্বেসী নদীর গতিপথ এবং ঐ অঞ্চলের প্রায় সমস্ত জলপথ খুঁজে বার করেছেন, আবিষ্কার করেছেন ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত—যা নাকি আমেরিকার

লিভিংস্টোনের অরণ্য-অভিযান

নায়গ্রা আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত বলে পরিচিত ছিল।

এরই সঙ্গে কতবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াইও করতে হয়েছে তাঁকে। নানারকম হিংস্র জন্তু—বুনো হাতি, গণ্ডার, কুমীর, হিপ্পো এবং সবার ওপরে আফ্রিকার দুরন্ত পশুরাজ সিংহের সঙ্গেও লড়তে হয়েছে। একবার তো একটা সিংহ তাঁর ঘাড়ের ওপর লাফিয়েই পড়েছিল। কোন রকমে গুলি

সিংহের কবলে লিভিংস্টোন

করে তাকে তিনি মারেন, কিন্তু মরার আগে সে তাঁর বাঁ-হাতটা কামড়ে টেনে প্রায় ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যায়। সেই জখম হাতটা, নানা চিকিৎসা সত্ত্বেও, গোটা জীবন ধরেই তাঁর একটা স্থ খুঁত হয়ে ছিল।

তখনকার দিনে আফ্রিকায় জংলী, অসভ্য মানুষেরও অভাব ছিল না। তাঁর আগে মাঙ্গো পার্কের এ রকম অভিজ্ঞতার কথা তো আগেই বলেছি। লিভিংস্টোন তাঁর ভালোবাসা আর অদ্ভুত চিকিৎসা-বিদ্যার সাহায্যে তাদেরও অনেকের হৃদয় জয় করেছিলেন। একবার এই রকম এক দুর্দান্ত সর্দার তাঁর সামনে এসে বলল, "জান আমি কে? আমি হচ্ছি কাতেমা, সর্দারদেরও রাজা। সমস্ত আফ্রিকা মুল্লুক আমার নামে কাঁপে।"

লিভিংস্টোন কোনদিন তার নাম না শুনলেও অত্যন্ত বিনীতভাবে তাকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন,

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আপনার নাম কে না জানে? সারা দেশ আপনাকে শ্রদ্ধা করে; বলে,—একটা লোকের মত লোক এই কাতেমা সর্দার।"

কাতেমা তো শুনে খুব খুশি। সে লিভিংস্টোনের কোন ক্ষতি তো করলই না, উপরন্ত তাঁকে অনেক খাবারদাবার আর লোকলস্কর দিয়ে সাহায্য করল। তবে তার একটা অনুরোধ ছিল। সাদা চামড়ার লোকেরা যেমন রঙচঙে পোশাক পরে, সে রকম একটা পোশাক যদি তিনি ওকে এনে দেন তা হ'লে ও খুব খুশি হবে। বলা বাহুল্য, লিভিংস্টোন তার সে সাধ পূর্ণ করেছিলেন।

এরই মধ্যে একদিন তাঁকে তাঁর স্ত্রীকে হারাতে হ'ল। স্ত্রীর মৃত্যুতে লিভিংস্টোন প্রথমটা খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন, কিন্তু যে কাজের ভার তিনি নিয়েছেন তা অসম্পূর্ণ রেখে যেতে তিনি রাজী ন'ন। আবার নতুন উদ্যমে শুরু হ'ল তাঁর অভিযান।

এই সময়ে আফ্রিকায় দাস-ব্যবসায়ীদের ছিল দারুণ উৎপাত। সশস্ত্র আরব দস্যুরা যখন তখন কাফ্রীদের গ্রামে ঢুকে মারধোর করে নিরীহ গ্রামবাসীদের বেঁধে ধরে নিয়ে যেত আর নানা জায়গায় চালান দিত ক্রীতদাস হিসেবে। লুঠপাট করতেও তাদের যেমন বাধত না, তেমনি মানুষ খুন করতেও দ্বিধা ছিল না একটুও। শুধু আরব দস্যু কেন, কোন কোন সাদা চামড়ার তথাকথিত "সভ্য" মানুষও এই দাস-ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। একবার লিভিংস্টোনের এ বিষয়ে একটা দারুণ অভিজ্ঞতা ঘটল।

লুয়ালাবা নদীর ধারে একটা বর্ধিষ্ণু গ্রামে এসে

সঙ্গীরা অসুস্থ লিভিংস্টোনকে ঝোলায় করে নিয়ে চলেছে।

পৌঁছেছেন তিনি। গ্রাম না বলে শহরই বলা যায় তাকে। সেখানে একটা বড় হাট বসত। আশপাশের মেয়ে-পুরুষরা তাদের জিনিসপত্র কেনাবেচার জন্য সেখানে এসে জড় হ'ত। সেখানে একটা সুবিধে-মত নৌকো যোগাড় করার জন্য বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করছেন লিভিংস্টোন। একদিন হাটবারে এসেছেন হাট দেখতে। বেশ কয়েকশ' লোক জড় হয়েছে হাটে বেচাকেনার উদ্দেশ্যে। হঠাৎ একদল আরব দাস-ব্যবসায়ী এসে হাজির এবং, বলা নেই কওয়া নেই, বেপরোয়া বন্দুক চালাতে শুরু করল হাটের লোকদের মধ্যে,—বিশেষ করে মেয়েদের ওপর। দেখতে দেখতে লুটিয়ে পড়ল শত শত প্রাণ, রক্তে ভেসে গেল সমস্ত হাট। লিভিংস্টোন প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু একা তিনি কতজনকে ঠেকাবেন ? দস্যুরা প্রায় শ' চারেক লোককে খুন করে লুটের ভাগ নিয়ে চলে গেল।

এর পরেই লিভিংস্টোনের জীবনের পথে একটা নতুন মোড় দেখা দিল। এই জঘন্য দাস-ব্যবসাকে তিনি পৃথিবী থেকে নির্মূল করে দিয়ে যাবেন। তিনি স্বচক্ষে-দেখা সমস্ত ব্যাপারটার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাঠিয়ে দিলেন বিলেতে। এতে ফল হ'ল। দাস-ব্যবসার প্রতি রুখে দাঁড়াল শিক্ষিত মানুষের দল। শুরু হ'ল প্রচণ্ড আন্দোলন আর তারই ফলে ভাঁটা পড়ল এই জঘন্য দাস-ব্যবসায়ে। লিভিংস্টোনের জীবনের এটাও একটা মস্ত কীর্তি।

ধীরে ধীরে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল। আফ্রিকার দুরন্ত রোগ তাঁর শরীরেও বাসা বেঁধে-ছিল, শুধু মনের জোরে তিনি তাকে ঠেকিয়ে রেখে-ছিলেন। প্রত্যহ তিনি ডাইরীতে সব কথা লিখে রাখতেন। ২৭শে এপ্রিল, ১৮৭৩। এই দিনই তাঁর শেষ ডাইরী লেখা। তারপরও অবশ্য তিনি দিন চারেক বেঁচে ছিলেন, কিন্তু ডাইরী লেখার আর ক্ষমতা ছিল না। ১লা মে তারিখে তাঁর সঙ্গীরা দেখল লিভিংস্টোন তাঁর বিছানার পাশে হেলান দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন, দেহ প্রাণহীন। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতেই তাঁর জীবনাবসান হয়েছে।

মৃতদেহটি যতটা সম্ভব রোদে শুকিয়ে নিয়ে তারপর কাপড়ে ঢেকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল তাঁর স্বদেশে। লণ্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে এনে তা সমাহিত করা হ'ল। আজও তিনি সেখানে কবরের নীচে শুয়ে আছেন ; কিন্তু আফ্রিকায়, যাদের তিনি ছেড়ে এলেন, তারা বলত,—ওঁর দেহটাই শুধু আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি, হৃদয়টা কিন্তু আমাদের এখানেই রয়ে গেছে।

বিদেশী, তথাকথিত "অসভ্য" বলে যারা সভ্য সমাজে পরিচিত,—তাদের কাছ থেকে এমন সম্মান পাওয়া বড় কম কথা নয়।

সাহারা-অভিযান

আফ্রিকার গহন অরণ্য, হিংস্র জন্তুজানোয়ার আর জংলী মানুষদের কথাই এতক্ষণ বলেছি, কিন্তু আফ্রিকার যে একটা বিরাট অংশ যুড়ে ছড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক মরুভূমি সাহারা, পৃথিবীতে যার যুড়ি নেই, তার কথা বলা হয় নি। প্রকাণ্ড বলে প্রকাণ্ড ? অ্যাটলাস খুলে দেখ, আমাদের ভারতবর্ষের মত গোটা কয়েক ভারতবর্ষ ওর মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা যায়।

অদ্ভুত রাজ্য এই সাহারা। যেদিকে তাকাও শুধু বালি, বালি আর বালি। সমুদ্রের মতই তার কূল-কিনারা খুঁজে পাওয়া মুশ্‌কিল। বছরের পর

সাহারার বুকে দল বেঁধে উটের পিঠে…

বছর কেটে যায়, এক ফোঁটা বৃষ্টির জল সেখানে পড়ে না। ফলে গাছপালা কিছুই জন্মাতে পারে না। শুধু ক্বচিৎ কোন জায়গায় হয়তো এক-আধটা মনসা জাতের গাছ চোখে পড়তে পারে। ইংরেজিতে এগুলিকে বলে ক্যাক্‌টাস্। মনসা গাছের শিকড় খুব লম্বা, ফলে বালির অনেকখানি নীচে নেমে গিয়ে ওরা একটু-আধটু রস টেনে নিতে পারে। আর, ওদের পাতাগুলোও, জান তো, খুব চ্যাপ্টা আর পুরু। ফলে তা দিয়ে ঐ কষ্ট-করে-পাওয়া জলকণা ওরা বেশ কিছুটা ধরে রাখতে পারে।

যেখানে জল নেই, নেই কোন গাছ-পালা, সেখানে জনপ্রাণীও থাকতে পারে না। থাকা সম্ভবও নয়। তবে একেবারে বাইরের দিকে ক্বচিৎ ত্‌'-একটা পোকা-মাকড়, সাপ, গিরিগিটি বা বিছে জাতীয় জীব হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু একটু ভিতরের দিকে গেলে একদম ফাঁকা।

তবে একটা কথা এখানে বলা দরকার। সাহারা আগাগোড়া অফুরন্ত বালির রাজ্য হ'লেও মাঝে মাঝে একটু ব্যতিক্রমও আছে। কোন কোন জায়গায় বালি থেকে বালিয়াড়িও যেমন আছে, তেমনি সেই বালি শতাব্দীর পর শতাব্দী জমে জমে সৃষ্টি করেছে বেলে পাথর আর তা পাহাড়ের চেহারা নিয়ে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। আবার কোথাও বা রয়েছে গভীর খাদ। আর, সবচেয়ে বড় কথা, ক্বচিৎ কোন কোন জায়গায় বালির গভীর নীচে জলস্রোত বা ঝরণাও রয়েছে। সেই জলস্রোতের ওপরকার বালি স্বভাবতই কিছুটা উর্বর। ফলে খেজুর গাছ প্রভৃতি জন্মে জায়গাটাকে একটা স্নিগ্ধ গ্রামের রূপ দিয়েছে। বিরাট মরুভূমির মধ্যে এগুলিই যেন বিধাতার আশীর্বাদ। মরুবাসীরা এই সব গ্রামেই আস্তানা গাড়ে। আমরা এগুলিকে বলি মরূদ্যান অর্থাৎ মরুভূমির বাগান। ইংরেজিতে এগুলিকেই বলা হয় ওয়েসিস্।
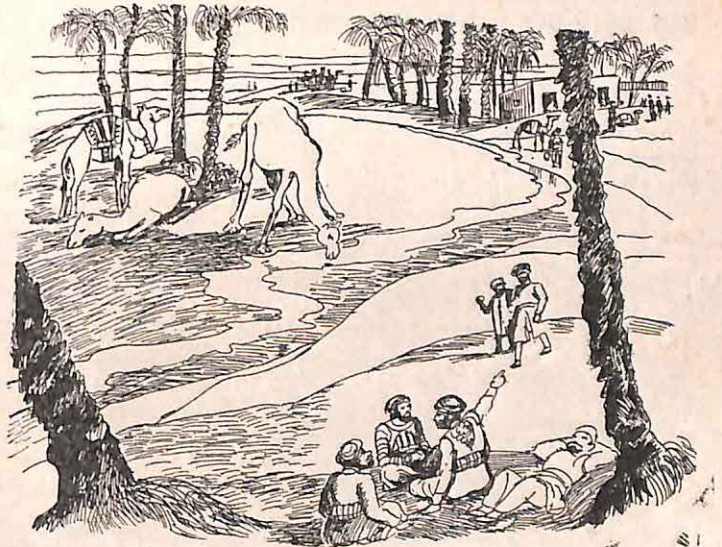
মরূদ্যান

এই সব মরূদ্যান ইতস্তত ছড়ানো আছে বলেই বিরাট সাহারা মরুভূমিতে মানুষের বাস একেবারেই অসম্ভব হয় নি। তবে ঐ সব মরুবাসীরা বেশির ভাগই যাযাবর। এক মরূদ্যানে কিছুদিন কাটিয়ে কিছুদিন পরেই আবার বেরিয়ে পড়ে নতুন

আস্তানার সন্ধানে। এক জায়গায় বেশিদিন থাকলেই তো খাবারদাবার নিঃশেষ হয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে থাকে কিছু ছাগল এবং বিশেষ করে উট। উটই যে মরু-অঞ্চলের প্রধান সম্বল তা তো সবাই জানি। উট ছাড়া ওদের একদণ্ডও চলে না।

এই সব ভ্রাম্যমাণ যাযাবর লোকদের পেশা কি? এক কথায় বলা যায়, এদের প্রায় সকলেরই পেশা দস্যুবৃত্তি। চলতে চলতে কোন ভ্রাম্যমাণ পথিক-দলের সঙ্গে মোলাকাৎ হ'লেই তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিতে ওদের একটুও বাধে না। বিশেষত তাদের উটগুলো। অনেক সময় কোন মরূদ্যানে পৌঁছে যদি দেখে অন্য কোন যাযাবরের দল সেখানে আস্তানা গেড়েছে, তখন তাদেরকেও আক্রমণ করতে ছাড়ে না। তু' দলে লড়াই চলে। যারা জেতে, তারা অপর দলের
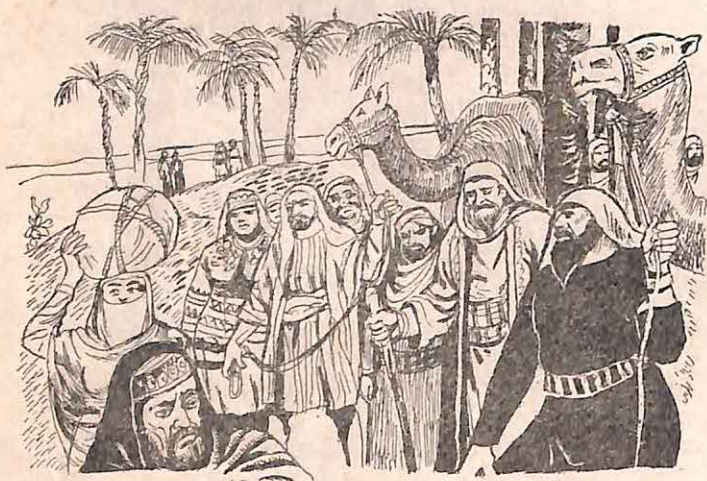
যাযাবরের দল মরূদ্যানে আশ্রয়ের খোঁজে

সব কিছু লুঠপাট করে নিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেয়। বেচারারা তখন হন্যে হয়ে ছোটে নতুন কোন আশ্রয়ের খোঁজে।

আরও ২।১টি ব্যাপার আছে। একটি হচ্ছে ও অঞ্চলের আবহাওয়া। দিনের বেলা মাটি অর্থাৎ বালি যেমন সহজেই তেতে ওঠে, রাত্রিবেলা আবার তেমনি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দিনের তাপমাত্রা কখনই ১১০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের নীচে নামে না, আবার রাত্রে ভীষণ শীত।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে মরীচিকা। প্রচণ্ড গরমে পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, হঠাৎ দেখা গেল সামনে অদূরেই স্বচ্ছ জল টল্ টল্ করছে। কিন্তু একটু এগোলেই দেখা যাবে, কোথায় জল? জলের চিহ্নমাত্র নেই! যেমন বালির সমুদ্র চলছিল তেমনি চলছে। মরুভূমি অঞ্চলে অনিয়মিত উষ্ণতার জন্য বাতাসের বিভিন্ন স্তরে আলোর বিভিন্ন প্রতিসরণের ফলেই এ-রকমটা ঘটে।

এ ছাড়া জলকষ্টের ব্যাপারটা তো আছেই। গরমের মধ্যে চলতে চলতে পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়। প্রতি মুহূর্তে জলের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য প্রাণ হাহাকার করে। কিন্তু কোথায় জল? সঙ্গে করে প্রচুর জল বয়ে নিয়ে না এলে যে-কোন মরুযাত্রীরই অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠবে।

এই হচ্ছে সাহারা! এমন জায়গায় কেউ কখনও ইচ্ছে করে বেড়াতে যায়?

যায় বৈকি! যারা অসমসাহসিক, অজানাকে জানবার জন্য যাদের কাছে কোন বাধাবিঘ্নই বাধা বলে মনে হয় না, জীবন বিপন্ন করেও তারা ঐ সব অঞ্চল আবিষ্কার করতে ছোটে। এমনই একজন লোকের কথা এখন বলব,—এঁর নাম ক্যাপ্টেন বুকানন্।

সাহারার কথা লোকে অবশ্য আগেই জানত, কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিক্ থেকে এই বিরাট মরুভূমি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ছিল অতি সামান্য। কেমন করে হবে? ঐ দুস্তর বালির সমুদ্র দিয়ে

হাজার হাজার মাইল পথ পেরিয়ে ওর এপার থেকে ওপারে যাওয়া যে সম্ভব, এ কেউ বিশ্বাসই করত না। বুকানন্ কিন্তু দু' দু'বার এই অসমসাহসিক অভিযানে নেমেছিলেন। প্রথম বার যাত্রা শুরু করেও শেষ করতে পারেন নি। কিন্তু সেবারেও সাহারার অর্ধেকটা পথ তিনি চষে বেড়িয়েছিলেন। তারপর নানা প্রতিকূল অবস্থায় আর এগোতে না পেরে তাঁকে ফিরতে হয়েছিল।

বুকানন্ অবশ্য লিভিংস্টোনের অনেক পরবর্তী কালের লোক। কিন্তু সাহারা অভিযানের জন্য তাঁর নামও আজ স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথম বারের অসমাপ্ত অভিযানের পর তাঁর দ্বিতীয় অভিযান শুরু হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভিযানের ধরণধারণেরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বুকানন্ও নানারকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়েছেন, আর নিয়েছেন একটি মুভি-ক্যামেরা—যা দিয়ে ইচ্ছেমত চলচ্চিত্র তোলা যায়। তখনও অবশ্য টকির আমদানী হয় নি, আমরা যাকে বলি নির্বাক্ চলচ্চিত্র বা "সাইলেণ্ট পিক্চার"—তা-ই কেবল তোলা যেত সে ক্যামেরায়। তবু, সে যুগের অভিযানে, এও ছিল একটা নতুন জিনিস। এ-সব ছবি ভালো তুলতে পারেন এমন একজন ভালো ক্যামেরা-ম্যানেরও দরকার। মিঃ গ্লোভার নামে একজন দক্ষ ক্যামেরা-ম্যান্ও জুটে গেল—যিনি এই দুঃসাহসিক অভিযানে যেতে রাজী হলেন।

কিন্তু এ-ই সব নয়। তাঁদের জন্য তো বটেই, তাঁদের সঙ্গে যে সব দেশী অনুচর যাবে তাদের সঙ্গে যাবে অনেক উট। তাদের খাবারদাবারও সঙ্গে নিতে হবে। কারণ একবার সাহারার মরুপ্রান্তরে ঢুকলে কিছুই পাওয়া যাবে না। আর, এদের প্রত্যেকেরই খাবার এক এক রকম। আর সেই সঙ্গে নিতে হ'ল প্রচুর জল। তা ছাড়া ওষুধবিষুধ ইত্যাদি টুকিটাকি আরও কত কি! দীর্ঘ ষোল মাসের উপযোগী রসদ সঙ্গে নিয়ে শেষে একদিন বুকানন্ দলবল সহ নাইজেরিয়ার ল্যাগোস্ থেকে যাত্রা শুরু করলেন। অবশ্য সে যুগের ল্যাগোসের সঙ্গে এখনকার ল্যাগোসের তুলনাই চলে না।

যত অগ্রসর হচ্ছেন, পথ ততই দুর্গম হচ্ছে। রোদের তাতে সর্বশরীর যেন ঝলসে যাচ্ছে। আবার রাতে তেমনি ঠাণ্ডা। দিনের গরম হাওয়া হাল্কা হয়ে যখন ওপরে উঠে যায়, তখন তার জায়গায় ছুটে আসে আশপাশের ঠাণ্ডা হাওয়া। ফলে সৃষ্টি হয় ঝড়। ঝড় একা আসে না, সঙ্গে নিয়ে আসে রাশি রাশি উড়ন্ত বালি। সে বালি চোখে এসে পড়লে চোখ অন্ধ হয়ে যায়, নাকে ঢুকলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, আর গায়ে লাগলে তার ঘষায় ঘষায় সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। কখনও কখনও সে ঝড় দেখা দেয় ঘূর্ণিবায়ুর চেহারা নিয়ে। বালির রাশি পাক খেয়ে খেয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থামের মত আকৃতি নিয়ে ভীমবেগে ছুটে আসে। তাকে বলা হয় বালুস্তম্ভ। একবার তার খপ্পরে পড়লে আর বাঁচবার আশা নেই।

যাত্রা শুরুর অল্প পরেই এই সমস্ত বিপদ্ই একটার পর একটা দেখা দিতে লাগল। অবশ্য বুকানন্ এ-সবের জন্য তৈরি হয়েই এসেছিলেন। আগের বারের অভিজ্ঞতাও কাজে লাগছিল। কিন্তু তাঁর দেশী অনুচরেরা এ সব ঝুঁকি পোহাতে রাজী হ'ল না, একে একে তারা পালাতে শুরু করল। এমন কি শিক্ষিত উটগুলোও,—যাদেরকে বলা হয় "মরুভূমির জাহাজ,"—একে একে মারা পড়তে লাগল।

বুকানন্ তবু থামলেন না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোদ-ঝড় কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারল না। কত বার

এলেন আরও একদল কবি ও সাহিত্যিক—সাধারণ ভাবে যাঁদেরকে বলা হয় 'কল্লোল' ও 'কালিকলম'

সুধীন্দ্র নাথ দত্ত

পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী। অর্থাৎ কিনা ঐ তু'টি সাহিত্য-পত্রিকার মাধ্যমে তাঁরা লিখতে শুরু করেন। যাই হোক, আমরা এঁদের রবীন্দ্র-উত্তর যুগের লেখক বলেই মনে করব, কেন না এঁদের লেখার বড় কথাই হ'ল, রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা থেকে অন্য কিছু বলা। এই চেষ্টাতেই এঁরা সাহিত্যে নতুনত্ব আনলেন। এঁদের মধ্যে কবিতায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিত দত্ত প্রভৃতি। এঁদের প্রত্যেকের কবিতায় এক এক ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে। খুব অল্প কথায় সেটাকে বোঝানো যায় না।

কবিতা ছাড়াও, বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে দেখা দিল নতুনত্ব। একই সময়ে রবীন্দ্র-উত্তর লেখক-গোষ্ঠী তাঁদের গল্প-উপন্যাস লিখতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কয়লাকুঠির শ্রমিকদের কথা লিখলেন, জগদীশ গুপ্ত কঠিন বাস্তব জীবনের গল্প লিখলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখলেন একই সঙ্গে গল্প ও উপন্যাস—আর সেই সব গল্পের বিষয় নিয়ে এলেন প্রায় অপরিচিত সমাজের মানুষের মধ্য থেকে। বনফুল, পরশুরামের লেখায় পেলাম হাসির ও কৌতুকের হাল্‌কা রস, যার আড়ালে আছে ব্যঙ্গ বা সমালোচনা। এ ছাড়া অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—এঁরাও কবিতার সঙ্গে কথা-সাহিত্য রচনা করলেন। এই যুগের তিনজন বিখ্যাত

বুদ্ধদেব বসু

লেখক হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের কথা আগেও বলা হয়েছে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৬৮-৬৯)। বিভূতিভূষণ তাঁর 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসে গ্রাম বাংলার বাস্তব হাসিকান্না-ভরা ছবি,

শিশু ও বালক-চরিত্র সুন্দর ভাবে তুলে ধরলেন—যার স্বাদ বাংলা সাহিত্যে এর আগে কখনও পাওয়া

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

যায় নি। বালক অপু ও তার দিদি দুর্গার কথা কি ভোলা যায়? তারাশঙ্করের একখানি বিখ্যাত উপন্যাস হাঁসুলীবাঁকের উপকথা। তারাশঙ্কর তাঁর অন্যান্য লেখার সঙ্গে বেদে, ডোম, কাহার, বাউরি, বাগ্‌দি—এই সব সমাজের মানুষের জীবন-কথাও শুনিয়েছেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের পরিবেশে ঐ সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনকথা বলেছেন।

মোটামুটি ভাবে ওপরে আলোচিত এই সময়টাকে আমরা রবীন্দ্র-উত্তর যুগ বললেও বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ বলতে যা বোঝায় তাও এখান থেকেই শুরু। সাহিত্য সব সময় সমাজের ছবি, মানুষের বাস্তব জীবনের ও ঘটনার ছবি তুলে ধরে। নানা

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সময়ে দেশে ও পৃথিবীতে যে সব পরিবর্তন দেখা দেয় সাহিত্যে তার চেহারাও ফুটে ওঠে। এজন্য সাহিত্য হ'ল সেই যুগের ইতিহাসের দলিল। বহুদিনের হারিয়ে-যাওয়া ইতিহাস সাহিত্যেই খুঁজে পাওয়া যায়।

কি ভাবে সাহিত্যে নতুন যুগ এল

দু'টি বিরাট বিশ্বযুদ্ধ গোটা পৃথিবীকে কি কম অদল-বদল করেছে? ইয়োরোপের নানা দেশে তার প্রভাব যত বেশি আমাদের দেশে ঠিক ততখানি হয় নি, কারণ আমরা তো প্রত্যক্ষ ভাবে ঐ যুদ্ধের অংশীদার ছিলাম না। কিন্তু, তা না হ'লেও, এর ফলে এ-দেশেও আমাদের জীবনধারা বদলে গেল তার প্রভাবে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ল, জীবনধারণ করা আরও জটিল হ'ল, বেকার-সমস্যা দেখা দিল,—এর ওপর দেশবিভাগের ফলে

তাঁরা দুর্দান্ত আরব মরুদস্যুদের আক্রমণ কৌশলে এড়িয়ে গেলেন, যদিও তাদের লুঠপাটের চিহ্ন এখানে সেখানে চোখে পড়ল। কয়েকবার পড়লেন ক্ষুধার্ত পঙ্গপালের মুখে—মরুদস্যুদের চাইতেও যারা বোধ হয় বেশি ভয়ঙ্কর। যদিও তারা মানুষ খায় না,—গাছপালা, ক্ষেতের ফসলই তাদের লক্ষ্য—কিন্তু একসঙ্গে যখন কোটি কোটি পঙ্গপাল ঝাঁক বেঁধে উড়তে থাকে, তখন তার ভিতরে গিয়ে পড়লে জীবন্ত ফেরা প্রায় অসম্ভব।

এ ছাড়াও ছিল নানারকম অজানা বিপদ্। তুষার-রাজ্যে যেমন বরফের চাঁই ধ্বসে প'ড়ে তলাকার সব-কিছু ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়, সাহারারও কোন কোন জায়গায় তেমনি আছে পাহাড়ের মত বালির স্তূপ—যা যে-কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়তে পারে, এবং একবার তার তলায় পড়লে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে শেষ পর্যন্ত হবে জীবন্ত সমাধি। এ-রকম ধ্বসে-পড়া বালির স্তূপের খপ্পরেও তাঁদের একাধিকবার পড়তে হয়েছিল, কি করে যে রক্ষা পেলেন তা তাঁরা নিজেরাই যেন বুঝতে পারেন নি। আবার কোন কোন জায়গায় ছিল চোরাবালি। একবার তার মধ্যে পা দিলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যেতে হয়, উঠবার আর কোন উপায় থাকে না। বুকানন্ কয়েকবার এ রকম চোরাবালির পাল্লায় পড়েও ভাগ্যক্রমে উদ্ধার পেলেন।

তবু চলার বিরাম নেই। সঙ্গী গ্লোভার ক্রমাগত মুভি-ক্যামেরায় ছবি তুলে যাচ্ছেন, আর বুকানন্ চলতে চলতে যখনই কোন জীবন্ত গাছ বা প্রাণীর দেখা পাচ্ছেন তখনই তা সংগ্রহ করে তল্পীজাত করছেন—ক্যাক্টাস, পোকা-মাকড়, বিছে, গিরগিটি, এমন কি সাপও বাদ যাচ্ছে না।

এইভাবে অবশেষে সাড়ে তিন হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে সাহারার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে এসে পৌঁছলেন তাঁরা। মরুভূমি সম্বন্ধে কত যে অজানা তথ্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কত যে অজানা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হ'ল এই অভিযানে তার আর লেখাজোখা নেই।

বুকাননের পরে আরও কোন কোন অসমসাহসিক অভিযাত্রী সাহারায় অভিযান করেছেন। এমন কি একজন মহিলা-অভিযাত্রীও বাদ যান নি। তাঁরাও কম অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসেন নি। তবে বুকানন্ এ বিষয়ে একজন পথিকৃৎ বলে তাঁর কথাই শুধু বললাম।

মধ্য এশিয়ার টাকলা মাকান

সাহারা মরুভূমি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মরুভূমি, কিন্তু সাহারা ছাড়াও পৃথিবীতে বড় বড় মরুভূমি আরও অনেক আছে। আমাদের ভারতবর্ষেই

মরুরাজ্যের জাহাজ

তো আছে থর মরুভূমি। এশিয়ার গোবি মরুভূমিও কম যায় না। কিন্তু তাদের কথা এখন থাক, আমরা এবার বলব মধ্য এশিয়ার আর একটি বিরাট এবং ততোধিক ভয়ঙ্কর মরুভূমির কথা—টাকলা মাকান মরুভূমি।

এশিয়ার ম্যাপ্ খুললেই দেখা যাবে তার প্রায় মাঝামাঝি—তিব্বতের ওপরে আর সাইবেরিয়ার নীচে এক বিরাট মরুরাজ্য পড়ে আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিপদ্সঙ্কুল হচ্ছে টাকলা মাকান মরুভূমি। ছ'দিকে ছুই নদী,—একদিকে ইয়ারকান্দ, আর একদিকে খোটান। তারই মাঝখানে শ' ছুই মাইল যুড়ে পড়ে রয়েছে এই টাকলা মাকান। ও অঞ্চলের লোকেরা ওকে বলে "অজানা দেশ"।

টাকলা মাকান যুড়ে ছড়িয়ে আছে একটার পর একটা বালির পাহাড়। আর সে বালি এত নরম যে তার ওপর পা রাখলে যে-কোন মুহূর্তে ভিতরে তলিয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। শোনা যায়, এই মরুভূমি কিন্তু চিরকালই এমনটা ছিল না। প্রায় হাজার ছুই বছর আগেও কম করে সাতটা বড় শহর ছিল ওখানে। কিন্তু খরার দারুণ বালি জমে জমে শেষ পর্যন্ত সবই ঐ বালির গভীর নীচে চাপা পড়ে গেছে। অনেকের ধারণা ঐ বালি খুঁড়ে সে-সব শহরের কোনটা খুঁজে বার করতে পারলে সেখানকার রাশি রাশি ধনরত্ন হয়তো উদ্ধার করা যেতে পারে। সে চেষ্টা যে কেউ কেউ করে নি তা নয়। কিন্তু তাদের বেশির ভাগই আর জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে পারে নি। যে ২।৪ জন ফিরে এসেছে তারা তাদের অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা দিয়েছে তা শুনলে আতঙ্কে শরীর শিউরে ওঠে।

কিন্তু এ হেন ভয়ঙ্কর—ছুর্গম—বিপদ্সঙ্কুল মরুভূমিও মানুষের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। সেই অসমসাহসিক অভিযাত্রীর নাম ডক্টর স্বেন হেডিন (কেউ কেউ বলেন সোয়েন হেডিন), বাড়ি সুইডেনে।

বিদেশীদের মধ্যে স্বেন হেডিনই প্রথম মধ্যএশিয়ার প্রায়-অগম্য দেশগুলি আবিষ্কার করেছিলেন। এজন্য তাঁকে কত রকম বাধাবিঘ্ন, ঝড়ঝাপ্টা সহ্য করতে হয়েছিল তার বিস্ময়কর কাহিনী তিনি তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখে রেখে গেছেন। কখনও ছুরন্ত শীতের মধ্যে রক্ত-জমাট-করা বরফের রাজ্যে তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে, আবার কখনও-বা ঠিক উল্টো অবস্থায়—অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ডের মত মরুভূমির বুকে তাঁর কেটেছে দিনের পর দিন। কিন্তু ঐ অবস্থায়ও, যেখানেই গেছেন, সেখানকারই ম্যাপ্ তৈরি করেছেন, পথঘাট খুঁজে বার করেছেন, সেখানকার লোকদের সঙ্গে মিশে তাদের রীতিনীতি, জীবনযাত্রা-প্রণালী সংগ্রহ করেছেন, তাদের ভাষা শিখবারও চেষ্টা করেছেন। এক কথায়, পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার বাড়িয়ে দেওয়া বলতে আমরা যা বুঝি, তার অনেকখানিই করে গেছেন এই আশ্চর্য সুইডিশ ভ্রমণকারী ডঃ স্বেন হেডিন।

স্বেন হেডিন যাচ্ছিলেন মধ্য-এশিয়া থেকে তিব্বতের দিকে। বেশ খানিকটা এগিয়ে তাঁর সামনে পড়ল এই টাকলা মাকান। তিব্বতে পৌঁছতে হলে এটা পার হয়ে তবেই যাওয়া যেতে পারে এবং তাই তিনি করবেন বলে ঠিক করলেন।

ও অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে বার বার নিষেধ করল—অমন কাজটি করতে যাবেন না। এ কাজ মানুষের অসাধ্য, যারা চেষ্টা করেছে সকলেই প্রাণ হারিয়েছে। স্বেন হেডিন কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে অটল।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সত্যিই একদিন তিনি এই বিপদ্-সঙ্কুল মরুভূমি পার হবার জন্য যাত্রা শুরু করলেন। সঙ্গে নিলেন আটটা বড় বড় বলিষ্ঠ উট, কতকগুলি ভেড়া, কুকুর, মুরগী আর তাঁবু

ইত্যাদি সরঞ্জাম। এ ছাড়া দীর্ঘ পথ চলার উপযোগী খাবারদাবার আর জল তো নিতেই হবে। সঙ্গী হ'ল তাঁর এক বিশ্বাসী চাকর ইসলাম আর দু'জন উট-চালক। তাদের দু'জনের নামই কাশিম।

মরুভূমির ভিতর দিয়ে একটা লম্বা পাহাড় চলে গেছে। স্বেন হেডিন ঠিক করলেন এই পাহাড়ের তলা ঘেঁষেই তাঁরা চলবেন। প্রথম থেকেই পথ-যোড়া বালি আর বালি। মাঝে মাঝে ওরই মধ্যে ২।১টা পপলার বা টামারিস্কের ঝোপও চোখে পড়ল। এগুলি সবই গলা পর্যন্ত বালির ভিতর ডুবে আছে। কিন্তু একটু পরেই আশপাশের চেহারা একদম বদলে গেল। এবার আর গাছপালার চিহ্ন নেই। কোন জীবজন্তু, এমন কি পোকামাকড়ও চোখে পড়ে না। কাশিমদের একজনের এ অঞ্চল সম্বন্ধে একটু-আধটু অভিজ্ঞতা ছিল। সে বলল, এবার বাকি পথটুকু পার হতে দিন চার-পাঁচ লাগবে। স্বেন হেডিনেরও সেই রকমই ধারণা ছিল, তবু তিনি বলে দিলেন, দেখো, সঙ্গে যেন অন্তত দিন দশেকের মত জল থাকে। কারণ এবার থেকে আর এক ফোঁটা জলও পাওয়া যাবে না কোথাও। বলে দিলেন বটে, কিন্তু তাঁর কথামত কাজ হ'ল কিনা সেটা আর দেখা দরকার বোধ করলেন না, আর সেইখানেই হ'ল তাঁর মস্ত ভুল। তাঁর সঙ্গীরা আর অত জল বয়ে নেবার কষ্ট স্বীকার না করে পাঁচদিনের মতই জল নিয়ে পথের বোঝা হাল্কা করে নিল।

এর ফল একটু পরেই টের পাওয়া যেতে লাগল। বড় বড় বালির স্তূপ এবার বড় ঘন ঘন দেখা যেতে লাগল। সে কি সহজ স্তূপ? কোন কোনটা বিশ-পঁচিশ তলা বাড়ির সমান উঁচু। এক-একটা পার হতে প্রাণান্তকর পরিশ্রম। আর শুধু তাই নয়, পা ফেলতে হয় অতি সন্তর্পণে। একটু পা ফস্‌কালেই উটশুদ্ধু একেবারে স্তূপের তলায় চলে যেতে হবে।

শুরু হ'ল মরুঝঞ্ঝা

এর পর শুরু হ'ল মরুঝঞ্ঝা। উড়ন্ত বালির আঘাতে সর্বশরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতে লাগল। কোন রকমে নাক-কান গুঁজে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থেকেও রেহাই নেই। ঝড় থামলে দেখা গেল, তাঁদের জিনিসপত্র সব উধাও! কোথায় গেল? কে নিল? না, কেউ নেয় নি; ঝড়ে-ওড়া বালির তলায় সব চাপা পড়ে গেছে। বালি খুঁড়ে সেগুলি উদ্ধার করা হ'ল, কিন্তু অনেক কিছুই গেল হারিয়ে।

এদিকে ক্রমে জল ফুরিয়ে আসতে আসতে এক সময় সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল। পথশ্রমের ক্লান্তিতে আর জলতৃষ্ণায়
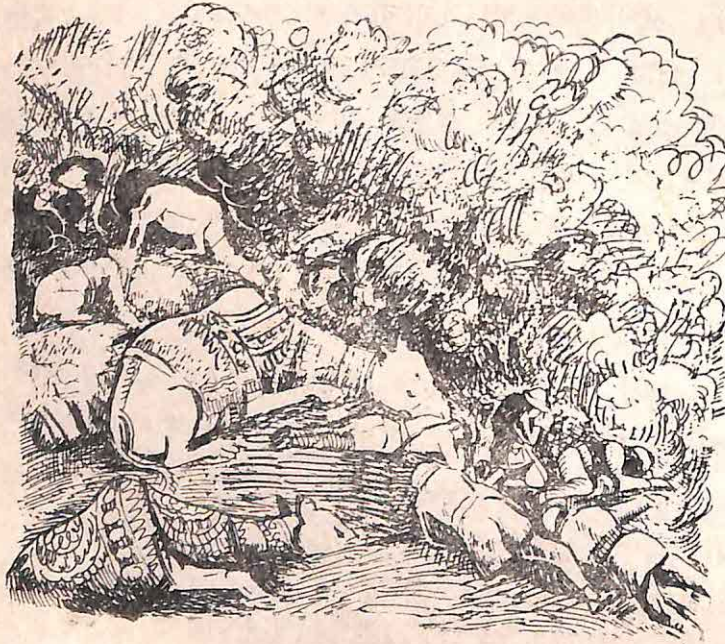
সবাই তখন প্রায় পাগল হয়ে উঠেছেন। উটগুলোও একটা একটা করে মরতে শুরু করেছে। স্বেন হেডিন আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, আগু-পিছু চিন্তা না করে সঙ্গে আনা মেথিলেটেড স্পিরিট, যা নাকি ভীষণ বিষাক্ত,—তাই খানিকটা ঢেলে দিলেন গলায়। পরক্ষণেই পক্ষাঘাত-গ্রস্ত রোগীর মত তিনি অসাড় হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

কিন্তু তখন যা অবস্থা, নিজেকে বাঁচাবার জন্যই সবাই ব্যস্ত। সঙ্গীরা তাঁকে সেখানেই ফেলে রেখে এগিয়ে গেল।

কিন্তু স্বেন হেডিন মরেন নি। মনে হ'ল আচ্ছন্ন ভাবটা একটু একটু করে কমে আসছে। তিনি টলতে টলতে একাই আবার এগিয়ে চললেন। সঙ্গীরা বেশিদূর যেতে পারে নি, খানিকটা গিয়ে বিশ্রাম করছিল। তিনি তাদের ধরে ফেললেন।

সঙ্গে একটা মাত্র ভেড়া তখনও অবশিষ্ট ছিল। ঠিক হ'ল তাকেই কেটে তার রক্ত পান করে তাঁরা পিপাসা মেটাবেন। সেটাকে কাটা হ'ল। কিন্তু কোথায় রক্ত? সে রক্ত শুকিয়ে এমন জমাট বেঁধে গেছে যে তা কারো পক্ষে পান করা অসাধ্য।

উট তো গেলই, ক্রমে সঙ্গীরাও একে একে বসে পড়তে লাগল। কিন্তু তাদের জন্য অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সেইখানেই তাদের ফেলে রেখে, পথে এক-একটা আলো নিশানা হিসেবে রেখে রেখে স্বেন হেডিন ও কাশিমদের একজন আরো এগিয়ে চললেন।

পথে এক জায়গায় একটা টামারিস্ক ঝোপ দেখে মনে হ'ল বুঝি পথ এবার শেষ হ'ল। কিন্তু না, সামনে আবার বালির সমুদ্র। তবু ওঁরা ঐ গাছের পাতা চিবিয়ে খানিকটা তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে কি তৃষ্ণা মেটে?

শেষে এক জায়গায় এসে কাশিমও শুয়ে পড়ল। স্বেন হেডিন কিন্তু তখনও আশা ছাড়েন নি। তাঁর মনে হ'ল দূরে একটা কালো রেখার মত দেখা যাচ্ছে! ঐ কি তবে নদী? হাঁটবার সাধ্য নেই, হামাগুড়ি দিয়ে তিনি সেই কালো রেখাটার দিকে এগিয়ে চললেন। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখেন, হ্যাঁ, এক সময় হয়তো ওটা নদীই ছিল কিন্তু এখন তা একেবারে
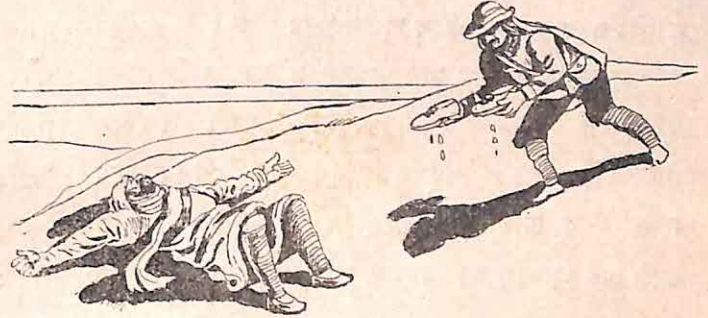
সেই জুতো জলে ভরে নিয়ে···

শুকনো খাত ছাড়া কিছুই নয়। তবু দমলেন না হেডিন, সেই শুকনো নদীই পার হবার জন্য চলতে লাগলেন—যদি ওপারে সামান্য জলরেখা থেকে থাকে এই আশায়। দু' মাইল নদী পার হতে ছ' ঘণ্টা সময় লাগল তাঁর। তারপর, আশ্চর্য কাণ্ড, সত্যিই দেখা গেল একটা ক্ষীণ জলরেখা তর্ তর্ করে বয়ে চলেছে বালির ওপর দিয়ে! অঞ্জলি ভরে সেই জল পান করলেন হেডিন। আঃ, কী অসীম তৃপ্তি! তারপর তাঁর হুঁশ হ'ল পথে কয়েক মাইল দূরে কাশিম পড়ে আছে। তিনি পায়ের জুতো খুলে সেই জুতো জলে ভরে নিলেন, তারপর ফিরে এসে

কাশিমকেও সেই জল পান করালেন। কাশিম জল পান করে একটু সুস্থ হ'ল বটে, কিন্তু তখনও তার চলবার মত শক্তি হয় নি। অগত্যা স্বেন হেডিন একাই নদীর ধার দিয়ে চলতে লাগলেন।

পথ এবার একটু সহজ হ'ল, কিন্তু খাবার যে কিছুই নেই! জলের মধ্যে ছিল কিছু বেঙাচি আর জলজ ঘাস। সেই বেঙাচি আর ঘাস খেয়েই কয়েক দিন কাটিয়ে দিতে হ'ল তাঁকে। এদিকে ইসলাম কিন্তু মরে নি। স্বেন হেডিনের আলোর নিশানা লক্ষ করে সে একদিন এসে হাজির হ'ল,—উটের পিঠে পরিত্যক্ত সাজসরঞ্জাম যতটা সম্ভব তুলে নিয়ে। তারপর কাশিমও এক সময় এসে জুটল তার সঙ্গে।

অবশেষে টাকলা মাকান জয় হ'ল। অভিযানের ইতিহাসে এ এক অভাবনীয় ঘটনা। আর, সবচেয়ে বড় কথা, এত বিপদ্-অপদের মধ্যেও স্বেন হেডিন কিন্তু তাঁর ডাইরীটা হাতছাড়া করেন নি। তারই ফলে এই আশ্চর্য অভিযানের কাহিনীর প্রতিটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লিখে যেতে পেরেছিলেন।

আবার আফ্রিকায়

লিভিংস্টোনের আবিষ্কার-কাহিনী বলতে গেলে সেই সঙ্গে আর একজন অসমসাহসী যুবকের কথাও বলতে হয়। তাঁর নাম হেনরী মর্টন স্ট্যানলী। ইনি ছিলেন আমেরিকার একখানি কাগজের মালিক।

এক সময়ে লিভিংস্টোন আবিষ্কারের নেশায় ঘুরতে ঘুরতে ভীষণ ভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ওষুধপত্র দূরের কথা, তাঁর খাবারদাবারও তখন ফুরিয়ে গেছে। চলবার শক্তিও নেই, উজিজি নামে একটা জায়গায় এসে তিনি প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।

এদিকে লিভিংস্টোনের কোনও খবরাখবর না পেয়ে তাঁর দেশের লোকেরা ভেবে অস্থির। কি হ'ল? কি হ'ল লিভিংস্টোনের? শুনে স্ট্যানলী বললেন, "আমি যাব ওঁর খোঁজে। খুঁজে বার করতেই হবে। এবং তা আমি পারবই।"

১৮৭১ সালে, স্ট্যানলীর বয়স তখন বছর তিরিশ,—তিনি এসে নামলেন জাঞ্জিবারে। খোঁজ্ খোঁজ্ খোঁজ্। আশপাশের দুর্গম জায়গাগুলি চষে ফেলতে লাগলেন স্ট্যানলী। শেষে একদিন সত্যিই এসে হাজির হলেন উজিজিতে। সেখানেই লিভিংস্টোনকে খুঁজে বার করলেন তিনি। ওঁরা কেউ কাউকে চিনতেন না। প্রথম সাক্ষাতেই স্ট্যানলী বললেন, "আমার মনে হচ্ছে আপনিই ডক্টর লিভিংস্টোন!" লোক চিনতে তাঁর ভুল হয় না।

স্ট্যানলীর যত্নেই সেবার লিভিংস্টোন সেরে ওঠেন, তার পর দু'জনে মিলে আফ্রিকার নানা অজানা অঞ্চল আবিষ্কার করতে করতে টাঙ্গানিকা হ্রদে গিয়ে পৌঁছান।

সেবারকার মত ফিরে এলেও স্ট্যানলী কিন্তু আবারও একবার গিয়েছিলেন আফ্রিকায়। আবিষ্কারের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। বহু নতুন নতুন আবিষ্কারের পর কঙ্গো নদীর মোহানাও আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। আর একবার আমিন পাশাকে (এডওয়ার্ড শ্নিৎজার) উদ্ধার করবার জন্যও মরণপণ করেছিলেন। আফ্রিকার আবিষ্কারের ইতিহাসে স্ট্যানলীর নামও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

বাংলা সাহিত্যের কথা

রবীন্দ্র যুগ ও রবীন্দ্র-উত্তর যুগ

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র যুগ বলে একটা কথা অনেকেই শুনেছ। এর অর্থ কি ? অর্থ হ'ল,—একটু ব্যাখ্যা করেই বলি। রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে কবিতা, গান, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের সব বিভাগেই লিখেছিলেন, এবং এই লেখার কাজ চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে। রবীন্দ্রনাথ প্রায় দু'টো শতাব্দী ধরে বাংলা সাহিত্য অধিকার করে ছিলেন। কাজেই তাঁর সাহিত্যরচনার যুগ তো নিশ্চয়ই রবীন্দ্র যুগ। তা ছাড়াও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ কতগুলো বিশেষ চিন্তা, ভাবনা, সুর—এইসব তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তৈরি করে দিয়েছিলেন। যেমন, তিনি ছিলেন আনন্দ ও সুন্দরের পূজারী। বা তিনি সব সময় আশা ও বিশ্বাস রাখতেন, কখনও হতাশায় ভেঙে পড়তেন না। একদল সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের এইসব ভাবনা নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করে সাহিত্য রচনা করেন। এঁরা রবীন্দ্র-অনুসারী বা রবীন্দ্র-প্রভাবিত লেখক। কাজেই এঁদের কালকেও আমরা রবীন্দ্র যুগ বলব। এঁদের মধ্যে কবি হিসেবে রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। উপন্যাস ও ছোটগল্পের লেখক হিসেবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি, প্রবন্ধলেখক হিসেবে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম করা যায়।

রবীন্দ্র যুগের পরেই আসে রবীন্দ্র-উত্তর যুগ। অর্থাৎ কিনা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগ। কিন্তু সাহিত্যে এই শব্দটিরও মানে একটু আলাদা। এখানে রবীন্দ্র-উত্তর বলতে বোঝায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য থেকে ভিন্ন সুর বা ধরনের সাহিত্যের যুগ। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ দিন বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে তাকে প্রভাবিত করে চলছিলেন। তাঁর জীবিতকালেই একদল কবি মনে করলেন রবীন্দ্রনাথের মতে ও পথে সাহিত্যচর্চা করলে তার মধ্যে নিজস্বতা থাকে না। কোনও লেখকের পক্ষেই আর একজনের অনুকরণ বা অনুসরণ করা গৌরবের নয়। তাই এঁরা রবীন্দ্র-নাথের উল্টো পথে চিন্তা করলেন। নিয়ে এলেন নতুন সুরের কবিতা। এঁদের হাতে—অর্থাৎ মোহিত-লাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম্—এই তিন কবির হাতে বাংলা কবিতায় প্রথম রবীন্দ্র-উত্তর যুগ তৈরি হ'ল।

রবীন্দ্র-উত্তর যুগের দু'টি ভাগ

এই যুগের আবার দু'টো ভাগ দেখা যায়। প্রথম ভাগে ওপরের তিন কবির কবিতা আর দ্বিতীয় ভাগে

সমাজে উদ্বাস্তু-সমস্যা বলে যে সমস্যা দেখা দিল সেটাও বড় কম সমস্যা নয়। এর আগে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল কত সহজ ও সরল! অল্প আয়ে মানুষের সংসার চলত। একজনের আয়ের ওপর নির্ভর করে চলত একটা বড় পরিবারের পোষ্যবর্গ। কিন্তু এই যুদ্ধ এমন ভাবে আমাদের সমাজে ওলট-পালট করে দিয়ে গেল যার ফলে তখন থেকে বাঁচার অর্থ ই দাঁড়াল লড়াই করে বাঁচা। মানুষের মনও এই সব নানা বিরোধী পরিবেশে সহজ, সরল, খোলামেলা থাকতে পারল না। মানুষের মনের এই জটিলতার জন্য সাহিত্যে, কবিতায়—সব ক্ষেত্রেই আমরা এই জটিলতা দেখতে পাই। তাই সাধারণ পাঠকের কাছে একালের কবিতা দুর্বোধ্য মনে হয়।
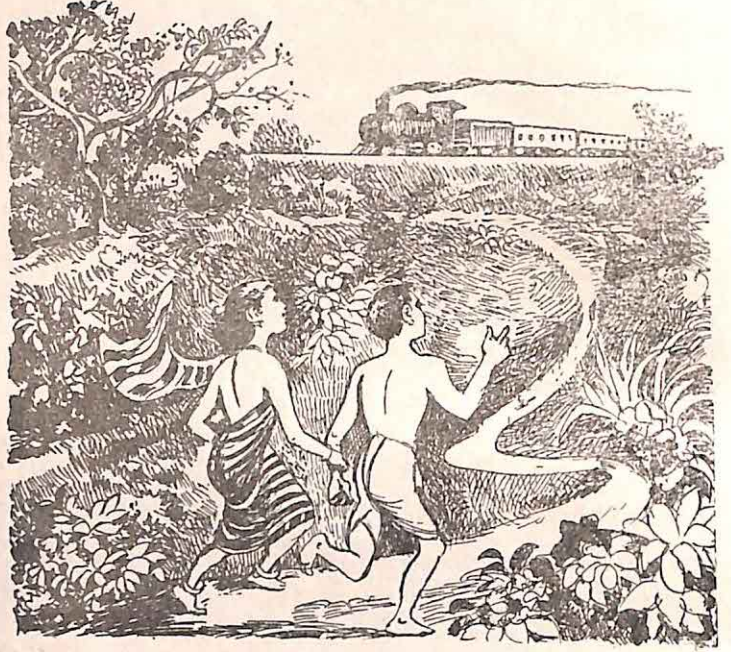
তা ছাড়াও আরও কারণ আছে। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা 'আধুনিক সাহিত্য' বার বার প্রভাবিত হয়েছে,—যেমন মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কিংবা তাঁদের আগেকার লেখকেরা হয়েছিলেন। আধুনিক বাংলা কবিতাও তেমনি ইংরেজি কবিতার প্রভাব পেয়েছে। পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে এজরা পাউণ্ড, টি. এস. এলিয়ট, ওয়াল্ট হুইটম্যান, উইসট্যান হ্যুগ আডন, স্টিফেন স্পেণ্ডার, সিসিল ডে লুইস প্রমুখ কবিদের দ্বারা আধুনিক বাংলা কবিতা অনেকাংশেই প্রভাবিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস্-এর চিন্তাধারা, রুশ ও চীনবিপ্লবের প্রভাব, বামপন্থী চিন্তাধারা—এ-সব বিষয় ও ঘটনা। এই সব কিছু মিলে মানুষের মন যখন পুরোনো যুগের সব চিন্তা, রীতিনীতিকে প্রায় অস্বীকার করতে চেয়েছে তখনই আধুনিক বাংলা কবিতা ও সাহিত্যের জন্ম হ'ল।

পথের পাঁচালির একটি দৃশ্য :
অপু ও দুর্গা রেলগাড়ি দেখতে ছুটেছে।

দেখা গেল কবিতাতে শুধু ছন্দ বা ভাষাতেই বদল হয় নি, বিষয়ের বদলও যথেষ্ট হয়েছে। এখন থেকে গদ্যের মতো কাটা কাটা ছন্দ লেখা হতে লাগল, আবার কবিতার মিল ও ছন্দও কোথাও কোথাও রাখা হ'ল। গদ্যেও ছোট ছোট বাক্যের মধ্যে বক্তব্যকে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা দেখা দিল। জীবনের সব রকম সমস্যা, নানা ধরনের চরিত্র, নানা মানুষের বর্ণনা গল্প-উপন্যাসে দেখা দিল। চোর, ফেরিওয়ালা, রেলের ভেণ্ডার, মধ্যবিত্ত মানুষ,—এমনি কত রকম চরিত্র এল সাহিত্যে! পাশ্চাত্য লেখক এমিল জোলা, সামারসেট ম্যম, বোদলেয়ার, মোপাসাঁ, গোর্কি, চেকভ, এমন কি পুরোনো যুগের বালজাক প্রভৃতিরও প্রভাব পড়ল সাহিত্যে। কবিতায় নতুন

নতুন শব্দ, দেশী ও বিদেশী নানা অচেনা শব্দের ব্যবহার হতে লাগল। কবিতায় মণীশ ঘটক, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, অজিত দত্ত, সমর সেন, হরপ্রসাদ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, আনন্দ বাগচী প্রমুখ কবিরা এলেন এবং এই ধারা পরবর্তী কাল—অর্থাৎ এখনকার কাল পর্যন্ত বয়ে চলল। প্রতিদিনই নতুন পদ্ধতিতে কবিতা লেখা চলছে। জন্ম নিচ্ছেন নতুন নতুন কবি। আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস তাই এখনও শেষ হয় নি।

সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে

এ-কথা অবশ্য সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। গল্প-উপন্যাস সাহিত্যে দেখা দিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ী, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, আশাপূর্ণা দেবী, বিমল মিত্র, সমরেশ বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, প্রমথনাথ বিশী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, জরাসন্ধ প্রমুখ লেখকেরা। এর পরেও নানা ঔপন্যাসিক ও গল্পকারের ছোঁয়ায় বাংলা সাহিত্য ভরে উঠেছে। তাঁরা নানাভাবে নতুনত্ব আনতে চেয়েছেন। এঁদের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম করা যায়।

গল্প-উপন্যাস ছাড়াও প্রবন্ধ সাহিত্য লেখা হয়েছে এ যুগে। এখনও হচ্ছে। অবশ্য যে কোনও প্রবন্ধ

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা : পটভূমি

বা গদ্য রচনাকেই কিন্তু 'সাহিত্য' বলা চলবে না। যে প্রবন্ধ রস অর্থাৎ আনন্দের স্বাদ নিয়ে আসে, যা পড়ে আমরা একই সঙ্গে জ্ঞান ও আনন্দের অনুভূতি লাভ করি তাকেই বলব প্রবন্ধ সাহিত্য। যেমন জগদীশচন্দ্র বসু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু আমরা তার মধ্যে কাব্যপাঠের মতই আনন্দ পাই। উপরন্তু জ্ঞানের কথা পাই জানতে।

রবীন্দ্র যুগে প্রমথ চৌধুরী (বীরবল), অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ লেখকের কথা তোমরা আগেই জেনেছ। রবীন্দ্র-উত্তর কালের প্রথম ভাগে আমরা প্রাবন্ধিক হিসেবে পাই মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাস, গোপাল হালদার, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, রাজশেখর বসু, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অমিতাভ চৌধুরী, ইন্দ্রমিত্র প্রমুখ লেখকদের। এঁরা কেউ কবিতা, কেউ বা সাহিত্য-

সমালোচনা কেউ বা ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যরস সবই এই সব প্রবন্ধে পাওয়া যায়।

নরেন্দ্র দেব

আধুনিক সাহিত্য নানা শাখায় ছড়ানো

আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্য গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ ইত্যাদি নানা শাখায় ছড়ানো। এর সঙ্গে আছে রম্য রচনা বলে এক জাতীয় সাহিত্য। এগুলো প্রবন্ধের মতো গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে লেখা নয়, হাল্‌কা সুরে লেখকের ব্যক্তিগত কথা ও মেজাজে ভরা লেখা। ফরাসী সাহিত্যের অনুসরণে বাংলায় এ-জাতীয় লেখার চলন হয়েছে। এদিক্ দিয়ে যাযাবর, সৈয়দ মুজতবা আলি প্রভৃতির কথা মনে পড়ে। প্রবন্ধের মধ্যে কিছু আছে গবেষণামূলক, আবার কিছু লেখায় পাই লেখকের নিজের ভাবনা-চিন্তার কথা। এ ছাড়াও ভ্রমণ-কাহিনী বা ভ্রমণসাহিত্য, অ্যাড্‌ভেঞ্চার-কাহিনী, বিজ্ঞান-ভিত্তিক লেখা, নাটক, নাট্যকাব্য—এমনি কত ধরনের লেখায় বাংলা সাহিত্য ভরে উঠেছে। তবে নাটকের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে রঙ্গমঞ্চের প্রসঙ্গ আসবে। কেন না নাটক তো অন্যান্য সাহিত্যের মতো মনে মনে পড়ার জিনিস নয়, নাটক চোখে দেখতে হয়, মানে নাটকের অভিনয় দেখতে হয়। তাই যতক্ষণ না নাটক মঞ্চে অভিনয় করা হচ্ছে ততক্ষণ তার রস ঠিকমতো পাওয়া যাবে না। হয়তো সেই কারণেই এখনকার নাটক বিশেষ কতগুলো নাট্যগোষ্ঠীর নামেই প্রচারিত হয়, কোন একজন

সুখলতা রাও

নাট্যকারের নামে নয়। তা সত্ত্বেও মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শচীন সেনগুপ্ত, বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, সলিল সেন, বাদল সরকার প্রমুখ নাট্যকারের নাম উল্লেখ করা চলে। আধুনিক কালের নাটকের মধ্যে অনুবাদ নাটক (বিদেশী নাটকের অনুবাদ) বিশেষ ভাবে জনপ্রিয়

হয়ে উঠছে। সেই তুলনায় মৌলিক নাটক রচনার পরিমাণ কিছু কম। তবে এই সব নাটকে যে নতুনত্বের চমক পাওয়া যাচ্ছে তা বলতে হয়।

এ যুগের শিশুসাহিত্য

এই যুগের বয়স্ক-সাহিত্যের কথা যেমন বলা হ'ল, তেমনি শিশুসাহিত্যের কথাও আসে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা শিশুসাহিত্যও বিশেষভাবে প্রাচুর্যময় হয়ে উঠছিল। একদিকে যেমন সন্দেশ, মৌচাক, শিশু-সাথী, খোকাখুকু, রামধনু, রংমশাল, মাসপয়লা ইত্যাদি শিশুমাসিকপত্রগুলি ছোটদের মনের কল্পনার রাজ্য ও জিজ্ঞাসার জগৎকে কাছে নিয়ে এল তেমনি প্রতিভা-বান্ শিশুসাহিত্যিকদের হাতে বিচিত্র বিষয় ও

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

ভঙ্গীতে শিশুসাহিত্যের সম্পদ্ বেড়ে উঠল। এক যুগে যেমন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, সুকুমার রায়ের স্পর্শে এই সাহিত্য প্রাণ পেয়েছিল, আবার এ যুগে নতুন অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী, হাসির গল্প, ডিটেকটিভ বা রহস্য-গল্প, বৈজ্ঞানিক গল্প—এ ছাড়াও ঐতিহাসিক কাহিনী, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ—অজস্র শাখায় সমৃদ্ধ হ'ল শিশু-সাহিত্য। সুখলতা রাও, নরেন্দ্র দেব, হেমেন্দ্রকুমার রায় এঁদের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৮০-৮১)।
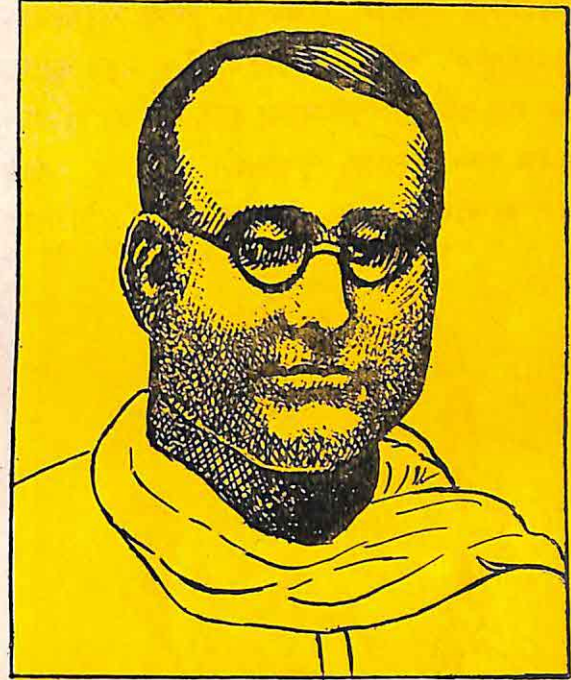
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ভোম্বল সর্দার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের আয়ুষ্কালেই যাঁর হাতে জন্ম নিল হুকাকাশির আশ্চর্য রহস্য-উপন্যাস—'সোনার হরিণ', 'পদ্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি' আর হাসি-কৌতুকের আশ্চর্য কল্পনার উপাদান 'নূতন পুরাণ', প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী, 'ঘনাদার গল্প', বুদ্ধদেব বসুর 'দস্যুর দলে ভোমরা' আর আরো নানা মজার গল্প, এবং বিখ্যাত কবিতা 'নদীর স্বপ্ন', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'ডাকাতের হাতে', নানা ছোট গল্প, আর সেই সুপরিচিত কবিতা 'কুটীর', অজিত দত্তের ছড়া ও কবিতা, শিবরাম চক্রবর্তীর 'হর্ষবর্ধন',

'বাড়ি থেকে পালিয়ে' আর অনেক হাসির জগৎ, রবীন্দ্রলাল রায়ের হাসির গল্প, চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর (জরাসন্ধ) মজাদার গল্প, হেমচন্দ্র বাগচীর সেই আশ্চর্য ছন্দোময় মন-দোলানো কবিতাগুলি, ধীরেন্দ্রলাল ধরের 'অসি বাজে ঝন ঝন' আর অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাস, যুদ্ধের গল্প, লীলা মজুমদারের 'দিনে দুপুরে', "পদীপিসির বর্মী বাক্স" ও নতুন স্বাদের নানা গল্প, সুনির্মল বসুর অজস্র ছড়া, কবিতা, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সহজ সরল ছন্দোময় কবিতা, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের

শিবরাম চক্রবর্তী

সরস তথ্যবহুল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প, বৈজ্ঞানিক উপন্যাস—'ধূমকেতু', 'মেঘনাদ', 'তুষারলোকের রহস্য', 'লুপ্তধন' কিংবা ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস 'বারোদীঘির রায়বাড়ি'—এ সব লেখা আজকের যে কোনও বয়স্ক মানুষের স্মৃতির আনন্দসঞ্চয়।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

এর আগে-পরে এলেন—এখনও আসছেন আরও কত শক্তিশালী শিশুসাহিত্যিক। উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, সত্যজিৎ রায়, অরবিন্দ গুহ, ননীগোপাল মজুমদার, বিমল দত্ত, ধীরেন বল, অজিতকৃষ্ণ বসু, সুকমল দাশগুপ্ত, কুঞ্জবিহারী পাল, শৈল চক্রবর্তী, ননীগোপাল চক্রবর্তী, অখিল নিয়োগী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিশিরকুমার মজুমদার, রেবন্ত গোস্বামী, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, পলাশ মিত্র এবং একে একে আরও কত জনা! কাকে বাদ দিয়ে কার কথা বলব? [এই প্রবন্ধের লেখিকা সুচেতা মিত্রও এঁদের মধ্যে পড়েন—ছো. বি. সম্পাদক।]

এই যুগ বাংলা শিশুসাহিত্যেও বলা যায় প্রাচুর্যের যুগ। বর্তমানে অনেক বয়স্ক সাহিত্যিকও শিশুসাহিত্যের জন্য কলম ধরেছেন। নানা নতুন পরীক্ষার

মধ্য দিয়ে বাংলা শিশুসাহিত্য এগিয়ে চলেছে। সাহিত্যের পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কেন না, একই জিনিস যেমন আমাদের রোজ খেলে জিভের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও হয়। একই বিষয় আমাদের মন নিতে পারে না। তাই রান্নায় যেমন নতুন নতুন উপকরণ, কসরৎ—এই সব আনা হয়, লেখার বেলাতেও তাই হয়। তবে কিছু কিছু খাবার জিনিস যেমন কখনও পুরোনো হয় না, বিস্বাদ লাগে না, তেমনি এক এক যুগের সাহিত্যও কখনও পুরোনো হয় না। এতক্ষণ যে শিশুসাহিত্যের কথা বললাম তা এই জাতীয় সাহিত্য।

দু'-একটা উদাহরণ

রবীন্দ্রোত্তর বা আধুনিক বাংলা কবিতার বিষয়ে ইতিপূর্বে যা বললাম, নিশ্চয় সেই সব কবিতা সম্বন্ধে তোমাদের আগ্রহ জাগবে। গদ্য সাহিত্য যেমন কয়েক লাইন পড়ে ঠিক বোঝা যায় না, কবিতার ক্ষেত্রে তা নয়। কবিতার ছোট ছোট কিছু উদাহরণ থেকে তোমরা তার সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবে। যেমন—

"এক একটা চেয়ার অসম্ভব দামি।
ক্ষমতা আকাঙ্ক্ষা অমরতা
লোকজন
সবই তখন ধাবমান ঐ দিকে, গোপনে।
অজগরের মতো।"

কিংবা

"স্মৃতি আমার সোনার ফসল
একদা কোন ভরা দিনের
স্মৃতি আমার সঞ্চয়ী তাই
নেশার মতো জড়িয়ে দিলে
একটু করে শূন্য ভাঁড়ার
কখন যে সব বাড়-বাড়ন্ত
স্মৃতি এখন প্রতারণা
আমার সঙ্গে খেলায় মাতে।"

এমনি অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু তার চেয়ে নিজে পড়ে নেবার আনন্দ তো অনেক বেশি!

ওপার বাংলার সাহিত্য

১৯৪৭ সালে আমাদের বাংলাদেশকে দু'টুকরো করে দু'টি পৃথক্ রাষ্ট্রে ঠেলে দেওয়া হয়। পূর্ববাংলা হয়ে গেল পূর্বপাকিস্তান। কিন্তু বেশি দিনের জন্য নয়। নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব রইল পশ্চিমী-দের হাতে। তারা পূর্ববাংলাকে সব দিক্ দিয়ে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে লাগল। এমন কি তাদের মাতৃভাষা বাংলাকে শুদ্ধু হঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় উর্দুকে বসাবার চেষ্টা চলতে লাগল। কিন্তু পূর্ববাংলার লোকেরা এ জুলুম মানতে রাজী হ'ল না। তারপর কি ভাবে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীন 'বাংলা দেশের' সৃষ্টি হ'ল সে কাহিনী কারো অজানা নয়। ভারতের ভূমিকাও এতে কম উল্লেখযোগ্য নয়।

স্বাধীন হবার পর 'বাংলা দেশ' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হ'ল বাংলা ভাষা। তার যাবতীয় কাজকর্ম এখন ঐ ভাষাতেই চলছে। ভাষাই হচ্ছে সাহিত্যের বাহন। কাজেই ভাষায় যদি স্বাচ্ছন্দ্য আসে সাহিত্যেও তা আসতে বাধ্য। পূর্ববাংলায় এখন তাই আসতে শুরু করেছে। বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন প্রাণপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন ওপার বাংলার নতুন যুগের সাহিত্য-সেবীরা। তার সঠিক খবর হয়তো আমরা পাচ্ছি না, কিন্তু অগ্রগতি যে হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা

মহাকবি কালিদাসের লেখা কথাসাহিত্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' অর্থাৎ বত্রিশটি পুতুল। 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' বত্রিশটি ছোটবড় উপাখ্যানের সমষ্টি। উপাখ্যানগুলিতে রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের বিভিন্ন সদ্‌গুণ—যেমন উদারতা, দানশীলতা, আত্মত্যাগ ইত্যাদিকে প্রকাশ করা হয়েছে।

'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' বাংলার অনুবাদ সাহিত্যে 'বত্রিশ সিংহাসন' নামে প্রচলিত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কাহিনীগুলি বত্রিশটি সিংহাসনকে কেন্দ্র ক'রে নয়। সিংহাসন এখানে একটি। সেই সিংহাসনের গায়ে খোদাই করা আছে বত্রিশটি রত্নখচিত পুতুল। সেই বত্রিশটি পুতুলের মুখ থেকে বলা বত্রিশটি কাহিনীর সমন্বয়ে রচিত হয়েছে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা।

একদিন কৈলাস পর্বতশিখরে সমাসীন মহাদেবকে পার্বতী এমন একটি গল্প শোনাতে অনুরোধ করলেন যা সর্বলোকের মনোহরণ করে। মহাদেব তখন শুরু করলেন :

"উজ্জয়িনী নগরে ভর্তৃহরি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ভাই ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত সর্বগুণসম্পন্ন বিক্রমাদিত্য। ভর্তৃহরির রাণীর নাম ছিল অনঙ্গসেনা। সেই উজ্জয়িনী নগরে একজন সর্বশাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ ছিলেন। মন্ত্রসাধনায় তিনি ভুবনেশ্বরী দেবীকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন দরিদ্র। ব্রাহ্মণের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে দেবী একদিন তাঁকে বর দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, 'দেবি, আমাকে এমন বর দিন যাতে আমার রোগমৃত্যু না হয়।' দেবী তখন তাঁকে একটি স্বর্গীয় ফল দান ক'রে বললেন, 'এই ফলটি খেলে তোমার আর রোগমৃত্যু হবে না।'

"ফলটি খেতে গিয়ে ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবলেন—আমি দরিদ্র। আমি কারো কোনও উপকার করতে পারি না। কাজেই অমর হয়ে আমার লাভ কি? তার চেয়ে যিনি পরের উপকার করতে পারবেন এই ফলটি তাঁকেই দেওয়া উচিত। অনেক ভেবেচিন্তে ব্রাহ্মণ দেখলেন ফল পাবার যোগ্যতা আছে একমাত্র রাজার। তিনি অমর হলে প্রজাদের অনেক মঙ্গল সাধন করতে পারবেন। ব্রাহ্মণ তখন ফলটি নিয়ে রাজা ভর্তৃহরিকে দিলেন। রাজা ভর্তৃহরি ফলটি পেয়ে ব্রাহ্মণকে অনেক পারিতোষিক দিয়ে ফলটি তাঁর প্রিয় পত্নী অনঙ্গসেনাকে উপহার দিলেন। অনঙ্গসেনা আবার ফলটি দিলেন তাঁর প্রিয় পরিচারক মাথুরিককে। মাথুরিক ফলটি দিলেন তাঁর প্রিয় এক দাসীকে। দাসী দিল এক রাখালকে সেই ফল। রাখাল আবার ফলটি দিল তার প্রিয় এক ঘুঁটেওয়ালীকে। ঘুঁটে-ওয়ালী গোবর কুড়িয়ে তার ওপর ফলটি চাপিয়ে সেটি ঝুড়ি ক'রে মাথায় নিয়ে চলতে লাগল। ঠিক সেই সময়ে নগর-ভ্রমণে বেরিয়ে ভর্তৃহরি ঘুঁটেওয়ালীর ঘুঁটের ওপর সেই ফলটি দেখে চিনতে পারলেন। অনেক সন্ধান করে রাজা জানতে পারলেন ফলটি কেমন ক'রে ঘুঁটেওয়ালীর কাছে গেল। সব কথা জেনে রাজার সংসারের প্রতি দারুণ বৈরাগ্য এল; তিনি তাঁর ভাই বিক্রমাদিত্যকে রাজপদে অভিষিক্ত করে বনে চলে গেলেন।

"বিক্রমাদিত্য রাজা হলেন। খুব দক্ষতার সঙ্গে তিনি রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। তাঁর শাসনে দেশে শান্তি ও সুখ প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

"মহারাজ বিক্রমাদিত্য একদিন রাজসভায় বসে আছেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে বিক্রমাদিত্যের হাতে একটি ফল দিয়ে বললেন, 'মহারাজ, আগামী কৃষ্ণাচতুর্দশীতে আমি মহাশ্মশানে অঘোরমন্ত্রে হোম করব। আমার অনুরোধ সেই সময়ে সেইখানে

আপনি আমাকে সাহায্য করার জন্য উপস্থিত থাকবেন।'

"রাজা তাতে সম্মত হ'লেন এবং সন্ন্যাসীও যথারীতি তাঁর কাজ শেষ করলেন।

"এই সময়ে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনির তপস্যা ভঙ্গ ক'রবার জন্য দুই অপ্সরা রম্ভা ও উর্বশীকে ডেকে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে নৃত্যগীতে যে বেশি নিপুণ সে বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করতে যাও।' তখন নৃত্যগীতে কে বেশি নিপুণ এই নিয়ে দুই অপ্সরার মধ্যে কলহ আরম্ভ হ'য়ে গেল। তা মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে দেবরাজ স্বর্গে দেবতাদের এক

দুই অপ্সরার মধ্যে কলহ আরম্ভ হয়ে গেল।

সভা আহ্বান করলেন। কিন্তু দেবতারা এ-বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। তখন নারদ ইন্দ্রকে বললেন, 'পৃথিবীতে সকল কলাবিদ্যায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী মহারাজ বিক্রমাদিত্য আছেন। তিনি রম্ভা ও উর্বশীর কলহের মীমাংসা করতে পারবেন।'

"দেবরাজের আমন্ত্রণে বিক্রমাদিত্য স্বর্গে এসে বিচার ক'রে উর্বশীকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে ঘোষণা করলেন। ইন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন,—'উর্বশীর জয় হ'ল কেন?' বিক্রমাদিত্য বললেন,—'নৃত্যশাস্ত্রে লেখা আছে নৃত্যে অঙ্গসৌষ্ঠবই প্রধান। সেই দিক্ দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় উর্বশীই শ্রেষ্ঠ।'

"এই কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র বিক্রমাদিত্যকে বস্ত্রাদি দান করলেন এবং তাঁর সম্মান আরও বৃদ্ধি করার জন্য তাঁকে রত্নখচিত মহামূল্য একখানি সিংহাসন দান করলেন। সেই সিংহাসনের গায়ে বত্রিশটি পুতুল খোদাই করা ছিল। তাদের মাথায় পা রেখে সিংহাসনে উঠে বসতে হয়। ইন্দ্রের আদেশে সেই সিংহাসন নিয়ে বিক্রমাদিত্য নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন। তারপর শুভদিনে সেই সিংহাসনে বসে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করতে লাগলেন।

"তারপর বহু বছর পরে প্রতিষ্ঠা নগরে শালিবাহনের জন্ম হ'ল। শালিবাহনের জন্মের সময় পৃথিবীতে ভূমিকম্প, ধূমকেতুর উদয়, অগ্নিদাহ ইত্যাদি নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিল। তখন রাজা বিক্রমাদিত্য দৈবজ্ঞদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—'এই সব অঘটন কি কোনও ভবিষ্যৎ অনিষ্টের সূচনা করছে?'

"দৈবজ্ঞরা জানালেন এসব অঘটন রাজ্যের পক্ষে অমঙ্গলজনক ও রাজার জীবন-হানির সূচনা করছে।

"বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আমি যখন তপস্যায় ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করি তখন তিনি আমাকে শর্তানুসারে অমরত্ব দান করতে চান। আমি তখন একটা অসম্ভব শর্তের কথা বলি। শর্ত এই যে, মায়ের বয়স আড়াই

নন্দ রাজার মন্ত্রীর এই জ্ঞান ছিল। তার ফলে তিনি ব্রহ্মহত্যা নিবারণ করেছিলেন।'

"ভোজরাজ বললেন, 'সে আবার কোন্ ঘটনা? আমি তো জানি না!'

"তখন মন্ত্রী বলে চললেন: 'বিশালা নগরে নন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পত্নীর নাম ভানুমতী, পুত্রের নাম জয়পাল এবং মন্ত্রীর নাম বহুশ্রুত। মন্ত্রী বহুশ্রুত ছ' রকম দণ্ডশাস্ত্রবিদ্যা জানতেন। ভানুমতী রাজার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। রাজা এক মুহূর্ত ভানুমতীকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না। এমন কি রাজসভায় গিয়েও তাঁকে পাশে নিয়ে গিয়ে বসাতেন। মন্ত্রী দেখলেন ভানুমতীর প্রতি রাজার এই অনুরক্তি বিসদৃশ। তিনি রাজাকে বললেন, 'মহারাজ আপনি যে মহারাণীকে সভায় বিভিন্ন রকম লোকের সামনে নিয়ে আসেন তা শাস্ত্রমতে অনুচিত।' রাজা বললেন, 'সে কথা ঠিকই। তবে ভানুমতীকে ছেড়ে আমি যে একদণ্ডও থাকতে পারি না! কি করি বলুন তো?'

"তখন মন্ত্রী বুদ্ধি দিলেন—'চিত্রকরকে ডেকে ভানুমতীর একটি ছবি আঁকিয়ে রাজসভার দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখুন। তারপর ঐ ছবির মধ্য দিয়েই সব সময় মহারাণী ভানুমতীর রূপ দেখুন।'

"রাজা মন্ত্রীর প্রস্তাব শুনে খুশি হ'য়ে চিত্রকর ডেকে ভানুমতীর ছবি আঁকালেন। তারপর রাজগুরু শারদানন্দ এসে ভানুমতীর ছবিটি দেখে চিত্রকরকে বললেন, 'ছবিটিতে ভানুমতীর সব লক্ষণই সুন্দর করে আঁকা হয়েছে, শুধু ভানুমতীর বাম উরুতে যে তিল-আকারের একটি মৎস্যচিহ্ন আছে তুমি সেটি ছবিতে আঁক নি।'
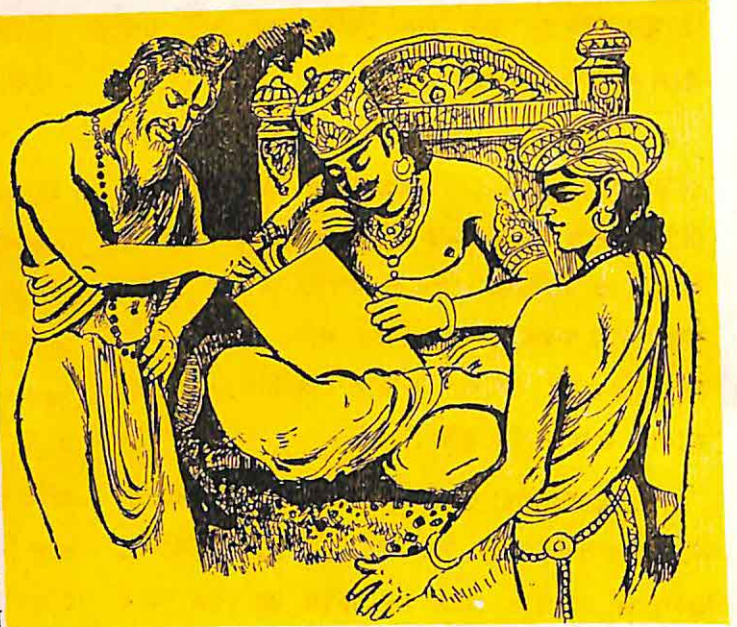
তিল-আকারের মৎস্যচিহ্ন···ছবিতে আঁক নি।

"রাজা চিন্তায় পড়লেন, ভানুমতীর ঐ চিহ্ন শারদানন্দের চোখে পড়ল কি করে? নিশ্চয়ই শারদানন্দের সঙ্গে ভানুমতীর মেলামেশা আছে। রাজা মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে আদেশ দিলেন শারদানন্দকে বধ করার।

"শারদানন্দকে নিয়ে মন্ত্রী বধ্যভূমিতে প্রবেশ করলেন। তখন শারদানন্দ বললেন, 'বনে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শত্রুর কাছে জলের মধ্যে, অগ্নির মধ্যে, মহাসাগরে, পর্বতশিখরে, প্রমত্ত বা বিপজ্জনক অবস্থায় মানুষ যে রকমই থাকুক আগেকার পুণ্য তাকে রক্ষা করে।'

"মন্ত্রী তখন মনে মনে ভাবলেন ব্যাপারটি সত্যিই হোক আর মিথ্যাই হোক আমি শুধু শুধু ব্রহ্মহত্যা করি কেন? এই ভেবে অন্যের

অজ্ঞাতসারে শারদানন্দকে এক গুপ্তভবনে নিয়ে গিয়ে মাটির নীচের এক কক্ষে রেখে রাজার কাছে এসে বললেন, 'মহারাজ আপনার আজ্ঞা পালন করা হয়েছে।' রাজাও সন্তুষ্ট হলেন।

"এভাবে কিছুকাল কেটে গেলে রাজপুত্র জয়পাল একদিন মৃগয়া করতে বনে গেলেন। যাত্রার সময় নানারকম অমঙ্গল চিহ্ন দেখা দিল। মন্ত্রিপুত্র বুদ্ধিসাগর অমঙ্গল চিহ্ন দেখে রাজপুত্রকে মৃগয়ায় যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু রাজপুত্র সে নিষেধে কান দিলেন না। তিনি মৃগয়ায় যাত্রা করলেন। বনে গিয়ে রাজকুমার অনেক পশুপাখি বধ করলেন। তারপর একটি কৃষ্ণসার হরিণ দেখে তার পিছনে পিছনে ছুটে রাজকুমার একেবারে গহন বনে এসে পড়লেন। ওদিকে রাজকুমারের দলের লোকজন তাঁকে বহু খুঁজেও না পেয়ে তাঁকে ফেলেই নগরের পথে চলে গেল।

সেই ঘনঘোর জঙ্গলে ঘোড়ার পিঠে রাজকুমার একেবারে একা। ক্লান্ত রাজকুমার ঘোড়া থেকে নেমে, ঘোড়াকে জল খাইয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে বিশ্রাম নেবার জন্য গাছতলায় এসে বসলেন। অমনি দেখেন চোখের সামনে এক ভয়ঙ্কর বাঘ। বাঘ দেখে ঘোড়া দড়ি ছিঁড়ে নগরের দিকে ছুটল। রাজকুমারও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোনও রকমে একটা গাছে চড়ে বসলেন। কিন্তু গাছে উঠলে কি হবে? সেই গাছে আগে থেকেই একটা ভালুক চড়ে বসেছিল। বাঘ-ভালুক একসঙ্গে দেখে রাজকুমার অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। তখন ভালুক বলল, 'রাজকুমার, তোমার ভয় নেই। তুমি যখন আমার শরণ নিয়েছ তখন বাঘের হাত থেকে তোমাকে আমি রক্ষা করব।'

"ভালুকের কথায় রাজপুত্র আশ্বস্ত হলেন।

"এদিকে বাঘও সেই গাছতলায় এসে পড়েছে।

আগে থেকেই একটা ভালুক গাছে চড়ে বসেছিল।

বছর এমন কোন ছেলের হাতে ছাড়া অন্য কারুর হাতে যেন আমার মৃত্যু না হয়। আড়াই বছর বয়সে কেউ মা হয় না, তাই এ শর্ত অসম্ভব বলেই আমার মনে হয়েছিল। ঈশ্বর কিন্তু আমাকে সেই বরই দেন।'

"দৈবজ্ঞরা রাজাকে কোথাও ঐ ধরনের কোনও শিশুর জন্ম হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে বললেন। রাজা তখন বেতালকে চারদিকে খোঁজ করবার জন্য পাঠালেন।

প্রতিষ্ঠা নগরে এসে রাজা তলোয়ারের আঘাতে শালিবাহনকে বধ করতে গেলেন।

"রাজার আদেশ মত বেতাল কুশদ্বীপ ইত্যাদি নানা স্থানে ঘুরে শেষে জম্বুদ্বীপে এসে উপস্থিত হ'ল। সেখানে গিয়ে সে দেখতে পেল একটি ছোট্ট ছেলে আর তার প্রায় সমবয়সী একটি সোনার পুতুলের মত ছোট্ট মেয়ে খেলা করছে। ছেলেটি মেয়েটিকে মা বলে ডাকছে। খবর নিয়ে বেতাল জানতে পারল যে ঐ বালকটি ঐ মেয়েটির পুত্র। তার নাম শালিবাহন। এই শালিবাহনের যখন জন্ম হয় তখন তার মায়ের বয়স ছিল আড়াই বছর। শালিবাহনের বাবা হচ্ছেন শেষনাগ।

"বেতালের মুখে এই খবর শুনে বিক্রমাদিত্য তক্ষুণি প্রতিষ্ঠা নগরে যাত্রা করলেন। প্রতিষ্ঠা নগরে এসে রাজা যেই তলোয়ারের আঘাতে শালিবাহনকে বধ করতে গেলেন অমনি শালিবাহনও তাঁকে প্রচণ্ড দণ্ডা-ঘাত করল। সেই আঘাতে বিক্রমাদিত্য একেবারে প্রতিষ্ঠা থেকে এসে পড়লেন উজ্জয়িনীতে এবং সেখানে এসেই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। রাজার কোনও পুত্র না থাকায় সিংহাসনে কা'কে বসাবেন মন্ত্রীরা তা স্থির করতে পারলেন না।

"একদিন দৈববাণী শোনা গেল—'মন্ত্রিগণ, এই সিংহাসনে বসে রাজ্যশাসন করতে পারে এ রকম উপযুক্ত রাজা এখন কোথাও কেউ নেই। অতএব এই সিংহাসনটি কোনও সুস্থানে ফেলে দিন।'

"মন্ত্রীরা তাই-ই করলেন।

"তারপর বহু বছর কেটে গেল। অবশেষে ভোজরাজ রাজা হয়ে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে যেখানে বিক্রমাদিত্যের সেই সিংহাসনটি ফেলে রাখা হয়েছিল সেখানে মাটি চাপা পড়ে পড়ে একটা ঢিপি
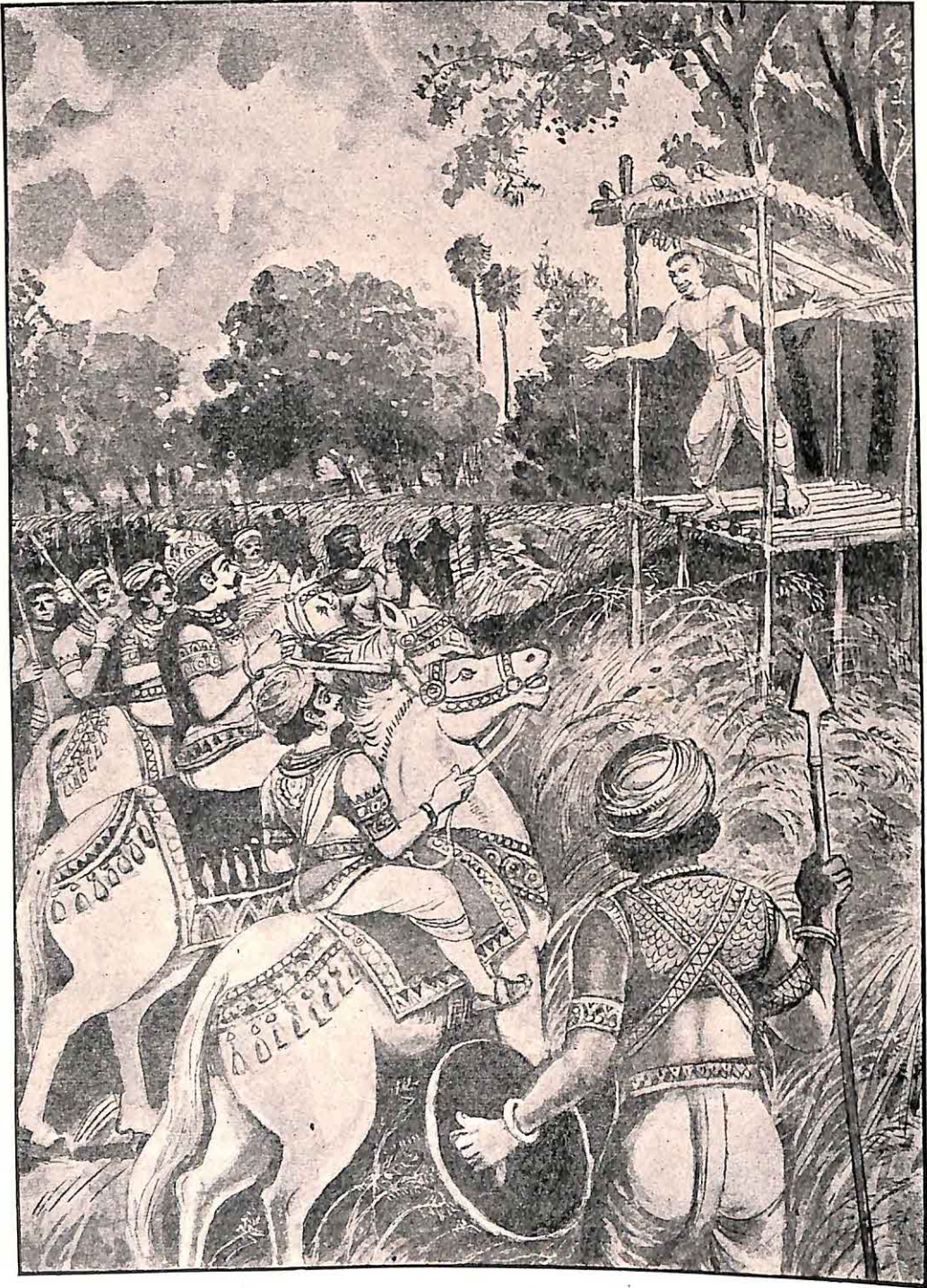
ব্রাহ্মণ মঞ্চ থেকে বললেন···

(যে গল্প চিরকালের : পৃঃ ১৬১৯)

মত হয়ে গেছে। এক ব্রাহ্মণ সেখানে যবের চাষ শুরু করলেন। ঢিপির নীচে কি আছে কেউ জানে না, কিন্তু জায়গাটা আশপাশের জমি থেকে একটু উঁচু, তাই ব্রাহ্মণ সেখানে এক মঞ্চ তৈরি করে তার ওপরে বসে পাখি তাড়াতেন।

"একদিন ভোজরাজ রাজকুমারদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সেই শস্যক্ষেত্রে এসে পৌঁছলেন। তাঁকে দেখে ব্রাহ্মণ মঞ্চ থেকে বললেন, 'মহারাজ, আপনি ও আপনার সৈন্যরা যথেচ্ছ আমার ক্ষেতের শস্য ভোগ করুন। ঘোড়াদের দানা খেতে দিন। আপনার মত লোক আমার অতিথি হওয়াতে আমার জন্ম সার্থক হ'ল।'

"ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা সসৈন্য ক্ষেতে প্রবেশ করলেন। তখন ব্রাহ্মণ মঞ্চ থেকে নেমে এসে বললেন, 'মহারাজ, আমার ক্ষেত নষ্ট ক'রে এ রকম অধর্ম আচরণ করছেন কেন ?'

"ব্রাহ্মণের এই কথা শুনে রাজা সবাইকে নিয়ে ক্ষেত থেকে বেরিয়ে এলেন। ব্রাহ্মণও আবার পাখি তাড়াবার জন্য মঞ্চে উঠে বসলেন। সেখান থেকে আবার আগের মত রাজাকে ক্ষেতের ফসল ভোগ করবার জন্য আহ্বান করলেন। রাজা আবার সসৈন্য যেই ক্ষেতে প্রবেশ করলেন, অমনি ব্রাহ্মণ মঞ্চ থেকে নেমে এসে রাজাকে আবার আগের মত আপত্তি জানিয়ে নিষেধ করলেন।

"রাজা বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন—ঐ মঞ্চে যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ ব্রাহ্মণের মনে দান, ভদ্রতা ইত্যাদি সদ্‌বুদ্ধির উদয় হয়, আবার মঞ্চ থেকে নেমে এলে এঁর মনে দীন বুদ্ধি দেখা দেয়। ব্যাপারটা কি ? আমি একবার ঐ মঞ্চে উঠে পরীক্ষা করে দেখব।

"এই স্থির ক'রে রাজা যেই মঞ্চে উঠলেন অমনি তাঁর মনে হ'ল জগতের দুঃখ দূর করা কর্তব্য। সবার দারিদ্র্য দূর করা উচিত। দুষ্টকে শাস্তিদান, শিষ্টকে পালন ও ধর্মানুসারে প্রজাদের রক্ষা করা উচিত। মঞ্চে ব'সে রাজা ভাবতে লাগলেন কি ক'রে মঞ্চের মাহাত্ম্য জানা যায়।

"রাজা তখন সেই ব্রাহ্মণকে ঐ ক্ষেতের বিনিময়ে যথোপযুক্ত ধনধান্য ইত্যাদি দিয়ে সন্তুষ্ট করে ঐ ক্ষেতটি তাঁর কাছ থেকে কিনে নিয়ে মঞ্চের তলা খোঁড়াতে লাগলেন। বেশ খানিকটা খোঁড়ার পর একটি সুন্দর পাথর দেখা গেল। আরও খোঁড়া হলে দেখা গেল সেই পাথরখানির তলায় চন্দ্রকান্তশিলায় তৈরি, নানা রত্নখচিত বত্রিশটি মূর্তি বসানো একখানি অতি সুন্দর স্বর্গীয় সিংহাসন রয়েছে। রাজা সিংহাসনটি সঙ্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সেটিকে তার জায়গা থেকে এক তিলও নড়াতে পারা গেল না। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন,—'সিংহাসনটি নড়ানো যাচ্ছে না কেন ?'

"মন্ত্রী বললেন,—'মহারাজ, এটি স্বর্গীয় সিংহাসন। একে হোম, পূজা-অর্চনা ছাড়া নড়ানো যাবে না।'

"মন্ত্রীর কথামতো রাজা ব্রাহ্মণদের ডেকে পূজাদি সম্পন্ন করালেন। সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসনটি নিজে নিজেই রাজার সঙ্গে চলতে লাগল। রাজা তখন মন্ত্রীর বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা ক'রে বললেন, 'বুদ্ধিমানের সংসর্গ সর্বদাই সুখের কারণ হয়।' মন্ত্রী বললেন, 'যিনি স্বয়ং বুদ্ধিমান্, কিন্তু পরের যুক্তি-বুদ্ধি শোনেন না, তাঁর বিনাশ হয়। আপনি সে প্রকৃতির মানুষ ন'ন। রাজার যে যে গুণ থাকা প্রয়োজন আপনার মধ্যে তা সবই আছে। রাজাদের মধ্যে আপনি অগ্রগণ্য। রাজার মঙ্গলসাধন করাই মন্ত্রীর কর্তব্য। অনিষ্টকর কাজ থেকে রাজাকে বিরত করা মন্ত্রীর অন্যতম কাজ।

বাজাচ্ছেন আর তাঁর চারদিকে যত সব ভূতপ্রেতের দল নৃত্য করছে। রাজা কিন্তু এতে একটুও ভয় পেলেন না। তিনি ভক্তিভরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বললেন, "ঠাকুর, আমাকে কি করতে হবে বলুন।" সন্ন্যাসী বললেন, "এখান থেকে ছু' ক্রোশ দক্ষিণে আর একটা শ্মশান আছে। সেখানে গেলে দেখতে পাবেন একটা শিরীষ গাছে একটা শব ঝুলছে —ঐ শবটা আমায় এনে দিতে হবে।"

সন্ন্যাসীর কথামত রাজা সেই শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সে রাত্রিটা ছিল ভয়ঙ্কর। কৃষ্ণা-চতুর্দশীর ঘন ঘোর অন্ধকার, তার সঙ্গে প্রবল বর্ষণ। শিরীষ গাছের কাছে গিয়ে রাজা দেখলেন চারদিকে ভূতপ্রেতের কোলাহলের মধ্যে একটি শব মাটির দিকে মাথা করে ঝোলানো আছে। রাজা তার বাঁধন কেটে দিতেই শবটা মাটিতে পড়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। রাজা তখন অবাক্ হয়ে তাকে

'ঐ শবটা আমায় এনে দিতে হবে।'

জিজ্ঞেস করলেন তার এই তুর্দশার কারণ কি। শব তাঁর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে খিল খিল করে হাসতে হাসতে আবার গাছে উঠে পড়ল। রাজা তখন বাঁধন কেটে শবটিকে মাটিতে না ফেলে

শবটাকে কাঁধে নিয়ে চললেন।

একটা চাদর দিয়ে বেঁধে সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে চললেন।

কিছুদূর চলার পর হঠাৎ শবের ভূত বেতাল বলে উঠল, "তুমি তো দেখছি মস্ত বীর আর সাহসী! এখন বল, আমায় কোথায় আর কেন নিয়ে যাচ্ছ?" বিক্রমাদিত্য বললেন, "আমি মহারাজ বিক্রমাদিত্য, শান্তশীল সন্ন্যাসীর অনুরোধে তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

বেতাল বলল, "মহারাজ সারাপথ চুপচাপ না গিয়ে তোমায় কয়েকটা গল্প শোনাই। প্রত্যেক গল্প শেষ করেই আমি তোমায় প্রশ্ন করব। যদি ঠিক উত্তর দিতে পার তবে আমি আবার আমার আগের জায়গায় ফিরে যাব;
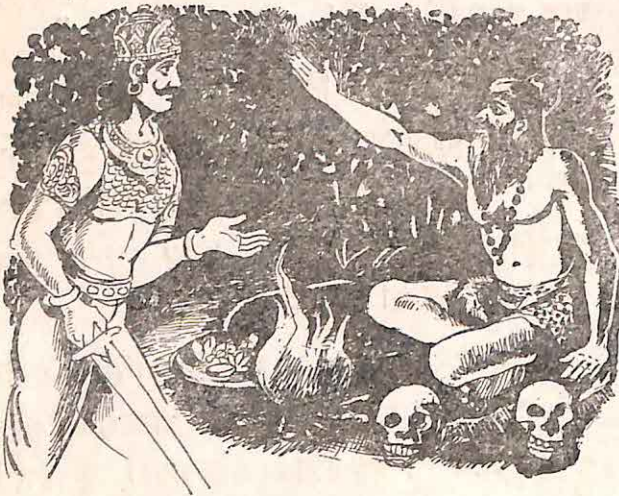
আর জেনেশুনেও তুমি যদি ঠিক উত্তর না দাও তা হলে তখনই তোমার বুক ফেটে যাবে।"

বিক্রমাদিত্য বেতালের কথায় সম্মত হয়ে তাকে কাঁধে নিয়ে সন্ন্যাসীর আশ্রমে চললেন। পথে যেতে যেতে বেতাল রাজাকে পঁচিশটি গল্প শোনাল। প্রত্যেকটি গল্প শেষ করে বেতাল রাজাকে একটা করে প্রশ্ন করল এবং রাজা তার সঠিক উত্তর দেওয়াতে বেতাল আবার তার আগের জায়গায় ফিরে যেতে লাগল। রাজাও আবার তাকে তুলে এনে কাঁধে ক'রে গন্তব্য স্থানের দিকে চলতে লাগলেন।

এইভাবে পথ চলে তাঁরা যখন সন্ন্যাসীর আশ্রমের কাছে এসে পড়লেন তখন বেতাল রাজাকে বলল, "মহারাজ, তোমার সাহস ও বুদ্ধি দেখে আমি এতই খুশি হয়েছি যে তোমার কিছু উপকার করতে চাই। আমি যা বলব সেই রকম কাজ করলে তুমি মহাবিপদ্ থেকে উদ্ধার পাবে।"

বেতাল বলে চলল: "শান্তশীল সন্ন্যাসী হচ্ছে সেই কুমোর, যক্ষের মুখে যার কথা শুনেছিলে। আর যে শব তুমি কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছ তা হচ্ছে রাজা চন্দ্রভানুর। শান্তশীল যোগে সিদ্ধিলাভের জন্য চন্দ্রভানুকে মেরেছে। এখন তোমাকে মারতে পারলে তার সাধনার শেষ হয়। পূজো শেষ করে শান্তশীল তোমাকে বলবে দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে। তুমি তা করতে গেলেই ও খড়্গ দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেলবে। তুমি বলবে যে আমি রাজা, কোনও দিন কাউকে ও-ভাবে প্রণাম করি নি। তুমি ভঙ্গীটি দেখিয়ে দাও। শান্তশীল তা দেখাতে গিয়ে যেই লম্বা ভাবে শোবে, সঙ্গে সঙ্গে তুমি তলোয়ার দিয়ে তার মাথাটা কেটে ফেলবে। এর পর দেখতে পাবে তোমাদের কাছেই এক মস্ত বড় কড়াইএ গরম তেল ফুটছে। তুমি যোগী ও চন্দ্রভানুর শব ঐ গরম তেলে ফেলে দেবে। তার থেকে তোমার তাল-বেতাল লাভ হবে। তাল-বেতালের সাহায্য পেলে তুমি পৃথিবীতে অসাধ্য সাধন করতে পারবে।" এই বলে বেতাল চন্দ্রভানুর মৃতদেহ ত্যাগ করে চলে গেল।

তাল-বেতাল বেরিয়ে এসে বলল···

মহারাজ বিক্রমাদিত্য চন্দ্রভানুর শব শান্তশীলের কাছে নিয়ে গেলে তিনি মহারাজের সাহসের খুবই প্রশংসা করতে লাগলেন। তারপর চন্দ্রভানুর দেহে প্রাণসঞ্চার করে তাকে দেবীর কাছে বলি দিলেন। তারপর দেবীর বাকি পূজো সম্পন্ন করে বিক্রমাদিত্যকে বললেন দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে। বেতালের

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ক্লান্ত রাজপুত্রের চোখে ঘুম এসে গেল। তখন ভালুক বলল, 'রাজকুমার, তুমি ঘুমের ঘোরে গাছ থেকে নীচে পড়ে যেতে পার। তার চেয়ে বরং আমার কোলে এসে ঘুমোও।'

"রাজকুমার তাই করলেন।

"ব্যাপার দেখে বাঘ ভালুককে ডেকে বলল, 'ওহে ভালুক, ও লোকটা মৃগয়ায় এসে আমাদের যথেচ্ছ বধ করছে। ও আমাদের শত্রু। তুমি ওর উপকার করলেও ও আমাদের বধ করবে। তার চেয়ে বরং ওকে নীচে ফেলে দাও। আমি ওকে খাই।'

"ভালুক তখন বলল, 'দেখ, শরণাগতকে হত্যা করা মহাপাপ। রাজকুমার যখন আমার শরণ নিয়েছে তখন কিছুতেই আমি তাকে বধ করতে পারব না।'

"এর পর রাজকুমারের ঘুম ভাঙ্গলে ভালুক তাকে সাবধানে থাকবার নির্দেশ দিয়ে নিজে রাজকুমারের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। বাঘ তখন রাজকুমারকে বলল, 'রাজকুমার, এই ভালুক নখী। শাস্ত্রে বলে নখী, শৃঙ্গী, নদী ও স্ত্রী জাতিকে বিশ্বাস করতে নেই। ভালুক আমার হাত থেকে রক্ষা করে নিজে তোমাকে খেতে চায়। সুতরাং তুমি ওকে নীচে ফেলে দাও; আমি ওকে খাই, আর তুমিও নিশ্চিন্তে বাড়ি চলে যাও।'

"বাঘের কথা শুনে রাজকুমার ভালুককে নীচে ঠেলে ফেলে দিলেন। নীচে পড়তে পড়তে কোনও রকমে গাছের একটি ডাল চেপে ধরে আত্মরক্ষা করে ভালুক বলল, 'ওরে পাপিষ্ঠ, তুই যে অন্যায় কাজ করলি তার জন্য এখন থেকে তুই 'সসেমিরা' এই কথা বলতে বলতে পিশাচ হয়ে ঘুরে বেড়াবি। তোর মুখ দিয়ে আর অন্য কোন কথা বেরোবে না।'

"সকাল হলে বাঘ চলে গেলে ভালুকও প্রস্থান করল, আর রাজকুমার জয়পালও 'সসেমিরা' বলতে বলতে পিশাচ হয়ে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে

রাজপুত্র 'সসেমিরা' বলতে বলতে পিশাচ হয়ে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লাগলেন। তাঁর ঘোড়াটি তাঁকে দেখতে না পেয়ে একাকী রাজধানীতে ফিরে এল।

"এদিকে ঘোড়াটি কুমারকে না নিয়ে একাই রাজধানীতে ফিরে আসায় রাজা বুঝলেন রাজপুত্রের কোনও বিপদ্ ঘটেছে। ছেলের খোঁজে রাজা তখন নিজেই বনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

"বনের গভীরে গিয়ে রাজা দেখতে পেলেন তাঁর প্রিয় পুত্র 'সসেমিরা' এই বলতে বলতে পিশাচ হয়ে সারা বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গভীর দুঃখে রাজা

রাজকুমারকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। কত চিকিৎসক দেখালেন, কিন্তু কেউই তাঁকে ভালো ক'রে তুলতে পারলেন না। তখন বিষণ্ণচিত্তে রাজা মন্ত্রীকে বললেন, 'হায়, এখন যদি শারদানন্দ থাকতেন তবে তিনি আমার ছেলেকে রোগমুক্ত করতে পারতেন। আমি তাঁকে হত্যা করিয়ে মহাপাপ করেছি। এখন রাজকুমারের রোগ সারানোর জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। রাজ্যের চারদিকে ঘোষণা করে দিন, যে রাজকুমারকে নীরোগ করতে পারবে তাকে আমি অর্ধেক রাজত্ব দান করব।'

"মন্ত্রী তখন শারদানন্দকে সব কথা জানালেন। সব শুনে শারদানন্দ বললেন, 'মন্ত্রিবর, আপনি রাজার কাছে গিয়ে বলুন যে আপনার একটি মেয়ে আছে। সেই মেয়ে রাজকুমারের অসুখ সারিয়ে দেবে। তার সঙ্গে রাজকুমারের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন।'

"মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা পাত্রমিত্র, সভাসদ্ সব নিয়ে মন্ত্রীর বাড়ি এলেন। রাজকুমারও 'সসেমিরা' 'সসেমিরা' বলতে বলতে সেখানে এলেন। তখন শারদানন্দ পর্দার আড়াল থেকে একটি শ্লোক শোনালেন ঃ 'যে বন্ধু সদ্ভাবে এসেছে তাকে প্রতারণা ক'রে কি নিপুণতা দেখানো হয়েছে? কোলে শয়ন করে যে নিদ্রা যাচ্ছে তাকে হত্যা করলে কি পৌরুষ হয়?'

"এই কথা শোনা মাত্র রাজকুমার 'সসেমিরা' শব্দের 'স' বাদ দিয়ে কেবল 'সেমিরা' 'সেমিরা' বলতে লাগলেন।

"শারদানন্দ আবার বললেন ঃ 'সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও সাগরসঙ্গমে গেলে ব্রহ্মহত্যার পাপও বিনষ্ট হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি মিত্রদ্রোহী কোথাও তার মুক্তি নেই।'

"এই শ্লোক শোনামাত্র রাজকুমার 'সসে' বাদ দিয়ে কেবল 'মিরা' 'মিরা' বলতে লাগলেন।
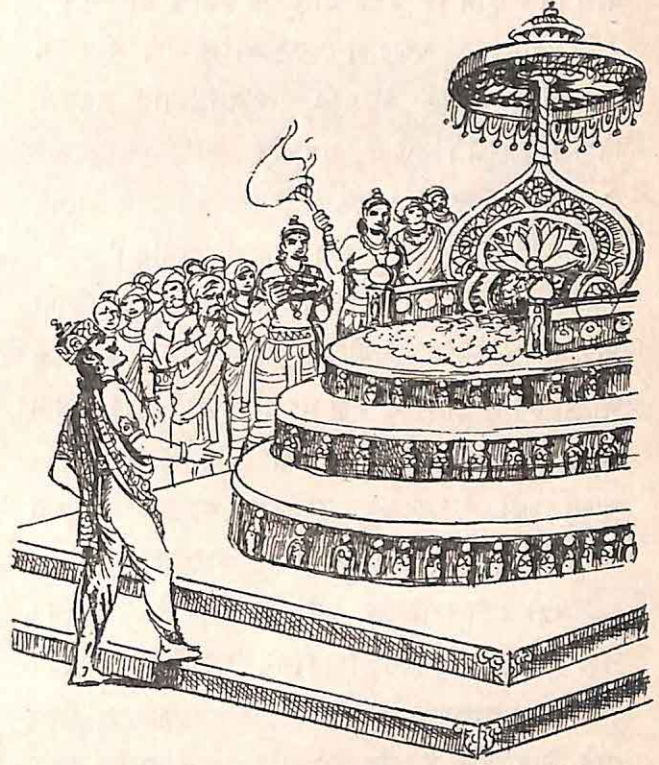
সিংহাসনে বসবার জন্য এগিয়ে গেলেন।

"শারদানন্দ তাঁর তৃতীয় শ্লোকে বললেন, 'যতদিন না মহাপ্রলয় হয় ততদিন কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক ও মিত্রদ্রোহীকে নরকবাস করতে হয়।'

"এই শ্লোক শোনামাত্র রাজকুমার 'সসেমি' বাদ দিয়ে কেবল 'রা' 'রা' বলতে লাগলেন।

"তখন শারদানন্দ চতুর্থ শ্লোকটি বললেন ঃ 'মহারাজ, আপনি যদি কুমারের কল্যাণ ইচ্ছা করেন তবে ব্রাহ্মণকে দান ও দেবগণের আরাধনা করুন।'

"শ্লোকটি শোনামাত্র রাজকুমার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। সুস্থ হয়ে রাজকুমার জয়পাল নন্দ রাজার কাছে ভালুকের সব কথা খুলে বললেন। রাজা আর

কথামত রাজা সন্ন্যাসীকে কি করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয় দেখিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন। সন্ন্যাসী প্রণাম দেখাতে মাটিতে লম্বা হয়ে শুতেই রাজা খড়্গ দিয়ে তাঁর মাথা কেটে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে রাজার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং এসে তাঁকে বর দিলেন, যতদিন চন্দ্র-সূর্য, পৃথিবী-আকাশ বর্তমান থাকবে ততদিন তোমার এই কাহিনীও জগতে প্রচলিত থাকবে।

ইন্দ্র বিদায় নিলে বিক্রমাদিত্য চন্দ্রভানু ও শান্তশীলের শব ফুটন্ত তেলের কড়াইএ ফেলে দিলেন। অমনি তার ভেতর থেকে তাল-বেতাল নামে দুই বিকটাকৃতি বীর বেরিয়ে এসে বলল, "আদেশ করুন মহারাজ!" বিক্রমাদিত্য বললেন, "এখন তো কোনও প্রয়োজন নেই। স্মরণ করলেই যেন তোমাদের পাই।"

আরব্য উপন্যাস

অত্যাশ্চর্য গল্পের খনি "আরব্য উপন্যাস" এক-যোগে শিশু ও বৃদ্ধদের আনন্দের খোরাক যুগিয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে। হীরা-মণি-মাণিক্যের দ্যুতিতে ঝলমল সেই অভিনব গল্পের জগতে কত দৈত্য, দানব, হুরী, পরী, বাদশা, বেগম, কাজী, উজীর, উড়ন্ত ঘোড়া, অতিকায় পশু-পাখি, যাদুকর-যাদুকরী ছড়িয়ে আছে তার সীমা সংখ্যা নেই।

কাহিনীর অভিনবত্বে, কল্পনার বৈচিত্র্যে, ঘটনা সমাবেশের চমকপ্রদ সংস্থানে পাঠকের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। বইখানিকে সকলে 'আরব্য উপন্যাস' বলে জানলেও, ঐতিহাসিকদের কাছে এর আসল নাম হ'ল "সহস্র রজনী" বা "একাধিক সহস্র রজনী"। কে বা কারা এই গল্পগুলিকে কোন্ সময়ে রচনা করেছেন তার সঠিক খবর আজও জানা যায় নি।

এই একহাজার একটি গল্পের সবগুলি পড়ে ফেলেছেন এমন মানুষ হাতে গোণা যায়। আবার অন্যদিকে বই না পড়েও এর অনেকগুলি গল্প না জানে এমন মানুষও বড় একটা দেখা যায় না। আলিবাবার গল্প, আবুহোসেনের কাহিনী, আলাদীন, সিন্ধবাদ, কুব্জ দর্জির কাহিনী প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর জানে। এক একটি গল্পের মধ্যে আবার পাঁচ, সাত কি দশটি পর্যন্ত শাখা বা প্রশাখা-গল্পও আছে।

আমাদের দেশেও এই শাখা-প্রশাখা দিয়ে গল্প রচনার রীতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই বর্তমান ছিল। যেমন "মহাভারত", "কথাসরিৎসাগরের উপাখ্যান", "পঞ্চতন্ত্র" ইত্যাদি। অতি সহজে গল্পগুলিকে শেষ না করে, শাখা-প্রশাখা দিয়ে সেগুলিকে বহুদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতিই ছিল হয়তো সে যুগের গল্প-বলিয়েদের একটা চমকপ্রদ "আর্ট"।

আরব্য উপন্যাসের গল্পগুলি আরব দেশের পোশাকী সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এগুলি অমার্জিত মনের প্রকাশ হলেও, কেবলমাত্র গল্প বলার ও আনন্দ দেবার ক্ষমতায় এরা নিজেদের আসন কায়েম করে নিয়েছে বিশ্বের গল্পের দরবারে।

কাহিনীর উৎপত্তি ঃ পণ্ডিতদের মত

গল্পগুলির উৎপত্তি নিয়ে নানা পণ্ডিত বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ঐগুলির মধ্যে যেটি বেশি সম্ভাব্য সেটির কথা হ'ল এই ঃ—মরুভূমির দেশ আরব। বড় বড় শহর, বন্দরগুলি সবই প্রায় ছিল মরুভূমির ধারে ধারে। এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতে হলে মরুভূমির ভিতর দিয়েই যেতে হ'ত। কোন কোন ক্ষেত্রে মরুভূমি পার হতে সময় লাগত মাসাবধি।

দুর্দ্ধর্ষ মরুদস্যুদের ভয়ে বণিকেরা দলবদ্ধ না হয়ে

পথ চলত না। জনবল বাড়াবার জন্য তিন-চারটি দল একত্র হয়েই পথ চলত।

এরা যে শহর বা বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করত সেখান থেকেই দস্যুদের মোকাবেলা করার জন্য কিছু অস্ত্রধারী প্রহরী ও দু'-তিনটি "কিস্‌সা-কহনেওয়ালা" অর্থাৎ গল্প-বলিয়ে লোক সংগ্রহ করত। আর একটা কাজও ছিল অবশ্য করণীয়। মরুযাত্রায় অভিজ্ঞ কাউকে দলের সর্দার পদে নির্বাচিত করা। মরুযাত্রায় তার আদেশ সকলেই মেনে চলবে—এমন একটা অলিখিত চুক্তি সকলেই স্বীকার করে নিত।

মরুভূমি দিনে ও রাত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত। দিনে যেমন প্রচণ্ড গরম, রাত্রিতে আবার তেমনি কন্‌কনে ঠাণ্ডা। সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী ও গরমের পর রাতের প্রথম দিকের ঠাণ্ডা ভাবটি খুবই আরাম-প্রদ। তার পর খান দু'য়েক কম্বল মুড়ি দিয়ে নরম বালির উপর শয়ন খুবই সুখকর। এইভাবে দলের সব লোকই যদি সুখে মশ্‌গুল হয়ে ঘুমে অচেতন হয়ে যায় তবে দস্যুদের হাতে ধন ও জীবন বিপন্ন হতে কতক্ষণ? সেজন্য সর্দারের নির্দেশে ঘুমোতে হ'ত পালা করে। অর্থাৎ দলের অর্দ্ধেক থাকবে জেগে, বাকি অর্দ্ধেক লাগাবে ঘুম। এখন, যারা জেগে থাকবে তারা যাতে না ঘুমিয়ে পড়ে সে জন্যই প্রয়োজন হ'ত এই কিস্‌সা-কহনেওয়ালাদের। মরু-ভূমির রাত্রির দুরন্ত শীতে আগুন জ্বালিয়ে, শ্রোতারা সকলে গল্প-বলিয়েকে ঘিরে গোল হয়ে বসে বসে গল্প শুনত। সে দৈত্য, দানা, জীন, হুরী, পরী, বাদশা-বেগমদের লোমহর্ষক কাহিনী বলে যেত অনর্গল স্রোতধারার মত। কখনও বসে, কখনও ভাবাবেগে দাঁড়িয়ে উঠে অভিনয়ের ভঙ্গীতে, কখনো বা উচ্চকণ্ঠে গান করে অথবা নানা রসাল ছড়া কেটে গল্প চালিয়ে যেত—রাতের পর রাত। একটা মূল গল্প থেকে শাখা-প্রশাখা টেনে নিয়ে গল্পের পর গল্প বলে যেত। শ্রোতারাও ভয়ে, বিস্ময়ে, আনন্দে, হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে রাতগুলি কাটিয়ে দিত। এই ভাবেই নাকি হয়েছিল "আরব্য রজনীর" গোড়াপত্তন।

কিস্‌সার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রূপান্তর

রাত্রে শোনা 'কিস্‌সা' বা গল্পগুলি বিভিন্ন শ্রোতাদের মুখে মুখে নানাভাবে রূপান্তরিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়ে বহুদিন পর্যন্ত মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল। এগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে সর্বসাধারণের আসরে পৌঁছায় বহুদিন পরে। অনেকে মনে করেন বাগ্‌দাদের সুবিখ্যাত খলিফা হারুন-অল্ রসিদই নাকি সর্বপ্রথম এগুলিকে একত্রে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করেন অষ্টম শতাব্দীতে। আবার অনেকের মত—এগুলি দশম শতাব্দীতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ হারুন-অল্ রসিদের অনেক পরে।

এদেশের রাজা বিক্রমাদিত্যের মত খলিফা হারুন-অল্ রসিদও তাঁর প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্য রাত্রিতে প্রধান উজীর জাফর ও দেহরক্ষী খস্‌রুকে নিয়ে নগরভ্রমণে বেরুতেন। আরব্য উপন্যাসের অনেকগুলি গল্পের মধ্যেই হারুন-অল্ রসিদ ও তাঁর বেগম জুবেদীর কথা আছে।

ঐতিহাসিকেরা বলেন, আরব্য উপন্যাসের গল্প-গুলি প্রাচীন ভারতীয়, মিশরীয়, চৈনিক, পারসিক, তুর্কী, হাবসী প্রভৃতি বহু দেশের লোকগাথার সংমিশ্রণে গ্রথিত। এই গ্রন্থখানি বর্তমানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, আর ইয়োরোপে এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। গল্পগুলির অভিনবত্বে "আরব্য উপন্যাস"

থাকতে পারলেন না, মন্ত্রিকন্যাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কুমারী, তুমি গ্রামের মেয়ে। কখনও বনে যাও নি। তুমি কি ক'রে ভালুকের বৃত্তান্ত জানলে?'

"যবনিকার অন্তরাল থেকে শারদানন্দ বললেন, 'দেব ও ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে আমার জিহ্বায় সরস্বতী বিরাজ করেন। তাঁর প্রসাদেই আমি ভানুমতীর উরুর তিলের কথা জানতে পেরেছিলাম। সেই ভাবেই রাজকুমার ও ভালুকের কথা জানতে পেরেছি।'

"এই কথা শুনে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পর্দা সরিয়ে দেখলেন সেখানে বসে আছেন রাজগুরু শারদানন্দ। রাজা ও অন্য সব লোকেরা তাঁকে প্রণাম করলেন। মন্ত্রী তখন রাজাকে সব কথা খুলে বললেন। রাজা মন্ত্রী বহুশ্রুতের বুদ্ধি ও কাজের প্রশংসা করে তাঁকে বস্ত্রাদি দানে সম্মানিত করলেন।"

মন্ত্রী ভোজরাজকে এই উপাখ্যানটি বললেন। তারপর ভোজরাজ সেই সিংহাসন নগরে নিয়ে গেলেন। সেখানে যথোপযুক্ত পূজার্চনাদি সম্পন্ন করিয়ে রাজা যেই সিংহাসনে বসবার জন্য পা রাখতে যাবেন তখন প্রথম পুতুল মিশ্রকেশী ব'লে উঠল, "মহারাজ, যদি বিক্রমাদিত্যের মত আপনার শৌর্য্য, উদারতা ও সত্ত্বাদি গুণ থাকে তা হলে আপনি সিংহাসনে বসুন।" এমনি করে একে একে প্রভাবতী, সুপ্রভা, ইন্দ্রসেনা, সুদতী, অনঙ্গনয়না, কুরঙ্গনয়না, লাবণ্যবতী, কামকলিকা, চণ্ডিকা, বিদ্যাধরী, প্রজ্ঞাবতী, জনমোহিনী, বিদ্যাবতী, নিরুপমা, হরিমধ্যা, মদনসুন্দরী, বিলাসরসিকা, শৃঙ্গারকলিকা, মন্মথসঞ্জীবনী, রতিলীলা, মদনবতী, চিত্ররেখা, সুভগা, প্রিয়দর্শনা, কামোন্মাদিনী, সুখসাগরা, শশিকলা, চন্দ্ররেখা, হংসগামিনী, রসবতী ও উন্মাদিনী —এই ৩২টি পুতুল একে একে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের বিভিন্ন সদ্‌গুণ,—যথা পরোপকার, দানশীলতা, ধৈর্য্য, আত্মত্যাগ, উদারতা প্রভৃতির কথা বলে গেল।

উন্মাদিনী বিক্রমাদিত্যের গুণকীর্তন করার পর বলল, "মহারাজ, আপনিও সামান্য ন'ন। আপনার মত পবিত্র-চরিত্র, সকল-কলা-বিশারদ্, উদার রাজা একালে আর নেই। আপনার অনুগ্রহে আমাদের বত্রিশটি পুতুলের পাপক্ষয় হ'ল। আমাদের শাপমুক্তি হ'ল। আমরা বত্রিশ জন পার্বতীর সখী ছিলাম। আমাদের আচরণে ক্রুদ্ধ হ'য়ে পার্বতী অভিশাপ দেন, 'তোমরা নিষ্প্রাণ পুতুল হয়ে ইন্দ্রের সিংহাসনে সংলগ্ন থাকো।' আমরা শাপমোচনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। তখন দেবী বললেন, 'সেই সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্যের পরে যখন ভোজরাজের হাতে আসবে তখন তোমাদের বত্রিশ জনের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হবে। তোমাদের মুখে ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের কথা শুনলে তোমাদের শাপমোচন হবে'।"

শাপমুক্ত হয়ে পুতুলেরা ভোজরাজের অনুমতি নিয়ে স্বর্গে ফিরে গেল। তখন ভোজরাজ সিংহাসনের ওপর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে উমা-মহেশ্বরের মূর্তি স্থাপন করে প্রত্যহ ষোড়শোপচারে পূজা করতে লাগলেন।

ভোজরাজ প্রজাপালন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর পূজায় দেবী পার্বতী পরম পরিতুষ্ট হয়েছিলেন।

বেতাল পঞ্চবিংশতি

দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার মত, সংস্কৃত সাহিত্যের আর একটি জনপ্রিয় বই হচ্ছে বেতাল পঞ্চবিংশতি। রাজা বিক্রমাদিত্যকে বেতাল ২৫টি গল্প শুনিয়েছিল, তাই থেকেই বইখানির নাম। বিক্রমাদিত্য কি করে

তালবেতালের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করলেন তাও বর্ণনা করা হয়েছে এই বইটিতে।

অনেকদিন আগে প্রাচীন উজ্জয়িনী রাজ্যে গন্ধর্বসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল ছয় ছেলে—সবাই মস্ত জ্ঞানী ও গুণী। রাজা গন্ধর্বসেনের মৃত্যুর পরে তাঁর সিংহাসনে বসলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্য ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। বাহুবলে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হলেন।

কিছুদিন রাজত্ব করার পর বিক্রমাদিত্য বুঝতে পারলেন যে প্রজাদের যথার্থ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে হলে তাঁর উচিত রাজ্যের সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে নিজের চোখে দেশের লোকদের অবস্থা দেখা। কর্মচারীদের দিয়ে সেই কাজ করানোতে তাঁর রাজকর্তব্য ঠিকমত পালন করা হচ্ছে না। তিনি তখন তাঁর ছোট ভাই ভর্তৃহরির ওপর রাজ্যভার দিয়ে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন কোথায় কি হচ্ছে।

এদিকে ভর্তৃহরির কিছুদিন রাজত্ব করার পর সংসারের প্রতি বৈরাগ্য এল। তিনিও সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে গেলেন। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন শূন্য পড়ে রইল।

দেবরাজ ইন্দ্র এই অবস্থা দেখে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যরক্ষার জন্য একজন যক্ষকে নগররক্ষক করে পাঠালেন উজ্জয়িনীতে। ক্রমে ভর্তৃহরির রাজ্যত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণের কথা বিক্রমাদিত্যের কানে গিয়ে পৌঁছল। তিনি চিন্তিত হয়ে দেশে ফিরে এলেন।

নগররক্ষক যক্ষ তো একজন অপরিচিত আগন্তুককে রাজ্যে ঢুকতে দেবে না কিছুতেই। বিক্রমাদিত্য জানালেন, তিনিই এখানকার রাজা স্বয়ং বিক্রমাদিত্য। তখন যক্ষ বলল, "ঠিক আছে, তুমি

যক্ষ বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও।'

যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাকে হারিয়ে দিতে পার তা হলেই বুঝব তুমি সত্যি বিক্রমাদিত্য।"

দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত হয়ে যক্ষ স্বীকার করল, ইনিই হচ্ছেন প্রকৃত বিক্রমাদিত্য। যক্ষ বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে তোমার আসন্ন মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারব।"

যক্ষ ছাড়া পেয়ে বিক্রমাদিত্যকে তাঁর জীবন সম্বন্ধে গোপন কথা খুলে বলল।

ভোগবতী নগরে চন্দ্রভানু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর প্রতাপ ছিল প্রবল। একদিন মৃগয়ায় বেরিয়ে রাজা দেখলেন এক তপস্বী মাথা নীচের দিকে ও পা ওপরের দিকে করে একটি গাছে ঝুলে ধূমপান করছেন। মৃগয়া থেকে ফিরে এসে রাজা মন্ত্রী ও পারিষদ্‌বর্গকে এই আশ্চর্য সন্ন্যাসীর কথা বললেন এবং ঘোষণা করলেন কেউ যদি এই তপস্বীকে রাজধানীতে নিয়ে আসতে পারে তবে তাকে তিনি লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দেবেন।

কিছুদিন পরে একটি মেয়ে এসে রাজাকে জানাল যে যথোপযুক্ত সাহায্য পেলে সে ঐ সন্ন্যাসীকে রাজার কাছে এনে দেবে। রাজাও সাহায্যদানে সম্মত হলেন।

বনে গিয়ে মেয়েটি দেখল সত্যিই অনাহারশীর্ণ এক সন্ন্যাসী মাটির দিকে মাথা করে গাছে ঝুলে ধূমপান করছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই সন্ন্যাসীর তপোভঙ্গ করা অসম্ভব মনে করে মেয়েটি তার কাছাকাছিই একটি সুন্দর আশ্রম তৈরি করে বাস করতে লাগল।
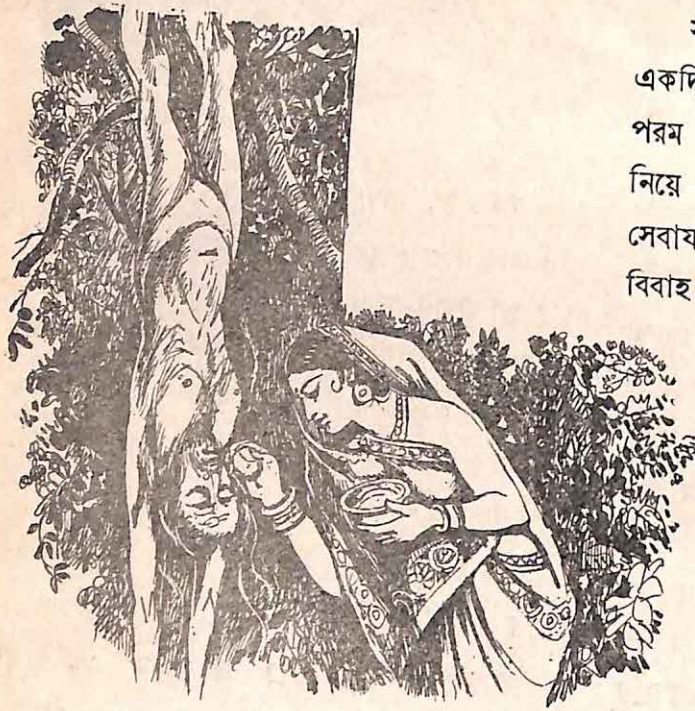
সুস্বাদু মোহনভোগ সন্ন্যাসীর মুখের কাছে ধরল।

এইভাবে কিছুদিন যাবার পর মেয়েটি একদিন খানিকটা সুস্বাদু মোহনভোগ তৈরি করে সন্ন্যাসীর মুখের কাছে ধরল। সন্ন্যাসীও মুখে মিষ্টি লাগায় সঙ্গে সঙ্গে তা খেয়ে ফেললেন। মেয়েটি তখন আরও মোহনভোগ তুলে ধরল সন্ন্যাসীর মুখে এবং সন্ন্যাসী এবারেও তা খেয়ে ফেললেন। এইভাবে পর পর ক'দিন মোহনভোগ খাইয়ে মেয়েটি সন্ন্যাসীর শরীরে আগের মত শক্তি ফিরিয়ে আনল। গায়ে জোর পেয়ে সন্ন্যাসী গাছ থেকে নেমে এসে বললেন, "তুমি কে? এখানে এসেছ কেন?"

মেয়েটি উত্তর দিল, "আমি দেবকন্যা, দেবলোকে তপস্যা করি। এখানে তীর্থ করতে এসে আপনার মত তপস্বীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমার জীবন ধন্য।"

সন্ন্যাসী মেয়েটির সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে একদিন মেয়েটির সঙ্গে তার আশ্রম দেখতে গেলেন। পরম সমাদরে মেয়েটি সন্ন্যাসীকে নিজের আশ্রমে নিয়ে গিয়ে তাঁর অনেক সেবাযত্ন করল। মেয়েটির সেবাযত্নে মুগ্ধ হয়ে সন্ন্যাসী অবশেষে মেয়েটিকে বিবাহ করে গৃহী লোকের মত জীবনযাপন করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে তাঁদের একটি পুত্র হ'ল।

তারপর মেয়েটি একদিন তীর্থযাত্রার নাম করে ছেলেটিকে সন্ন্যাসীর কাঁধে চাপিয়ে তাঁকে নিয়ে সোজা চন্দ্রভানুর রাজসভায় এসে উপস্থিত হ'ল। রাজা দূর থেকে দেখে সন্ন্যাসীকে চিনতে পারলেন। মেয়েটি এই দুরূহ কাজ করতে পেরেছে বলে সবার সামনে তার বুদ্ধির প্রশংসা করে তাকে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন।

সন্ন্যাসীর এবার পুরো ব্যাপারটা বুঝতে বাকি রইল না। ক্ষুব্ধ, অপমানিত সন্ন্যাসীর তখন সব রাগ গিয়ে পড়ল রাজার ওপর। তিনি স্থির করলেন যেমন করেই হোক এর প্রতিশোধ নিতে হবে। ছেলেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে সন্ন্যাসী
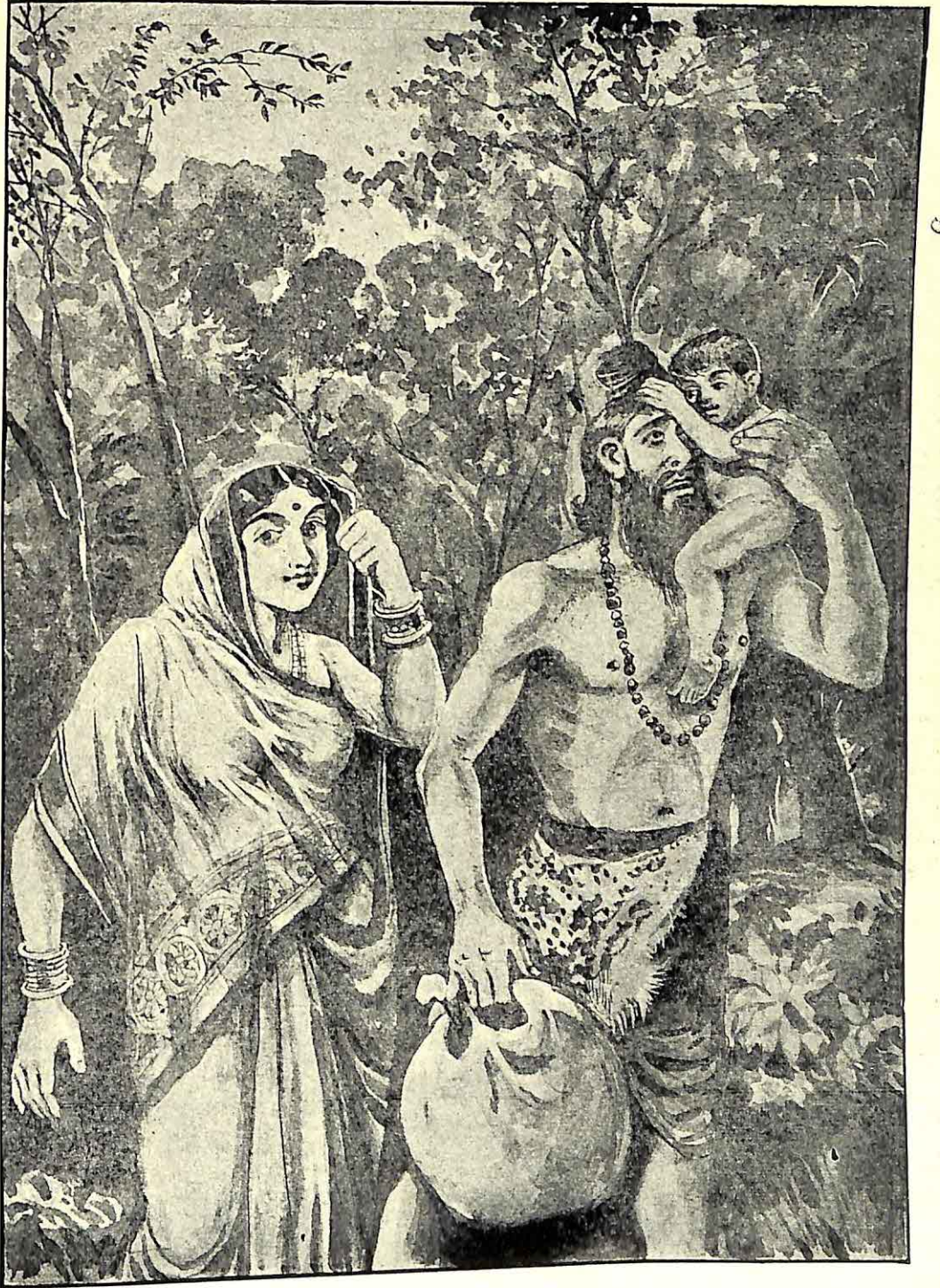
ছেলেটিকে সন্ন্যাসীর কাঁধে চাপিয়ে···

(যে গল্প চিরকালের ঃ পৃঃ ১৬২৬)

চলে গেলেন আর এক গভীর বনে আরও কঠিন তপস্যার উদ্দেশ্যে। এর পর তপস্যার প্রভাবে বিশেষ শক্তিলাভ করে সন্ন্যাসী রাজা চন্দ্রভানুকে বধ করলেন।

যক্ষ বলল, "মহারাজ, তুমি, চন্দ্রভানু ও যোগী একই লগ্নে, একই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেছ। চন্দ্রভানু তেলির ঘরে জন্মেও ভাগ্যগুণে ভোগবতীর রাজা হয়েছিলেন। যোগী কুমোরের ঘরে জন্মগ্রহণ করে মস্ত সন্ন্যাসী হয়ে নিজের তপস্যার বলে চন্দ্রভানুকে বধ করে শ্মশানের কাছে এক শিরীষ গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে। এখন তোমার প্রাণসংহার করতে পারলেই তার বাসনা পূর্ণ হবে। তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে তবেই তুমি দীর্ঘকাল নিষ্কণ্টক হয়ে রাজ্যশাসন করতে পারবে।" এই বলে যক্ষ ফিরে গেল।

কিছুদিন পরে শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী রাজাকে একটা বেল হাতে দিয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন। রাজার সন্দেহ হ'ল যক্ষ যে সন্ন্যাসীর কথা বলেছিল এ সে নয়তো! এ বেল খাওয়া তা হলে ঠিক হবে না। রাজা কোষাধ্যক্ষকে বেলটি সাবধানে তুলে রাখতে নির্দেশ দিলেন। তার পর থেকে ঐ সন্ন্যাসী প্রতিদিনই ঐ রকম একটি করে বেল দিয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করে যেতেন। একদিন একটি বেল অসাবধানতায় মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে যাওয়ায় তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক অপূর্ব উজ্জ্বল রত্ন। পরে রাজা জানতে পারলেন যে সন্ন্যাসীর দেওয়া সব ক'টি বেলেই ঐ রকম মূল্যবান্ রত্ন আছে। জহুরীকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে রাজা আরও জানতে পারলেন যে প্রত্যেকটি রত্নই কোটি টাকা মূল্যের। রাজা তখন সন্ন্যাসীকে বললেন, "আপনি আমাকে এই
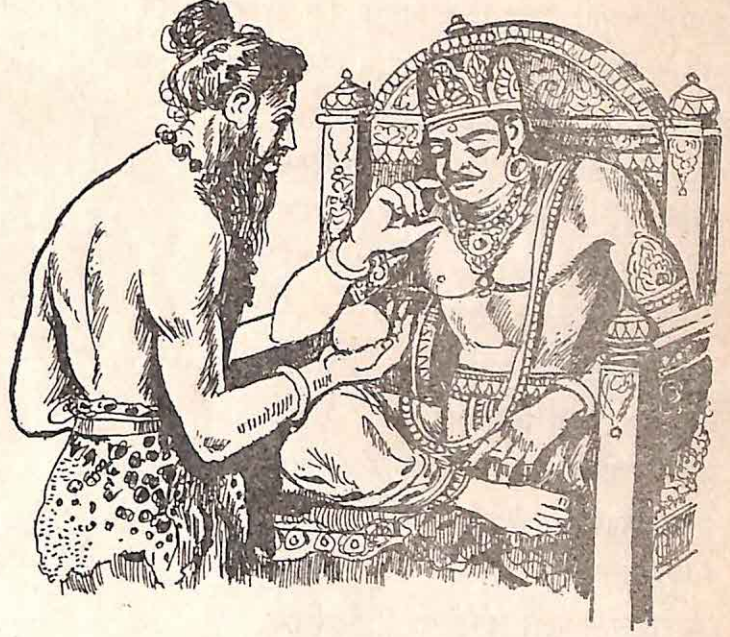
রাজাকে একটা বেল হাতে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

যে এত সব দুর্মূল্য রত্ন উপহার দিলেন তার পরিবর্তে আমার কাছে আপনার যদি কিছু প্রার্থনীয় থাকে তা হলে জানান। আমি নিশ্চয়ই তা পূরণ করব।"

সন্ন্যাসী রাজাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে বললেন, "গোদাবরী নদীর তীরে এক শ্মশানে আমি মন্ত্রসাধনা করি। আমার একান্ত অনুরোধ, কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রে আপনি সন্ধ্যে থেকে প্রভাত পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকবেন।" রাজা সম্মত হলেন।

কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রে মহারাজ বিক্রমাদিত্য একটি তলোয়ার মাত্র হাতে নিয়ে সন্ন্যাসীর সাধন-ক্ষেত্র সেই শ্মশানে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে রাজা দেখলেন সন্ন্যাসী দু'টি মড়ার খুলি নিয়ে বাজনা

স্থাপত্যে, শিল্পে, ফরাসীদের প্রচুর নাম। মধ্য যুগে তৈরি ওর শ্যাতুগুলো (যাকে ইংল্যাণ্ডে বলা হয় ক্যাস্‌ল্‌) এখনও দর্শকদের বিস্মিত করে। তেমনি ওদের ললিত কলা। ফরাসী অপেরা, থিয়েটার—এগুলির কথাও না বললে ফরাসীদের সঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না।

শহরবাসী ফরাসীদের মধ্যে আড়ম্বর ও বিলাসিতার বাহুল্য দেখা গেলেও ওখানকার গ্রামের লোকদের জীবনযাত্রা কিন্তু খুব সরল। সেখানে অনেকেই চাষবাস করে এবং তাদের সকলেরই নিজস্ব খানিকটা করে জমি আছে। আর, ফরাসীদের আর একটা মস্ত গুণ ওদের রান্না। গোটা ইয়োরোপে নাকি এ ব্যাপারে ওদের সমকক্ষ কেউ নেই। নানারকম মুখোরোচক খাবারের আবিষ্কার করে ওরা সারা ইয়োরোপের মন জয় করেছে।

এক সময় বাণিজ্যের নাম করে ফরাসীরা আমাদের দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ইংরেজদের সঙ্গে তাদের এ নিয়ে অনেক লড়াইও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইংরেজরাই এখানে জেঁকে বসে। তবে এই সেদিন পর্যন্ত ভারতের কয়েকটি জায়গা ছিল ফরাসীদের দখলে। এগুলির মধ্যে আমাদের ঘরের কাছে চন্দননগর আর দক্ষিণ ভারতে পণ্ডিচেরীর কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। ভারত স্বাধীন হবার পর ফরাসীরা ওগুলি ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেও ওদের নানা স্মৃতি এখনও ঐ সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

জার্মেনী

আসল নাম 'ডয়ট্‌শ্‌লাণ্ট'। জার্মানরা ওই নামেই দেশের পরিচয় দেয়—যদিও পৃথিবীর অন্যত্র দেশটি জার্মেনী নামেই পরিচিত। তবে ইতিহাসের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে একেবারে গোড়ায় জার্মেনী নামেও কোন দেশ ছিল না, ছিল ছোট ছোট আলাদা আলাদা রাজ্য। সেখানকার বাসিন্দা ছিল গথ, ভিসিগথ, ফ্রাঙ্ক, স্যাক্সন প্রভৃতি জাতের লোক। খুব সভ্য না হলেও যুদ্ধবিগ্রহে তারা বীর বলেই পরিচিত ছিল। এই বিভিন্ন জাতের লোকদের একত্র করে এক শাসনে আনার কৃতিত্ব সম্রাট্ শার্লমেনেরই বলতে হবে। সে হচ্ছে ৮ম শতাব্দীর কথা। অবশ্য পরে আবার ওর মধ্যেও কতকগুলি পৃথক্ রাজ্য গড়ে ওঠে। তবে মোটামুটি এদের সবাইকে নিয়েই জার্মেনী।

পরবর্তী কালে এদেরও কিছু কিছু নাম পালটে যায়। এদের মধ্যে প্রধান বোধ হয় প্রুশিয়া। এ ছাড়াও কিছু কিছু অন্য নামের রাজ্যও ছিল। কিন্তু এখন আর সে সব নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন দেখি না। তবে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশগুলি পৃথক্ দেশ হলেও সবাই কিন্তু মোটামুটি এক জার্মান ভাষাভাষী।

বর্তমানে জার্মেনী কিন্তু দু'টো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে—একটার নাম পশ্চিম জার্মেনী, অপরটি পূর্ব জার্মেনী। সে কথায় পরে আসছি।

এক সময়ে জার্মেনীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিসমার্কের ভূমিকা তোমরা ইতিহাসের পাতায় পড়েছ। তাঁরই চেষ্টায় পৃথিবীর একটি বিরাট শক্তিশালী সাম্রাজ্য হয়ে উঠল জার্মান সাম্রাজ্য। জার্মান সম্রাট্‌কে বলা হ'ত কাইজার। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম (ভিলহেল্‌ম্‌) জার্মেনীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি করে গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখতেন। হয়তো তারই ফলে ঘটল প্রথম মহাযুদ্ধ। এ যুদ্ধে জার্মানদের পরাজয়ের ফলে সমস্ত জার্মান জাতটাকে যেন ধুলোয় মিশিয়ে দেবার চেষ্টা হ'ল। ভার্সাই সন্ধির

ফলে এমন সব শর্ত আরোপ করা হ'ল যাতে ওরা আর কোনদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। কিন্তু জার্মানরা মরা জাত নয়; আবার তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। অ্যাডল্‌ফ্ হিটলারের নেতৃত্বে গঠিত হ'ল ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট দল (নাৎসীওনেল)—যাদের সংক্ষেপে বলা হ'ত নাৎসী।

দেখতে দেখতে হিটলার হয়ে উঠলেন জার্মেনীর সর্বেসর্বা। তিনি বললেন, ভার্সাই চুক্তি জার্মানদের কাছে মস্ত বড় এক অপমানের চুক্তি। এ চুক্তি মানা চলবে না। সত্যি সত্যি তিনি সে সব চুক্তি উড়িয়ে দিয়ে নতুন করে গড়ে তুললেন জার্মেনীকে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুত বেড়ে চলল। বেকার সমস্যা দূর হ'ল। এমনিতেই জার্মান জাতটা যেমন কর্মনিষ্ঠ, তেমনি মাথাওয়ালা। দেখতে দেখতে হিটলারের জার্মেনী—রাইখ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির একটি হয়ে উঠল। একটা বিরাট যুদ্ধে পরাজয়ের পর ধূলিলুণ্ঠিত একটা দেশকে এত বড় করে তোলা নিশ্চয়ই কম কৃতিত্বের কথা নয়।

কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে। ক্ষমতায় উন্মত্ত হিটলার বললেন, জার্মানরাই পৃথিবীর সেরা জাত, তারাই প্রকৃত আর্য। ইহুদীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে ছিল খুবই উন্নত। তবে তারা যে সকলেই সৎ ছিল তা হয়তো নয়। কিন্তু হিটলার সৎ-অসৎ মানলেন না, ভালো-মন্দর ধার ধারলেন না, ইহুদীদের পাইকারী হারে জার্মেনী থেকে তাড়িয়ে দিতে শুরু করলেন। আরও নানাভাবে নির্যাতন শুরু হ'ল তাদের ওপর। যে সব জার্মান ইহুদী জ্ঞানে, গরিমায় জার্মেনীকে পৃথিবীর সামনে উঁচু করে দিয়েছিলেন রেহাই পেলেন না তাঁরাও।

এইতেই শেষ নয়। বাড়তে লাগল নাৎসীদের সমরসজ্জা। নানা রকম সন্ধি, চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে তারা ইয়োরোপের নানা দেশ দখল করতেও শুরু করল। ফলে শুরু হ'ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। নাৎসী বাহিনী এবার ইহুদীদের ওপর আরও অকথ্য অত্যাচার শুরু করল।

প্রথম দিকে জয়ের পর জয়। হিটলারের অজেয় সৈন্য পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, নরওয়ে, ফ্রান্স সব দখল করে ফেলল। কিন্তু ঘা খেল প্রথম রাশিয়ার কাছে। প্রথম দিকে অবশ্য তারা প্রচণ্ড আক্রমণে রাশিয়ারও বিরাট অংশ দখল করে নিয়েছিল কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যেরা অমানুষিক বিক্রমে শেষ পর্যন্ত তাদের রুখে দিল। ওদিকে ইটালি, জাপান এরা এসে যোগ দিল জার্মেনীর সঙ্গে। অপর পক্ষেও ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও সোভিয়েত বাহিনী একত্র হয়ে দু'দিক্ থেকে চেপে ধরল জার্মেনীকে। জাপান সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ জয় করে ভারতের দিকে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু তার পরই ঘটল বিপর্যয়। আমেরিকা অ্যাটম্ বোমা ফেলল জাপানে, জাপান আত্মসমর্পণ করল। জার্মেনীও চারিদিক্ থেকে ঘেরাও হয়ে হার স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল। হিটলার শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে নিগ্রহের হাত থেকে রক্ষা পেলেন। বিরাট জার্মান শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

বিপক্ষ দল,—অর্থাৎ আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স প্রথমে জার্মেনীকে চার ভাগে ভাগ করে নিল। পরে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স নিজেদের অংশ মিশিয়ে গড়ে তুলল ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মেনী (এফ. ডি. আর) যাকে বলা হয় পশ্চিম জার্মেনী। তার নতুন রাজধানী হল বন্। আর বাকি জার্মেনী রইল রাশিয়ানদের আওতায়।

ইয়োরোপীয় সমাজের মন জয় করে নেয় অল্পকালের মধ্যেই। ইয়োরোপীয় সব ভাষাতেই আরব্য উপন্যাসের ছোটবড় বহু তর্জমা হয়েছে। কেউ বেছে নিয়েছে এর নির্দোষ গল্পগুলিকে শিশুপাঠ্য পুস্তক রূপে, কেউ করেছে এর "অ্যাড্‌ভেঞ্চারের" গল্পগুলিকে নিয়ে শোভন সংস্করণ, আবার কেউ বা গল্পগুলিকে সাজিয়েছে বয়স্কদের মনোরঞ্জনের জন্য। এর নানা কাহিনী অবলম্বন করে নাটক, সিনেমা, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত ভাষাতেই কত যে রচিত হয়েছে তার সীমা সংখ্যা নেই।

বাংলায় আরব্য উপন্যাসের আদর

প্রায় একশ' বছর আগে বাংলা দেশের পুস্তক প্রকাশের আদি পীঠস্থান চিৎপুর (বটতলা) থেকে মূল পারসী ভাষা হ'তে অনুবাদ করে স্বর্গত যোগেন্দ্রনাথ দে মহাশয় "আরব্য উপন্যাস" সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। পুস্তকখানি ছিল সচিত্র। ছবিগুলি ফর্মার সঙ্গে ছাপা হয় নি, সেগুলি পরে বইটির সঙ্গে যুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ছবিগুলির নীচের দিকে এক কোণে লেখা থাকত "নৃত্যলাল শীল খোদিত ও নন্দলাল শীল মুদ্রিত"। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও বটতলার পুস্তক-প্রকাশকদের প্রত্যেকেরই একটা করে সচিত্র "আরব্য উপন্যাসের" বই নানা নামে, ঐ একই গল্প দিয়ে ছাপা হ'ত। "মরুর দেশের রূপকথা", "একাধিক সহস্র রজনী", "একাধিক সহস্র দিবস", "মরুকুসুম" ইত্যাদি কত নামেই না! ফরাসী দেশের চিত্রকর "এডমণ্ড ডুলাক" আরব্য উপন্যাসের ছোটবড় সংস্করণের ছবি এঁকে জগৎবিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি আরব্য উপন্যাসের ছবি এঁকে এমনই তদ্‌গতচিত্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে পরবর্তী জীবনে ফরাসী, ইংরেজি, জার্মান্ প্রভৃতির রূপকথার ছবি আঁকবার সময়েও তাঁর "আরব্য উপন্যাসের" ছবির ধাঁচই চলে আসত, শিল্পীর অজানতে। অবনীন্দ্রনাথেরও শেষজীবনের আঁকা কুড়ি-পঁচিশখানি চমৎকার "আরব্য উপন্যাসের" ছবি আছে।

"আরব্য উপন্যাস" গ্রন্থটির আরম্ভে যে কাহিনীটি আছে তা যেমনই চমকপ্রদ, তেমনি লোমহর্ষক। এখানে সংক্ষেপে সে কাহিনীটি দেওয়া হ'ল।

গল্প শুরু হওয়ার গল্প

ইরানের শাহানশা বাদশা শাহরিয়ার। দোর্দণ্ড তাঁর প্রতাপ। তাঁর বেগম আমিনা ছিলেন ইরানের সেরা সুন্দরী। ঐশ্বর্য, সম্পদ্—কিছুরই অভাব ছিল না এঁদের, ছিল না শুধু স্বামীস্ত্রীর মনের মিল। বেগম বাদশাকে বিষনজরে দেখতেন, এবং ভিতরে ভিতরে তাঁর অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করতেন। কিছুদিন পরে বাদশা সবই জানলেন, সবই বুঝলেন। তারপর, সেকালে যেমনটি হ'ত তাই হ'ল, অর্থাৎ বেগমের গর্দান নেওয়া হ'ল।

এই ঘটনার পরে বাদশা গেলেন একেবারে ক্ষেপে, তাঁর মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। বৃদ্ধ উজীরকে ডেকে বললেন যে তিনি প্রতিদিন রাত্রিবেলা একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করবেন, আর প্রভাত হলেই তার যাবে গর্দান।

চলল এইভাবে নারীহত্যা দিনের পর দিন। অভিজাত, আমীর ওমরাহ্‌রা তাঁদের সুন্দরী মেয়ে-বোনদের নিয়ে রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে রাজ্য ছেড়ে পালাতে লাগলেন। বৃদ্ধ উজীর পড়লেন মহা দুর্ভাবনায়। প্রতিদিন একটি করে

সুন্দরী বিবাহযোগ্যা মেয়ে তিনি আর কত জোগান দেবেন ?

উজীরেরও ছিল দু'টি কন্যা,—বড়টির নাম শাহারজাদী, ছোটটি দুনিয়ারজাদী। শাহারজাদী ছিল পরমা সুন্দরী এবং খুবই উচ্চশিক্ষিতা। সে পিতাকে

কন্যার কথায় অসহায় বৃদ্ধ উজীর মাথায় হাত দিলেন।

দুর্ভাবনাগ্রস্ত দেখে একদিন তাঁর কাছে গিয়ে বলল, "আব্বাজান, কত দিন আর চলবে এই নির্মম নারী-হত্যা ? আর আপনিও কি এই বীভৎস নারীহত্যার জন্য বাদশাহের সঙ্গে প্রায় সমান অংশীদার হয়ে পড়ছেন না ? তারপর, কোথায় পাবেন প্রতিদিন এই সাদীর উপযোগী কন্যা ? কন্যার জোগান না দিতে পারলে একদিন আপনাকেও যে বসতে হবে ঘাতকের তলোয়ারের নীচে !

বৃদ্ধ উজীর কন্যার দিকে তাকিয়ে অসহায় ভাবে বলে উঠলেন, "আমি কি করতে পারি ?"

শাহারজাদী বলল, "আমি এক মৎলব ঠাউরেছি। আজ রাত্রে আমিই যাব বাদশাহের কাছে সাদীর কন্যা হিসেবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি সুন্দর সুন্দর গল্প বলে বাদশাহের মন ফেরাতে পারব।"

কন্যার কথায় অসহায় বৃদ্ধ উজীর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কোন্ পিতা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে আদরের দুলালী কন্যাকে সমর্পণ করতে চায় ? কিন্তু শাহারজাদী নাছোড়বান্দা। বহু কষ্টে সে পিতার সম্মতি আদায় করে ছোট বোন দুনিয়ারজাদীকে বলল, "বহিন, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। একটা উন্মাদ বাদশাকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় আমি তা জানি। আমার সাদীর পর তোমাকে ডেকে পাঠাব আমাদের শয়ন-ঘরে। তুমি গিয়েই বলবে, 'বহিন, তোমার তো কাল সকালেই গর্দান যাবে, আজ রাত্রে তুমি আমাকে শেষবারের মত তোমার অপূর্ব দু'-একটি গল্প শোনাও।' তারপর সব ভার আমার।"

যথা নিয়মে শাহী জাঁকজমকের সঙ্গে শাহারজাদীর সাদী হয়ে গেল বাদশাহের সঙ্গে সেই রাত্রিতেই। অপূর্ব বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল সুন্দরী তরুণী উজীরকন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে বাদশাহের মনে

একটু করুণার উদ্রেক হ'ল—তার পরিণামের কথা চিন্তা করে। হঠাৎ বাদশা দেখতে পেলেন —উজীর-কন্যার চোখে জল মুক্তাবিন্দুর মত টলমল করছে। শান্তকণ্ঠে শাহরিয়ার বললেন, "তুমি তো জেনেশুনেই এ কাজ করেছ উজীরকন্যা, তবে এখন কাঁদছ কেন?"

দৃপ্তকণ্ঠে শাহারজাদী বলল, "শাহান শাহ্ দিন ছুনিয়ার মালিক। মরণকে ভয় করলে আমি যেচে এ কাজ করতাম না। আমার একটি ছোট বোন আছে। এই শেষ সময়ে তাকে একবার কাছে পেলাম না বলে আমার মন বড়ই ব্যথিত হয়ে উঠছে।"

আমার একটি ছোট বোন আছে···

বাদশা তৎক্ষণাৎ তাঞ্জাম পাঠিয়ে ছুনিয়ারজাদীকে নিয়ে এলেন সেখানে। ছ'বোনের মিলনদৃশ্য শাহরিয়ারকে একটু বিচলিত করে তুলল।

ছুনিয়ারজাদী বললে, "বহিন, জন্মের মত তোমার মুখ থেকে একটি চমৎকার গল্প শুনতে চাইছি—রাত্রি প্রভাতেই তোমার মৃত্যু যখন অবধারিত হয়ে আছে।"

এই কথা শুনে শাহরিয়ারও বলে উঠলেন, "তুমি ভালো গল্প বলতে পার নয়া বেগম?"

কুর্নিশ করে শাহারজাদী বলল, "শাহান শাহের হুকুম হলেই আরম্ভ করতে পারি আমার গল্প।"

তারপর আরম্ভ হ'ল শাহারজাদীর গল্প। সুমধুর জলতরঙ্গের বাজনার মত সুধা-মাখানো কণ্ঠে মনোহর চিত্তাকর্ষক সেই কাহিনী শুনে বাদশাহ আনন্দে, হর্ষে ও বিস্ময়ে মগ্ন হয়ে রইলেন। এদিকে ভোর হয়ে গেল, কিন্তু গল্প শেষ হ'ল না। চিন্তিত মুখে শাহারজাদী বলল, "শাহন শাহ্, গল্পের শেষ দিক্‌টা যে আরও চমৎকার। কিন্তু রাত তো শেষ হয়ে গেল।"

বাদশাহ্ গল্পে এতই মশ্‌গুল হয়ে গিয়েছিলেন যে শেষটা না শুনে মোটেই তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। বাধ্য হয়ে সেদিনের মত বেগমের শিরশ্ছেদের আদেশ মুলতুবী রেখেই তিনি দরবারে চলে গেলেন।

এইভাবে রাতের পর রাত বসতে লাগল গল্পের আসর শাহী শয়নঘরে। দেখতে দেখতে একাধিক সহস্র রজনী পার হয়ে গেল। বাদশা শাহরিয়ারও দিনের পর দিন একটু একটু করে রূপসী ও প্রখর-বুদ্ধিসম্পন্না বেগমকে এমনই ভালবেসে ফেললেন যে তার মৃত্যুদণ্ড একেবারেই রহিত হয়ে গেল।

বেগম শাহারজাদীর বলা সেই গল্পগুলোই হ'ল আরব্য উপন্যাস বা আরব্য রজনীর গল্প—ইংরেজিতে যার নাম 'অ্যারেবিয়ান নাইট্‌স্'।

ইতিহাসের কথা

ইতিহাসের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা

ইতিহাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনেক স্মরণীয় ঘটনা লুকিয়ে আছে। মানবসভ্যতার উত্থান-পতন, লোমহর্ষক যুদ্ধবিগ্রহ, অসাধারণ বীরত্বের কাহিনী, রক্তক্ষয়ী বিপ্লব, আরও কত কি! ইতিহাসের পাতা থেকে তাই কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা বেছে নিয়ে এবার তুলে ধরব। ইতিহাস গল্পের চেয়েও বোধ হয় বিস্ময়কর।

ম্যারাথনের যুদ্ধ

ইতিহাসের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল প্রাচীন গ্রীস এবং পারস্যের ইতিহাসে। পারস্য সাম্রাজ্য ছিল এক বিরাট সাম্রাজ্য। এশিয়া মাইনর (আধুনিক তুরস্ক) থেকে সিন্ধুনদের তীর (ভারত) অবধি বিস্তৃত ছিল এই রাজ্য। মিশর এবং এশিয়া মাইনরের কিছু গ্রীক শহরও ছিল এই সাম্রাজ্যের মধ্যে। প্রাচীন গ্রীকদের সঙ্গে পারসিকদের গড়ে উঠেছিল একটি সংঘর্ষের সম্পর্ক। গ্রীসের মাটিতে তাই ঘটেছিল দু'টি ঐতিহাসিক যুদ্ধ—প্রথমটি ম্যারাথনে, দ্বিতীয়টি থার্মোপিলিতে। দু'টি যুদ্ধেই পারসিকরা আক্রমণ করে শাস্তি দিতে চেয়েছিল গ্রীকদের। কিন্তু পরাস্ত হয়েছিল বা অসফল হয়েছিল। গ্রীকদের সেই বীরত্ব এবং শৌর্যের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাই স্মরণীয় হয়ে আছে।

খৃষ্টপূর্ব ৪৯৩ অব্দে সম্রাট্ প্রথম দারিয়াস বা দারায়ুসের নেতৃত্বে পারস্য সাম্রাজ্য ম্যাসিডোনিয়া থেকে ভারতবর্ষের পাঞ্জাব অবধি বিস্তারলাভ করেছিল। এই সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্তর্গত ছিল মিশরও। আইয়োনিয়ার শহরগুলিও সম্রাট্ দারিয়াসের অধীনে ছিল। এই গ্রীক শহরগুলি শাসন করত তাদের গ্রীক শাসকরা—কিন্তু তারা পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল।

৪৯৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে আইয়োনিয়ার গ্রীক শহরগুলি এথেন্স এবং ইরিত্রিয়ার সাহায্যে বিদ্রোহ করেছিল, কিন্তু খৃঃ পূঃ ৪৯৪ অব্দে পারসিকরা এই বিদ্রোহ দমন করে মিলেটাস অধিকার করে নিল। সম্রাট্ দারিয়াস এবার এথেন্স এবং ইরিত্রিয়াকে যে শাস্তি দেবেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইল না।

বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাসের লেখা থেকে আমরা সে সময়কার ইতিহাসের বিবরণ পাই। যদিও হিরোডোটাসের লেখা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল

তার নাম হ'ল জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক (জি. ডি. আর)—যাকে বলা হয় পূর্ব জার্মেনী। রাজধানী রইল সেই বার্লিনেই।

এখন জার্মেনী এই দু'টি পৃথক্ রাজ্যে ভাগ হয়ে গেছে। মাঝখানে দেয়াল। এক দিক্ থেকে অন্য দিকে যেতে অনেক ল্যাঠা। পশ্চিম জার্মেনী এখন আমেরিকা-ঘেঁষা, পূর্ব জার্মেনী রাশিয়া-ঘেঁষা অর্থাৎ কমিউনিস্ট দেশ। দু'টি জার্মেনী-ই আবার জেগে উঠছে। তবে পশ্চিম জার্মেনীর অগ্রগতি হয়েছে অনেক বেশি। শত বাধাবিঘ্নের মধ্যেও জার্মান জাত আবার আগের মত শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে।
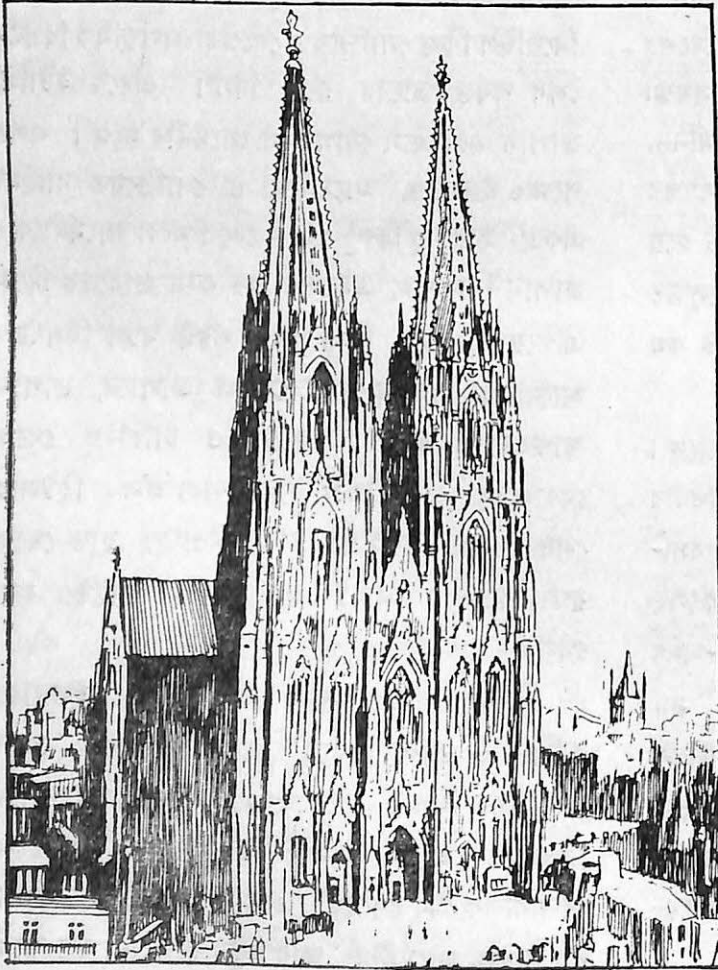
জার্মেনীর কোলোনের বিখ্যাত গীর্জা

যুদ্ধের ফলে জার্মেনীতে পুরুষের সংখ্যা এত কমে গিয়েছিল যে মেয়েদেরই বেশির ভাগ কাজ চালাতে হ'ত। ফলে বহু বিদেশী এসে সহজেই ওখানে আস্তানা গাড়ার সুযোগ পায়। বহু ভারতীয়ও জার্মেনীতে গিয়ে ওখানকার মেয়ে বিয়ে করে ওদেশে স্থায়ী ভাবে রয়ে গেছে।

অত্যন্ত সুন্দর দেশ এই জার্মেনী। ওখানকার রাইন নদী বলতে ওরা অজ্ঞান। রাইন ধরে ধরে স্টীমারযাত্রা এক অদ্ভুত আনন্দদায়ক অভিযান। পাহাড়পর্বত, ছোট ছোট গ্রাম, আঙুরের ক্ষেত, ফুলের বাগান আর নিরলস পল্লী-বাসীদের সহজ সুন্দর জীবন দেখলে মনেই হবে না এরাই একদিন লড়াই করে সারা পৃথিবী যুড়ে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তুলেছিল। রাইনের মত ড্যানিউবও জার্মেনীর ভিতর দিয়েই বয়ে চলেছে।

জার্মানরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ জাত। বিজ্ঞানে ওদের দান অপরিসীম। জার্মান বিজ্ঞানীদের কথা শুনলে আজও শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। শিলে, ভ্যান্টহফ্ থেকে শুরু করে আইন-স্টাইন, অটো হান সবাই তো জার্মান। সকলের নাম করতে গেলে বিরাট ফর্দ হয়ে যাবে। তেমনি জার্মান ভাষাও অত্যন্ত উন্নত। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য সম্বন্ধে ভালো করে জানতে গেলে এ

ভাষা শিখতেই হবে। তা ছাড়া জার্মেনীর বাইরেও বহু জায়গায় এই ভাষা চালু থাকায় জার্মান ভাষা শেখার একটা আকর্ষণও আছে।

বিজ্ঞানের মত সাহিত্যে, দর্শনেও জার্মানদের অবদান বড় কম নয়। সেই মধ্যযুগের মার্টিন লুথার থেকে শুরু করে কাণ্ট, লিবনিৎজ, গয়টে, হেগেল, হাইনে, শিলার, শপেনহাওয়ার, নিট্‌শে, হপ্‌ট্‌ম্যান্, টমাস্ মান্—এঁদের নাম কে না জানে? আর সাম্যবাদের প্রবর্তক কার্ল মার্ক্স? তিনিও তো জার্মেনীরই লোক!

নানা রকম বৈজ্ঞানিক শিল্পে, বাণিজ্যে এক সময় জার্মেনী ছিল পৃথিবীর একটি সেরা দেশ ; সে গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্য আজও তাদের চেষ্টার অন্ত নেই। শিক্ষাদীক্ষায়, স্থাপত্যে, শিল্পে জার্মেনী চিরকালই বরণীয় হয়ে আছে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। ভারতের স্বাধীনতার মূলেও কিন্তু জার্মেনীর সাহায্যের কথা ভুললে চলবে না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রথমে তাদেরই সাহায্যে সাবমেরিনে জাপান যাবার সুযোগ পান এবং জাপানীদের সাহায্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলে বৃটীশ শক্তিকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে কাঁপিয়ে দেন, ভারতে ঢুকে পড়ে তার খানিকটা দখলও করে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত নানা প্রতিকূল বিপর্যয়ে তাঁরা সফল না হলেও ভারতের স্বাধীনতা লাভ যে একমাত্র শুধু গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনেই এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়েছে এ কথা বলা যায় না। এই স্বাধীনতা লাভে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদানও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা কখনই অস্বীকার করতে পারবেন না।

ভারত স্বাধীন হবার পর লর্ড এটিলি একবার এদেশে এলে তাঁকে নাকি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—'আপনারা কার ভয়ে এ দেশ এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে গেলেন?—গান্ধীজীর ভয়ে?' এটিলি নাকি বলেছিলেন, 'না, আমাদের ভয় ছিল সুভাষ বসুকে। সে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে টলিয়ে দিয়েছিল। সৈন্যবাহিনী একবার বিগড়ে গেলে সে দেশকে আয়ত্তে রাখা খুবই কঠিন।'

ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র

সারা ইয়োরোপে ছড়িয়ে আছে আরো অনেক ছোট-বড় স্বাধীন রাষ্ট্র—ইতিহাস, প্রাকৃতিক শোভা এবং নানারকম বৈচিত্র্যে যার অনেকগুলোই উল্লেখ-যোগ্য। সবগুলির কথা বলা সম্ভব নয়, অল্প কয়েকটির কথা বলি।

হাঙ্গেরী রয়েছে ২৩৫,৯১৯ বর্গ কিলোমিটার জায়গা যুড়ে। রাজধানী বুডাপেষ্ট।

হাঙ্গেরীর ইতিহাস নানা আক্রমণের ইতিহাসে রঞ্জিত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হাঙ্গেরী ছিল অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের মধ্যে। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর ১৯১৮ সালে আবার সে স্বাধীনতা পেলেও ২য় মহাযুদ্ধে জার্মানদের পক্ষে যোগ দেওয়ায় হাঙ্গেরী নাৎসীদের কবলে গিয়ে পড়ে। ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত রাশিয়া দেশটার বেশির ভাগই দখল করে নেয়। পরের বছর সেখানে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হলেও রুশরাই তাদের নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। তার পর থেকে হাঙ্গেরী একটি কমিউনিস্ট দেশ হিসেবে রয়ে গেছে।

জার্মানদের সঙ্গে হাঙ্গেরিয়ানদের রয়েছে প্রায় রক্তের সম্বন্ধ। ভাষাতেও রয়েছে প্রচুর মিল। তা সত্ত্বেও হাঙ্গেরীর নিজস্ব সংস্কৃতি অস্বীকার করার উপায় নেই। হাঙ্গেরিয়ান সাহিত্যও খুব উঁচু মানের।

না—অর্থাৎ গ্রীকদের প্রতি লেখাতে পক্ষপাতিত্ব ছিল, তবুও হিরোডোটাসের বিবরণ থেকে এইসব যুদ্ধের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

হিরোডোটাস্

পারসিকদের গ্রীস জয়ের প্রথম প্রচেষ্টা সফল হয় নি, কারণ পারস্যের সৈন্যবাহিনী এই অভিযানে স্থলপথ ব্যবহার করেছিল; পথে খাদ্যাভাবে এবং রোগাক্রান্ত হবার ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল তারা। এই অভিযান গ্রীস অবধি পৌঁছুতেই পারে নি, ফিরে যেতে হয়েছিল সৈন্যবাহিনীকে। দারিয়াস এবার তাই সমুদ্রপথ বেছে নিলেন। খৃঃ পূঃ ৪৯০ অব্দে অশ্বারোহী বাহিনী সমেত বিরাট এক পারসিক অভিযান ইজিয়ান সমুদ্রের পথ ধরে ইউবিয়ায় এসে পৌঁছুল। পারসিকরা সহজেই ইরিত্রিয়া জয় করে নিল। তারপর পারস্যের সৈন্যবাহিনীর এক অংশ জলপথ পার হয়ে গ্রীসের অ্যাটিকার অন্তর্গত ম্যারাথনে এসে পৌঁছুল। ম্যারাথন ছিল এথেন্সের কাছে। কিন্তু পারসিকরা নির্বোধের মত তাদের অশ্বারোহী বাহিনীকে ইউবিয়ায় রেখে এসেছিল।

এথেন্সের অভিজাত দলের নেতা সেই সময়ে ছিলেন মিল্‌টিয়াডিস্। এথেনিয়ান মিল্‌টিয়াডিস্ আগে ছিলেন থ্রেসের চার্‌সোনিসের শাসক, পরে পালিয়ে এসেছিলেন এথেন্সে। মিল্‌টিয়াডিস্ দশ হাজার এথেনিয়ান এবং এক হাজার প্লেটিয়ান সৈন্য নিয়ে দ্রুতবেগে হাজির হলেন ম্যারাথনে এবং আক্রমণ করলেন পারসিকদের। গ্রীক তীরন্দাজের তীরের তীব্র আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল পারসিকরা। তারা সমুদ্রে তাদের জাহাজে পালিয়ে গেল। মিল্‌টিয়াডিস্‌কে এই যুদ্ধের বীর বলা যেতে পারে—এথেন্সকে রক্ষা করার জন্য তাঁর অবদান ছিল অনেকখানি। এই যুদ্ধে প্রমাণিত হ'ল যে ভারী অস্ত্র এবং বর্মে সজ্জিত সৈন্যবাহিনী কাছাকাছি যুদ্ধে হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত এবং বর্মবিহীন সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করতে পারে। তা ছাড়া দারিয়াসের সৈন্যরা ছিল ভাড়া করা সৈন্য—পারস্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের মোতায়েন করা হয়েছিল। এই মিশ্র বাহিনীর মধ্যে আন্তরিকতা বা গ্রীস জয় করার বিশেষ উৎসাহ ছিল না। টাকার জন্যই তারা লড়াই করছিল। অথচ গ্রীকরা অর্থাৎ এথেনিয়ানরা তাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছিল—স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতেও তারা কুণ্ঠিত ছিল না। এই স্বদেশপ্রেমই ছিল গ্রীকদের জয়ের আসল অনুপ্রেরণা।

পারসিক বাহিনীর আবির্ভাবের কথা শুনে এথেনিয়ানরা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারা তাদের পুরোনো শত্রু স্পার্টার সঙ্গে মিটমাট করে নিয়ে পারসিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু স্পার্টার বাহিনী উপস্থিত হবার আগেই এথেনিয়ানরা পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছিল। ম্যারাথনে সম্রাট্ দারিয়াসের এইভাবেই হয়েছিল পরাজয়। গ্রীকদের শৌর্যের
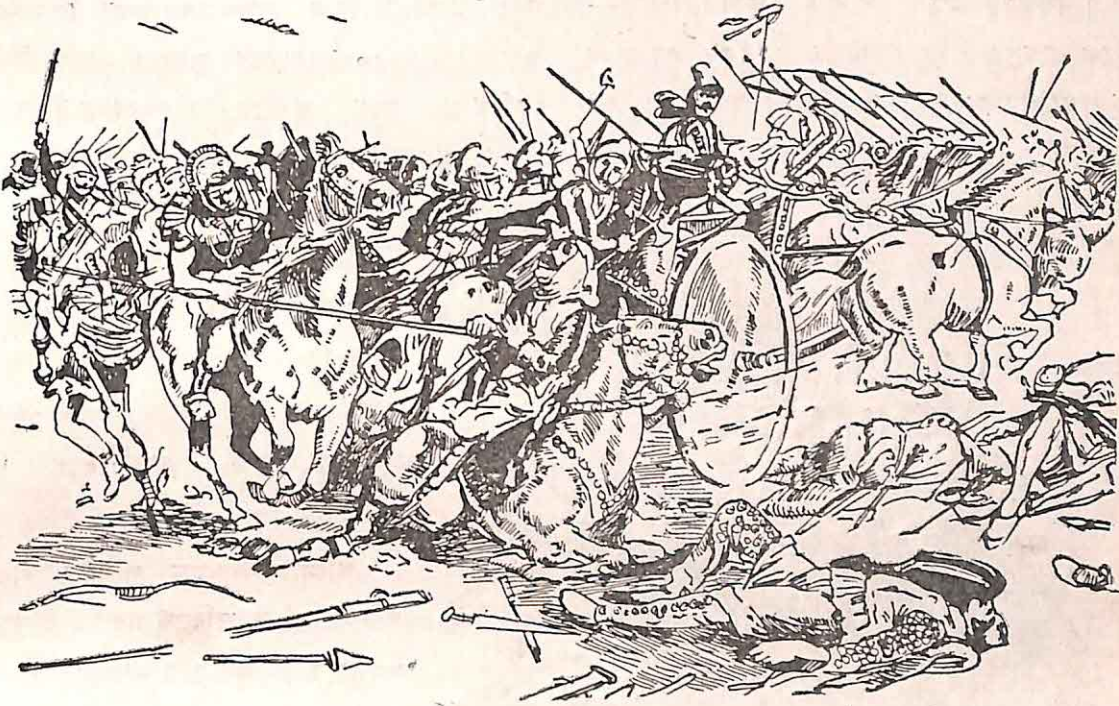
গ্রীকদের তীব্র আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল পারসিকেরা

খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। একজন গ্রীক সৈন্য ২৬ মাইল পথ দৌড়ে এই বিজয়বার্তা এথেন্সে বহন করে এনেছিল ম্যারাথনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। ম্যারাথন দৌড়ের সূত্রপাত এই ঘটনার সঙ্গেই জড়িত। এখনও অলিম্পিক গেম্‌স্‌-এ যে ম্যারাথন দৌড় হয় তার দূরত্ব ২৬ মাইল।

থার্মোপিলির যুদ্ধ

ম্যারাথনের যুদ্ধে এথেন্সের সেনাবাহিনী প্রচুর সুখ্যাতি লাভ করেছিল। দশ বছর বাদে আর একটি যুদ্ধ ঘটেছিল গ্রীসদেশের থার্মোপিলিতে। এই যুদ্ধের ফলে গ্রীসের আর একটি রাজ্য স্পার্টার বীরত্বের গৌরব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সম্রাট্ দারিয়াসের পর পারস্যের সম্রাট্ হয়েছিলেন তাঁর ছেলে জারেক্‌সেস্ (Xerxes)। খৃঃ পূঃ ৪৮ অব্দে গ্রীস জয়ের জন্য এক বিরাট অভিযানে পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। এক লক্ষ সৈন্যে এক বিরাট বাহিনী স্থলপথে যাত্রা করে এশি মাইনর পার হ'ল কবং দার্দানেলেস পার হ ইয়োরোপে প্রবেশ করল। সমুদ্রপথে ৬৬ জাহাজের এক বিরাট নৌবাহিনী এই সৈন্যবাহিনী সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হ'ল। গ্রীসের দুই রাষ্ট্র এথে এবং স্পার্টা পরস্পরের কলহ ভুলে গিয়ে বৈদেশিক শত্রুর মোকাবিলার জন্য তৈরি হ'ল।

পারসিক সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হতে লাগল গ্রীক বাহিনী পিছনে সরে আসতে লাগল। গ্রী বাহিনী চেষ্টা করল থার্মোপিলি বলে একটা জায়গ পারসিক বাহিনীকে আটকাতে। থার্মোপিলি

একটা মৃত্যুফাঁদের মত। সংকীর্ণ একটা গিরিপথ—একদিকে পাহাড়, আর একদিকে সমুদ্র। এর ফলে অল্পসংখ্যক লোকের পক্ষেও এই গিরিপথ রক্ষা করা সম্ভব ছিল।

থার্মোপিলির যুদ্ধ

স্পার্টার রাজা লিওনিডাস ৩০০ স্পার্টানকে সঙ্গে নিয়ে এই গিরিপথ পাহারা দিতে এসে দাঁড়ালেন। উদ্দেশ্য পারসিক বাহিনীকে আটকে রাখা—যাতে গ্রীক বাহিনী সুবিধামত পশ্চাদপসরণ করতে পারে। একের পর এক এক-একজন গ্রীক বীরের পতন হতে লাগল—পুরোনো যোদ্ধার জায়গায় নতুন যোদ্ধা গিয়ে গিরিপথ আটকে দাঁড়াল। পারসিক বাহিনী কিছুতেই আর অগ্রসর হতে পারল না। শেষ পর্যন্ত যখন তারা থার্মোপিলিতে ঢুকল তখন রাজা লিওনিডাস এবং তাঁর ৩০০ সহচরের মৃতদেহ থার্মোপিলির গিরিপথের মুখে শায়িত। অসামান্য বীরত্ব এবং দেশপ্রেমের কাহিনী বলা চলতে পারে এই যুদ্ধকে। নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও বীর লিওনিডাস এবং তাঁর সঙ্গীরা স্বদেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দুঃসাহসিক চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের সেই চেষ্টা সফল হয়েছিল—গ্রীক বাহিনীর পক্ষে পশ্চাদপসরণ সম্ভব হয়েছিল।

থার্মোপিলির যুদ্ধ পৃথিবীর বীরত্বের ইতিহাসে—আত্মবিসর্জনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে।

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী রাষ্ট্র বলা হয়। কিন্তু একদিন এই পরিস্থিতি ছিল না। এই শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশের জায়গায় ছিল কতগুলি কলোনী বা উপনিবেশ। উত্তর আমেরিকায় যারা এই কলোনীগুলির পত্তন করেছিল তাদের অধিকাংশই ছিল ইংরেজিভাষী—গ্রেট ব্রিটেন থেকে এসেছিল তারা। তা ছাড়া হল্যাণ্ড, জার্মানী, ডেনমার্ক এবং ফ্রান্স থেকেও লোকেরা এসে মিশ্র উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল যুড়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে গড়ে উঠেছিল তেরোটি উপনিবেশ। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ঘটেছিল এই গড়ার ইতিহাস। এই উপনিবেশগুলি ছিল ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে।

এই বিভিন্ন উপনিবেশগুলি নিজেদের মতে স্বাধীন রাষ্ট্রের মত চলত—একের সঙ্গে অন্যের খুব মিল ছিল না। উত্তর দিকের রাষ্ট্রগুলিতে ছিল ছোট ছোট খামার,—অধিবাসীদের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা অনেকটা বেশি ছিল। কিন্তু দক্ষিণ দিকের রাষ্ট্র-গুলিতে গড়ে উঠেছিল বড় বড় খামার ও তামাকের ক্ষেত। নিগ্রো ক্রীতদাস দিয়ে চাষ করানো হ'ত এখানে। ইংল্যাণ্ডের অনেক ভূমিপতির এই দক্ষিণের কলোনীগুলিতে স্বার্থ ছিল। দক্ষিণের কলোনী হিসাবে ভার্জিনিয়া, ক্যারোলিনা আর জার্জিয়ার নাম করা যেতে পারে।

১৭৬৩ সালের পর আমেরিকার কলোনীগুলিকে শোষণ করে অর্থলাভ করার একটা নীতি গ্রহণ করে-ছিলেন ইংল্যাণ্ডের রাজা। তাঁর হাতিয়ার ছিল ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট—সেখানে ভূমিপতিদের প্রাধান্য ছিল। এর ফলে আমেরিকার কলোনীগুলির ওপর কর চাপানো হ'ল—তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর নানা নিয়ন্ত্রণ আদেশ ধার্য করা হ'ল এই সঙ্গে। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আমেরিকার ঔপনিবেশিক-দের কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না।

এই জিনিসটা আমেরিকার ঔপনিবেশিকরা ভালো চোখে দেখল না। কলোনীগুলির প্রতিবাদ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট অগ্রাহ্য করলেও কলোনীগুলি কোন অন্যায় দাবী সহজে মেনে নিতে রাজী ছিল না। অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে লাগল।

তারপর ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট (১৭৭৩ সালে) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চা আমেরিকায় বিক্রি করার একটা পরিকল্পনা হাতে নিল—এতে কোম্পানীর ব্যবসায়ে লাভ হবার কথা। কিন্তু এটা ছিল স্থানীয় আমেরিকান চায়ের ব্যবসার স্বার্থের প্রতিকূল। ফলে আমেরিকার অধিবাসীরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চা বর্জন করার নীতি গ্রহণ করল। শুধু তাই নয়, বোষ্টন বন্দরে (ডিসেম্বর, ১৭৭৩) জাহাজ থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সব চা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে তাদের অসন্তোষ পূর্ণভাবে ঘোষণা করল ঔপনিবেশিকরা। বলা বাহুল্য, বিদ্রোহী কলোনীদের এই ঔদ্ধত্য মানতে ইংল্যাণ্ড তৈরি ছিল না। শুরু হ'ল আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ বা বিদ্রোহ।
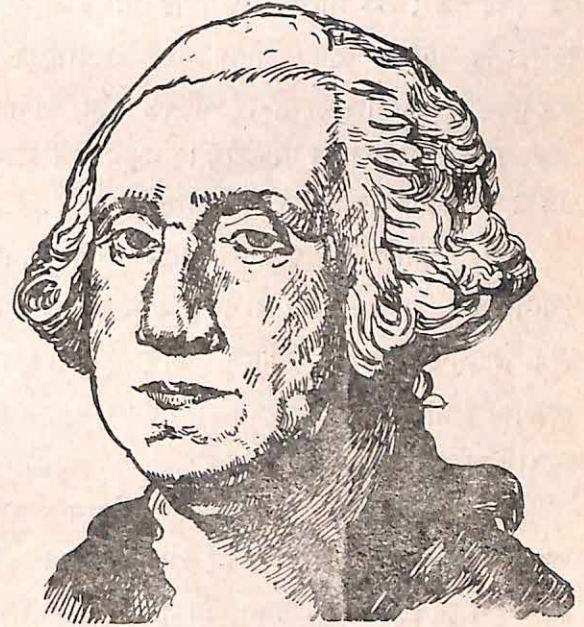
জর্জ ওয়াশিংটন

ইংল্যাণ্ড এবং বিদ্রোহী কলোনীদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হ'ল ১৭৭৫ সালে। ঔপনিবেশিকরা প্রথমটাতেই স্বাধীনতার প্রশ্ন তোলে নি,—করের নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু পরে ঔপনিবেশিকরা গড়ে তুলল তাদের নিজেদের সৈন্যদল। আমেরিকার বিস্তৃত ভূ-খণ্ড যুদ্ধের পক্ষে ছিল অনুকূল। জর্জ ওয়াশিংটন, ঔপনিবেশিকদের একজন বিখ্যাত নেতা,—হলেন এই সৈন্যবাহিনীর প্রধান।

ওয়াশিংটনের সৈন্যদল কয়েকটা যুদ্ধে জয়লাভও করল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। সুযোগ বুঝে ইংল্যাণ্ডের শত্রু ফ্রান্সও যোগ দিল কলোনীদের দলে, আর সেই সঙ্গে স্পেনও (যার কলোনী ছিল আমেরিকার দক্ষিণে) যুদ্ধ ঘোষণা করল ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ইংল্যাণ্ড একটু অসুবিধায় পড়লেও যুদ্ধ বেশ কিছুদিন চলল। ১৭৭৬ সালে কলোনীগুলি বিখ্যাত 'ডিক্ল্যারেশন অব্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স'-এর মাধ্যমে ঘোষণা করল স্বাধীনতা। যুদ্ধ শেষ হল ১৭৮২ সালে। তারপর ১৭৮৩ সালের প্যারিসের চুক্তি ছেদ টানল এই অধ্যায়ের। আমেরিকার তেরোটি কলোনী পরিণত হ'ল স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। নতুন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হল তারা—সৃষ্টি হল মার্কিন জাতির।

জর্জ ওয়াশিংটন হলেন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেণ্ট। তাঁর বীরত্ব এবং নেতৃত্বের জন্য কলোনী-দের জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল, তাই আমেরিকার রাজধানীর নামও রাখা হয়েছে ওয়াশিংটন—এই মহান্ নেতার স্মৃতিকে মনে রাখবার জন্য।

আমেরিকার প্রজাতন্ত্র স্থাপনের পিছনে আরো কয়েকজন বিখ্যাত আমেরিকান নেতার নাম করা যেতে পারে। তাঁরা হলেন টমাস্ পেন্, বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাংক্লিন্ (বিখ্যাত বিজ্ঞানী), প্যাট্রিক হেনরী, টমাস্ জেফার্সন্, অ্যাডাম্স্ এবং জেম্স্ ম্যাডিসন্।

এইভাবে ইংল্যাণ্ডের একটি বড় উপনিবেশ তার নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল স্বাধীনতা-যুদ্ধের ভিতর দিয়ে। ইতিহাসে যেখানেই শোষণের কাহিনী শোনা যায়, প্রায়ই দেখা যায় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চারিত হয়ে উঠছে। আমেরিকার বিপ্লব ইতিহাসের এই শিক্ষাই দান করে গেছে মানুষকে।

ফরাসী বিপ্লব

ফরাসী বিপ্লবের কথা অনেকের কাছেই সুপরিচিত। তবু সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে কিসের জন্য একদিন ঐ বিস্ফোরণ ঘটেছিল এবং তার পরিণাম গড়িয়েছিল কতদূর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ সেটা। ফ্রান্সে তখন ষোড়শ লুইএর রাজত্ব। রাজ্যে অশান্তি দানা বেঁধে উঠছে। ভূমিহীন কৃষক এবং অনাহারী শহরবাসীরা প্রতিবাদের ঝড় তুলছে। ১৭৮৯ সালের

মেরী অ্যাণ্টয়নেট (আঁতোয়ানিয়ে)

১৪ই জুলাই জনতা বিদ্রোহী হয়ে প্যারীর কুখ্যাত ব্যাস্টিল কারাগার দখল করে বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দিল। কিন্তু দেশের সমস্যাগুলির তবুও সুরাহা হ'ল না। বুর্বোঁ (Bourbon) বংশের অপদার্থ রাজা ষোড়শ লুই তাঁর বিলাসী রাণী মেরী অ্যাণ্টয়নেটকে (আঁতোয়ানিয়ে) সঙ্গে নিয়ে রাজত্ব করছিলেন। প্রজাদের ওপর খড়্গহস্ত নেমে আসছিল শাসনের নামে। দেশের দারিদ্র্যের খবর রাজপ্রাসাদে পৌঁছুত না। শোনা যায় মেরী অ্যাণ্টয়নেট অজ্ঞাতসারে এক নির্মম মন্তব্য করেছিলেন প্রজাদের সম্বন্ধে—'ওরা যদি রুটি না পায় তবে ওরা কেক তো খেতে পারে!'

ফরাসী বিদ্রোহ

১৭৯১ সালে দেশের গোলমাল দেখে রাজা লুই তাঁর রাণীকে নিয়ে একবার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের সীমানায় ভার্নেতে কৃষকেরা তাঁদের চিনে ফেলল—রাজাকে ফের ফেরৎ নিয়ে আসা হ'ল প্যারীতে। কিন্তু অবস্থা চরমে উঠল যখন ১৭৯২ সালের ১০ই আগষ্ট প্যারীর বিপ্লবী কমিউনের নির্দেশে জনতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করল। প্রথমে প্রাসাদের সুইস্ রক্ষীরা জনতার ওপর গুলি চালাল। কিন্তু অবশেষে রাজা সিংহাসনচ্যুত এবং বন্দী হলেন। প্যারীর বিদ্রোহী লোকেরা উন্মত্তের মত বহু সন্দেহভাজন লোককে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করল। সেপ্টেম্বর মাসে (১৭৯২) লোক-দেখানো বিচারের পর প্রায় হাজার খানেক লোককে দেওয়া হ'ল মৃত্যুদণ্ড। এই বিখ্যাত 'সেপ্টেম্বর ম্যাসাকার্স্' দিয়ে শুরু হ'ল ফরাসী বিপ্লবের প্রথম রক্তপাতের অনুষ্ঠান।

১৭৯২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর প্যারীর ন্যাশনাল কন্‌ভেন্‌শন দেশকে রিপাবলিক বলে ঘোষণা করল। অর্থাৎ রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে কায়েম করা হ'ল প্রজাতন্ত্রের।

বিপ্লবীরা রাজার বিচার করল—বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ল রাজাকে। অবশেষে ১৭৯৩ সালের ২১শে জানুয়ারী এক কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে গিলোটিন যন্ত্রে রাজা লুইএর মাথা কাটা গেল। ব্যাপারটা ঘটল বিরাট জনতার সামনে। রাজার মাথার টুপি, মাথার চুল আর উইগ্ বিক্রি হল নিলামে। জনতা এতেও ক্ষান্ত হ'ল না—কেউ কেউ গিলোটিনকে ঘিরে নাচল,—কেউ কেউ রাজার রক্তে রুমাল বা কাগজ ভিজিয়ে বাড়ি নিয়ে এল স্মারক-চিহ্ন হিসেবে। ১৭৯৩ সালের অক্টোবর মাসে রাজার মত রাণীরও (মেরী অ্যাণ্টয়নেট) শিরচ্ছেদ করা হ'ল গিলোটিনে।

এর পর ফ্রান্সে যা ঘটল তাকে ইংরেজিতে বলা হয় "রিজিয়ন্ অব্ টেরর" অর্থাৎ বিভীষিকার রাজত্ব। ১৭৯৩ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৭৯৪ সালের মাঝখানটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বিপ্লবীদের একটি

কমিটি—কমিটি অব্ পাব্লিক্ সেফ্টি তখন ফ্রান্সের শাসন পরিচালনা করছিল। এই সময় শত শত অভিজাত ব্যক্তি, ধর্মযাজক এবং সাধারণ লোকের বিচার হ'ল। বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে যাদেরই সন্দেহ করা হতে লাগল তাদেরই হতে লাগল দ্রুত বিচার। বিচারের রায় ছিল হয় মুক্তি, নয় গিলোটিনে মৃত্যু। ফ্রান্সের শহরগুলিতে সে সময় একটি পরিচিত দৃশ্য সহজেই চোখে পড়ত—দু'চাকার গাড়িতে করে অভিযুক্তদের রাস্তা দিয়ে বধ্যভূমিতে অর্থাৎ গিলোটিনের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সময়টা হয়ে দাঁড়াল প্রতিহিংসা ও সন্দেহের সময়। অসংখ্য লোকের এর ফলে মাথা কাটা গেল। বলা বাহুল্য, কিছু নির্দোষ লোকেরও প্রাণহানি ঘটল এই সময়ে।

রাণীকে গিলোটিনের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কিছুদিন বাদে আবহাওয়া এমন হয়ে উঠল যে বিপ্লব তার শত্রুদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য নেতাদেরও গ্রাস করতে শুরু করল। বিপ্লবের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা ছিল রবেপিয়ের। রবেপিয়েরের নেতৃত্বে বিপ্লবের অনেক নামকরা নেতাকেও সন্দেহের বশে করা হ'ল খতম্। তার মধ্যে ছিল রাজা লুই-কে বন্দী করার ব্যাপারে বিখ্যাত নেতা দাঁতোঁ, ব্যাস্টিল কারাগার আন্দোলনের নেতা ক্যামিলি দেস্মুলিঁ, বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ নেতা মারা বা ম্যারাট্ প্রভৃতি ব্যক্তি। শোনা যায় গিলোটিনে যাবার রাস্তায় রবেপিয়েরের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় দাঁতোঁ ব্যঙ্গ করেছিল, বলেছিল,—তুমিও শীগ্গিরই আমাকে অনুসরণ করবে। হ'লও ঠিক তাই। ছ'মাসের মধ্যে রবেপিয়েরের সহকর্মীরা বিনা বিচারে তাকেও গিলোটিনে পাঠিয়ে দিল।

রবেপিয়েরের মৃত্যুর পর ক্রমে বিভীষিকার রাজত্বের অবসান ঘটল। ফ্রান্স তখন বিপ্লবের প্রভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ষড়যন্ত্র, মতবিরোধ এবং রক্তপাত অসহনীয় হয়ে উঠেছে তার কাছে। তাই ১৭৯৯ সালে প্রায় কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই নেপোলিয়নের মিলিটারী ডিক্টেটরশিপ মেনে নিল ফ্রান্স। দেশে আবার পিছনের দরজা দিয়ে ফিরে এল রাজতন্ত্র।

ফরাসী বিপ্লব হঠাৎ জ্বলে উঠে যদিও শেষ অবধি নিভে গেল, তবুও সাধারণ লোকের উন্নতির জন্য রেখে গেল কিছু অবদান। সমস্ত ইয়োরোপে প্রজাতন্ত্রের প্রেরণা এবং মানবতার দাবীর কথা ছড়িয়ে দিয়ে গেল ফরাসী বিপ্লব।

নেপোলিয়ন

ইয়োরোপের ইতিহাসে একটি বিস্ময় হ'ল নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

ইতিহাসের দিগ্বিজয়ী বীরদের দলে ফ্রান্সের এই দুর্ধর্ষ ব্যক্তিটির নাম উল্লেখ করতে হয়। আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সীজার এবং চেঙ্গিস খাঁর সঙ্গে দলভুক্ত করা হয় সম্রাট্ নেপোলিয়নকে।

১৭৬৯ সালে ফ্রান্সের শাসনাধীন কর্সিকা দ্বীপে জন্ম হয়েছিল নেপোলিয়নের। ফরাসী বিপ্লবের পতনের মুখে প্রতি-বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়ে এই তরুণ সামরিক অফিসার সুনাম অর্জন করেছিলেন। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি হয়েছিলেন জেনারেল। ১৭৯৬ সালে উত্তর ইটালীতে সফল অভিযান চালিয়ে ইয়োরোপকে চমকে দিয়েছিলেন তিনি। তরুণ বয়স থেকেই সাম্রাজ্য গড়ার একটা বাসনা ছিল তাঁর মনে। তাই বোধ হয় প্রতীচ্যের দিকে ঝোঁক পড়ল তাঁর। ১৭৯৮ সালে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভূমধ্যসাগরের ব্রিটিশ নৌবহরকে ফাঁকি দিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন মিশরে। মিশর তখন তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ—কিন্তু মিশরের মামেলুকরা তুরস্কের সুলতানের নামে মাত্র অধীন ছিল। জুলাই মাসে (১৭৯৮) তাঁর বিরাট জয় হ'ল মিশরে, যা ব্যাট্‌ল্ অব্ পিরামিড্‌স নামে খ্যাত। কিন্তু ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল নেল্‌সন্ নীলনদের যুদ্ধে ফরাসী নৌবহরকে আলেকজেন্দ্রিয়ায় ধ্বংস করে ফেলায় নেপোলিয়নকে মিশর থেকে ফ্রান্সে পালিয়ে চলে আসতে হ'ল।

যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ন

ফ্রান্সে ফিরে এসে নেপোলিয়নের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। ফ্রান্সে পত্তন হ'ল নতুন সংবিধানের— ফ্রান্সের শাসনভার পড়ল তিনজন কন্‌সালের ওপর। জনতার ভোটে নেপোলিয়ন দশ বছরের জন্য ফার্স্ট কনসাল্ (প্রধান কন্‌সাল্) নিযুক্ত হলেন। ১৮০২ সালে নেপোলিয়ন নিজেকে আজীবনের জন্য কনসাল্ তৈরি করলেন—তাঁর ক্ষমতাও অনেক বৃদ্ধি পেল। ১৮০৪ সালে জনতার রায় নিয়ে নিজেকে সম্রাট্ বলে ঘোষণা করলেন নেপোলিয়ন। ফ্রান্সের কৃষক-সমাজে নেপোলিয়নের ছিল বিরাট সমর্থন।

দশ বছর ধরে নেপোলিয়ন ইয়োরোপের মানচিত্রের চেহারাই পাল্টে দিলেন। এগিয়ে চলল তাঁর একাধিক সফল সামরিক অভিযান এবং গড়ে উঠল যুদ্ধজয়ের পাহাড়। সমস্ত ইয়োরোপ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল তাঁর নাম শুনে। প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য গড়ে উঠল তাঁর ইয়োরোপে। তুষার-ঢাকা আল্পস্ পর্বত ডিঙিয়ে, সুইট্জারল্যাণ্ডের সেন্ট বার্নার্ড গিরিবর্ত্ম পার হয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনী মারেনগোর যুদ্ধে জয়লাভ করল। উম্, অষ্টারলিজ্, জেনা, ইলু, ফ্রিড্ল্যাণ্ড, ভাগ্রাম্ ইত্যাদি জায়গায় বিখ্যাত যুদ্ধে জয়লাভ করলেন নেপোলিয়ন। অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া এবং রাশিয়ার প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল তাঁর অভিযানের বেগে। স্পেন, ইটালী, নেদারল্যাণ্ড (হল্যাণ্ড), কনফিডারেশন্ অব্ রাইন্ (জার্মানীর একটা বড় অংশ), ডাচী অব্ ওয়ার্‌শ বা পোল্যাণ্ড সবই অধীন রাজ্যে পরিণত হ'ল ফ্রান্সের। ইয়োরোপের রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র ইংল্যাণ্ডই তাঁর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেল।

নেপোলিয়নের বিজয়গুলির মধ্যে অস্টারলিজের যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভিয়েনার উত্তরে অস্টারলিজে ১৮০৫ সালের ২রা ডিসেম্বর এই যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধকে বলা হয় ব্যাট্‌ল্ অব্ থ্রি এম্পারার্স্ (তিন সম্রাটের যুদ্ধ)। অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী এই যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অস্ট্রিয়ার বাহিনীকে আর নতুন করে জড় করা সম্ভব হয় নি; আর প্রচণ্ড যুদ্ধের পর রাশিয়ার বাহিনী উত্তর-পূর্ব দিকে সরে যেতে বাধ্য হয়। টলস্টয়ের বিখ্যাত 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস্' উপন্যাসে এই বিখ্যাত যুদ্ধে নেপোলিয়নের অসাধারণ নেতৃত্বের বর্ণনা আছে।

ইংল্যাণ্ড নেপোলিয়নের এক বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংল্যাণ্ডকে শিক্ষা দেবার বাসনা ছিল নেপোলিয়নের মনে। কিন্তু স্পেনের দক্ষিণ উপকূলে কেপ ট্রাফাল্‌গারের যুদ্ধে ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল নেল্‌সন্ আবার সম্মিলিত ফরাসী এবং স্প্যানিশ নৌবহরকে হারিয়ে দেন (এই যুদ্ধেই নেল্‌সন্‌ও মারা যান)। এর ফলে নেপোলিয়নকে বাধ্য হয়ে ইংল্যাণ্ড জয়ের আশা পরিত্যাগ করতে হয়। অবশ্য নেপোলিয়ন
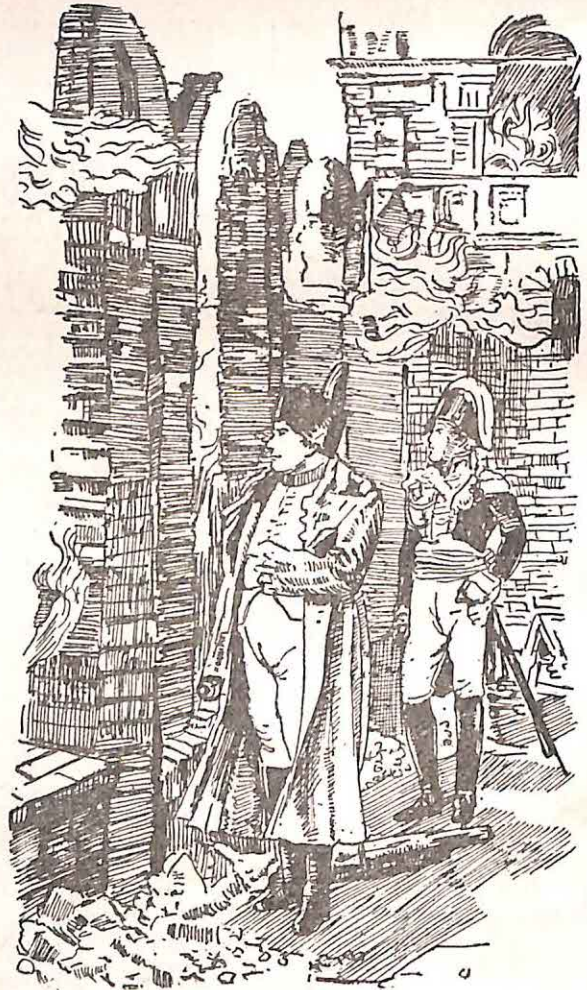
মস্কোতে নেপোলিয়ন

ইয়োরোপের সমস্ত বন্দরকে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। এর উত্তরে

ইংল্যাণ্ডও অবশ্য ইয়োরোপের সঙ্গে আমেরিকা এবং অন্যান্য মহাদেশের বাণিজ্য করার সমুদ্রপথ অবরোধ করার ব্যবস্থা নিয়েছিল।

নেপোলিয়নের বিজয়সূর্য এবার আস্তে আস্তে দিগন্তের দিকে হেলতে লাগল। চতুর্দিকের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে লাগলেন তিনি। কিন্তু ১৮১২ সালে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাশিয়ায় অভিযান করলেন নেপোলিয়ন। উদ্দেশ্য রাশিয়ার জারকে একটু শিক্ষা দেওয়া,—কারণ জার নিকোলাস নিজের বোনের সঙ্গে নেপোলিয়নের বিবাহে রাজী হন নি। রাশিয়ানরা ক্রমাগত সরে যেতে লাগল—সামনা-সামনি যুদ্ধ এড়িয়ে গেল তারা। নিজেদের প্রিয় মস্কো শহরেও আগুন ধরিয়ে দিয়ে রাশিয়ানরা দূরে সরে গেল, আর জ্বলন্ত শহরে প্রবেশ করলেন নেপোলিয়ন। কিন্তু এই যুদ্ধই নেপোলিয়নের কাল হ'ল। মস্কো থেকে ফ্রান্সে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে চললেন নেপোলিয়ন। পথে প্রচণ্ড শীতে এবং খাদ্যের অভাবে বহু সৈনিক মারা গেল। তা ছাড়া রাশিয়ান বাহিনী ক্রমাগত অবসন্ন ফরাসী বাহিনীকে আক্রমণ করে উত্যক্ত করতে লাগল; এর ফলেও লোকক্ষয় হ'ল। বিখ্যাত রাশিয়ান জেনারেল কুটুজভের বীরত্বের কথা টলস্টয় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসে (ওআর অ্যাণ্ড পীস্) অমর করে রেখেছেন। কুটুজভ জারোস্লাভেট্জ্-এ ফরাসী বাহিনীর পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন, ফলে নেপোলিয়নকে অসুবিধার মধ্যে অন্য পথ দিয়ে ফিরতে হ'ল রসদ এবং খাদ্যবিহীন অবস্থায়।

রাশিয়ার যুদ্ধের ফল নেপোলিয়নের পক্ষে হ'ল সত্যিকারের আঘাত। ফ্রান্সের জনবলেরও প্রচণ্ড ক্ষতি হ'ল। এক লক্ষ সত্তর হাজার লোক বন্দী হ'ল—এক লক্ষ সত্তর হাজার লোক প্রাণ হারাল রাশিয়ার অভিযানে। ১৮১৩ সালে প্রাশিয়ানদের সঙ্গে লিপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়নের আবার পরাজয় হ'ল—যদিও নেপোলিয়নের শত্রুদেরও অনেক বেশি লোকক্ষয় হ'ল। কিছুদিন পর ফ্রান্সে বিজয়ী প্রাশিয়ান, রাশিয়ান এবং ইংরেজ বাহিনী প্রবেশ করল। ১৮১৪ সালে নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করলেন, ভূমধ্যসাগরের এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হ'ল তাঁকে। ইয়োরোপের শক্তিগুলি ইয়োরোপের মানচিত্র নতুন করে তৈরি করার জন্য ভিয়েনায় এক কংগ্রেসে মিলিত হ'ল।

কিন্তু ১৮১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নেপোলিয়ন আবার ফ্রান্সে ফিরে এলেন। কৃষক এবং সৈনিকদের মধ্যে সম্রাট্ পেলেন নতুন সম্বর্ধনা। ভীত হয়ে উঠল ইয়োরোপের রাজনীতিকদের দল। কিন্তু ফ্রান্স তখন যুদ্ধের ভারে অবসন্ন। নেপোলিয়ন কয়েকটি যুদ্ধে আবার জিতলেও ভাগ্যের চাকা তাঁর অনুকূলে আর ঘুরল না। ফ্রান্সে ফিরে আসার ১০০ দিনের মধ্যে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ইংরেজ এবং প্রাশিয়ান বাহিনীর হাতে নেপোলিয়নের ঘটল চূড়ান্ত পরাজয়।

ওয়াটার্লুর যুদ্ধ ঘটেছিল ১৮১৫ সালে। জুন মাসেই নেপোলিয়ন তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ এবং প্রাশিয়ান সৈন্যবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করা—তারা পরস্পর মিলিত হবার আগেই তাদের পৃথক্ ভাবে আঘাত হানা। লিগ্‌নীতে প্রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে আংশিক সাফল্য লাভ করলেন নেপোলিয়ন। প্রাশিয়ান সেনাপতি ব্ল্যুখের (Blüiucher) ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে মণ্ট্ সণ্ট্ জাঁতে প্রাশিয়ান বাহিনী ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে। এই প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করেই

ওয়েলিংটন ১৮ই জুন ওয়াটার্লুতে যুদ্ধ মেনে নেন। ওয়াটার্লু ছিল বেলজিয়ামে, ব্রাসেল্‌স্‌ শহরের কাছে।

ছ' পক্ষে সমানে সমানে লড়াই হ'ল। কিন্তু নেপোলিয়নের কপাল ছিল খারাপ। দিনের শেষে ফরাসীদের পরাজয় ঘটল। ৩রা জুলাই প্যারিসের পতন হ'ল আর ৯ই জুলাই নেপোলিয়ন দ্বিতীয়বার সিংহাসন ত্যাগ করলেন—এক ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপ্‌টেনের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন তিনি। ইয়োরোপের সম্মিলিত শক্তিরা এবার তাঁকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসনে পাঠাল। সেখানে হ'ল কড়া পাহারার ব্যবস্থা। সেখানেই, সাড়ে পাঁচ বছর বাদে, অবহেলা এবং অমর্যাদার ভিতর নির্বাসিত নেপোলিয়নের মৃত্যু ঘটল (মে, ১৮২১)। ইয়োরোপের রাজনৈতিক আকাশের একটি বিরাট নক্ষত্র অবশেষে খসে পড়ল।

রুশ বিপ্লব

রুশ বিপ্লবের কথা ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনাগুলির মধ্যে স্বভাবতই সহজে চোখে পড়ে। ঐতিহাসিক জারের (রাশিয়ার সম্রাট্‌) শাসনের অবসান ঘটেছিল রাশিয়ায় এই বিপ্লবের ফলে। সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকের জন্ম হয়েছিল—যার মূল প্রেরণা ছিল সাম্যবাদ।

রুশ বিপ্লব ঘটেছিল ১৯১৭ সালে। আসলে ছ'টি বিপ্লব ঘটেছিল এই বছরে। একটি মার্চ মাসে, দ্বিতীয়টি নভেম্বরে। কিন্তু রাশিয়ার পুরোনো ক্যালেণ্ডার (ইয়োরোপের ক্যালেণ্ডারের চাইতে ১ মাস পিছিয়ে) অনুযায়ী এই ছ'টি বিপ্লবকে ফেব্রুয়ারী এবং অক্টোবরের রিভলিউশন বলা হয়।

রাশিয়াতে ১৯০৫ সালে আগে একটি বিপ্লব হয়েছিল। কিন্তু জারের আমলে তা কঠোরভাবে দমন করা হয়। রাশিয়ার মার্ক্‌স্‌বাদীদের *, বিশেষ
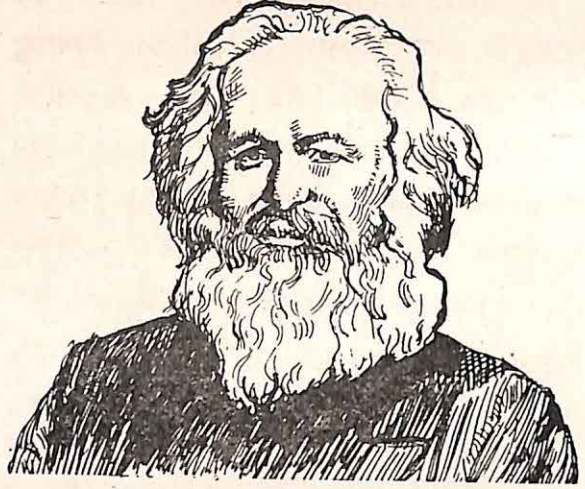
কার্ল মার্ক্‌স্‌

করে বলশেভিকদের (এরাও এক ধরনের মার্ক্‌স্‌বাদী) প্রচণ্ডভাবে দমন করা হয়েছিল। এই বলশেভিকদের অনেকেই ছিল সাইবেরিয়ায় বা রাশিয়ার বাইরে নির্বাসিত। বিখ্যাত মার্ক্‌স্‌বাদী নেতা লেনিন (বিদেশে নির্বাসিত) এই নির্বাসিত রাশিয়ান মার্ক্‌স্‌বাদীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। লেনিনের উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ায় মার্ক্‌স্‌বাদকে বিপ্লবের মাধ্যমে স্থাপন করা এবং বিপ্লবকে সফল করার জন্য ট্রেনিং দিয়ে এক সুদক্ষ বিপ্লবী দল গড়ে তোলা।

১৯১৪ সালে রাশিয়ার পটভূমিকা বিপ্লবের অনুকূল হয়ে উঠছিল। শহরের শ্রমজীবীদের অসন্তোষ ফেটে পড়ছিল ধর্মঘট বা স্ট্রাইকে। এর পর এল প্রথম মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধকে মার্ক্‌স্‌বাদীরা সমর্থন করল না। যুদ্ধে রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হ'ল। পেট্রোগ্রাড্‌ শহরে (আগেকার সেণ্ট

* সমাজবাদের প্রচারক কার্ল মার্ক্‌সের মতের অনুগামী।

লেনিন

পিটার্সবার্গ—পরে নাম হয়েছে লেনিনগ্রাড্) এক ধরনের লোক প্রচুর মুনাফা লুটল যুদ্ধের সুযোগে, কিন্তু দেশের সৈন্যশ্রেণী—কৃষকদের দলে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল অসন্তোষ।

রাজা জার নিকোলাস নির্বোধ তো ছিলেনই—উপরন্তু ছিলেন তাঁর জারিনার (রাণীর) বশীভূত। রাস্‌পুটিন্ নামের একজন কুখ্যাত এবং অসাধু ধর্মযাজক এই সময় জার-জারিনার খুব প্রিয়পাত্র হয়ে শাসন-ক্ষমতা অনেকটা হাত করে নিয়েছিল। বড় বড় পদের নিয়োগ ছিল রাস্‌পুটিনের হাতে। দেশের লোকের অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। ১৯১৬ সালে রাসপুটিনকে হত্যা করা হ'ল। কিন্তু জারের গুপ্ত পুলিশবাহিনীর দমনলীলা আরো বেড়ে গেল।

পেট্রোগ্রাড শহরে খাদ্যাভাবের জন্য দুর্ভিক্ষ এবং দাঙ্গা হ'ল এরপর। জমে-ওঠা সমস্যা এবার গুরুতর আকার ধারণ করল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে মার্চ মাসে (১৯১৭) এল বিপ্লব। এই বিপ্লব কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি ছিল না। এতে প্রধান অংশ নিয়েছিল পেট্রোগ্রাডের ফ্যাক্টরী-শ্রমিকেরা। সৈনিকেরা শ্রমিকদের জন্য সহানুভূতি দেখাল—পুলিশ গুলি চালিয়েও এই বিপ্লবকে দমন করতে পারল না। পেট্রোগ্রাড্ থেকে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ল মস্কোতে। কৃষক-সমাজ এই নতুন পরিবর্তনকে মেনে নিল। রক্তপাতের ভিতর দিয়ে এল এই মার্চ বিপ্লব।

মিলিটারী জেনারেল এবং নেতাদের চাপে পড়ে জার সিংহাসন ত্যাগ করলেন। রোমানফ্ রাজবংশের

রাশিয়ার শেষ জার নিকোলাস

৩০০ বছরের স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটল এই সঙ্গে।

ইতিমধ্যে শ্রমিক এবং সৈনিকদের প্রতিনিধি নিয়ে সৃষ্টি হ'ল প্রতিনিধি সভা—সোভিয়েটের। ভূস্বামীদের দল (Duma) সোভিয়েটের অনুরোধে

রাশিয়ার শেষ জারিনা

কাজ চালাবার মত শাসনভার (প্রভিশনাল গভর্নমেণ্ট) হাতে নিল। সোভিয়েট—কিন্তু আসলে প্রভিশনাল গভর্নমেণ্ট,—এই দুইএর হাতেই রইল শাসনভার। ফলে শুরু হ'ল সোভিয়েটের হস্তক্ষেপ। চলল বিশৃঙ্খলা। জনতা অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগল বিপ্লবের কথা। কারণ জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার শপথ ছাড়া নতুন গভর্নমেণ্টের কাজ থেকে সমাজকল্যাণমূলক কিছুই পাওয়া গেল না।

এই পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট বা সেন্ট্রাল সোভিয়েট—সৈনিক ও শ্রমিকদের নির্বাচিত সমিতি (ইলেক্‌টেড্ কাউন্‌সিল অব্ সোল্‌জার্স অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স) পরে দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সভা হয়ে দাঁড়াল। প্রথম থেকেই প্রভিশনাল গভর্নমেণ্টের ডিক্রীগুলি কেন্দ্রীয় সোভিয়েটের অনুমোদন ছাড়া জারি হ'ত না। প্রত্যেক শহরে, প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতে এবং প্রত্যেক রেজিমেণ্টের ইউনিটে সোভিয়েট (প্রতিনিধি সভা) প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এই সব সোভিয়েটদের সমর্থনে পেট্রোগ্রাড্ সোভিয়েট পরে শক্তিশালী হয়ে উঠল।

১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে লেনিন নির্বাসন থেকে রাশিয়ায় ফিরে এলেন। লেনিনের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েটে আস্তে আস্তে বলশেভিকদের (মার্ক্‌স্‌বাদী) প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা এবং মেন্‌শেভিকদের (আর এক মার্ক্‌স্‌বাদী দল) প্রভাব হ্রাস করা। তাই লেনিন এসেই চেষ্টা করলেন শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর জনপ্রিয়তা অর্জন করবার। বলশেভিক পার্টির মন্ত্র হ'ল ধনতন্ত্র বা ক্যাপিটালিজ্‌ম্-এর বিরুদ্ধে লড়াই। প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্র (ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক), জমিদারী দখল এবং শ্রমিকদের আট ঘণ্টা কাজের (ডিউটির) প্রতিশ্রুতি বলশেভিক পার্টির স্লোগানের অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল। আর একজন বিখ্যাত নেতা ইতিমধ্যে নির্বাসন থেকে পেট্রোগ্রাডে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর নাম ট্রট্স্কী। বলশেভিকদের সেন্ট্রাল সোভিয়েটে

ক্ষমতা দখলের লড়াইএ তিনি হয়ে উঠলেন লেনিনের সব চাইতে সুযোগ্য সহচর। লেনিন এবং ট্রট্স্কী দু'জনেই খুব ভালো বক্তা ছিলেন। বিভিন্ন সোভিয়েটে বলশেভিকদের সংখ্যা এবং প্রতিপত্তি বাড়তে লাগল।

কাজ-চালানো প্রভিশনাল গভর্নমেন্টকে তখন পরিচালনা করছিল একটি রক্ষণশীল এবং উদারপন্থী এই দুই-এ মেশানো দুর্বল 'কোয়ালিশন' দল। প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের নেতৃত্ব ছিল কৃষক-শ্রমিক পার্টির কেরেন্স্কীর হাতে। ইনি ছিলেন পেট্রোগ্রাড্ সোভিয়েটের সভ্য। কিন্তু কেরেন্স্কী বলশেভিকদের সায়েস্তা করতে উঠে পড়ে লাগলেন। লেনিনের নামে জার্মানীর গুপ্তচর হিসেবে কুৎসা রটনা করা হ'ল—গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারি হ'ল তাঁর নামে। ট্রট্স্কী সমেত অনেক বলশেভিককে গ্রেপ্তার করা হ'ল। পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের হস্তক্ষেপে ট্রট্স্কী অবশ্য ছাড়া পেলেন, লেনিনও গা ঢাকা দিলেন কিছুদিনের জন্য।

প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের প্রতি জনতা ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে সোভিয়েটের সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠছিল। ঠিক সেই সময় লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের পতন ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থাৎ সেন্ট্রাল সোভিয়েটে ক্ষমতা দখল করবার পরিকল্পনা করলেন।

৭ই নভেম্বর (১৯১৭) এই বিপ্লব ঘটল বলশেভিকদের নেতৃত্বে,—অক্টোবর বিপ্লব বলে এই ঘটনা পরিচিত। খুব সামান্যই রক্তপাত ঘটল—প্রায় শান্তিপূর্ণই বলা চলতে পারে এই বিপ্লবকে। প্রভিশনাল গভর্নমেন্টকে খতম্ করা হ'ল। লেনিন হলেন সেন্ট্রাল সোভিয়েটের প্রধান। সুপরিকল্পিত ছিল এই বিপ্লব। শিল্পশ্রমিকদের প্রতিনিধিরা এই প্রথম দেশের শাসনভার গ্রহণ করল। ট্রট্স্কী হলেন বিদেশ-মন্ত্রী।

রাসপুটিন

অক্টোবর বিপ্লবের অল্প কিছুদিন পরে দেশের সমস্ত শিল্পকে সমাজতান্ত্রিক নিয়মে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হ'ল। লেনিন চাইলেন জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধে শান্তি—যাতে বিপ্লবে ক্ষতবিক্ষত রাশিয়াকে আবার গড়ে তোলা যায়। ব্রেষ্ট্ লিটভ্স্কের সন্ধি অনুযায়ী জার্মানদের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধবিরতি ঘটল। কিন্তু ১৯১৯ থেকে

১৯২০ সাল অবধি জারের সমর্থকরা ডেনিকিন্, কোলচাক্, র‍্যাঞ্জেল এবং ইউডেনিক্ প্রভৃতি জেনারেল-দের নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট রিপাব্লিককে নানা দিক্ থেকে আক্রমণ করে চলল। কিন্তু লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সোশ্যালিষ্ট রিপাব্লিক তখন নতুন আত্মবিশ্বাস এবং দেশাত্মবোধ খুঁজে পেয়েছে। ট্রট্স্কীর নেতৃত্বে গড়ে উঠল বিশাল লাল ফৌজ। নানা শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হ'ল সোশ্যালিষ্ট রিপাব্লিক অব্ রাশিয়া। ১৯২০ সালে লাল ফৌজের সৈন্যসংখ্যা হয়ে দাঁড়াল তিপ্পান্ন লক্ষ।

বিখ্যাত রাশিয়ান ঔপন্যাসিক ম্যাক্সিম গোর্কীর লেখা থেকে লেনিন এবং ট্রট্স্কীর চরিত্রের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। তা ছাড়া ১৯১৮ সালে রাশিয়ার ওপর চেক সৈন্যদল (অ্যালায়েড পাওয়ার) আক্রমণ করার সময় পূর্ব রাশিয়ায় স্থানীয় সোভিয়েট জার সমেত সমস্ত রাজপরিবারকে হত্যা করেছিল। শোনা যায় এই রক্তপাত লেনিনের মনঃপূত ছিল না। রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব ইতিহাসের পাতায় একটি আশ্চর্যজনক অধ্যায় হয়ে রইল।

কামাল আতাতুর্ক

তুরস্কের বিখ্যাত অটোমান সাম্রাজ্য আস্তে আস্তে একদিন ভেঙ্গে পড়েছিল। মানচিত্রের চেহারা পাল্টে গিয়েছিল ইয়োরোপের। গৌরবের দিনে তুরস্কের সৈন্যবাহিনী একদা হাজির হয়েছিল ইয়োরোপে—ভিয়েনা শহরের দরজায়। তারপর সেই শক্তিশালী সাম্রাজ্য আস্তে আস্তে দুর্বল—মুমূর্ষু হয়ে পড়ল। রাশিয়ার জার বিদ্রূপ করে তুরস্ককে ইয়োরোপের রোগাক্রান্ত ব্যক্তি (দি সিক্ ম্যান্ অব্ ইয়োরোপ) বলে সম্বোধন করলেন। বোঝা গেল অটোমান সাম্রাজ্য তার দুর্বল সুলতানের শাসনের নীচে ধুঁকছে।

প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের ফলে তুরস্কের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়িয়ে-ছিল। রাজধানী কন্স্টান্টিনোপ্লে পুতুল সুলতান খলিফা ওয়াহিদ্-উদ্দিন ব্রিটিশ-ফরাসীদের তাঁবেদার হয়ে রাজত্ব করছিলেন। তুরস্কের পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। কন্স্টান্টিনোপ্ল্ বলতে গেলে তখন মিত্র শক্তিদের অধীনে। যুদ্ধে পরিশ্রান্ত তুরস্ককে এক অপমানজনক পরিস্থিতির মধ্যে নিজের ভাগ্যের জন্য প্রস্তুত থাকতে হচ্ছিল। কিন্তু সেই সময় তুরস্কে কিছু জাতীয়তাবাদী নেতা ঠিক করেছিলেন যে এই অপমানজনক পরিস্থিতির হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হলে লড়াইও চালাতে হবে। এই জাতীয়তাবাদী নেতারা গোপনে এশিয়া মাইনরে অস্ত্র সংগ্রহের কাজও করছিলেন। এই দলের মধ্যে মুস্তাফা কামাল পাশার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯১৯ সালে (মে মাস) গ্রীস তুরস্কের অন্তর্গত এশিয়া মাইনরের স্মার্না আক্রমণ করল। এই আক্রমণ হয়েছিল ব্রিটিশ, ফরাসী এবং আমেরিকান অর্থাৎ মিত্র-শক্তিদের প্ররোচনায় এবং সাহায্যে। গ্রীকরা ব্যাপক নরহত্যা এবং ধ্বংসলীলা চালিয়ে খুব দুর্নাম কিনল। কিন্তু এর ফলে তুরস্কে সঞ্চার হ'ল প্রবল ক্রোধ এবং দেশাত্মবোধের। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কামালের হাত আরও শক্ত হ'ল।

১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে জাতীয়তাবাদী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি সভা (কংগ্রেস) হ'ল—তুরস্কের অ্যানাটোলিয়ায়। এর ফলে প্রতিরোধ আন্দোলনের এক্জিকিউটিভ কমিটির প্রেসিডেণ্ট হলেন কামাল।

এই সভায় একটি ন্যাশনাল প্যাক্ট গৃহীত হ'ল। মিত্রশক্তিদের সঙ্গে সন্ধির শর্তগুলি বলা ছিল এতে, তুরস্কের সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও এতে দাবী করা হ'ল। কিন্তু ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের ফলে এই কংগ্রেসের অনেক প্রতিনিধিকে ইস্তাম্বুল (কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌-এর তুরস্ক নাম) থেকে গ্রেপ্তার করে নির্বাসিত করা হ'ল বিদেশে। প্রতিক্রিয়া হিসেবে উত্তেজনা বাড়ল। পলাতক জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধিরা অ্যাঙ্গোরায় নতুন পার্লামেণ্ট (গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্ব্লী) গঠন করল। এই পার্লামেণ্ট ঘোষণা করল তুরস্কের গভর্নমেণ্ট এবার থেকে তারাই পরিচালনা করবে—তাঁবেদার সুলতানের শাসনতান্ত্রিক কোন অস্তিত্ব থাকবে না। ফলে সুলতানের নির্দেশে কামাল পাশাকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে ঘোষণা করা হ'ল—মৃত্যুদণ্ডের পরওয়ানাও বেরুল। ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করা হ'ল কামাল এবং তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল তুরস্কে।

১৯২০ সালে (আগষ্ট) মিত্রশক্তিরা তুরস্কের উপর আপত্তিকর সেভ্‌রেস্‌এর চুক্তি চাপিয়ে দিল। এর ফলে তুরস্কের স্বাধীনতা হ'ল বিপন্ন। সুলতানের প্রতিনিধিরা এই চুক্তিতে সই করলেও জাতীয়তাবাদীরা তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করল এই চুক্তিকে। তুরস্ককে ফের শায়েস্তা করতে উঠেপড়ে লাগল মিত্রশক্তিরা। এশিয়া মাইনরে ভূখণ্ড দখলের লোভ দেখিয়ে গ্রীসকে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানো হ'ল। ওদিকে কামাল পাশার দলও বসে রইল না। গড়ে উঠল জাতীয়তাবাদী সৈন্যবাহিনী। ইংরেজদের প্রতি শত্রুতার সম্পর্ক থাকায় কামালকে রাশিয়া টাকা আর অস্ত্রের ঢালাও সাহায্য দিল এই ব্যাপারে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তৈরি হলেন কামাল।

১৯২০ সালে কামাল গ্রীকদের হাতে একবার পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯২১ সালের গ্রীষ্মে এবং শরতে অভিযান চালালেন গ্রীক রাজা কনস্‌টান্‌টাইন্‌। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ তাঁকে মন্ত্রণা

কামাল আতাতুর্ক

এবং অর্থসাহায্য দুইএরই সুবিধা দিয়েছিলেন। ফরাসীরা ইঙ্গিতে জানাল যে তারা হয়তো কামালকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারে। প্রথম দিক্‌টায় গ্রীকদের জয় হ'ল। কিন্তু জলবিহীন আংকারার (অ্যাংগোরা) পার্বত্য মালভূমি গ্রীক শৌর্য দিয়ে জয় করা সম্ভব হ'ল না। আংকারা শহরের পথে সাকারিয়া নদীতে গ্রীক বাহিনীর গতিরোধ করলেন কামাল। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর গ্রীকরা পশ্চাদপসরণ

করতে বাধ্য হ'ল। কিন্তু যাবার পথে ধ্বংস এবং অগ্নিকাণ্ডের আশ্রয় নিল তারা।

গ্রীক বাহিনীর অবস্থা তখন অনেকটা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। এশিয়া মাইনরের উপকূল ধরে সরল-রেখার মত গ্রীক ফ্রণ্ট দাঁড়িয়েছিল—নৌশক্তি দিয়ে সেইকুটুই ধবে রাখা যেত। অথচ এশিয়া মাইনরের অন্তর্ভাগকে আংকারা থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল। গ্রীকরা এগুতেও পারল না, পিছুতেও সাহস পেল না। ফলে ১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে কামাল পাহাড় থেকে অতর্কিতে নেমে এসে প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করলেন গ্রীক বাহিনীকে। গ্রীক ফ্রণ্টকে অনেকগুলি জায়গায় ভেঙে দিল তুর্কী বাহিনী। তারপর সমুদ্রের দিকে বিতাড়িত করল গ্রীকদের। প্রচণ্ড পরাজয় ঘটল গ্রীক বাহিনীর এবং বিরাট বিজয় ঘটল কামালের। সেপ্টেম্বর মাসে স্মার্না পুনরুদ্ধার করা হ'ল। যাবার আগে শহর জ্বালিয়ে দিয়ে গেল গ্রীকরা। কিন্তু এই যুদ্ধের পরিণাম স্বরূপ এশিয়া মাইনরে গ্রীক প্রভুত্বের এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক বসবাসেরও অবসান ঘটল। কারণ মোস্তাফা কামাল এশিয়া মাইনর থেকে শুধু প্রতিটি গ্রীক সৈন্য নয়, প্রতিটি গ্রীক অধিবাসীকেও বিতাড়িত করে ছাড়লেন। ইতিমধ্যে ফরাসী এবং রাশিয়ান গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃতির ফলে কামালের অ্যাংগোরা গভর্ণমেণ্টের হাত অনেক শক্ত হয়ে উঠেছিল। একজন কাহিনীকার কামালের এই বীরত্বের জন্য তাঁকে ধূসর নেকড়ে (গ্রে-উল্‌ফ্) বলে বর্ণনা করেছেন।

কামালের বিজয়ী বাহিনী রাজধানী ইস্তাম্বুলের দিকে অগ্রসর হবার সময় ব্রিটিশ বাহিনী তার গতিরোধ করল। তবে তুরস্কের সঙ্গে ব্রিটেনের কোন যুদ্ধ হ'ল না। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা কামালের প্রায় সব শর্ত মেনে নিল। জুলাই, ১৯২৩এ সন্ধি স্বাক্ষরিত হ'ল। তুর্কীজাতি-অধ্যুষিত তুরস্কের আসল ভূ-খণ্ড স্বাধীন হ'ল। তুরস্ককে স্বাধীনতার আলো দেখালেন কামাল। অতুলনীয় বীরত্ব এবং দেশপ্রেমের জন্য কামালকে সকলেই মনে রাখবে।

১৯২৩ সালে তুরস্ক হ'ল প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত। অ্যাংগোরা হ'ল রাজধানী। কামাল হলেন প্রেসিডেণ্ট এবং হাতে নিলেন ডিক্টেটরের ক্ষমতা। ইস্তাম্বুলের (কনস্‌টাণ্টিনোপ্‌ল্) পুরোনো রাজধানীর পরিবর্তে অ্যাংগোরায় (আংকারা) নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা কামালের পক্ষে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাঁর ছিল অস্বাভাবিক সাহস ও দৃঢ় সংকল্প। বিরোধের ঝড়কে তুচ্ছ করে তুরস্কে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের প্রবর্তন করলেন তিনি। শাসনব্যবস্থার আমূল সংশোধন, নতুন আইন প্রণালীর প্রবর্তন, পরিবহন, আর্থিক, কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে সংস্কার, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা, ইয়োরোপীয় প্রথায় পোশাক-পরিচ্ছদের রূপান্তর, ল্যাটিন অক্ষরের প্রবর্তন—সবই তাঁর অবদানের মধ্যে পড়ে। ১৯৩৪ সালে তাঁরই নির্দেশে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়—তার ফলে সব তুর্কীর পক্ষে পদবী গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়। কামাল নিজের নাম এই প্রসঙ্গে বদলে আতাতুর্ক (তুর্কীদের পিতা) রাখেন। তুরস্কের তৎকালীন অনিশ্চিত আবহাওয়ায় কামালের কঠোর শাসন এবং সংস্কারগুলির প্রয়োজন ছিল। যে রাষ্ট্রকে উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে অনধিকার প্রবেশকারী বলে মনে করা হ'ত সেই রাষ্ট্রকে কামাল রূপান্তরিত করে-ছিলেন এক নতুন তুরস্কে। নতুন তুরস্কে নারীপুরুষের নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা আগেকার চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। দু'শ' বছরের বৈদেশিক হস্তক্ষেপের

ইতিহাসের পর কামাল প্রথম এক স্বাধীন এবং সার্বভৌম তুরস্কের প্রতিষ্ঠা করলেন ইতিহাসের পাতায়।

শিবাজী

এতক্ষণ বিদেশের কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করলাম। আমাদের নিজেদের ভারতবর্ষের ইতিহাসেও অনেকগুলি স্মরণীয় ঘটনা মনে রাখবার মত। এবারে তারই কথা বলি। পশ্চিম ভারতে ছত্রপতি শিবাজীর অভ্যুত্থানের কাহিনী এই প্রসঙ্গে মনে আসছে। এটিও একটি বিশেষভাবে মনে রাখবার মত ঘটনা।

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যকে যে কয়েকটি শক্তি আঘাত হেনেছিল তার মধ্যে শিবাজীর অভ্যুত্থান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে মারাঠা জাতিকে সুদৃঢ় নেতৃত্ব দান করে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেছিলেন শিবাজী, সৃষ্টি করেছিলেন

শিবাজী ও তাঁর মা জিজাবাঈ

মহারাষ্ট্রের জাতীয় একতা এবং স্থাপন করেছিলেন দাক্ষিণাত্যে এক সফল হিন্দু রাষ্ট্র। চারটি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল তাঁকে—ক্ষমতার তুঙ্গে আসীন মোগল সাম্রাজ্য, বিজাপুর রাজ্য, ভারতবর্ষের পর্তুগীজ শক্তি এবং জঞ্জিরার আবিসিনিয়ান্‌দের (হাবসী) চাপ। অসামান্য সাহস, বীরত্ব এবং কূটনৈতিক প্রতিভার বলে সাধারণ জায়গীরদারের স্থান থেকে "ছত্রপতি" অর্থাৎ রাজাধিরাজের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন তিনি।

শিবাজীর জন্ম হয়েছিল ১৬৩০ সালে (মতান্তরে ১৬২৭ সালে) জুন্নারের নিকটবর্তী শিবনার গিরিদুর্গে। তাঁর বাবা শাহজী আহ্‌মদনগর এবং বিজাপুর রাজ্যে রাজকর্মচারী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। পুনায় তাঁর পুরোনো জায়গীর ছিল। তা ছাড়া কর্ণাটকেও তিনি অনেক বড় জায়গীর লাভ করেছিলেন। শিবাজীর মায়ের নাম ছিল জিজাবাঈ। অসামান্য প্রতিভাময়ী এবং ধর্মপরায়ণা ছিলেন জিজাবাঈ। শাহজী তাঁর দ্বিতীয় পত্নীকে নিয়ে তাঁর নতুন জায়গীরে চলে যান ; যাবার আগে স্ত্রী জিজাবাঈ এবং শিশুপুত্র শিবাজীকে এক সুদক্ষ ব্রাহ্মণের (দাদাজী খোণ্ডদেব) তত্ত্বাবধানে রেখে যান। জিজাবাঈ তাঁর শিশুপুত্রের মনে সঞ্চার করেছিলেন দুঃসাহস, বীরত্ববোধ, ধর্মপ্রেরণা এবং ধর্মরক্ষার বাসনা। শিবাজীর জীবনে তাঁর মায়ের শিক্ষা এক বিরাট প্রভাব সঞ্চার করেছিল। শিবাজী কেতাবী শিক্ষা পেয়েছিলেন কিনা জানা যায় নি—কিন্তু দাদাজী খোণ্ডদেবের শিক্ষাও তাঁকে সাহসী এবং পরিশ্রমী হতে প্রেরণা জুগিয়েছিল। পশ্চিম ঘাট এলাকার মাবল অঞ্চলের পাহাড়ী অধিবাসীদের

সঙ্গে শিবাজীর ছিল অন্তরঙ্গ পরিচয়। এই মাবলীরাই পরে তাঁর শ্রেষ্ঠ রণদক্ষ সৈনিক, সঙ্গী এবং বিশ্বস্ত সেনাপতিতে পরিণত হয়েছিল। শিবাজীর মাতৃকুল দেবগিরির যাদব বংশোদ্ভূত ছিল এবং পিতৃকুল ছিল মেবারের (রাজস্থান) শিশোদিয়া বংশোদ্ভূত।

দাক্ষিণাত্যের সুলতানী রাষ্ট্রগুলির ক্রমবর্দ্ধমান দুর্বলতা এবং উত্তর ভারতে বিভিন্ন রাজশক্তি এবং মোগলদের যুদ্ধবিগ্রহ দক্ষিণ ভারতে শিবাজীর পক্ষে সুবর্ণসুযোগ এনে দিয়েছিল। মাত্র উনিশ বছর বয়সে (১৬৪৬ সালে) তিনি তোর্না দুর্গ অধিকার করলেন। সেখান থেকে পাঁচ মাইল পূর্বে তিনি শীগ্‌গিরই গড়ে তুললেন রায়গড় দুর্গ। রায়গড়ই পরে তাঁর রাজধানী হয়েছিল। দাদাজী খোণ্ডদেবের মৃত্যুর পর (১৬৪৭ সাল) শিবাজী অনেকগুলি দুর্গ তাদের বংশানুক্রমিক অধিকারীদের কাছ থেকে বা বিজাপুর রাজ্যের কর্মচারীদের কাছ থেকে বাহুবলে বা সুকৌশলে দখল করেন, কিছু নতুন দুর্গ তিনি গড়েও তোলেন। ১৬৪৯ থেকে ১৬৫৫ সাল অবধি শিবাজীকে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ রাখতে হয়েছিল কারণ তাঁর পিতাকে বিজাপুর রাজ্যে বন্দী করা হয় এবং পুত্র ভালোভাবে আচরণ করবে এই শর্তে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু ১৬৫৬ সালের জানুয়ারীতে তিনি ক্ষুদ্র মারাঠা রাজ্য জাবলী অধিকার করেন। তারপর ১৬৫৭ সালে মোগলদের সঙ্গে তাঁর প্রথম বিরোধ শুরু হয়। সেই সময় আওরঙ্গজেব এবং তাঁর মোগল বাহিনী বিজাপুর অভিযানে ব্যস্ত ছিল। সেই সুযোগে তিনি আহ্‌মদনগর এবং জুন্নারের মোগল জেলাগুলি আক্রমণ করলেন এবং জুন্নার লুণ্ঠন করলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের বাহিনীর হাতে পরে শিবাজীর পরাজয় হ'ল এবং তিনি বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহের মত আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সন্ধি করলেন। পিতা শাহজাহানের অসুস্থতার জন্য আওরঙ্গজেবকে উত্তর ভারতে চলে যেতে হ'ল। শিবাজী এবার দৃষ্টি ফেরালেন উত্তর কোঙ্কনের দিকে। কল্যাণ ভিওয়াণ্ডী এবং মাহুলি অধিকার করলেন তিনি, এবং দক্ষিণে মাহাদ অবধি অগ্রসর হলেন।

দাদাজী খোণ্ডদেবের শিক্ষা শিবাজীকে সাহসী এবং পরিশ্রমী হতে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

বিজাপুরের সুলতান কিছুদিনের জন্য আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং মোগল আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। তিনি এবার মনস্থ করলেন যে শিবাজীর শক্তিকে বরাবরের মত চূরমার করে দিতে হবে। শিবাজীকে জীবন্ত অথবা মৃত ধরে আনবার জন্য ১৬৫৯ সালের গোড়ায় বিখ্যাত সেনাপতি আফজল খাঁর নেতৃত্বে বিরাট এক সৈন্যদল পাঠালেন বিজাপুরের সুলতান। সাতারার

কুড়ি মাইল উত্তরে য়াইতে পৌঁছুলেন আফজল খান। কিন্তু শিবাজীকে তাঁর প্রতাপগড়ের দুর্ভেদ্য কেন্দ্র থেকে বের করে আনা সম্ভব হ'ল না। তাই মারাঠা ব্রাহ্মণ কৃষ্ণজী ভাস্করের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনার বন্দোবস্ত করলেন আফজল। শিবাজীকে এক আলোচনায় আমন্ত্রণ করা হলেও আফজলের মনে দুরভিসন্ধি ছিল। এই মতলবের আঁচ পেয়ে শিবাজী পোশাকের নীচে বর্ম এবং অস্ত্র লুকিয়ে নিয়ে আফজলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আফজল আলিঙ্গনের ছলে তাঁকে আক্রমণ করতে যেতেই শিবাজী বাঘনখ দিয়ে আফজল খাঁকে হত্যা করলেন। তারপর নেতাবিহীন বিজাপুর বাহিনীকে পরাস্ত করতে কষ্ট হ'ল না তাঁর। তিনি বিজাপুরের সৈন্যদলের শিবিরও লুণ্ঠন করলেন।

কথিত আছে যে সুদীর্ঘ আফজল খাঁ তাঁর বিরাট শরীর দিয়ে অপেক্ষাকৃত খর্বকায় এবং ছিপ্‌ছিপে শিবাজীকে আলিঙ্গন করার সময় শিবাজীর গলা বাঁ হাত দিয়ে লৌহ-আলিঙ্গনে চেপে ধরতে চেয়েছিলেন— আর তাঁর ডান হাত দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন শিবাজীর শরীরে তলোয়ারের কোপ বসিয়ে দিতে। কিন্তু শিবাজীর লুকানো বর্ম তাঁকে রক্ষা করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘনখ (লোহার নখ লাগানো দস্তানা) দিয়ে আফজল খাঁর পেট চিরে শিবাজী তাঁকে হত্যা করেন।

শিবাজী এর পর অগ্রসর হলেন দক্ষিণ কোঙ্কন এবং কোলাপুর জেলায়। বিজাপুরের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাঁর আবার সংঘর্ষ ঘটল। কিন্তু শিবাজীকে আবার এক নতুন বিপদের সম্মুখীন হতে হ'ল। আওরঙ্গজেব এই পার্বত্য মূষিককে (শিবাজীকে তিনি পাহাড়ী ইঁদুর নাম দিয়েছিলেন) দমন করার জন্য দাক্ষিণাত্যের নতুন শাসক শায়েস্তা খাঁকে পাঠালেন। শায়েস্তা খাঁ প্রথমে পুনা অধিকার করলেন এবং চকন দুর্গ দখল করে কল্যাণ জেলা থেকে মারাঠাদের বিতাড়িত করলেন। কিন্তু শিবাজী ইতিমধ্যে বিজাপুর রাজ্যের সঙ্গে একটা সন্ধি করে মোগলদের

শিবাজী ও আফজল খাঁ

দিকে দৃষ্টি ফেরাবার জন্য নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন। দু'বছর ধরে শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে ১৬৬৩ সালের ১৫ই এপ্রিল কয়েকজন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে শিবাজী গোপনে পুনায় শায়েস্তা খাঁর আস্তানায় প্রবেশ করলেন। শায়েস্তা খাঁকে তাঁর শয়নকক্ষে অতর্কিতে আক্রমণ করে আহত

করা হ'ল। শায়েস্তা খাঁ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন অতি কষ্টে—কিন্তু তাঁকে তাঁর বুড়ো আঙুলটা খোয়াতে হ'ল। শায়েস্তা খাঁর ছেলে আবুল ফত, একজন পদস্থ সামরিক কর্মচারী এবং তাঁদের চল্লিশ জন অনুচরকে নিহত করে সিংহগড় দুর্গে ফিরে গেলেন শিবাজী।

মোগল শিবিরের ভিতরে ঢুকে এই দুঃসাহসিক অভিযান শিবাজীর মর্যাদা আরও বাড়িয়ে তুলল। ১৬৬৪ সালের জানুয়ারীতে সুরাট আক্রমণ করে লুণ্ঠন করলেন তিনি। সুরাট তখনকার দিনে পশ্চিম উপকূলের সবচেয়ে সমৃদ্ধ বন্দর শহর ছিল। এই আক্রমণের ফলে তাঁর প্রচুর ধনলাভ হ'ল। সুরাটের মোগল শাসক যুদ্ধের আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের শক্তির বার বার এই অবমাননার ফলে আওরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হয়ে ১৬৬৫ সালে অম্বরের রাজা জয়সিংহ এবং দিলীর খাঁকে দাক্ষিণাত্যে পাঠালেন। সঙ্গে এল বিরাট মোগল ফৌজ। জয়-সিংহ সাহসী এবং কূটনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, তাই শিবাজীর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন তিনি। মোগল সৈন্যরা পুরন্ধর এবং রায়গড় দুর্গ (শিবাজীর রাজধানী) অবরোধ করল। পুরন্ধর দুর্গে মারাঠী সৈন্যরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করল কিন্তু তাদের সেনাপতি মুনার বাজী দেশপাণ্ডে তিনশ' মাবলী সৈন্যের সঙ্গে নিহত হলেন। আর অতিরিক্ত লোকক্ষয় অসমীচীন মনে করে জয়সিংহের সঙ্গে পুরন্ধরের সন্ধি (২২শে জুন, ১৬৬৫) করলেন শিবাজী। এর ফলে তাঁকে তেইশটি দুর্গ মোগলদের ছেড়ে দিতে হ'ল, কিন্তু তাঁর হাতে বারোটি দুর্গ রইল। চৌথ বা সরদেশমুখী (রাজস্ব) আদায়ের ক্ষমতাও বিজাপুর রাজ্যের কিছু অংশের জন্য তাঁকে দেওয়া হ'ল। শিবাজী এর পর মোগলদের বিজাপুর অভিযানে সামিল হলেন এবং জয়সিংহের প্রস্তাব অনুযায়ী আগ্রাতে আওরঙ্গজেবের রাজসভায়ও হাজির হলেন তারপর। সভায় আওরঙ্গজেব শিবাজীকে উপযুক্ত রাজকীয় মর্যাদা না দেওয়ায় অপমানিত শিবাজী প্রতিবাদ করে উত্তেজনায় অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি আওরঙ্গজেবের প্রতি বিশ্বাস-হানির অভিযোগ করেন। ফলে আওরঙ্গজেব তাঁকে বন্দী করেন। কিন্তু সুচতুর শিবাজী কৌশলে মোগল পাহারার চোখে ধুলো দিয়ে কিছুদিন পরে অন্তর্দ্ধান করেন আগ্রা থেকে। অসুস্থতার ভান করে শিবাজী মিঠাইএর ঝুড়ি উপহারের জন্য সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণদের কাছে রোজ পাঠাতেন রোগশান্তির কামনায়। পাহারাদাররা শেষের দিকে আর ঝুড়িগুলি পরীক্ষা করত না। একদিন দু'টি ঝুড়িতে করে শিবাজী আর তাঁর পুত্র শম্ভুজী বাইরে পালিয়ে এলেন। শিবাজীকে অনেক ঘুরে এলাহাবাদ, বারাণসী, গয়া এবং তেলেঙ্গানা হয়ে দেশে ফিরতে হ'ল। শিবাজীর এই বুদ্ধিমত্তা এবং দুঃসাহসের পরিচয় জগতে বিরল।

এর পর তিন বছর শিবাজী মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষান্তি দিলেন—নিজের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন সুসংহত করার কাজে মন দিলেন। এই সময়ে আওরঙ্গজেব তাঁকে রাজা উপাধি দিলেন এবং বেরারের জায়গীর দান করলেন। কিন্তু ১৬৭০ সালে মোগলদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ শুরু হ'ল। দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসক শাহ আলমের সঙ্গে তাঁর সেনাপতি দিলীর খাঁর কলহ শুরু হওয়ায় দাক্ষিণাত্যে মোগল শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে শিবাজী তাঁর ১৬৬৫ সালে সমর্পিত প্রায় সব ক'টি দুর্গই পুনরুদ্ধার করলেন। ১৬৭০ সালের অক্টোবরে তিনি দ্বিতীয়বার

সুরাট লুণ্ঠন করলেন এবং প্রচুর লুণ্ঠিত ধন লাভ করলেন। মোগল জেলাগুলিতে তিনি এবার চালালেন দুঃসাহসিক অভিযান এবং মোগল সেনাপতিদের বার বার মুখোমুখি যুদ্ধে পরাজিত করলেন। ১৬৭২ সালে তিনি সুরাটে চৌথ (রাজস্ব) দাবী করলেন।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে উপজাতিদের বিদ্রোহের ফলে আওরঙ্গজেবকে বাধ্য হয়ে মোগল সৈন্যবাহিনীর এক অংশকে দাক্ষিণাত্য থেকে উত্তর ভারতে নিয়ে যেতে হ'ল। ১৬৭২ থেকে ১৬৭৮ অবধি মোগল সৈন্যবাহিনীর ভগ্নাংশ শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। শিবাজী তখন তাঁর ক্ষমতার তুঙ্গে। ১৬৭৪ সালের ১৬ই জুন রাজধানী রায়গড়ে প্রচুর সমারোহে তাঁর অভিষেক হ'ল—শিবাজী 'ছত্রপতি' নাম ধারণ করলেন। 'ছত্রপতি' কথার অর্থ ছত্রধারীদের—অর্থাৎ রাজাদের রাজা।

মোগলদের চাপ শিবাজীর ওপর কমে এসেছিল। তা ছাড়া গোলকুণ্ডার সুলতানের সঙ্গে তাঁর হয়েছিল সখ্যতা। এই সুযোগে শিবাজী ১৬৭৭ সালে জিঞ্জি, ভেলোর এবং সংলগ্ন জেলাগুলি জয় করলেন। এর ফলে তাঁর মর্যাদা প্রচুর বেড়ে গেল এবং মাদ্রাজ, কর্ণাটক এবং মহীশূর মালভূমির এক বিরাট ভূখণ্ড—একশ'টি দুর্গ সমেত তাঁর দখলে এল। কিন্তু ১৬৮০ সালের ১৪ই এপ্রিল মাত্র তিপ্পান্ন (মতান্তরে পঞ্চাশ) বছর বয়সে মৃত্যু ঘটল এই বীরের।

শিবাজীর রাজ্য পশ্চিম উপকূলে উত্তরের রামনগর (সুরাট এজেন্সীর ধরমপুর রাজ্য) থেকে দক্ষিণের কারওয়ার অবধি বিস্তৃত ছিল—অবশ্য বৈদেশিক উপনিবেশগুলি বাদ দিয়ে। তাঁর শেষ অভিযানের ফলে পশ্চিম কর্ণাটক (বেলগাঁও থেকে তুঙ্গভদ্রার তট অবধি প্রসারিত—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেলারী জেলার মুখোমুখি) এবং মহীশূর রাজ্যের একটি বিরাট অংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

শিবাজী শুধু মাত্র সফল সামরিক অভিযান চালিয়ে ইতিহাসের পাতায় প্রসিদ্ধ হন নি। সুশাসক হিসেবেও তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। প্রশাসন-দক্ষতার জন্য নেপোলিয়নের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক এক সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন তিনি। রাজ্যশাসন ছাড়াও রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা তাঁর শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল। মারাঠা সৈন্যবাহিনীর সুসংস্কার করে অসামান্য সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন শিবাজী। সৈন্যবাহিনীতে কঠিন শৃঙ্খলার প্রবর্তন করেছিলেন তিনি।

শিবাজী ছিলেন খুব মাতৃভক্ত। জিজাবাঈ-এর শিক্ষা তাঁর জীবনে অসাধারণ প্রেরণা এনে দিয়েছিল। অসামান্য বীরত্বের সঙ্গে মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় পাওয়া যায় শিবাজীর চরিত্রে। তিনি যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে নারী ও শিশুর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব প্রদর্শনের জন্য সৈন্যদের নির্দেশ দিতেন। শিবাজীর নৈতিক জীবন অত্যন্ত উঁচু ছিল। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। বিখ্যাত সাধক রামদাস ছিলেন তাঁর গুরু—তাঁরই প্রভাবে শিবাজী তাঁর রাজপতাকার রঙ রাখেন গৈরিক।

শিবাজীর সবচেয়ে বড় অবদান বিক্ষিপ্ত মারাঠা জাতিকে একত্র করে এক বলিষ্ঠ ঐক্যবদ্ধ জাতিতে রূপান্তরিত করা। মারাঠা জাতি শিবাজীর মৃত্যুর পর সামরিক শক্তিতে ভারতে খুব উঁচুতে উঠেছিল। ক্ষয়িষ্ণু মোগল সাম্রাজ্যের পতনের মুখে এরা এক নতুন জাতীয়তাবোধের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

———
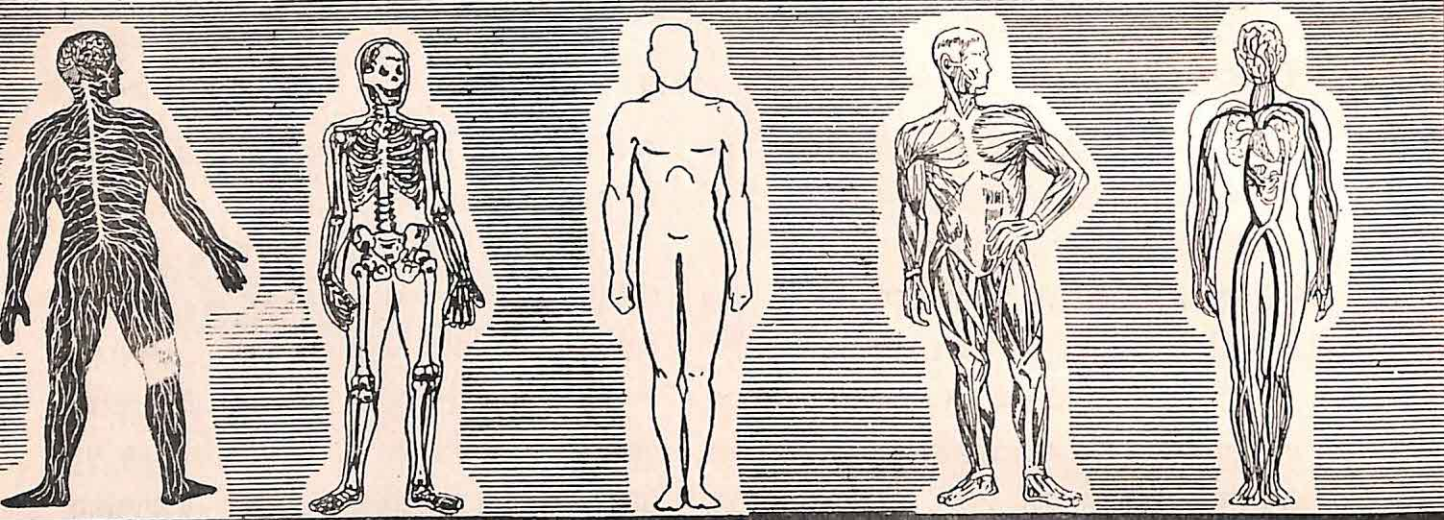
আমাদের শরীরের কথা

কাজের জন্য চাই শক্তি

ছোটদের বিশ্বকোষের অন্যান্য খণ্ডে তোমরা পড়েছ যে আমাদের দেহের গঠন কি রকম, কি ভাবে আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, কি ভাবে আমরা আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা চালাই, কি ভাবে আমাদের রোজকার কাজকর্ম করে থাকি।

প্রত্যেক কাজেই আমরা খরচ করি কিছুটা শক্তি। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটা কাজ করতে গেলে খানিকটা শক্তি খরচ করতেই হবে। এই যে আমি বসে বসে লিখছি, তাতে আমার মস্তিষ্ককে শক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে—কি ভাবে লিখলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে, আর আমার হাতের মাংসপেশীরা লিখে যাচ্ছে তারই নির্দেশমত। কিন্তু তাতেও হাতের মাংসপেশীদের ব্যয় করতে হচ্ছে শক্তি। এখন, প্রশ্ন হ'ল, এই শক্তি আসে কোথা থেকে?

খাদ্যই হ'ল শক্তির উৎস

আমরা যা খাই তারই একটা অংশ আমাদের দেহের শক্তি জোগায়। আমাদের খাদ্যকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়,—প্রোটিন, স্নেহ ও শর্করা। "মেটাবলিজ্‌ম্" বা রাসায়নিক রূপান্তর হ'ল এই খাদ্যগুলিকে ভেঙ্গে, আমাদের শরীরের যেখানে যেমন দরকার সেখানে সেই রকম জিনিস সরবরাহ করা এবং তা করতে গিয়েই হয় শক্তির জন্ম। শক্তির এই মুক্তি কিন্তু আমাদের অতি সামান্য কাজের জন্যও দরকার—হাঁচতে, কাসতে, চলতে-ফিরতে, খেলতে, লেখাপড়া করতে, এমন কি ঘুমোতে পর্যন্ত আমাদের দেহের শক্তির প্রয়োজন। তোমরা হয়তো ভাবছ যে ঘুমোলে তো আমাদের দেহ থাকে স্থির হয়ে, কোন কাজই তো সে করে না! অর্থাৎ জ্ঞানত কোন শক্তিই তো খরচ করা হয় না, তবে শক্তি লাগে কি কাজে? একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে যে আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনও আমরা নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি, আমরা হজম করছি আমাদের খাবার, আমাদের শরীরের চতুর্দিকে রক্ত বহন করে নিয়ে যাচ্ছে খাদ্য, বৃক্ক বা কিডনী কাজ করে চলেছে—তার ছাঁকনির কাজ। এই প্রত্যেকটা কাজের জন্যই প্রয়োজন শক্তির। কিন্তু আমাদের জীবনধারণের নানারকম কাজের জন্য কতটা শক্তির দরকার তা প্রথমে জানতে হবে, তারপর

কি ভাবে সে শক্তি পাওয়া যেতে পারে করতে হবে তারই খোঁজ।
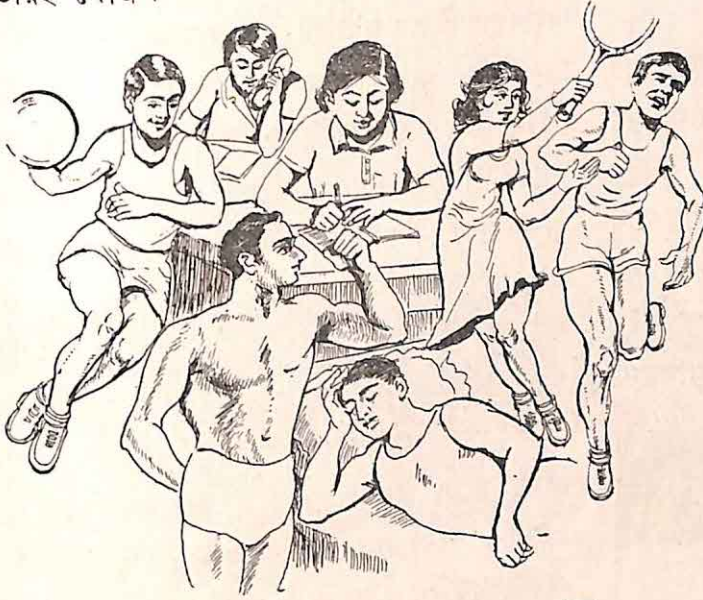
চলতে-ফিরতে, খেলতে, লেখাপড়া করতে, ঘুমোতে সবেতেই শক্তি খরচ হচ্ছে।

শক্তির মাপ ঃ ক্যালরী

প্রথমেই তা হলে দরকার হচ্ছে একট মাপের। শক্তি মাপে কি করে? সমস্ত মাপের বেলা যেমন, শক্তির বেলাও তেমনি। সবাই মিলে শক্তির যে মাপ ঠিক করেছেন তার নাম দেওয়া হয়েছে "ক্যালরী"। এক গ্রাম জলকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (আজকাল বলা হয় সেলশিয়াস) গরম করতে যতটা শক্তির দরকার তাকেই সবাই ধরে নিয়েছেন শক্তির মাপ এক ক্যালরী। কিন্তু মাপটা এতই ছোট যে সাধারণ কাজের জন্য ধরা হয় বড় ক্যালরী, যার পরিমাণ হ'ল এর ১০০০ গুণ। এই শক্তি বা ক্যালরী আমরা পাই আমাদের খাদ্য থেকে।

আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনও হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্, বৃক্ক, যকৃৎ যে কাজ করে যাচ্ছে তার জন্য চাই প্রায় ৫০০ ক্যালরী শক্তি। এই যে আমি তোমাদের জন্য লিখছি তাতে আমার খরচ করতে হচ্ছে ঘণ্টা প্রতি ৪০ থেকে ৫০ ক্যালরী। মা যখন রান্না বা ঘরকন্নার অন্যান্য কাজ করেন তখন তাঁর খরচ করতে হয় ১০০ থেকে ১৫০ ক্যালরী। তোমরা যখন বাগান করার জন্য মাটি কোপাও তখন খরচা হয় ৩০০ ক্যালরী। ১৫০-৯০০ ক্যালরী খরচা করে টেনিস খেলোয়াড়রা যখন তারা ম্যাচ্ খেলে। কাজেই আমাদের রোজই চাই ২৫০০-৩০০০ ক্যালরী শক্তি।

তিন জাতীয় খাদ্য

আগেই বলেছি এই শক্তি বা ক্যালরীর উৎস হ'ল খাদ্য। আর, এও বলেছি, যে সাধারণ ভাবে আমাদের খাদ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—প্রোটিন জাতীয় খাদ্য, স্নেহ জাতীয় খাদ্য আর শর্করা জাতীয় খাদ্য। এদের মধ্যে প্রোটিন আর শর্করা দেয় এক এক গ্রামে ৪ ক্যালরী করে শক্তি, আর স্নেহ জাতীয় খাদ্য দেয় ৯ ক্যালরী করে। তাই আমাদের খাদ্যে থাকা চাই ৪০০ গ্রাম শর্করা জাতীয় খাবার, ১০০ গ্রাম প্রোটিন আর অন্তত ৬০ গ্রাম স্নেহ জাতীয় পদার্থ। এর মধ্যে শর্করা জাতীয় খাদ্য আমাদের শক্তি দিয়ে নিজে নিঃশেষ হয়ে যায়, ফলে খুব বেশি না হলে এদের কাছ থেকে আমাদের শরীর শক্তি ছাড়া আর কিছুই পায় না। তাই এদেরকে বলা হয় "ফাঁকা ক্যালরী"। শর্করাকে এ রকম তাচ্ছিল্য করার কারণ হ'ল এই যে প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য আমাদের শরীরে শক্তি ছাড়া অন্য জিনিসও দেয়। এই সব খাদ্যের প্রয়োজন শুধু

শক্তি সরবরাহের জন্যই নয়। অবশ্য, প্রয়োজনের বেশি শর্করা খেলে, তার থেকে তৈরি হয় মেদ।

প্রোটিন

প্রথমে প্রোটিনের কথা ধরা যাক। আমাদের শরীর গড়ার কাজে প্রোটিন জোগায় আবশ্যকীয় মালমশলা—যা দিয়ে গড়ে ওঠে আমাদের দেহের কোষ, তন্তু। প্রোটিন আমাদের অন্ত্রে গিয়ে ভাগ ভাগ হয়ে যায় ছোট ছোট কতগুলি উপাদানে, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে "অ্যামাইনো অ্যাসিড"। পৃথিবীতে অনেক অ্যামাইনো অ্যাসিডই আছে, কিন্তু আমাদের

প্রোটিন আমরা পেতে পারি আমিষ নিরামিষ দু'রকম খাদ্য থেকেই।

শরীরের কোষ গড়ার কাজের জন্য অবশ্যই চাই আট রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড—ফেনাইল অ্যালানিন, লিউসিন, আইয়োলিউসিন, মেথিওনিন, ভ্যালিন, লাইসিন, ট্রিপ্‌টোফেন, এবং থ্রিওনিন। এদের সবগুলিই আমরা পেতে পারি আমাদের খাবারের প্রোটিন থেকে।

প্রোটিন আমরা পেতে পারি দু'ভাবে। এক—প্রাণিজগৎ থেকে অথবা দুই—গাছপালা থেকে। অর্থাৎ প্রোটিনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—আমিষ বা নিরামিষ। আমাদের দেশে অনেকেই তো নিরামিষ-ভোজী এবং তাদের শরীরেও যে সব সময় শক্তি কম থাকে তা তো নয়! কাজেই আমাদের আগে যে ধারণা ছিল যে আমিষ প্রোটিন নিরামিষ প্রোটিন থেকে বেশি ভালো তা ঠিক নয়। আসল কথা, আমাদের শরীরের উপযোগী অ্যামাইনো অ্যাসিড আমিষ খাদ্য থেকে পাওয়া সহজ। নিরামিষ খাদ্য থেকে পেতে হলে তাদের হিসেব করে মেশাতে হবে। যেমন দুধের সব অ্যামাইনো অ্যাসিড পেতে হলে মেশাতে হবে চাল আর ডালকে। তা ছাড়া আর একটা অসুবিধাও আছে। অনেক কম আমিষ খাদ্য থেকে যে পরিমাণ অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায় নিরামিষ খাদ্য তার থেকে অনেক বেশি লাগবে সমান পরিমাণ অ্যামাইনো অ্যাসিড পেতে হলে। কারণ, দুধ ছাড়া আর সব নিরামিষ খাবারেই আছে শর্করা জাতীয় উপাদান বেশি। তা হলে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য কি কি?—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ হচ্ছে জান্তব প্রোটিন, আর ডাল, গম, ভুট্টা প্রভৃতি হচ্ছে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন।

শর্করা

শর্করা জাতীয় খাদ্যই আমাদের দেহের শক্তির প্রধান আধার, তাই শর্করা জাতীয় খাদ্য আমরা বেশি খাই। অবশ্য শর্করা জাতীয় খাদ্য সস্তাও বটে। শর্করা জাতীয় খাদ্য আমাদের শরীর গঠনে প্রত্যক্ষ ভাবে কাজে না লাগলেও পরোক্ষভাবে কাজে লাগে। কারণ শর্করা জাতীয় খাবার আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় শক্তি জোগান দিলে অন্য দরকারী

খাদ্য,—যেমন প্রোটিন, অযথা ব্যয় করতে হয় না শক্তির জন্য। অনাহারে যে লোকেরা রোগা হয়ে যায় তার একটা কারণ এই যে তাদের প্রাণধারণের জন্য দেহের তন্তুগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেহের নানা কাজের জন্য শক্তি সরবরাহ করতে হয়। চাল, আটা, চিনি, গুড়, আলু, আপেল, কলা প্রভৃতি হ'ল আমাদের খাদ্যে শর্করা জাতীয় খাবার।

কয়েকটি শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের নমুনা

স্নেহ

স্নেহ জাতীয় খাদ্য আমাদের দরকার দু' কারণে। এক,—আমাদের দেহে শক্তি জমিয়ে রাখার জন্য ; অন্য খাবার থেকে যখন শক্তির অভাব ঘটে তখন শক্তি আমরা পাই আমাদের দেহে জমানো চর্বি বা মেদ থেকে। আর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আমাদের দেহের ত্বকের নীচে একটা মেদের আবরণ তৈরি করা, যাতে হঠাৎ চোট লাগলে আমাদের দেহের দরকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন ক্ষতি না হয়। মোটর গাড়ির

স্নেহ অর্থাৎ চর্বি জাতীয় খাদ্য কিসে কিসে পাওয়া যায়

'শক্ অ্যাবজর্বারের' কথা শুনেছ কি? ঠিক তারই মত। স্নেহ জাতীয় খাবার আমরা পাই তেল, ঘি, ডিম, মাখন ইত্যাদি থেকে।

ভিটামিন

মুশ্‌কিল হচ্ছে, প্রয়োজনমত প্রোটিন, শর্করা আর স্নেহ পদার্থ খেলেই যে রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা কিন্তু নয়।

মাংসই যাদের আসল খাবার তাদের ছাগল, ভেড়া, গরু, শূয়োর প্রভৃতি পুষতে হয়, তাদের খাইয়েদাইয়ে এমন করে রাখতে হয় যাতে তাদের মাংস থেকে যথেষ্ট খাবার পাওয়া যায়। কিন্তু দেখা গেছে যে হিসেব মত প্রোটিন, শর্করা ও স্নেহ মিশিয়ে খাবার তৈরি করে খাওয়ালেও শরীর ঠিক বেড়ে ওঠে না। তা ছাড়া কয়েকটা ব্যায়রামও তাদের শরীরে দেখা
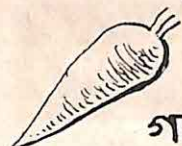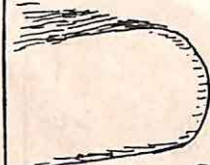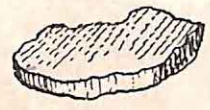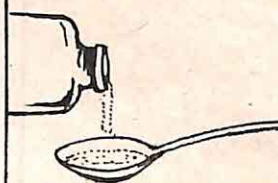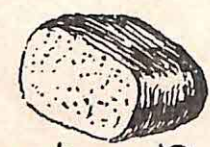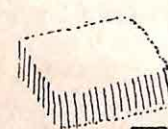
দেয়। এ থেকেই বিজ্ঞানীদের মনে এল যে বন্য অবস্থায় যে খাবার এরা খায় তাতে এমন কোন জিনিস নিশ্চয়ই আছে যা গৃহপালিত অবস্থার খাবারে নেই। গবেষণা করে দেখা গেল, কথাটা খুবই সত্যি। খুব সামান্য মাত্রায় কতগুলি জিনিস খাদ্যে না থাকলেই হয় নানান্ রকম ব্যাধি।

তখন অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে খুব কাজ চলছে, কাজেই সবাই ধরে নিল এও নিশ্চয়ই একটা ঐ দলেরই কোন কিছু। কাজেই ওদের নাম দেওয়া হ'ল 'ভাইটামিন' বা 'ভিটামিন',—অর্থাৎ যে অ্যামাইন বাঁচবার জন্য প্রয়োজন। আজকাল অবশ্য সবাই জানে যে কথাটা মোটেই সত্যি নয়। তবু এই জাতের খাবারের নাম কিন্তু ভিটামিনই রয়ে গেছে।

ভিটামিনকে সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (১) যেগুলি জলে গুলে যায় আর (২) যেগুলি জলে গুলে যায় না, তাদের গুলে নেবার জন্য দরকার হয় স্নেহজাতীয় কোন পদার্থ।

বুঝবার সুবিধের জন্য এই ভিটামিনগুলোকে এ, বি, সি, ডি, ই, কে ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম দলে আছে বি-জাতের ও সি-জাতের ভিটামিন। আর দ্বিতীয় দলে আছে এ, ডি, ই এবং কে-জাতের ভিটামিন।

পাশের এবং ১৬৬৪ পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ এদের কোন্‌টাকে কোন্ খাদ্যে পাওয়া যায়। কাজেই খাবারের মধ্যে এগুলিকে রোজই কিছু-না-কিছু রাখা দরকার। তোমাদের অনেকে তো তরিতরকারি খেতে চাও না! তাতে কিন্তু তোমাদের শরীরে ভিটামিন এ-র অভাব হতে পারে, হতে পারে তার জন্য চোখের রোগ। পরপৃষ্ঠার তালিকায় দেখ কোন্ ভিটামিনের অভাবে কোন্ ব্যায়রাম হয়।

ভিটামিন-এ কিংবা বি কোন্ কোন্ খাবারে পাওয়া যাবে

ভিটামিন	অসুখ
১। ভিটামিন এ-র অভাবে ঃ	১। রাতকানা
	২। চোখে সাদা সাদা দাগ (বিটট'স্ স্পট্)
	৩। চোখের অচ্ছোদপটল গলে যাওয়া
	৪। চোখ গলে যাওয়া ও অন্ধ হয়ে যাওয়া
	৫। চামড়া শক্ত হয়ে যাওয়া
২। ভিটামিন বি$_1$ (থিয়ামিন) -এর অভাবে ঃ	১। বেরিবেরি
	২। নার্ভের ব্যায়রাম
	৩। হৃদ্‌রোগ
বি$_2$ (রিবোফ্লাভিন)-এর অভাবে	১। চোখ লাল হওয়া
	২। জিভ লাল হওয়া
নিকোটিনেমাইড-এর অভাবে	১। পেলাগ্রা
পিরিডক্‌সিন-এর অভাবে	১। সময় বিশেষে তড়কা হওয়া
এ ছাড়া আছে প্যানটোথেনিক এসিড বি$_{12}$ ফলিক অ্যাসিড, এদের অভাবে ঃ	রক্ত তৈরি করার কাজ ঠিক মত না হওয়া
৩। ভিটামিন সি-র অভাবে ঃ	১। স্কার্ভি
৪। ভিটামিন ডি-র অভাবে	১। রিকেট্‌স্

ধাতব লবণ

আমাদের শরীরের জন্য খানিকটা ভিটামিন-সহ প্রোটিন, শর্করা বা স্নেহ জাতীয় খাবারের প্রয়োজন তো আছেই, তা ছাড়াও কতগুলি ধাতব লবণেরও প্রয়োজন। আমাদের সাধারণ খাবার পুরো খেতে পারলে শরীরে এদের অভাব হয় না। কিন্তু যারা খাওয়া নিয়ে গোলমাল করে, এ খাব না ও খাব না বলে আব্দার ধরে,—তাদের কিন্তু এই সব ধাতব লবণের অভাব ঘটতে পারে। আমাদের তরিতরকারি, মাছ-মাংস ইত্যাদি খাবারে আমরা নুন সব সময়েই দিয়ে থাকি, কম হলে আবার মিশিয়েও নিই। এ ছাড়া আমাদের শরীরে চাই লোহা (রক্তের জন্য), ক্যালসিয়াম (হাড়ের জন্য), ফসফরাস (হাড় ও নার্ভের জন্য)। এ ছাড়াও কিছুটা করে চাই পটাসিয়াম্, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরিন, ফ্লুওরিন, জিঙ্ক (বা দস্তা), তামা, ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট, মলিব্‌ডেনাম এবং আয়োডিন। এর কোন কোনটা লাগে অন্তঃস্রাবী রসের জন্য, আবার কোন কোনটা লাগে আমাদের দেহের বিবিধ এন্‌জাইম্ তৈরি করার জন্য।

সুষম খাদ্য

এখন তা হলে আলোচনা করা যাক সুষম খাদ্য (ইংরেজিতে যার নাম ব্যালেন্সড্ ডায়েট্) কাকে বলে। অর্থাৎ আমাদের প্রতিদিনকার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এমন খাদ্য খাওয়া একান্ত দরকার যার মধ্যে আমাদের দেহ সুস্থ ও কার্যক্ষম রাখার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় সবই পাওয়া যেতে পারে। পরের পৃষ্ঠার

তালিকা থেকে বুঝতে পারবে একজন কর্মঠ লোকের রোজ কি কি খাওয়া দরকার।

শস্য জাতীয় খাদ্য (চাল, আটা, যব, ভুট্টা)	....	৬৫০ গ্রাম
ডাল জাতীয় খাদ্য	....	৬৫ গ্রাম
শাকসব্জী	....	১২৫ গ্রাম
অন্যান্য সব্জী	....	১০০ গ্রাম
মূল, কন্দ এবং আলু জাতীয় খাদ্য	....	১০০ গ্রাম
ফল	....	৩০ গ্রাম
দুধ	....	১০০ গ্রাম
স্নেহ ও তেল	....	৫০ গ্রাম
মাছ, মাংস	....	৩০ গ্রাম
ডিম	....	৩০ গ্রাম
চিনি ও গুড়	....	৫৫ গ্রাম
বাদাম	....	৫৫ গ্রাম

মেয়েদের এবং ছোটদের অবশ্য এগুলো একটু কম লাগবে। তা ছাড়া যারা রোজ ডিম খায় না, তাদের তার বদলে সমপরিমাণ মাছ বা মাংস খেতে হবে। আবার যারা নিরামিষ খায় তাদের খেতে হবে বেশি করে দুধ, ঘি এবং ডাল।

মায়ের দুধ

নবজাত শিশুরা কেবল মায়ের দুধ খেয়েই বড় হয়। তা হলে কি মায়ের দুধে এত সব স্বাস্থ্যকর খাবার আছে?—হ্যাঁ। ভাবলে অবাক্ হতে হয়, শিশুর পুষ্টির জন্য যা যা দরকার তার সবই পাওয়া যায় মায়ের দুধে। শুধু কি তাই? মায়ের দুধ আর গরুর দুধ মোটেই এক রকম নয়। কারণ মায়ের দুধ মানুষের বাচ্চার জন্য আর গরুর দুধ বাছুরের জন্য। যার যেমন দরকার ঠিক তেমন তেমন উপাদানই আছে এই দুই রকম দুধে।

ভিটামিন-সি ও ডি কি থেকে পাওয়া যায়

এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা

শক্তি-সংকট

আজকাল খবরের কাগজ, রেডিও, টি. ভি. মারফত 'শক্তি বা এনার্জি-সংকট' কথাটা প্রায়ই আমাদের নজরে পড়ে। কথাটা নতুন, কারণ খুব বেশিদিন পৃথিবীর মানুষ এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে শুরু করে নি। গত দু' শতাব্দী ধরে মানুষের জীবন-যাত্রা ও চিন্তাধারা পুরোপুরি পাল্‌টে গেছে যন্ত্রের কল্যাণে। যন্ত্রযুগ শুরু হওয়ার পর থেকে নিত্য নতুন আবিষ্কারের ফলস্বরূপ দুনিয়ার লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ দূরের পথকে অতিক্রম করার জন্য যান্ত্রিক যানবাহন চালু করেছে—তার গতিবেগ বাড়তে বাড়তে শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী বিমান আজ নিত্যযাত্রার সঙ্গী হয়েছে। আলোর গতিকে ধরে ফেলার স্বপ্ন দেখতে তার আর কোনও দ্বিধা নেই। আবহাওয়ার হেরফেরে শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য চালু হয়েছে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। শহরে-গঞ্জে রাস্তায় রাস্তায় চোখধাঁধানো আলোর ব্যবস্থায় রাতের অন্ধকার এখন কোনও বাধাই নয় মানুষের কাছে—রাত আর দিনের তফাৎ এখন শুধু ঘড়ির নিশানায়।

প্রকৃতির প্রায় সব বাধাই মানুষ বিজ্ঞান ও যন্ত্রের সহায়তায় জয় করেছে—উচ্চতম পাহাড়চূড়া থেকে গভীরতম সমুদ্রতল এখন তার নাগালের মধ্যে। সাফল্যের এই উচ্চসীমায় এসে কিন্তু এক নতুন সংকট সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনীয়ারদের ভীষণভাবে চিন্তায় ফেলেছে।

এ সমস্যার গোড়াপত্তন করেছেন আবার এঞ্জিনীয়াররা নিজেরাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার থেকে বিজ্ঞান ও তার প্রযুক্তিবিদ্যা—এঞ্জিনীয়ারিং এগিয়ে চলেছিল অসম্ভবকে সম্ভব করার ব্রত নিয়ে জোর কদমে ; কিন্তু সাফল্যের উন্মাদনায় এই গতি যে কখন আত্মবিধ্বংসী হয়ে পড়েছে তার হিসেব রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। অপরিমিত অবক্ষয়ের ফলে আজকের দুনিয়ার শক্তির যোগানের এক প্রধান অংশীদার জ্বালানী খনিজ তেলের ভাণ্ডার নিঃস্ব হবার সম্ভাবনা যখন অবধারিত সত্য হিসেবে দেখা দিল তখন বিশ্বযোড়া বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনীয়াররা

ভাবনায় পড়লেন। এখন তাই তাঁদের নতুন করে খতিয়ে দেখতে হচ্ছে এই বেসামাল অগ্রগতির পাথেয় জোগাতে প্রকৃতির ভাণ্ডার কি মাশুল দিয়েছে দিকে দিকে।

আজ তাই হঠাৎই উপলব্ধি হয়েছে মানুষের যে আদিম প্রকৃতির অকৃপণ দান যে অরণ্যসম্পদ্ তা তাঁদের বেহিসাবী দাবী মেটাতে গিয়ে অতীত স্মৃতির মণি-কোঠায় ঠাঁই নিয়েছে। ভূগর্ভস্থ ধাতুভাণ্ডার ক্রমশ ক্ষীয়মাণ। সমুদ্রের অতলের মূল্যবান্ খনিজ ভাণ্ডারের দিকেও মানুষের আগ্রাসী মুঠি হাত বাড়িয়েছে। ছুনিয়াযোড়া এই আত্মবিশ্লেষণের প্রথম ফসল এঞ্জিনীয়ারিংএর ধারা বদল। এঞ্জিনীয়ারদের প্রথম চিন্তা আজ আর শক্তি প্রয়োগের নতুন দিশারা জোগানো নয়,—আজকের এঞ্জিনীয়ারদের প্রধান দায় শক্তির ব্যয় সংকোচন ও নতুন নতুন শক্তি-উৎস খুঁজে বার করা। এঞ্জিনীয়ারদের এই নতুন কর্মকাণ্ডে সাফল্যের নজির মিলেছে নানান্ দিকে। এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সাফল্য মানুষের জীবন-যাত্রারও নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠতে পেরেছে।

সংকটের সমাধানের নিশানা

শক্তির ভাণ্ডারকে ভরিয়ে তোলার জন্য আমাদের নিত্যব্যবহার্য শক্তির জোগানদার—কয়লা ও পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেলের নতুন নতুন খনি খুঁজে বার করার কাজকে জোরদার করতে হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এই সব খনি সন্ধানের কাজ বহুকাল ধরে চলছে বলে নতুন খোঁজার কাজ বিশেষ করে শুরু হয়েছে আগেকার খনির থেকেও গভীরতর ভূস্তরে আর সমুদ্রের তলায়। এসব জায়গায় নতুন খনি খুঁজে পাবার সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিনীয়ারদের ওপর দায় পড়েছে এই খনির সম্পদ্‌কে সফলভাবে নিষ্কাশন করে আনার। গভীরতর স্তরের কয়লাখনির কয়লা বার করার জন্য চালু হয়েছে 'ডীপ্ শ্যাফ্ট্ সিংকিং'। মাটির তলায় হাজার মিটার গভীর কূয়ো খুঁড়ে গভীর স্তরের কয়লা বার করে আনার জন্য বিশেষ ধরনের বিদ্যুৎ-চালিত উইঞ্চ বসানো হয়েছে এবং সেই গভীরে হাওয়া চলাচলের জন্য তৈরি করতে হয়েছে নতুন ধরনের বায়ুচলাচল ব্যবস্থা—যাকে বলা হয় ভেন্টি-লেশন্ সিস্টেম্‌স্। এইসব খনির মধ্যে যে সব লোক কাজ করে তাদের আপদ্‌বিপদ্ থেকে আগলাবার জন্যও বিশেষ সংকেত-ব্যবস্থা চালু করতে হয়েছে।

সমুদ্রের তলা থেকে তেল বার করা

আরও চমকপ্রদ নতুন কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন হয়েছে কিন্তু গভীর সমুদ্রের তলা থেকে তেল বার করতে গিয়ে। এর সমস্যাগুলি এতই নতুন ধরনের ও জটিল যে এর সমাধানের জন্য এঞ্জিনীয়ারিংএর একটা নতুন শাখাই তৈরি করতে হয়েছে—যাকে বলা হয় 'অফ্ শোর এঞ্জিনীয়ারিং'। এঁদের কাজ সমুদ্রের গভীরে গিয়ে আস্তানা গাড়া, আর সেখানে গিয়ে বিশেষ ভাবে তৈরি প্ল্যাটফর্ম্ বসানো—যা থেকে নল বসিয়ে তুলে আনা যাবে এত কালের লুকিয়ে-থাকা তেলের ভাণ্ডারকে। সমুদ্রের নানান্ অসুবিধাকে সামাল দিয়ে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ও মাপের প্ল্যাটফর্ম্। এর মধ্যে কিছু তৈরি হয়েছে জাহাজের মত চেহারা নিয়ে। এগুলি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে তলায় থামের মতন পা নামিয়ে দিয়েছে সমুদ্রের তলে,—শক্ত পাথরের বুকে, ঝড়ঝাপ্টা থেকে বাঁচবার জন্য। তারপর এই জাহাজের পাটাতন থেকে পাইপ নামিয়ে চলছে তেল তোলার কাজ। খুব চেনা-জানা

জ্যাক্ আপ্ টাইপের একটি প্ল্যাটফর্ম্ বসেছে বম্বের সমুদ্রে (বম্বে হাই)। নাম—সাগরসম্রাট্—ভারতের প্রথম অফ্ শোর প্ল্যাটফর্ম্।
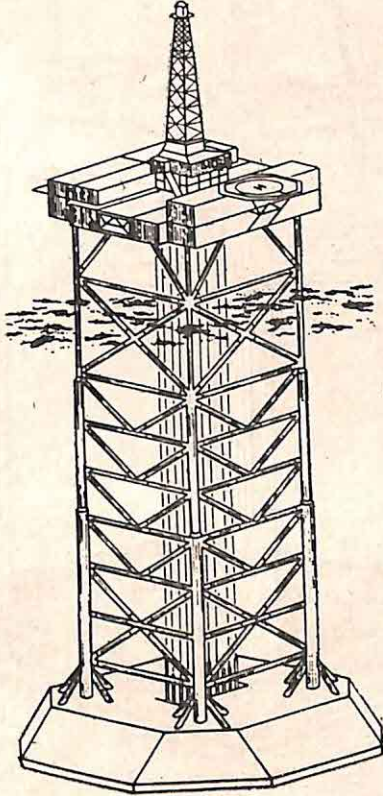
গ্র্যাভিটি টাইপ প্ল্যাটফর্ম্—ইস্পাতের কাঠামো

কিন্তু আমাদের দেশের তেলের প্রয়োজনের বড় রকমের ঘাটতি মেটাতে সমুদ্রবক্ষে তেলের সন্ধানের কাজ আরও জোরদার করা দরকার। তাই তার জন্য জোগাড় করা হচ্ছে আরও অনেক নতুন নতুন প্ল্যাটফর্ম্। মনে রাখতে হবে বিভিন্ন গভীরতায় এবং সমুদ্রের অবস্থা বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্ল্যাটফর্ম্ চাই। এদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হয়েছে গ্র্যাভিটি টাইপ প্ল্যাটফর্ম্, যাকে ঠিকভাবে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে তার নিজস্ব ওজন ও বিস্তার। এইসব প্ল্যাটফর্ম্ ২৫০ মিটার পর্যন্ত জলের গভীরে সমুদ্রতলে বসানো হচ্ছে। এদের ভারসাম্য বজায় রাখার সমস্যাটা খানিকটা আন্দাজ করা যায় সমুদ্রের ঢেউএর মাপটা জানলে। ৩০ মিটার (দশতলা বাড়ির মাপ) উঁচু ঢেউ আর ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার বেগের ঝড়ো হাওয়া প্রায়ই এই প্ল্যাটফর্মগুলিকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে
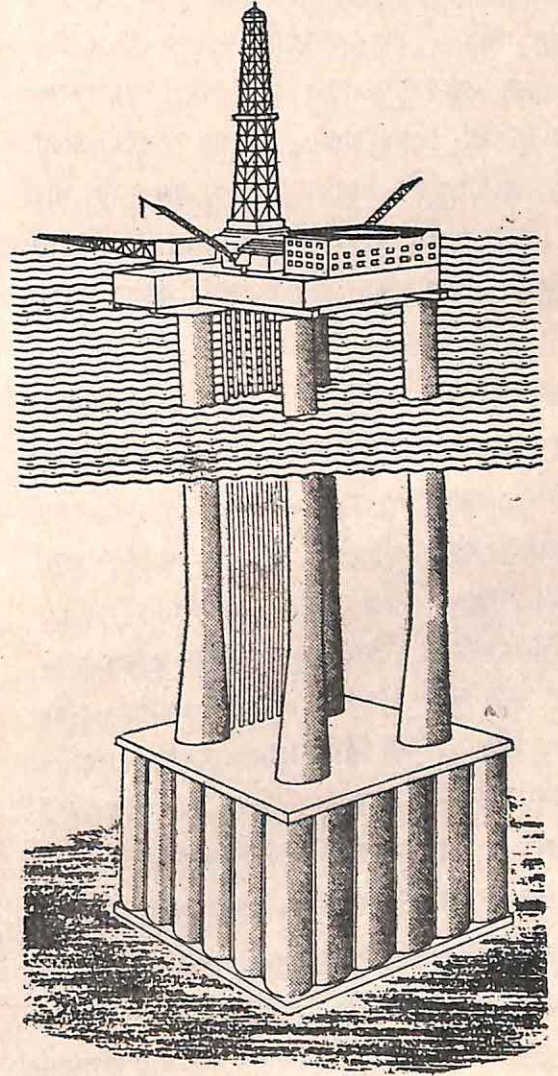
গ্র্যাভিটি টাইপ প্ল্যাটফর্ম্—কংক্রীটের তৈরি জলের ট্যাঙ্ক তলায়

যায়। ঢেউএর ঝাপ্টার ধাক্কার মাপ ১০০০০ টনের বেশি হয়ে যায় মাঝারি মাপের প্ল্যাটফর্মের ওপর। গোড়ায় গোড়ায় লোহার ওপর ভরসা বেশি রাখলেও এখন এঞ্জিনীয়াররা কংক্রীটের প্ল্যাটফর্ম্ করাও শুরু করে দিয়েছেন। এদের তলায় থাকে বড় বড় চৌবাচ্চা —যেগুলো তৈরি হওয়ার পর কারখানা থেকে বসাবার জায়গায় নিয়ে আসার সময় ভেসে থাকতে সাহায্য করে। ঠিক জায়গায় জাহাজ দিয়ে ঠেলে নিয়ে এসে চৌবাচ্চায় জল ভর্তি করে সমুদ্রতলের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়। জলের ওপরে জেগে-থাকা প্ল্যাটফর্ম্‌কে ধরে থাকে বড় বড় থাম, যার মধ্যে ফাঁপা জায়গা থাকে তলা-থেকে-তোলা তেল জমা রাখার জন্য। মধ্যে মধ্যেই তেলের জাহাজ (ট্যাংকার) এসে হাজির হয় এই সব প্ল্যাটফর্ম্ থেকে তেল বোঝাই করে দেশবিদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য। প্রত্যেক প্ল্যাটফর্মের ওপরে থাকে এদের একমাত্র যানবাহন হেলিকপ্টার নামার ও ওঠার পোতাশ্রয় (হেলিপোর্ট্)। এ ছাড়া ২৪ ঘণ্টা কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কর্মীদের বাসস্থান, অবসর-বিনোদনের ব্যবস্থা, ছোটখাট সারাইএর কারখানা—সবই রাখতে হয় ওপরের পাটাতন বা ডেকে। সব মিলে একটা ছোটখাট শিল্পনগরী বলা যেতে পারে।

বহু কোটি মুদ্রা মূল্যের এই তেল নিষ্কাশনী সামুদ্রিক প্ল্যাটফর্ম্‌গুলি বসাতে গিয়ে কিন্তু গোড়ার দিকে অনেক বিপদ্ ও দুর্ঘটনার সামনে পড়তে হয়েছে এঞ্জিনীয়ারদের। সমুদ্রতলে শক্ত ভিৎ না মেলায় একদিকে কাৎ হয়ে গিয়ে বিপত্তি ঘটেছে, ঘটেছে চরম দুর্ঘটনা। ঝড়ের ও ঢেউয়ের ঝাপ্টায় মূল্যবান্ প্রাণ ও বিত্ত নিয়ে জলের তলায় ভেঙ্গে পড়েছে প্ল্যাটফর্ম্ আর তার ভগ্নাবশেষ টুকরোগুলো রয়ে গেছে চিরকালের বিপদের ঝুঁকি হয়ে ভবিষ্যতের জলযানদের জন্য।
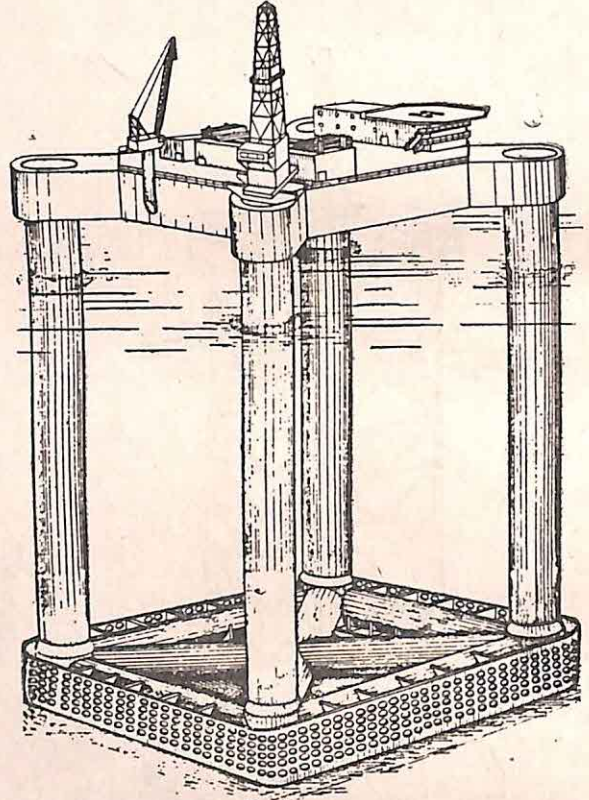
গ্র্যাভিটি টাইপ প্লাটফর্ম্—কংক্রীটের প্রশস্ত বেদী, তলায় ফাঁপা থামগুলি তেল মজুতের গুদাম

কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের জোর বেড়েছে—সমাধান হয়েছে প্রায় সব সমস্যার। ১৯৪৮ সালে ৬ মিটার জলের মধ্যে বসা বার্জ টাইপ প্ল্যাটফর্ম্ দিয়ে শুরু করে আজকে ৩০০ মিটার গভীরে নিষ্কাশনের জন্য 'টেনশন্‌লেস্' প্ল্যাটফর্ম্‌এর দিকে এগিয়ে গেছেন এঞ্জিনীয়াররা।

আরও নতুন পদ্ধতি

এখন ঢেউ ও ঝড়ের ঝাপ্টার ধাক্কা কমাবার জন্য ও ভারসাম্যের সমস্যা মেটাবার জন্য প্ল্যাটফর্মে্‌র

চেহারাটাকেই পাল্‌টে ছোট মাপের করে দেওয়ায় চেষ্টায় লেগে পড়েছেন তাঁরা। সমুদ্রতলের ওপর ভার চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ছেড়ে এখন এদের ধরে রাখার চেষ্টা হচ্ছে সমুদ্রতলের শিলাস্তর থেকেই শক্ত

টেনশনলেস প্ল্যাটফর্ম

বাঁধনে। অনেকটা গঙ্গার বুকে জাহাজ বাঁধার বয়ার মতন আর কি! এই নতুন নক্‌শার ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক নতুন ধরনের টেনশন্‌লেস্ প্ল্যাটফর্ম্‌ও শীগ্‌গিরই নেমে পড়বে সমুদ্রের বুকে নতুন নতুন খনির তেলের সন্ধানে।

আরও নতুন নতুন শক্তিভাণ্ডার

তেল ও কয়লা এই দুই ফসিল জ্বালানীর দিন একদিন শেষ হয়ে আসবেই, আর মানুষের জীবনযাত্রার ও পৃথিবীর রাজনৈতিক চরিত্রের আমূল পরিবর্তন না ঘটলে সে দিন খুব দূরে নয়। তাই বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনীয়াররা আজ নজর দিয়েছেন সেই সব শক্তি-ভাণ্ডারের দিকে যাদের ক্ষয়ের ভয় নেই—যাদের প্রকৃতি নিজের হাতে পুনর্জন্ম দেন। যেমন কিনা সৌরশক্তি, হাওয়ার ঝাপ্‌টা, সমুদ্রের ঢেউ, পাহাড়ের বুক থেকে লাফিয়ে-নামা নদীর ঝরণা, পৃথিবীর বুকে লুকিয়ে-থাকা উত্তাপ—যে নাকি নিজের অস্তিত্ব জানান দেয় উষ্ণ প্রস্রবণের মাধ্যমে। এই নতুন-করে-পাওয়া শক্তিভাণ্ডার নিয়ে আজ পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে দেশে দেশে। কোথাও কোথাও এসেছে সাফল্য, কোথাও বা পরীক্ষাগারের সাফল্যকে এখনও পৌঁছে দেওয়া যায় নি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সাফল্যের পর্যায়ে। নদীর দুর্দম শক্তিকে বাঁধ দিয়ে শক্তি-উৎসের পরিবর্তন করা শুরু হয়েছে অবশ্য বহুদিন আগেই, আমাদের দেশেও,—ভাকরা, মাইথন প্রভৃতি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে। কিন্তু কী বিশাল শক্তি এই একটা মাধ্যমেই প্রতিনিয়ত মানুষের কাজে না লাগিয়ে তার অপচয় ঘটানো হচ্ছে ভাবলেও চমকে উঠতে হয়। এক ব্রহ্মপুত্র নদকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে পারলে তৈরি করা যায় যে পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি তা সারা ভারতের বর্তমান চাহিদা মেটাতে সক্ষম, আর এই শক্তির উৎসের ফুরিয়ে যাওয়ারও কোন ভয় নেই।

নক্‌শা আর হিসাবপত্রের কাজ শুরু হয়ে গেছে এই প্রকল্পের জন্য। আশা রাখি কিছুকালের মধ্যে একে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে যাবে। এ-রকম অসংখ্য জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সন্ধান আজ আমাদের দেশের এঞ্জিনীয়ারদের হাতের মুঠোয় প্রযুক্তির অপেক্ষায় মজুত, এটা একটা ভরসার কথা।

ভূগর্ভস্থ তাপকে মানুষের কাজে ব্যবহারের কিছু কিছু প্রকল্প আজ পৃথিবীর জায়গায় জায়গায় গড়ে

সৌরশক্তি আর ভূগর্ভস্থ তাপ কাজে লাগানোর নক্সা

উঠেছে। সুইডেনের এঞ্জিনীয়াররা পরিকল্পনা বানিয়েছেন বাড়ির ভার নেবার জন্য এক নতুন ধরনের পাইলের। এই পাইলের মধ্যে ফাঁপা নল বসিয়ে তার মধ্যে দিয়ে জলের ধারা পাম্প দিয়ে চালিয়ে প্রয়োজনমাফিক ঠাণ্ডা জলকে গরম করে নেওয়া যায়, যা থেকে বাড়ির প্রয়োজনীয় শক্তির চাহিদা খানিকটা মেটানো যেতে পারে। এই একই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে বড় বড় শক্তি উৎপাদনের প্রকল্প হাতে নিয়েছেন পশ্চিমী দেশের এঞ্জিনীয়াররা। বায়ুর শক্তিকে তো কাজে লাগিয়েছিল বহুকাল আগে থেকেই ওলন্দাজরা—তাদের উইণ্ড মিলের মাধ্যমে। জ্বালানী শক্তির দাপটে এদের ব্যবহার বন্ধই হয়ে গিয়েছিল বহুকাল। এখন আবার নতুন করে সমুদ্রের ধারে ধারে বায়ুর শক্তিকে ব্যবহারের জন্য তৈরির চেষ্টা চলছে উন্নত মানের উইণ্ড মিল্,—যার ফলে শক্তির এই নিঃশুল্ক ও নিঃসীম উৎসকে নতুন করে কাজে লাগানো সম্ভব হতে পারে।

সৌরশক্তি আমাদের মত গরম দেশের পক্ষে প্রকৃতির আশীর্বাদ, কিন্তু কৃষির প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনও কাজে আজ পর্যন্ত এর ব্যবহারের সুযোগ আমাদের হয় নি। এখন পৃথিবী যুড়ে চেষ্টা চলছে এই অফুরন্ত শক্তি,—যে শক্তি কোনও না কোনও ভাবে পৃথিবীর সমস্ত শক্তির আকর,—তাকে সোজাসুজি ভাবে কাজে লাগাবার। বড় ভাবে সাফল্য এখনও আসে নি। হয়তো সময় লাগবে,—কিন্তু এই চেষ্টা বন্ধ হবার কোনও প্রশ্নই নেই পুরোপুরি সাফল্য মানুষের মুঠোয় না আসা পর্যন্ত।

পরমাণু থেকে শক্তি বার করা

মানুষের বর্তমানের শক্তির চাহিদা মেটাবার সম্ভবত সবচেয়ে বড় উৎস পারমাণবিক শক্তি। পরমাণুকে তেজস্ক্রিয় কণা দিয়ে আঘাত করে বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় অসীম শক্তির। এই শক্তি প্রয়োগ করে জল ফুটিয়ে বাষ্পে পরিবর্তন করে চালানো হয় টারবাইনের মধ্যে দিয়ে,—বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য। এই রকম বিদ্যুৎপ্রকল্প আজ গড়ে উঠেছে দেশে দেশে। ভারতেও আছে তারাপুর (বোম্বে), কল্পকম (মাদ্রাজ), কোটা (রাজস্থান) ও নারোরায় (উত্তরপ্রদেশ)। এক সময় পারমাণবিক বিদ্যুৎপ্রকল্পের চাহিদা খুব বেড়ে গিয়েছিল—কিন্তু এগুলি চালু রাখতে গিয়ে কিছু নতুন সমস্যা বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনীয়ারদের ভাবিয়ে তুলেছে। প্রতি পারমাণবিক চুল্লী থেকেই তৈরি হয় তেজস্ক্রিয় আবর্জনা—ইংরেজিতে যার নাম 'নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট', আর এর প্রতিটি কণাই মানবজীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। এই আবর্জনার রক্ষণাবেক্ষণ এবং সরিয়ে ফেলা এক বিশেষ সমস্যাসঙ্কুল ব্যাপার। অন্যান্য আবর্জনার মত এদের নিজে থেকে পচন ও পরিবর্তন হয় না, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে না রাখলে এর থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বেরিয়ে আশপাশের জীবন বিপর্যস্ত করে তোলে। বিশেষ ধরনের প্রতিরোধকে মোড়া আধারে নিয়ে এদের সমুদ্রে বা মরুভূমিতে মাটির তলায় চালান করা হচ্ছিল এতদিন। কিন্তু দিনে দিনে পারমাণবিক চুল্লীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যা একটি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এখন পৃথিবীর সব দেশেই বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনীয়াররা এই সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত। বহুদেশেই পারমাণবিক প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েও চুল্লীর কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না করা পর্যন্ত। বহু নতুন প্রস্তাব এখন বিচারাধীন। তার মধ্যে
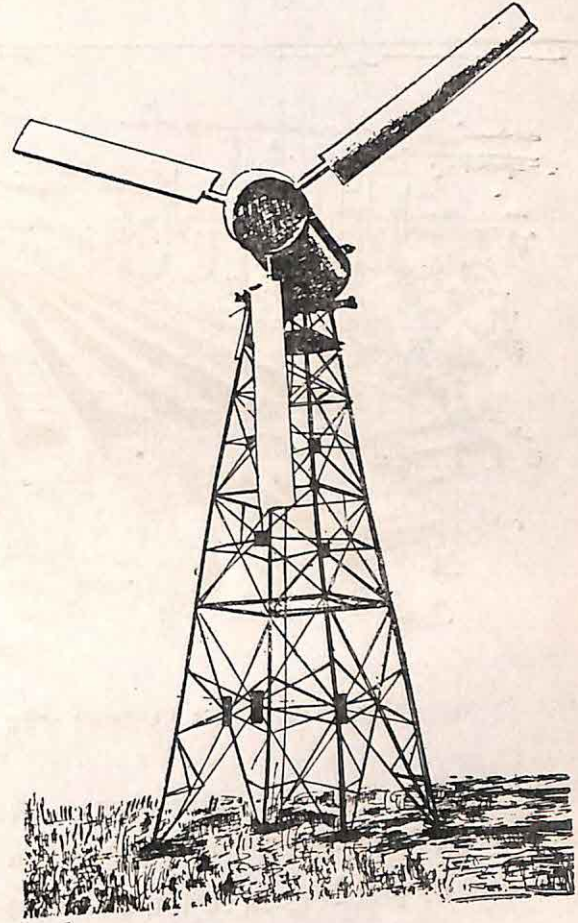
উইণ্ড মিল—বায়ুচালিত শক্তির উৎস

সমুদ্রের গভীরে বিশেষ গর্ত বানানো বা মহাশূন্যে এই আবর্জনা ঠেলে দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। তবে কাজ অনেকটা এগিয়েছে পৃথিবীরই অনেক গভীরে বিশেষ ধরনের গুদামঘর বানানোর পরিকল্পনায়,—কংক্রীট আর ঘন কাদায় ঘেরা শক্ত শিলাস্তরের ভিতর খোদাই করা গুহার-মধ্যে তেজস্ক্রিয় আবর্জনা রাখার এক বিশেষ ব্যবস্থায়।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ পরিকল্পনার আর এক বিশেষ অঙ্গ গরম জলকে ঠাণ্ডা করার জন্য তৈরি কুলিং টাওয়ার। বিদ্যুৎ পরিকল্পনার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ঠাণ্ডা রাখার জন্য প্রচুর জল যোগাতে হয়। এই জলকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার ব্যবহারের জন্য একে নিয়ে আসা হয় কুলিং টাওয়ারে, যেখানে জল বাইরের আবহাওয়ার সংস্পর্শে এসে ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডা করার জন্য পাখা চালিয়ে বাতাস দিলে অনেক বিদ্যুৎ-শক্তির অপচয় হয় বলে এঞ্জিনীয়াররা বানাচ্ছেন বহু উঁচু উঁচু 'ন্যাচারাল ড্রাফ্ট্ কুলিং টাওয়ার', যার গঠনশৈলী সাহায্য করে আবহাওয়ার ঠাণ্ডা বাতাসকে টেনে এনে জলের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে। নতুন ধরনের গঠনচাতুর্য্য দরকার হচ্ছে এই সব ২০০ মিটার উঁচু কুলিং টাওয়ার তৈরি করতে।

সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প

একে একে পারমাণবিক চুল্লীর সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে মানুষের পয়লা নম্বর শক্তির জোগাড়ী—চাপ কমে যাবে ক্রমক্ষীয়মাণ ফসিল-শক্তির ওপর থেকে।

শক্তির মিতব্যয়

শক্তির অভাব মেটাবার একটা দিক্ যেমন নতুন শক্তির জোগান দেওয়া, তেমনি এরই আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক্ হ'ল শক্তিক্ষয়ের পরিমাণ কমানো। পৃথিবী সব প্রান্তের এঞ্জিনীয়াররাই এই ব্যাপারটায় মনঃসংযোগ করছেন গভীরভাবে এখন যে-কোনও বড় প্রকল্পের বিকল্প নক্শাগুলি যাচিয়ে দেখবার সময় টাকা খরচের অঙ্কটা যেমন হিসেব করা হয়, সঙ্গে সঙ্গেই এঞ্জিনীয়াররা প্রত্যেক বিকল্পের মোট শক্তি-ক্ষয়ের হিসেবটাও খতিয়ে নেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার সময় টাকা ও শক্তি দু'টো খরচের হিসেবই সামনে রাখা হচ্ছে। তাই আজ নতুন মডেলের গাড়ি বার করতে গেলে শুধু গাড়ি কত জোরে চালানো যাবে তার হিসেবই যথেষ্ট নয়, কত কম তেল খরচে গাড়ি বেশি দূরত্ব পাড়ি দেবে এ হিসেবটাও গুরুত্বপূর্ণ। বিমান বহরের সম্প্রসারণের সময় যাত্রী প্রতি তেল খরচটাই এখন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য বিমান সংস্থার এঞ্জিনীয়ারের কাছে। মিতব্যয়ের এই চেতনা ও চেষ্টা আজ এক জগৎ-জোড়া সর্বব্যাপী আন্দোলন বলা চলে। এঞ্জিনীয়াররা চেষ্টা করছেন ইলেক্ট্রনিক্স্এর সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতি ঘটিয়ে যাতায়াতের প্রয়োজন

কমানোর। বেতার টেলিফোন ও টেলিভিশনের সংযোগে আজ সম্ভব হয়েছে কনাফারেন্স কলের প্রচলন। পশ্চিমী দেশে জনপ্রিয় এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব হবে দিল্লী, বম্বে, কলকাতার মত বিচ্ছিন্ন জায়গায়
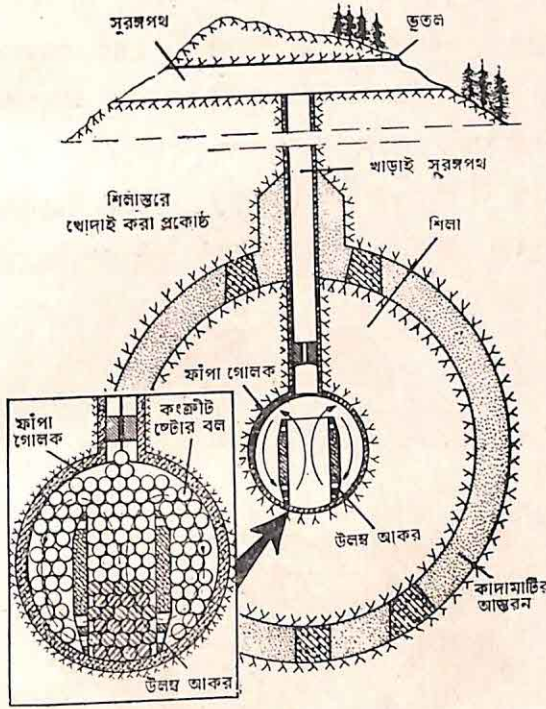
তেজস্ক্রিয় আবর্জনার গুদাম

বসে বসে তিনজনের মধ্যে একই সঙ্গে কথাবার্তা চালানো—পরস্পরের সচল ছবি সামনে রেখে। আবার কি কথাবার্তা হ'ল তার একটা ছাপানো প্রতিলিপিও পাওয়া যাবে একই সঙ্গে তিন কেন্দ্রে, টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে। তখন আর কথায় কথায় সরকারী, বেসরকারী আমলাদের মিটিং করতে ছুটতে হবে না দিল্লী,—বহু সময়, ও তার চেয়ে বড় কথা, দেশের বহু শক্তিসম্পদ্ নষ্ট করে। নব-আবিষ্কৃত পরশমণি মাইক্রোচিপ্ স্‌এর কল্যাণে পুরোনো দিনের অনেক শক্তিক্ষয়ী কর্মকাণ্ডই আজকে স্বল্প শক্তিক্ষয়ে সম্ভব হচ্ছে। কম্পিউটার, টেলিকম্যুনিকেশন আর মাইক্রোফিল্মিং ভবিষ্যতের অফিসে, কারখানায় অনেক কাজের বোঝাই হাল্‌কা করে শক্তি ও সম্পদে অপচয় কমাবে। প্রতিটি এঞ্জিনীয়ারিং প্রকল্পে
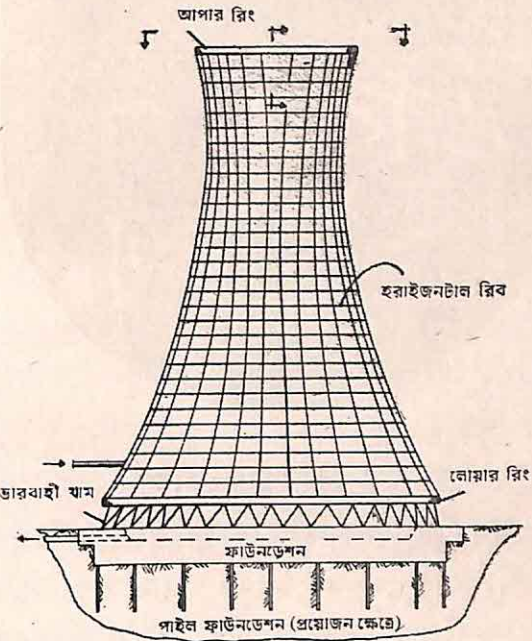
ন্যাচারাল ড্রাফ্‌ট্ কুলিং টাওয়ার

আজ প্রধান দাবী সম্পদের মিতব্যয়। একটা ঘরের কাছের চেনাজানা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা সহজ-বোধ্য হবে। হাওড়া ব্রীজ বা রবীন্দ্র সেতু ১৯৪২ সালে তৈরি হয়। এর ৬৩০ মিটার দৈর্ঘ্যে লোহা ব্যবহার করা হয়েছিল ২৫০০০ টন। বর্তমানে নির্মীয়মাণ দ্বিতীয় হুগলী সেতু ৮১০ মিটার দৈর্ঘ সত্ত্বেও লোহার প্রয়োজন ১৪০০০ টন। অথচ এটি কিন্তু চওড়ায় অপরিবর্তিত আর উচ্চতায় অনেক বেশি বেশি শক্তিক্ষয়ে তৈরি করা ইস্পাতের রডের পরিবর্তে কম শক্তিব্যয়ে তৈরি ফাইবার গ্লাসের তার আজ বেশি কাম্য এঞ্জিনীয়ারদের কাছে।

ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা আর দ্রুতক্ষীয়মাণ সম্পদের টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে আজকের বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনীয়াররা সজাগ ও সতর্ক। তবে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবার জন্যও তাঁরা আজ প্রস্তুত।

স্যর উইলিয়াম জোন্স

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যর উইলিয়াম জোন্সের নাম কে না জানে? তাঁর যুগে তিনিই বোধ হয় ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে বিদ্বান্ ও খ্যাতিমান্ পুরুষ। সবচেয়ে না হলেও, সর্বশ্রেষ্ঠদের একজন তো বটেই। ভাষা জানতেন ২৮টি: ইংরেজি, ল্যাটিন, গ্রীক, ইটালীয়, হিব্রু, ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, আরবী, ফার্সী, তুর্কী, রুনিক, রাশিয়ান, সিরিয়াক্, এথিওপিক্, কপটিক্, ওয়েল্স্, সুইডিশ, ডাচ্, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, তিব্বতী, পালি, পহ্লবী, দেরি ও চীনা। এর উপরে আবার জাপানী ভাষাও পড়েছিলেন কিছুদিন। তাঁর ভাষাজ্ঞান কিংবদন্তীর পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর সময়েই। একটা উদাহরণ দিই। ১৭৯৬ এর ১৬ই আগষ্ট মিস্ বেরিকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন হোরেস্ ওয়ালপোল। তার এক জায়গায় ছিল—"সারাদিনের কাজে আঙুলগুলোর এমন দুরবস্থা হয়ে আছে যে যা লিখলাম তার পাঠোদ্ধার করতে হয়তো স্যর উইলিয়াম জোন্সকে ডাকতে হবে।"

কিন্তু মাত্র ভাষাবিদ্ বললেই তাঁর পরিচয় শেষ হয় না। তখনকার দিনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির এমন কোনও দিক্ নেই যাতে তাঁর হাতের ছোঁওয়া লাগে নি। অনেক বিষয়ে তো তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক। মূলত কবি এবং সাহিত্যের অনুরাগী ছাত্র মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি আকৃষ্ট হ'লেন জোন্স ফার্সী সাহিত্যের আকর্ষণে,—রীতিমত অল্প বয়সেই। সেই পূবমুখো চলা শেষ হ'ল আরবী, তুর্কী পেরিয়ে সংস্কৃতের মণিকোঠায়। প্রাচীন ভারতের বহুমুখী প্রতিভার ছটায় থমকে দাঁড়ালেন স্তম্ভিত বিস্ময়ে। কে যেন উচ্ছ্বসিত আহ্বান জানাল—সারা বিশ্বকে এই রত্নোদ্ধারের

উইলিয়াম জোন্স—এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা

সন্ধান দিতে হবে তাঁকেই। মনে মনে গড়ে তুললেন এক বিশাল পরিকল্পনা।

ওদিকে আবার ব্যারিষ্টারী পড়তে গিয়ে আইনটাও ভারি ভালো লাগল তাঁর। গ্রীক আইনের নজির

টেনে সংস্কার করতে চাইলেন তৎকালীন ব্রিটিশ আইন ও সমাজব্যবস্থা।

এর পর তিনি চলে এলেন কলকাতায় সুপ্রীম কোর্টের জজ হয়ে। এখানে এসে নিমেষেই বুঝে ফেললেন, ভারতীয়দের প্রতি সুবিচার করতে হলে মুসলমানী ও হিন্দু আইন ভালোভাবে জানা চাই। অমানুষিক পরিশ্রম করে প্রায় একক চেষ্টায় বিধিবদ্ধ করে গেলেন সব মুসলমানী ও হিন্দু আইন।

মাত্র আটচল্লিশ বছরের জীবন তাঁর (১৭৪৬এর ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৭৯৪এর ২৭শে এপ্রিল)। কিন্তু এই সামান্য আয়ুর প্রায় সবটাই কাজে ঠাসা। বিশ্বের চোখে তিনি মূর্তিমান্ বিস্ময়।

চার বছর বয়স থেকেই

অল্পবয়সে পিতৃহীন জোন্স্ যখনই কিছু জানতে চান মার কাছে, মা জবাব দেন : "পড়ো, তা হ'লেই জানতে পারবে।" ফল হ'ল, চার বছর বয়স থেকেই পড়া আর কেবল পড়া। সে পড়ার শেষ হয় নি সারা জীবনেও।

সাত বছর বয়সে হ্যারোতে ভর্তি করা হয় তাঁকে। সেখানে ছেলেদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড়, ধ্বস্তাধ্বস্তিতে একটা উরুর হাড় যায় ভেঙ্গে। কয়েক মাস বিছানায় কাটিয়ে আবার যখন পড়াশোনা শুরু হ'ল ক্লাসের ছেলেরা তখন অনেক এগিয়ে গেছে। কিন্তু পড়াশোনা ছাড়া যে কিছু জানে না তাকে পিছনে ফেলবে কে? কিছুদিন পরই দেখা গেল রচনার সব পুরস্কারই পাচ্ছেন জোন্স।

ভার্জিল আর ওভিড্এর অনুবাদ দিয়ে সাহিত্যে হাতেখড়ি হ'ল। মাত্র ১৩ বছর বয়সে সল্ আর ডেভিড্কে নিয়ে ওড্ লিখে ফেললেন একটা। এমন কি একটা নাটকও। ক্লাসের ছেলেরা আবার সেটা অভিনয় করল। কিছুদিন পরে ঠিক হ'ল সেক্সপীয়ারের টেম্পেষ্ট্ অভিনয় হবে। হাতের কাছে বই পাওয়া যায় না কোথাও। কুছ পরোয়া নেই। স্মৃতি থেকে গোটা বইটা লিখে ফেললেন জোন্স। অভিনয় আটকাল না।

শুধু গ্রীক আর ল্যাটিন নিয়ে পড়ে থাকতে ভালো লাগে না জোন্সের। ছুটীতে ফরাসী, ইটালীয় ও স্প্যানিশ শিখতে শুরু করলেন। হীব্রুটাই বা বাদ যায় কেন? জানা থাকলে মূল বাইবেলটাও পড়া যাবে বেশ।

ছোট্ট জায়গা হ্যারো। সুতরাং খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না। বিদায়ী হেড্মাষ্টার থ্যাকারে মন্তব্য করেন : এত অনুসন্ধিৎসা ছেলেটার যে ওকে যদি সল্সবেরির মাঠে নগ্ন অবস্থায়ও ছেড়ে দেওয়া

মা জবাব দেন, পড়ো, তা হলেই জানতে পারবে।

যায়, খ্যাতি-প্রতিপত্তির পথ ও ঠিক খুঁজে বার করবে আপনা থেকেই। নতুন হেড্‌মাষ্টার ডঃ রবার্ট সাম্‌নারও মুগ্ধ। কিছুদিন পরই তাঁকে বলতে শোনা গেল : ছেলেটা আমার চেয়েও গ্রীক ভালো জানে। প্রায়ই সারারাত জেগে জোন্সের পড়াশোনা করার কথা জানতেন তিনি, কিন্তু বলতেন না কিছুই। বরং উৎসাহিত করতেন নানাভাবে। জোন্সের কোনও লেখা খুব বেশি রকম উৎরে গেলে স্কুল ছুটি দিয়ে দিতেন পর্যন্ত। ফলে দেখতে দেখতে জোন্সের নাম এত ছড়িয়ে পড়ল যে বাইরে থেকে লোকে দেখতে আসত, কে ঐ খুদে পণ্ডিতটি।

১৭৬৪তে ম্যাট্রিক পাশ করে অক্সফোর্ডে ভর্তি হলেন জোন্স। কিছুদিনের মধ্যেই মাষ্টার মশাইরা বুঝে ফেললেন, ক্লাসের তুলনায় জোন্স বড্ড বেশি তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে। ক্লাসে হাজির থাকার দায় থেকে রেহাই দিলেন তাঁরা। ছ' মাসের মধ্যেই একটা বৃত্তিও পেয়ে গেলেন জোন্স।

ভাষা শিক্ষা চলতে লাগল

এক ছুটীতে আলাপ হ'ল মির্জা নামে এক মিশর-বাসীর সঙ্গে। অক্সফোর্ডে থাকা-খাওয়ার বদলে আরবী শেখাতে রাজী হলেন তিনি। কয়েক মাস ধরে জোর চলল আরবী পাঠ। তারপরে অবশ্য ছেড়ে দিতে হ'ল তাঁকে, কারণ শেষ পর্যন্ত সহপাঠীরা খরচ যোগাতে রাজী হ'ল না কেউ, আর জোন্সের পক্ষে একা সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা সম্ভবও ছিল না। তবে ততদিনে আরবী লেখা ও পড়া বেশ সড়গড় হয়ে গেছে জোন্সের।

আরবী শিখতে শিখতে জোন্স জানতে পারলেন ফার্সীতে অনেক আরবী শব্দ আছে, ব্যাকরণের নিয়মেও আছে অনেক সাদৃশ্য। আর লিখন-পদ্ধতি দু'টোরই এক। ফার্সী সাহিত্যভাণ্ডার অপর্যাপ্ত। সুতরাং ফার্সী শেখার লোভ সামলানো গেল না। সহায় হ'ল মেনিন্‌স্কির ফার্সী 'শব্দকোষ'।

বয়স বাড়ছে। কিছু রোজগার দরকার। আর্ল স্পেন্সারের ছেলে জর্জ জনের (পরে ভাইকাউন্ট আলব্যার্ট্) গৃহশিক্ষকতা জুটে গেল। ১৭৬৭তে তাদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে জার্মান ভাষার দিকে নজর গেল জোন্সের। ফিরলেন যখন, গ্রামার আর অভিধানের সাহায্যে জার্মান ভাষার বই পড়ার মত বিদ্যা আয়ত্ত হয়ে গেছে তাঁর।

১৭৬৮তে আলাপ হ'ল কাউন্ট চার্ল্‌স্ রেভিস্কির সঙ্গে। জাতিতে তিনি পোল, পেশায় কূটনীতিবিদ্; ফার্সীতে খুব দখল। তাঁর নিজেরই লেখা হাফিজের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ পড়তে দিলেন জোন্সকে। জোন্সের ফার্সী-প্রীতি বেড়ে গেল। হাফিজকে যদি স্বদেশবাসীর কাছে তুলে ধরা যায় তা হলে ইংরেজি কবিতার মরা গাঙ্গে জোয়ার আসবে।

চলল অনুবাদের কাজ

তখনও জোন্সের বিশেষ কিছু লেখা ছাপা হয় নি, তবু প্রাচ্যভাষাবিদ্ বলে এত নাম ছড়িয়েছে সারা ইয়োরোপে যে ডেনমার্কের রাজা সপ্তম ক্রিশ্চিয়ান যখন ১৭৬৮ সালে লণ্ডনে এসে মির্জা মেহেদীর নাদির শাহের ইতিহাস 'তারিখ-ই-নাদিরি' অনুবাদ করাতে চাইলেন, তখন সরকার থেকে অনুরোধ গেল জোন্সের কাছে ফরাসী ভাষায় বইটি অনুবাদ করে দেবার জন্য। প্রথমে এড়াতে চাইলেন জোন্স। কিন্তু এর মধ্যে স্বদেশের সম্মানের প্রশ্ন জড়িত, সুতরাং এড়াতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত। নিজের সব কাজ ফেলে

লাগতে হ'ল এই অনুবাদের কাজে। এক বছরেই শেষ হ'ল অনুবাদ। ১৭৭০-এ ছাপা হ'ল ফরাসী অনুবাদ। ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই প'ড়ে বললেন ঃ

ষোড়শ লুই পড়ে বললেন, 'অদ্ভুত ছেলেটি তো !'

"অদ্ভুত ছেলেটি তো ! এ যে দেখছি আমার ভাষা আমার চেয়ে ভালো জানে !" ইংরেজি অনুবাদের জন্য দাবী এত সোচ্চার হ'য়ে উঠল যে ১৭৭৩-এ একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজি সংস্করণও বার করতে হ'ল। জোন্সকে কোপেনহেগেন রয়াল সোসাইটির সভ্য করা হ'ল। তাঁকে প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে তৃতীয় জর্জের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন ডেনমার্কের রাজা, সেটা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা হ'ল।

এদিকে ১৭৬৮তে গ্রাজুয়েট হয়ে গেছেন জোন্স। কিন্তু শুধু প্রাচ্যবিদ্যা নিয়ে থাকলে নাম হতে পারে ঠিকই, কিন্তু তাতে তো আর পেট ভরবে না ! একটা জীবিকা চাই। তখন ব্যারিষ্টারী পড়া ঠিক হ'ল। মিড্‌ল্ টেম্পল-এ যোগ দিলেন জোন্স ১৭৭০এর ১৯শে সেপ্টেম্বর।

এখন অবশ্য আর প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা করার সময় পাওয়া যাবে না। কিন্তু নোট্ তো জমা হয়ে আছে প্রচুর, সেগুলো বই করে ছাপালে কেমন হয় ?

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। ১৭৭১ থেকে ১৭৭৪ সালের মধ্যে ছাপা হ'য়ে বেরুল ফার্সী ব্যাকরণ, কবিতাগুচ্ছ (পোয়েম্‌স্)—এশিয়ার নানা ভাষার কবিতার অনুবাদ, কমেণ্টারিয়োরাম্। ফার্সী সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্য ভালোভাবেই পূরণ হ'ল। তাঁর হাফিজের কবিতার অনুবাদ "এ পার্সিয়ান্ সং অব হাফিজ" কত ডজন কবিতা-সঙ্কলনে যে স্থান পেল তার ঠিক নেই। অমর ফার্সী কবি ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের অনুবাদক ফিট্‌জেরাল্ড তাঁর কবিতা পড়েই ঐ রুবাইয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হন। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক ভাবচেতনায় জোন্সের কবিতাগুচ্ছের অবদান অনস্বীকার্য। নয়টি সংস্করণ হয় কবিতাগুচ্ছের ১৮২৩ সালের মধ্যে।

ফার্সী ব্যাকরণ ছাপানোর পিছনে জোন্সের উদ্দেশ্য ছিল যে সব ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী হয়ে ভারতে যান তাঁদের সাহায্য করা। জোন্স জানতেন মোগল শাসনে ভারতে দলিল দস্তাবেজ, আদালতের কাজ সবই ফার্সীতে হ'ত। সুতরাং সেখানে কাজ করতে গেলে প্রাথমিক ফার্সী জ্ঞান আবশ্যিক। সেই প্রয়োজন মেটাতে যে জোন্সের ব্যাকরণ প্রভূত সাহায্য করেছে তার প্রমাণ এই বইটিরও ১৮২৮ সালের মধ্যে নয়টি সংস্করণ হয়। শুধু তাই নয়, ফরাসী ভাষায়ও এর সংস্করণ হয়েছিল দু'টি। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জোন্সের তিনটি পদবী জুটল—ফার্সী জোন্স, ভাষাবিদ্ জোন্স, আর পূর্বী (ওরিয়েণ্টাল) জোন্স।

কমেণ্টারিয়োরাম ৫৪২ পৃষ্ঠার বই। ল্যাটিনে লেখা। আরবী, ফার্সী ও তুর্কী সাহিত্য নিয়ে বিদগ্ধ রচনা। বইটি বিশ্ববিখ্যাত করল জোন্সকে মাত্র ২৮ বছর বয়সে। বিখ্যাত পণ্ডিত ও লেখক গীবন তাঁর 'দি ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল্ অব্ দি রোমান এম্পায়ার' (রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন) বইটির কথা বলতে গিয়ে তাঁকে অপূর্ব ভাষাবিদ্ (ওয়াণ্ডারফুল লিঙ্গুইস্ট) বলে উল্লেখ করেছেন। ল্যাটিনে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও তিনটি সংস্করণ হয় বইটির।

নাম এত ছড়াল যে লোকে জোন্সকে 'বিশ্বকোষ' ব'লে ভাবতে শুরু করল। পোল্যাণ্ডের যুবরাজ জারতোরিস্কি চিঠি লিখলেন তাঁর কাছে জানতে চেয়ে—ফার্সী ভাষায় এত ইয়োরোপীয় শব্দ কেন? জোন্সও তার জবাব দিলেন কারণপরম্পরা সাজিয়ে ও বিশ্লেষণ করে।

মাত্র ২৬ বছর বয়সে ১৭৭২এর ৩০শে এপ্রিল এফ্. আর. এস্. (ফেলো, রয়াল সোসাইটি) হ'লেন জোন্স। ১৭৭৩এ ডঃ জনসন ক্লাবের সভ্য করা হ'ল তাঁকে। ডঃ জনসন অনেক সময় মুখের সামনেই প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতেন জোন্সের। স্বভাব-বিনয়ী জোন্স লজ্জা পেতেন। তাঁর বিনয় নিয়ে তো টমাস বার্নার্ড একটা কবিতাই লিখে ফেললেন—"জোন্স, টিচ্ মি মর্ডেস্টি অ্যাণ্ড গ্রীক" (জোন্স, আমাকে বিনয় এবং গ্রীক শেখাও।)

ব্যারিস্টার জোন্স

১৭৭৩এর ১৮ই জুন এম্. এ. ডিগ্রী পান জোন্স আর ১৭৭৪এর জানুয়ারীতে অনুমতি পান বার-এ যোগ দেবার। তখনই কিন্তু যোগ দেন নি তিনি, এক বছর ধরে কোর্টে বসে বসে লক্ষ করেন কি ভাবে বিখ্যাত আইনজীবীরা বক্তৃতা দেন, সুকৌশল প্রয়োগ করেন আইনের। তারপরে একদিন উঠে দাঁড়ান 'কিংস্ বেঞ্চে'। একঘণ্টা ধরে দেওয়া তাঁর সেই বক্তৃতা মনে পড়িয়ে দেয় সেকালের বক্তা সিসেরোর কথা।

এরই মধ্যে ব্ল্যাকষ্টোনের চার খণ্ড কমেণ্টারীতে ডুবে থাকেন জোন্স। আইনও এখন বেশ ভালো লাগে। বন্ধু জন্ উইলমণ্টএর কাছে মন্তব্য করেন,—'লোকে কেন যে আইনকে শুক্‌নো বলে বুঝি না!'

১৭৭৬ সালে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর সার্থক গ্রীক ব্যবহারজীবী ইসেউস্-এর দশটি ভাষণ অনুবাদ করেন জোন্স ইংরেজিতে। দশটি মামলায় প্রদত্ত এই ভাষণ থেকে তৎকালীন গ্রীস দেশের সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যবস্থার সুন্দর বিশ্লেষণ করেন তিনি। উদ্দেশ্য ছিল—ইংল্যাণ্ডের ভূসম্পত্তি-বিষয়ক আইনের প্রতি তুলনামূলক দৃষ্টি আকর্ষণ। এই বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই উদীয়মান আইনবিদ রূপে নাম ছড়িয়ে পড়ল জোন্সের।

গচ্ছিত সম্পত্তি (বেইলমেণ্ট) সম্বন্ধে আইনের কোনো নির্ভরযোগ্য বই ছিল না ইংল্যাণ্ডে। ব্ল্যাকষ্টোনও এই আইনের বিশদ ব্যাখ্যা করেন নি কিছু। অনেক খেটেখুটে রোমান আইনের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা ও ঐতিহাসিক পর্যায় বিশ্লেষণ ক'রে জোন্স বই লিখলেন একখানা (১৭৮১) "অ্যান্ এসে অন্ দি ল অব্ বেইলমেণ্টস্"। ছাপা হতেই সাড়া পড়ে গেল আইনবিদ্‌দের মধ্যে। পঞ্চাশ বছর ধরে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় আদৃত হ'ল বইটি। অসংখ্য সংস্করণ হ'ল তার।

১৭৮২তে বেরুল জোন্সের মুসলমানদের উত্তরাধি-

কার আইনের বই মুলাক্কিনের সর্বজনস্বীকৃত আইন ব্যাখ্যা, বুঘাইয়াৎ-অল্-বহিথ্-এর অনুবাদ। জোন্স জানতেন আরবী না জানার দরুন ব্রিটিশ আইনজীবী ও জজ্দের মুসলমানী আইনের ব্যাপারে দেশী মোল্লাদের উপর নির্ভর করতে হ'ত, আর মোল্লারা আইন ব্যাখ্যা করতেন নিজেদের সুবিধেমত। ফলে, বিচারের চেয়ে অবিচারই হ'ত বেশি। তাই এই প্রচেষ্টা। আইনব্যবসায়ীদের কাছে প্রচুর অভিনন্দিত হ'ল বইটি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হ'ল তাঁর মোয়াল্লাকাতের গদ্য অনুবাদ। কিংবদন্তী বলে, মক্কায় গুণিজনসমাবেশে যে সাতটি কবিতা সবচেয়ে ভালো বিবেচিত হয় তা-ই সোনার জলে লিখে রাখা হয় ধর্মস্থানের তোরণদ্বারে। মোয়াল্লাকাত সেই সাতটি কবিতার সঙ্কলন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে জোন্সের অধিকার আর একবার প্রমাণিত হ'ল।

ভারতে সুপ্রীম কোর্টের জজ

ওদিকে পাঁচ বছর ধরে কলকাতায় একজন সুপ্রীম কোর্টের জজের পদ খালি যাচ্ছে। সবাই জানে ঐ পদের জন্য জোন্সের মত উপযুক্ত ব্যক্তি আর কেউ নেই। কিন্তু সরকারী মহলের দ্বিধা কাটে না। জোন্সের উদারনৈতিক মতবাদ সুবিদিত। আমেরিকার মুক্তির দাবীর সমর্থক তিনি। এমন লোককে কি ভারতে অত উচ্চপদে পাঠানো ঠিক হবে? শেষ পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী মেল্‌বোর্ন ও স্বয়ং রাজা তৃতীয় জর্জের হস্তক্ষেপে লর্ড চ্যান্সেলর বার্লোকে মত দিতে হ'ল। ১৭৮৩ সালের ৪ঠা মার্চের লণ্ডন গেজেটে জোন্সের ঐ পদে নিয়োগের কথা ঘোষিত হ'ল। ২০শে মার্চ তাঁকে নাইট্ করা হ'ল। আর ১২ই এপ্রিল নবপরিণীতা বধূ এ্যানা মারিয়াকে নিয়ে ক্রোকোডাইল জাহাজে ভারত অভিমুখে ভেসে পড়লেন জোন্স।

বাঁয়ে পারস্য, সামনে ভারত; আরব সাগরের জল কেটে চলেছে ক্রোকোডাইল। গালে হাত দিয়ে ভাবছেন জোন্স্। কত কিছু জানার আছে ভারত সম্বন্ধে। স্থানীয় আইন তো বটেই, তা ছাড়া ভারতীয় ঔষুধপত্র, রসায়ন, শল্যশাস্ত্র, অঙ্ক, বিজ্ঞান, কাব্য, সঙ্গীত, নীতিশাস্ত্র, আরও কত কি! সব দিকেই গভীর অনুসন্ধান চালানো দরকার। কিন্তু একার পক্ষে তো এ কাজ সম্ভব নয়! আচ্ছা, রয়্যাল সোসাইটির মত একটা সংস্থা করলে কেমন হয়?

সেই মুহূর্তে জন্ম নিল ভবিষ্যৎ এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গলের অঙ্কুর।

পাঁচ মাসের জলযাত্রা শেষ করে, প্রথম ধাক্কা সামলে, সহকর্মী চেম্বার্সের কাছে মুখ খুললেন জোন্স। জানুয়ারীর (১৭৮৪) মাঝামাঝি ডাকা হ'ল সব গুণিজনদের। সব জজেরাই সোসাইটির মূল সদস্য হলেন। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল হলেন পৃষ্ঠপোষক। হেষ্টিংসের প্রস্তাবানুযায়ী সর্বসম্মতিক্রমে জোন্স হ'লেন সভাপতি।

কিন্তু সংস্কৃত যে এবার না শিখলেই নয়। সংস্কৃত পণ্ডিতদের আইনব্যাখ্যা অনেক সময়েই যুক্তিহীন মনে হয়েছে তাঁর। এ অবস্থা আর তো চলতে দেওয়া যায় না! বেনারসে গিয়ে খোঁজ পেলেন মনুর মানবধর্ম শাস্ত্রের। বুঝলেন এ বইয়ের অনুবাদ না হলে ইংরেজদের পক্ষে এ দেশে সুবিচার করা সম্ভবই নয়। বেনারসের যে দেশী ম্যাজিস্ট্রেটের

কাছে ঐ বইয়ের খোঁজ পেয়েছিলেন তিনি বা তাঁর কোর্টের কেউ সাহায্য করতে রাজী হলেন না। এমন কি একখানা কপিও যোগাড় করতে পারলেন না ঐ বইয়ের। বিদেশী ম্লেচ্ছের হাতে কি ঐ বই দেওয়া চলে?

সংস্কৃতের রত্নভাণ্ডার

কৃষ্ণনগরে বাড়ি নিয়েছিলেন একটা, লম্বা ছুটীতে নিরিবিলি কাজ করার জন্য। কৃষ্ণনগরের পাশেই নবদ্বীপ। সেখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হাতে সংস্কৃত শাস্ত্রের চাবিকাঠি। অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোন ব্রাহ্মণই রাজী হলেন না তাঁকে সংস্কৃত শেখাতে।

শেষ পর্যন্ত একজন বৈদ্যকে রাজী করানো গেল।

শেষ পর্যন্ত একজন বৈদ্যকে রাজী করানো গেল। ছুটী ফুরোলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলেন কলকাতায়। আদা-জল খেয়ে লাগলেন ১৭৮৫-র গ্রীষ্মের শেষ থেকে। ব্যাকরণ, সূত্র সব কিছুই সংস্কৃতে। সুতরাং পদে পদে হোঁচট খেতে হয়। স্বাস্থ্য তাঁর কোনদিনই ভালো নয়। ছেলেবেলার এক দুর্ঘটনায় একটা চোখ বেশ দুর্বলও। কিন্তু জোন্স অদম্য। অ্যাকৃটিং গভর্নর জেনারেল ম্যাক্‌ফারসনকে জানালেন, "সারা-জীবন রুগ্ন হ'য়ে থাকতে হয় থাকব, তবু সংস্কৃতের খনি আমি খুঁড়বই।"

পাণিনীর ব্যাকরণ প'ড়ে জোন্স মুগ্ধ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষার এমন সুষ্ঠু বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, শ্রেণীবিভাগ, নিয়মনির্দেশ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অর্থভেদ গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, ফার্সী কোনো ভাষার ব্যাকরণেই নেই। পড়তে পড়তে রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হয়। সংস্কৃতের সঙ্গে গভীর মিল খুঁজে পান গ্রীক, ল্যাটিন, কেলটিক, জার্মান ও ফার্সীর সঙ্গে। শুধু মূল শব্দ ও ধাতুতে নয়, ব্যাকরণের কোনও কোনও নিয়মেও। আবিষ্কার করেন মূল্যবান্ তথ্য—ভারতের সংস্কৃত ও ইয়োরোপের অনেক ভাষাই মূলত এক ভাষা থেকে এসেছে, যে ভাষার নাম পরে দেওয়া হয়েছে ইন্দো-ইয়োরোপীয়। সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিকী বক্তৃতায় ব্যক্ত করেন তাঁর মত ১৭৮৬-র ২রা ফেব্রুয়ারী। তারই ফলে জন্ম নিল তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞান।

জোন্স সমস্ত অবকাশ কাটালেন কৃষ্ণনগরে। পড়ে রইলেন সংস্কৃত নিয়ে। প্রতিদিন ভোর থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত। কিন্তু সেশন্স

আরম্ভ হ'লে কলকাতা আসতেই হয়। কিন্তু কাজের শেষে অন্য জজেরা যখন বিশ্রাম নেন চুপচাপ, অথবা সরস আলোচনায় মাতেন, জোন্স হুমড়ি খেয়ে পড়েন সংস্কৃত নিয়ে। চেম্বার্স দুঃখ ক'রে বলেন, "ও তো দিনের মধ্যে ষোলো ঘণ্টা পড়াশোনা নিয়েই থাকে, গল্প করবে কখন ?"

সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে উঁকি দিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায় জোন্সের। কি সর্বনাশ! অন্তত পাঁচ লক্ষ শ্লোকের ইতিহাস ও মহাকাব্যের জট, উদ্দেশ্যে হিতোপদেশের অনুবাদ করলেন জোন্স। শেষ পর্যন্ত ছাপাবার তাগিদ অনুভব করেন নি। মনুর ধর্মশাস্ত্র অনুবাদে হাত দিলেন এবার। শব্দ সংগ্রহ চলছে। ইংরেজি প্রতিশব্দ সহ দশ হাজার সংস্কৃত শব্দ সংগৃহীত হ'য়েছে। একজন ব্রাহ্মণ ও একটি দেশী ছেলেকে কাজে লাগিয়েছেন। মাইনে দিতে অনেক টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার আর কি করা যাবে ?

পণ্ডিত, মৌলবী দুই-ই, সঙ্গে একজন অনুলেখকও

অসংখ্য গীতিকবিতা, নাটকের লেখাজোখা নেই! এ ছাড়া আছে স্মৃতিশাস্ত্র, ভেষজশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, আরো কত কি! কত কিছুর উপরে! পড়ছেন আর ভাবছেন: হায় হায়! এখানকার এই 'হোমার', 'পিণ্ডার' ও 'প্লেটোদের' কথা পশ্চিমের কেউ জানল না!

সংস্কৃতে দখল যাচাই ও পাকা করার

আরো আরো আরো কাজ

ভারতীয়দের প্রতি সুবিচার করতে হলে দরকার মুসলমান ও হিন্দুদের সমস্ত আইন সংকলন (ডাইজেস্ট)। বিরাট ব্যাপার। অনুবাদ করবেন জোন্স নিজে। কিন্তু মূল পুঁথি জোগাড় ও নকল করতে লোক লাগবে,—পণ্ডিত, মৌলবী দুই-ই; তাদের মাইনে বাবদ লাগবে মাসে হাজার টাকা।

হিসেব করে দেখলেন, মোট সময় লাগবে ছ' থেকে তিন বছর।

লর্ড কর্নওয়ালিস রাজী হয়ে গেলেন। হিন্দু পণ্ডিত ও শিক্ষিত মৌলবীদের একটা তালিকা করে ফেললেন জোন্স। তারপরে তার থেকে দু'জন ক'রে বাছাই ক'রে নিলেন। অনুলেখকও থাকল একজন করে। ব্রাহ্মণরা এখন তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। ক্ষত্রিয় আখ্যা দিয়েছেন তাঁকে তাঁরা। অনর্গল সংস্কৃতে কথা বলেন তাঁদের সঙ্গে জোন্স। কাজ এগিয়ে চলে পুরোদমে।

সংস্কৃতচর্চার শুরু থেকেই যে সব মালমাশলা যোগাড় করেছিলেন তাই নিয়ে লেখা সব ছাপা হয়ে বেরোতে শুরু করল ইতিমধ্যে। কামদেব, নারায়ণ সরস্বতী, দুর্গা, লক্ষ্মী, গঙ্গা, ইন্দ্র, সূর্য নিয়ে তাঁর লেখা স্তব (হিম্‌স্) 'এশিয়াটিক মিসেলানী'তে ছাপা হয়ে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল ভারতীয় ভাব, ধ্যান, ধারণা নিয়ে ইংরেজি কবিতার একটি ধারা, যার বাহক হয়েছেন উত্তরকালে মূর ও কিপ্‌লিংএর মত কবিরা। এশিয়াটিক রিসার্চের প্রথম খণ্ডে গ্রীক, ইতালীয় ও ভারতীয় দেবদেবীর তুলনামূলক আলোচনা করলেন জোন্স। শুরু হ'ল সারা বিশ্বে তুলনামূলক পৌরাণিক আলোচনা। পর পর খণ্ডে নানা প্রবন্ধে নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন। ভারতসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তকে সনাক্ত করলেন মেগাস্থানিস-উক্ত স্যাণ্ড্রোকোটাস বলে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সত্যিকারের গোড়াপত্তন হ'ল। ভারতীয় ভেষজ শাস্ত্রের একটি নিবন্ধ অনুবাদ করে তুলে ধরলেন পরিশুদ্ধ শঙ্খবিষ প্রয়োগে গোদ (এলিফ্যান্টাসিস) রোগ সারাবার ভারতীয় পদ্ধতির কথা। রঘুনন্দনের সংস্কৃত নিবন্ধ অবলম্বনে আলোচনা করলেন হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র ও চান্দ্র বৎসর নিয়ে। সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্র ঘেঁটে গভীর তুলনামূলক আলোচনা করলেন পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে হিন্দু সংগীতের। এশীয় শব্দ ইয়োরোপীয়দের মুখে বিকৃত হয়। তাই উচ্চারণের দিকে জোর দিয়ে রোমান্ অক্ষরে সংস্কৃত, ফার্সী ও আরবী শব্দ বানানের পদ্ধতি নির্দেশ করলেন। যেখানে রোমান্ অক্ষরে ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে সাহায্য নিলেন ফরাসী প্রতীকের। আজও সে পদ্ধতি জোন্সীয় পদ্ধতি (জোন্সিয়ান্ সিস্টেম্) বলে বিখ্যাত। সেই পদ্ধতি অবলম্বনে ভারতীয় উদ্ভিদ্ নিয়ে লেখা প্রবন্ধে ৪১৯টি সংস্কৃত গাছগাছড়ার নাম রূপান্তরিত করলেন ইংরেজিতে। একটি প্রবন্ধে সংস্কৃত ভেষজশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া ৭৮টি গাছ-গাছড়ার পরীক্ষার ফল বর্ণনা করলেন। ভারতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা চর্চার অঙ্কুর গজাল। এক্ষেত্রেও জোন্সই প্রথম। তাই তো পরবর্তীকালে রক্স্‌বারো বোটানীতে অশোক গাছের নাম রাখলেন জোনেসিয়া অশোকা,—ভারতীয় উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রে জোন্সের অবদানের কথা যাতে কেউ না ভুলতে পারে।

মাত্র আটচল্লিশ বছরের জীবন

১৭৮৯-তে জয়দেবের গীতগোবিন্দের গদ্য অনুবাদ করেন জোন্স। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বললেন কালিদাসের শকুন্তলার কথা। সংস্কৃত লিপিতে লেখা পুঁথি কোথাও মিলল না। অনেক কষ্টে যোগাড় হ'ল বাংলা লিপির একখানা পুঁথি। তাই অনুবাদ করলেন জোন্স প্রথমে ল্যাটিনে, তারপরে ইংরেজিতে। ছাপিয়ে ফেললেন তৎক্ষণাৎ। কালিদাসের নাম দিলেন, "ভারতের সেক্সপীয়ার"। হৈ হৈ পড়ে গেল সারা ইয়োরোপে। গ্যেটে উচ্ছ্বসিত। ফরাসী বিপ্লবের শোরগোল ছাপিয়ে উঠল শকুন্তলার কথা,

আলোচনা,—ইয়োরোপে, আমেরিকায়। সাত বছরে তিনবার বইটির পুনর্মুদ্রণ হ'ল গ্রেট বৃটেনে। অনূদিত হ'ল জার্মান ভাষায়, ফরাসীতে, ইটালিয়ানে। বই থেকে আয়ও হ'ল বেশ। কিন্তু সব টাকা দিয়ে দিলেন জোন্স ভারতে দেউলিয়া ঋণগ্রস্তদের কল্যাণে। নিজ চোখে দেখে এসেছেন জোন্স কলকাতার কারাগারে নিরুপায় ঋণগ্রস্তের দল কি অসম্ভব কষ্টে থাকেন। এক ফোঁটা পরিস্রুত জলও পান না তাঁরা। আলো-হাওয়াহীন স্যাঁৎসেঁতে কাঁচা ঘরের নরকে দিনগত পাপ ক্ষয় করেন। চেষ্টা করেও তাঁদের জন্য কিছু করতে পারেন নি জোন্স। তাই এই দান।

১৭৯৩-এর নভেম্বরে স্ত্রী এ্যানা মারিয়া বিলেতে ফিরে গেলেন। এদেশে শরীর টিকছিল না তাঁর। জোন্সও যাবেন আইন সঙ্কলন (ডাইজেস্ট) শেষ হ'লেই। ১৭৯৪-এর প্রথম দিকে মনুসংহিতার অনুবাদ ছাপা হ'য়ে বেরুল। কুল্লুক ভট্টের ভাষ্য অবলম্বনে অনুবাদ করেছিলেন জোন্স। আট বছরে বিরাট পর্ব শেষ হ'ল। ডাইজেস্টের ন'টি খণ্ডও শেষ। বাকি মাত্র দু'খণ্ড। তা হলেই জোন্স ফিরে যেতে পারেন ইংল্যাণ্ডে। পরিকল্পনা অবশ্য অনেক তাঁর। বেদ থেকেও কিছু কিছু অনুবাদ শুরু করেছিলেন। মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদ করতে হবে। একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও শব্দকোষ প্রণয়ন একান্ত দরকার। প্রয়োজন প্রাক্-ইসলাম যুগের ভারতীয় ইতিহাস লেখা। তবে এ সব তিনি লণ্ডনে বসেও করতে পারবেন।

কিন্তু আইনকোষের শেষ দু'টি খণ্ডই আর লেখা হ'ল না। শেষ পর্যন্ত তা করতে হ'ল কোলব্রুককে। কিছুদিন থেকে পেটের ডানদিকে একটা টিউমার মত হ'য়েছে। প্রথমে গ্রাহ্য করেন নি জোন্স্। কিন্তু শেষে ব্যথা এত বাড়ল যে ডাক্তার ডাকতে হ'ল। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বললেন যকৃৎ ফুলে উঠেছে। ২০শে এপ্রিল শয্যা নিলেন। চেষ্টার ত্রুটি হ'ল না। কিন্তু করা গেল না কিছু। ২৭শে এপ্রিল ভোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন জোন্স। জীবনে বিশ্রাম নেন নি কোন দিন। মৃত্যু নিয়ে এল চিরবিশ্রাম।

জেম্স্ প্রিন্সেপ্

স্যর উইলিয়াম জোন্সের উৎসাহ, উদ্দীপনায় প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার যেন বান ডেকে গেল ইয়োরোপে। ইংরেজ পণ্ডিত ও রাজকর্মচারীদের তো কথা-ই নেই, দেশীয় রাজাদের চাকরি নিয়ে বা ভাগ্যের সন্ধানেও যাঁরা আসতেন বাইরে থেকে, তাঁরাও অনেকে একটা চোখ খোলা রাখতেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের দিকে। ঘুরে বেড়াতেন প্রাচীন নগরীর ধ্বংসস্তূপে, যোগাড় করে আনতেন বহু পুরোনো ভারতীয় মুদ্রা, ভাঙ্গাচোরা ভাস্কর্যের নিদর্শন, অজানা ভাষায় খোদাই-করা পাথরের টুকরো। এশিয়াটিক সোসাইটির ঘর দেখতে দেখতে ভরে উঠল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, পাঠোদ্ধার আর হয় না। কি লেখা আছে ঐ সব মুদ্রায় বা শিলালিপিতে বুঝতে পারেন না কেউই।

উদ্ধার হ'ল ব্রাহ্মী লিপি

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ। জেম্স্ প্রিন্সেপ্ তখন এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক। সাঁচীস্তূপের শিলালিপির কিছু প্রতিলিপি পরীক্ষা করছিলেন তিনি। হঠাৎ খেয়াল হ'ল প্রত্যেকটি লিপিরই শেষ দুটি অক্ষর এক। ভাবলেন, লিপিগুলিতে যদি দানপত্রের কথা লেখা থাকে, তা হ'লে শেষ দু'টি

অক্ষর হবে "দানং", আর তার আগের অক্ষরটি হবে "স্য"। কারণ, যাঁর দান তাঁর কথা বলতে গিয়ে সংস্কৃতে ষষ্ঠী বিভক্তির একবচনে "স্য" ব্যবহার করতেই হবে। এই সূত্র ধরেই এগিয়ে গেলেন তিনি। মিলিয়ে দেখলেন গিরনারের ও দিল্লীর অশোকস্তম্ভের লিপির সঙ্গে। পুরোনো ভারতীয় লেখার অক্ষরের সঙ্গে সাদৃশ্য থেকে চিনে নিলেন আরও কয়েকটি অক্ষর। এইভাবে একে একে প'ড়ে ফেললেন সবগুলি শিলালিপি।

প্রাণ পেল ব্রাহ্মী লিপি। এ যেন মুক্তি হ'ল পাষাণী অহল্যার। কথা ক'য়ে উঠল ইতিহাস। কতকগুলো অনুশাসনে পাঠ পেলেন "দেবানাম্ পিয় পিয়দর্শী"। সিংহলের "মহাবংশ" ঘেঁটে দেখলেন, সম্রাট্ অশোককে দেওয়া হ'ত এই আখ্যা। একটি শিলালিপিতে পেলেন অ্যান্টিয়োকের (অ্যান্টিওক্টাস থিওস, ২৬১ খৃষ্টপূর্ব) উল্লেখ। আত্মহারা হয়ে চিঠি লিখলেন শিবপুরের বিশপ্ কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড মিল্‌স্‌কে: এইমাত্র একটা চমৎকার আবিষ্কার করলাম আমি। অশোকের এক অনুশাসনে আন্টিয়োকস্ দি গ্রেটের নাম পেলাম—একবার নয়, দু'বার নয়,—চার চার বার। অন্যান্য শিলালিপিতে পাওয়া গেল তুরামায়ি (মিশরের দ্বিতীয় টলেমি), অ্যান্টিকিনি (অ্যান্টিগোনাস, ম্যাসিডোনিয়া) এবং আলেকজান্দারের (২য় আলেকজান্দার, এপিসাস্) নাম। সকলেই সমসাময়িক রাজা, বিদেশী হ'লেও মিত্র। তাঁদের কাল অজানা নয়। সুতরাং অশোকের শিলালিপির কালও ঠিক করতে দেরী হ'ল না। ২৫৩ থেকে ২৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ওগুলি খোদাই করা হয়েছে ঠিক করা হ'ল।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত জেম্‌স্ প্রিন্সেপের মূর্তি

অনেকেরই একটা ভুল ধারণা ছিল দেবনাগরীই বুঝি সংস্কৃতের মূল লিপি। আসলে সংস্কৃত ভাষার

সাঁচীস্তূপ, গিরনার ও দিল্লীর অশোকস্তম্ভ থেকে প্রাণ পেল ব্রাহ্মীলিপি

কোনও নিজস্ব লিপি ছিল না। বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় প্রাদেশিক লিপিতে সংস্কৃত লেখা হ'ত। সেই সব প্রাদেশিক লিপি,—বাংলা, মৈথিলী, ওড়িয়া, তামিল, কেরলী, তেলেগু, গুজরাতী, দেবনাগরী ইত্যাদি—সবই এসেছে ব্রাহ্মী লিপি থেকে। পণ্ডিতদের সাহায্যে প্রিন্সেপ্ প্রমাণ করলেন এই তত্ত্ব।

তারপর খরোষ্ঠী

খরোষ্ঠী লিপি পাঠেও আছে প্রিন্সেপের দান। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পাওয়া অশোকের শাহাবাজগড়ী শিলালিপিতে প্রথম পাওয়া যায় এই লেখা। বুলার নাম দেন খরোষ্ঠী। সেমিটিক লিপির মতো ডানদিক্ থেকে বাঁ দিকে লেখা দেখে অনেকে ভেবেছিলেন

ব্রাহ্মীলিপি

সেমিটিক ভাষায় লেখা বুঝি। প্রিন্সেপ্-ই প্রথম বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করলেন, বললেন, ও লিপি ভারতীয় ভাষারই। এক পিঠে গ্রীক ও অন্য পিঠে খরোষ্ঠী লিপিতে খোদাই করা কিছু মুদ্রাতে বক্ট্রিয় রাজাদের নাম থেকে ৯৭টি খরোষ্ঠী অক্ষরের পাঠোদ্ধার

করলেন তিনি। কিন্তু সম্পূর্ণ লিপির পাঠোদ্ধারের আগেই অসুস্থ হ'য়ে ভারত ছাড়তে হ'ল তাঁকে এবং এর অল্প কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হ'ল।

প্রিন্সেপের আরব্ধ কাজ শেষ করলেন লাসেন, নরিস ও কানিংহাম। তাঁরা বাকি খরোষ্ঠী অক্ষরগুলির পাঠোদ্ধার করলেন। দেখা গেল প্রিন্সেপের অনুমানই ঠিক। লেখাগুলো সব ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষায়। দীর্ঘকাল পারস্যের অধীন থাকায় অ্যারেমাইক লিপির প্রচলন হয় সেখানে। কালে সেই অ্যারেমাইক লিপি থেকেই জন্ম নেয় খরোষ্ঠী লিপি। তবে মাত্র কয়েকশ' বছর ঐ লিপি প্রচলিত ছিল ঐ অঞ্চলে।

মাত্র একচল্লিশ বছরের জীবনে

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট জন্ম হয় জেম্‌স্ প্রিন্সেপের। বাবা জন প্রিন্সেপ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি করে অনেক টাকাপয়সা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত পার্লামেণ্টের সদস্য ও লণ্ডনের অল্‌ডারম্যান্‌ও হয়েছিলেন। তাঁর এক বড় ভাই, এইচ্.টি. প্রিন্সেপ্ ছিলেন বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য। জেম্‌স্ চেয়েছিলেন স্থপতি হ'তে। বাদ সাধে তাঁর চোখ। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে চলে আসেন কলকাতায়, টাকশালে চাকরি নিয়ে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২০ বছর। কিছুকাল পরেই কাশীর টাকশালে বদলী করা হয় তাঁকে। দীর্ঘ দশ বছর থাকেন সেখানে। ১৮৩০-এ আবার ফিরে আসেন কলকাতায়। এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যোগ সেই থেকে। এর পর তিনি মেজর হার্বার্ট নামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক সামরিক কর্মচারীর সঙ্গে বার করেন 'গ্লীমিংস্ ইন্ সায়ান্স' নামে একখানি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা। পরের বছর হার্বার্ট দেশে ফিরে গেলে প্রিন্সেপ্ একাই চালাতে থাকেন সেই পত্রিকা। এদিকে কলকাতার টাকশালের ধাতু পরীক্ষক ডঃ উইলসন অক্সফোর্ডে সংস্কৃতের অধ্যাপক হয়ে চলে গেলে প্রিন্সেপ্‌কেই দেওয়া হ'ল সেই পদ। এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকও করা হ'ল তাঁকে। নিজের পত্রিকাটিকে এশিয়াটিক সোসাইটির আওতায় নিয়ে এলেন প্রিন্সেপ্ অনেক চেষ্টা ক'রে। ১৮৩২ সালের ৭ই মার্চ থেকে বার হতে শুরু করল এশিয়াটিক সোসাইটির নিজস্ব পত্রিকা—জার্নাল্ অব্ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল। এরপর তাঁর রচিত নানা বিষয়ে নানা প্রবন্ধ এই পত্রিকায়ই প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৪০ সালের ২২শে এপ্রিল মাত্র ৪১ বছর বয়সে তাঁর জীবন শেষ হয়।

মাত্র দশ বছর যুক্ত ছিলেন প্রিন্সেপ্ এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে, আর তারই মধ্যে পড়ে ফেললেন ব্রাহ্মী লিপি, আংশিক পাঠোদ্ধার করলেন খরোষ্ঠীর। রোজেটা পাথরে খোদিত হাইরোগ্রাফিক লিপির পাঠোদ্ধার করে ফরাসী পণ্ডিত সাঁপোলিয়েঁা মিশরের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর চেয়ে প্রিন্সেপের কৃতিত্ব এবং ভারতীয় ইতিহাস পুনরুদ্ধারে তাঁর অবদান একটুও কম নয়। ব্রাহ্মীলিপিই ভারতের আজ-পর্যন্ত-জানা প্রাচীনতম লিপি। অশোক থেকে আরম্ভ করে কয়েকশ' বছর পর্যন্ত এই লিপিরই ব্যবহার হয়েছে—মুদ্রায়, পাথরের গায়ে। প্রিন্সেপ্ না থাকলে আজও অন্ধকারে হাতড়াতাম আমরা, সম্রাট্ অশোক এবং তাঁর পরের যুগের অনেক তথ্যই থাকত আমাদের অজানা,—যেমন রয়ে গেছে মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতার কাল, সীলমোহরে প্রাপ্ত লিপি পাঠে অক্ষমতায়।

কথাসাহিত্যিকের অতিথি

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ছিল বৈচিত্র্যে ভরা। খেয়ালও ছিল তাঁর নানা রকম। তার মধ্যে একটি হচ্ছে কুকুরের প্রতি অদ্ভুত টান। কুকুর বলতে ধনীর বাড়ির অ্যালসেশিয়ান, গ্রে-হাউণ্ড, স্প্যানিয়েল ইত্যাদি বনেদী বিলিতী কুকুর নয়,—নেহাৎই দেশী কুকুর,—যাদেরকে আমরা বলি নেড়ি কুত্তা, বেওয়ারিশ ভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় যারা।

তাঁর নিজেরও ঐ রকম একটা পোষা কুকুর ছিল। তিনি ওর নাম দিয়েছিলেন ভেলু। বর্মায় যখন তিনি থাকতেন তখন নাকি আট আনা দিয়ে ভেলুকে কিনেছিলেন তিনি।

এই ভেলুকে তিনি রাজার হালে রাখতেন। তার পেছনে প্রচুর খরচ করতেন, তার খাবারদাবারের ব্যবস্থা ছিল বাড়ির ছেলেদেরই মত। লোকে বলত, কুকুর তো নয়, ভেলু শরৎচন্দ্রের পোষ্যপুত্র। বাস্তবিকই তাই। ব্যাপারটা ছিল ঐ রকমই। ভেলুকে ছেড়ে শরৎচন্দ্র একদণ্ডও থাকতে পারতেন না। ভেলুর অসুখবিসুখ হলে তার চিকিৎসা হ'ত মানুষেরই মত।

সেই ভেলু যখন মারা গেল তখন শরৎচন্দ্র কী অসীম বেদনা পেয়েছিলেন তার পরিচয় তিনি নিজের হাতেই লিখে রেখে গেছেন। তাঁর একখানা বাঁধানো খাতা পাওয়া গেছে, তাতে লেখা :

ভেলু। দেহত্যাগের দিন ১০ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৩২। সকাল সাড়ে ছ'টা। সমাধি বেলা সাড়ে এগারোটা। বাজে শিবপুর হাওড়া।

তার নীচে লেখা : আমার রাত্রিদিনের সঙ্গী। আমার পরম স্নেহের বস্তু।

শুধু কি ভেলু? রাস্তার সব কুকুরের ওপরই ছিল তাঁর অসীম মায়া। যখন তখন তাদের ধরে এনে সামনে বসিয়ে খাওয়াতেন, যেমন নেমন্তন্ন-বাড়ির গৃহকর্তারা খাওয়ান। বলতেন, আহা, ওরা বড় দুঃখী, কেউ ওদের দিকে ফিরে চায় না। লোকের যত নজর—যত বাড়াবাড়ি শুধু বিলিতী কুকুরের দিকে!

এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বলি।

একবার শরৎচন্দ্র কিছুদিনের জন্য দেওঘর এসেছেন। উদ্দেশ্য হাওয়া বদল।

রোজ বিকেলে তিনি বেড়াতে বেরোন, ফেরেন সন্ধ্যার পর। একা একাই বেড়ান। সেদিনও ঐ ভাবে বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নির্জন পথে শরৎচন্দ্র একা একা হাঁটছেন। হঠাৎ মনে হ'ল পেছনে কার পায়ের শব্দ। ফিরে দেখেন একটা রাস্তার কুকুর। ভারি রোগা কুকুরটা, পিঠের জায়গায় জায়গায় লোম উঠে গেছে। ভালো করে হাঁটতেও পারে না। দেখে মনে হয় প্রায়ই বোধ হয় খাওয়া জোটে না ওর।

শরৎচন্দ্র কুকুরটার দিকে ফিরে হাসিমুখে বললেন, "কি রে, আমার পেছন পেছন আসছিস যে বড়? যাবি নাকি আমার সঙ্গে? পৌঁছে দিতে পারবি তো আমাকে আমার বাড়িতে?"

কুকুরটা কি বুঝল সেই জানে, লেজ নাড়তে নাড়তে শরৎচন্দ্রের পিছু পিছু হাঁটতে লাগল।

বাড়ির ফটকে এসে শরৎচন্দ্র দেখলেন, কুকুরটা ঠিক তাঁকে অনুসরণ করে ফটক পর্যন্ত এসেছে। চাকর এসে ফটকটা খুলে দিল। শরৎচন্দ্র তাকে বললেন, "ফটকটা বন্ধ করিস না, কুকুরটা যদি ভেতরে আসতে চায় ওকে আসতে দিস। কিছু খাইয়ে দিস ওকে। ও আজ আমার অতিথি।"

রাত্রে শরৎচন্দ্র খোঁজ নিয়ে শুনলেন কুকুরটা চলে গেছে।

কিন্তু পরদিন সকালেই লক্ষ করলেন, চলে যায় নি তো! বোধ হয় কাছেপিঠেই কোথাও ছিল, সকালে উঠেই ফটকের বাইরে এসে বসে আছে।

শরৎচন্দ্র বললেন, "কি রে, কাল তোকে খেয়ে যেতে বলেছিলাম, খাস নি বুঝি? নাকি বুঝতে পারিস নি? আজ কিন্তু খেয়ে যাবি, না খেয়ে যাস নে। বুঝলি?"

কুকুরটা আবার লেজ নাড়তে লাগল।

শরৎচন্দ্র তার খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

সেদিনও সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল কুকুরটা আবার এসে বসে আছে। এবার তার সাহস বোধ হয় একটু বেড়েছে। ফটকের বাইরে নয়, এবার সে বারান্দার নীচে উঠোনে চলে এসেছে।

শরৎচন্দ্র বুঝলেন। বামুন ঠাকুরকে ডেকে বললেন, "এই কুকুরটাকে দেখে রাখ। ওকে আমি অতিথি বলে ডেকে এনেছি। ওকে রোজ পেট ভরে খেতে দিও।"

সেদিনের মত তাঁর হুকুম তামিল করা হ'ল, কিন্তু দু'দিন না যেতেই শরৎচন্দ্র লক্ষ করলেন, কুকুরটা তো আর আসছে না! কি হ'ল তার?

আসল ব্যাপারটা আবিষ্কার করতে কষ্ট হ'ল না। রাত্রে যে খাবার বাড়তি হয় সেটা মালীর বৌ রোজ বাড়ি নিয়ে যায়। তার ভাগ সে কুকুরকে দিয়ে দেবে এমন পাত্রী সে নয়। বামুন ঠাকুরও এ বিষয়ে তার সমর্থক।

শরৎচন্দ্র ধমকে বললেন, "আমার কথা শোন নি কেন? আজ থেকে ওর জন্য একটু বেশি রান্না করবে, তা হলে আর তোমাদের ভাগে কম পড়বে না।" চাকরটাকে ডেকে বললেন, "তুই তো কুকুরটাকে চিনিস, কোথায় থাকে তাও জানিস। ওকে ধরে নিয়ে আসবি। ও এই উঠোনেই থাকবে। এখানেই খাবে। দেখিস যেন আবার নতুন করে বলতে না হয়।"

সেই ব্যবস্থাই হ'ল। রাস্তার সেই অজানা অচেনা নেড়ি কুত্তাটা শরৎচন্দ্রের অতিথি হয়ে তাঁর বাড়ির উঠোনেই স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিল। রোজ বিকেলে শরৎচন্দ্র বেড়াতে বেরোবার সময় তাঁর সঙ্গে ওর দেখা হয়। ও-ও ভ্রমণে তাঁর সঙ্গী হয়, আবার তাঁরই সঙ্গে ফিরে আসে।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। তারপর একদিন শরৎচন্দ্রের হাওয়া বদলের পালা শেষ হ'ল। এইবার দেশে ফিরতে হবে।

যাবার দিন মালপত্র সব গোছানো হচ্ছে, বাইরে গাড়িও দাঁড়িয়ে। কুকুরটা তারই মধ্যে ঘুর ঘুর করছে। বেশ মজা লাগছে তারও, যদিও এ সব কি ব্যাপার তা সে তখনও আঁচ করতে পারে নি।

স্টেশনে এসে গাড়ি থেকে নেমে শরৎচন্দ্র দেখেন অতিথি কুকুরটাও গাড়ির পিছু পিছু স্টেশনে চলে এসেছে।

"কি রে, তুইও এখান এসে গেছিস? কিন্তু আমি যে আজ চলে যাচ্ছি রে!"—ম্লান হেসে শরৎচন্দ্র বললেন।

কুকুরটা হয়তো কিছুই বুঝল না, সে রোজকার মত লেজ নাড়তে লাগল।

শরৎচন্দ্র ট্রেনে গিয়ে উঠলেন। একটু পরেই ঘণ্টা বেজে উঠল; ট্রেন আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্ম্ ছেড়ে এগিয়ে চলল। শরৎচন্দ্র জানালা দিয়ে দেখলেন

বাতাসে ধুলো উড়ছে, সেই ধুলোর আড়ালে দৃষ্টি একটু ঝাপসা ঝাপসা লাগছে। কিন্তু তারই মধ্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কুকুরটা একদৃষ্টে গাড়িটার দিকে চেয়ে আছে করুণ চোখে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হতে লাগল—কুকুরটা আজ ফিরে গিয়ে নির্ঘাৎ দেখবে বাড়ির ফটক বন্ধ রয়েছে, কেউ তাকে আর সেখানে ঢুকতে দেবে না, খেতেও দেবে না আর। রাস্তার কুকুর রাস্তাতেই আবার ফিরে যাবে। তেমনি অনাহারে, অর্দ্ধাহারে বাকি দিনগুলো কাটাতে হবে ওকে। দু'দিনের এই অতিথির জন্য মনটা ভারী হয়ে উঠল তাঁর। বাড়ি ফিরে যাবার কোন আনন্দ—কোন আগ্রহই আর মনের মধ্যে খুঁজে পেলেন না তিনি।

এই "অতিথির" কাহিনী অত্যন্ত নিপুণ ভাবে তাঁর লেখার মধ্যে শুনিয়ে গেছেন তিনি।

কুকুরটা একদৃষ্টে গাড়িটার দিকে চেয়ে আছে করুণ চোখে।

মুখের মত জবাব

লণ্ডন শহরে হাইড্ পার্ক নামে একটা মস্ত বাগান আছে। বিকেলের দিকে বহু লোক ওখানে বেড়াতে যায়—ফাঁকা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে শরীরটা চাঙ্গা করতে।

বহু লোকের ভিড়, কাজেই বক্তৃতা দেবার পক্ষেও জায়গাটি মন্দ নয়। তুমি যদি জনসমক্ষে কিছু প্রচার করতে চাও তা হলে ওখানে একটা ভালো জায়গা দেখে দাঁড়িয়ে যাও। তার পর "লেডিস অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন্" বলে বক্তৃতা শুরু কর। একটি দু'টি করে দেখবে ক্রমে ক্রমে লোক এসে জমতে শুরু করবে এবং একটু পরেই বেশ ভিড় জমে যাবে —বিশেষ করে যদি তোমার বক্তৃতাটা সরস বা সারগর্ভ হয়।

যখনকার কথা বলছি সেটা প্রায় একশ' বছর আগেকার কথা। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখন ওখানে ছাত্র; কলেজে পড়ছেন, ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরবেন। সারাদিনের ক্লান্তির পর তিনিও প্রায়ই যান ঐ হাইড্ পার্কে সন্ধ্যাটা খোলা হাওয়ায় কাটাবার জন্য। ওখানে নানা রকম বক্তৃতা হয়, মাঝে মাঝে তাও শোনেন এবং মজা পান।

একদিন গিয়ে দেখেন পার্কের একটা জায়গায় বেশ ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেছে আর এক পাদরি সাহেব খৃষ্টধর্মের মহিমা বোঝাবার জন্য বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় হচ্ছে—যারা খৃষ্টের শরণ নেয় নি, শয়তান সর্বদাই তাদেরকে অনুসরণ করে ফিরছে। কোথাও তাদের শান্তি নেই।

দি ডেভিল ইজ্ স্টেয়ারিং ইউ অন্ দি ফেস্!

ভিড়ের মধ্যে অনেক বিদেশী লোকও ছিল, এবং তাদের মধ্যে সকলেই সাদা চামড়ার মানুষ নয়,—কালো, তামাটে চামড়ার লোকও কিছু কিছু ছিল। বলা বাহুল্য, তারা অনেকেই যে খৃষ্ট সম্প্রদায়ের লোক নয় তাদের চেহারা দেখলেই তা বোঝা যায়।

বক্তৃতা করতে গিয়ে শয়তানের দৃষ্টির কথা উল্লেখ করতে করতে পাদরি সাহেব এদিক্ ওদিক্ তাকাতে লাগলেন—কোন বিধর্মীকে খুঁজে পান কিনা দেখতে। একটু পরেই তাঁর নজর পড়ল দ্বিজেন্দ্রলালের দিকে। লোকটি যে ভারতীয় এবং সেজন্য নিশ্চয়ই খৃষ্টান নয়, হিন্দু বা ঐ রকম কোন ধর্মাবলম্বী, তা বুঝতে কষ্ট হ'ল না তাঁর। তিনি তীব্রদৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলালের দিকে তাকিয়ে ডান হাতের তর্জনী তাঁর দিকে উঁচিয়ে ধরে বললেন, "এই—এই যে তুমি! দি ডেভিল ইজ্ স্টেয়ারিং ইউ অন্ দি ফেস্।" (আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—শয়তান তোমার মুখের দিকে খরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।)

দ্বিজেন্দ্রলাল মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন, "ইয়েস্, ইউ আর।" (—হ্যাঁ, আপনি তাকিয়ে আছেন বটে।)

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

সাগরপারের টেলিগ্রাফি

খোকনদের বাড়ির ঠাকুর ত্রিনাথ খোকনের বাবার কাছে এসে বলল, 'বাবু, অনেকদিন বাড়ির খবর পাচ্ছি না। ছেলেটারও জ্বর দেখে এসেছিলাম। তাই একটা তার করব। আপনি যদি একটু লিখে দেন। লিখবেন, সকলে কেমন আছে তা যেন পত্র-পাঠ জানায়। চিন্তায় ঘুম নেই। আরো লিখে দেবেন যে আমি এখানে ভালোই আছি।'

এভাবে অনেক কথাই বলে চলল সে। সেই সঙ্গে একটা ছাপা কাগজ এগিয়ে দিল। টেলিগ্রাফ অফিসে টেলিগ্রাম পাঠানোর জন্যে এই ফর্ম্ পাওয়া যায়। খোকনের বাবা মৃদু হেসে ফর্মে গোটা গোটা অক্ষরে ত্রিনাথের বাড়ির ঠিকানা লিখলেন। তার তলায় শুধু আটটা শব্দ লিখলেন—"NO NEWS ANXIOUS REPLY SOON SELF WELL=TRINATH", কারণ তিনি জানেন, এ তো আর চিঠি লেখা নয়! প্রত্যেক শব্দ গুণে গুণে তার জন্যে পয়সা নেওয়া হয় টেলিগ্রামে।

যোগাযোগের মাধ্যম ও তার ক্রমবিকাশ

ত্রিনাথ টেলিগ্রাম করাকে 'তার করা' বলেছিল। সে তেমন লেখাপড়া জানে না, তবে এটুকু জানে যে টেলিগ্রাম রেল লাইনের পাশ-দিয়ে-চলা ঐ তারের মধ্যে দিয়েই যায় 'ইলেকটিরিক্'-এর সঙ্গে। হরিসাধন বাবু আবার একজন শিক্ষিত লোক। তাঁর ছেলে থাকে আমেরিকায়। তিনি বলেন, 'ছেলেকে কেব্‌ল্ করলাম।' কারণ তিনি জানেন, সাগরপারের দেশে টেলিগ্রাম তো যায় সমুদ্রের তলায় পাতা মোটা তার বা কেব্‌ল্-এর সাহায্যে। অবশ্য তিনি এটা জানতেন না যে ত্রিনাথ ঠিক কথা বললেও তিনি একটু ভুল বলেছেন। আগেকার দিনের মত এখন আর আমেরিকায় টেলিগ্রাম কেব্‌ল্-এর মধ্যে দিয়ে যায় না। পরে বলছি এ ব্যাপারে।

তবে এটা ঠিক যে এক সময়ে সাগরপারের দেশের সঙ্গে যোগাযোগ কেবলমাত্র কেব্‌ল্-এর সাহায্যেই হ'ত। সেটা আজ থেকে একশ' বছরেরও আগের কথা। ১৮৭০ সালে প্রথম আমাদের দেশের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ হ'ল কেব্‌ল্ মারফৎ। তোমরা রাস্তায় টেলিফোনের কেব্‌ল্ বসানো দেখেছ নিশ্চয়। সমুদ্রের তলার কেব্‌ল্ও ঠিক ঐ রকম। একেবারে সমুদ্রের তলায় মাটির ওপর দিয়ে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রাখে বা রাখত এই কেব্‌ল্।

ভারতের বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে এই কেব্‌ল্‌ যোগাযোগ ছিল। কলকাতা থেকে অবশ্য ছিল না—কারণ নদীর তলা দিয়ে অতখানি দূর পর্যন্ত কেব্‌ল্‌ নিয়ে যাওয়ার বোধ হয় অসুবিধে ছিল।

সমুদ্রের তলায় মাটির ওপর দিয়ে কেব্‌ল্‌ চলে গিয়েছে হাজার হাজার কিলোমিটার।

এই কেব্‌ল্‌-এর কয়েকটা অসুবিধের দিক্‌ আছে। প্রথমত, এই কেব্‌ল্‌ বসানো আর তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা ছ'টোই কী বিরাট খরচের ব্যাপার সেটা তো আন্দাজ করতেই পার। সমুদ্রের লোনা জল আর প্রচণ্ড চাপে ওগুলোর আয়ু বেশিদিন থাকে না। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধটুদ্ধ লাগলে অনেক সময় কেব্‌ল্‌ নষ্ট করেও দেওয়া হয়। যেমন পঞ্চাশের দশকে ইংল্যাণ্ড আর মিশরের মধ্যে গোলমাল বাধলে সুয়েজ-খালের মধ্যের কেব্‌ল্‌টা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জাহাজ থেকে সমুদ্রের তলায় কেব্‌ল্‌ পাতার (বা সারানোর) কাজ হচ্ছে।

কেব্‌ল্‌-এর জায়গায় ওয়ারলেস

এইসব সমস্যার সমাধান হ'ল বেতার বা ওয়ারলেস-এর আবিষ্কারে। সাবমেরিন অর্থাৎ সমুদ্রের তলার কেব্‌ল্‌-এর ছ'টো সমস্যাই এতে মিটে গেল। এতে শুধু দরকার একটা প্রেরক-যন্ত্র (ট্রান্সমিটার) আর একটা গ্রাহক-যন্ত্র (রিসিভার)। মাঝখানে হাজার হাজার কিলোমিটারের মধ্যে কোনো তারের বা কেব্‌ল্‌-এর যোগাযোগ দরকার নেই। রক্ষণাবেক্ষণের খরচও কত কম!

তোমরা হয়তো একটা প্রশ্ন করতে মুখিয়ে আছ। বলবে, গৌহাটি বা পাটনা থেকেই কলকাতার আকাশবাণী ভালো শোনা যায় না, তো লণ্ডন পর্যন্ত এই

বেতার-সংকেত কি ভাবে পৌঁছবে? তবে শোনো, বলি। রাস্তার একটা লাইটপোস্টের আলো কতদূরই বা আলোকিত করতে পারে? কিন্তু ভালো টর্চের আলো জ্বালিয়ে সামনে অনেক দূরের জিনিসও কি দেখতে পাও না? এর কারণ, রাস্তার আলো ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু টর্চের আলো কেন্দ্রীভূত হয়ে একদিকে সোজাসুজি যাচ্ছে। আকাশবাণীর বেতার-তরঙ্গ আর লণ্ডনে খবর যাওয়ার বেতার-তরঙ্গের মধ্যেও পার্থক্য এইটুকু।

আরও একটা প্রশ্ন এসে যায়। পৃথিবী তো গোল, কাজেই কলকাতা থেকে সোজাসুজি বেতার-তরঙ্গের রশ্মি পাঠালে সেটা তো লণ্ডনে যাওয়ার কথা নয়। আকাশের মেঘ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে তো!

এ ব্যাপারে আমাদের কথা ভেবেই বোধ হয় প্রকৃতিদেবী একটা ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। পৃথিবীর বায়ুস্তরের ওপরে আর একটি স্তর ঘিরে আছে, তার নাম আয়ন-স্তর (আয়নোস্ফিয়ার)। আয়ন কি সেটা তোমরা অনেকে হয়তো জান। যারা জান না, তারা উঁচু ক্লাসে বিজ্ঞান পড়লেই জেনে নেবে। এই আয়ন-স্তরের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটা বেতার-তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে—ঠিক যেমন আয়না আলোক-তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে, সেই একই নিয়মে। অবশ্য আয়না থেকে আয়ন নামটা হয় নি।
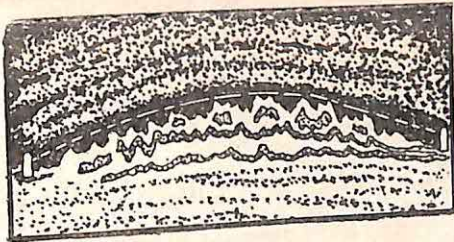
পৃথিবীর ওপরে আয়ন-স্তর

যাই হোক, এখন আমরা যদি কলকাতা থেকে এমন কোণাকুণিভাবে বেতার-তরঙ্গ পাঠাই যাতে সেটা আয়ন-স্তরে প্রতিফলিত হয়ে ঠিক লণ্ডনের ওপর পড়বে, তা হলেই লণ্ডন তার গ্রাহকযন্ত্রে আমাদের খবর পেয়ে যাবে। আবার লণ্ডনও ঠিক একই ভাবে কলকাতায় খবর পাঠাবে। (নীচের ছবিটা দেখ)।
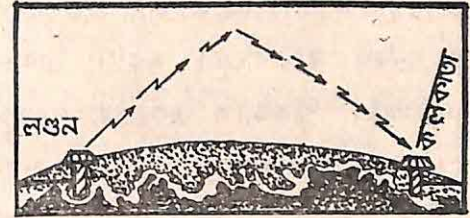
আয়নোস্ফিয়ারের সাহায্যে হাই-ফ্রিকোয়েন্সি (এইচ. এফ.) বা উচ্চ কম্পনসংখ্যার বেতার যোগাযোগ
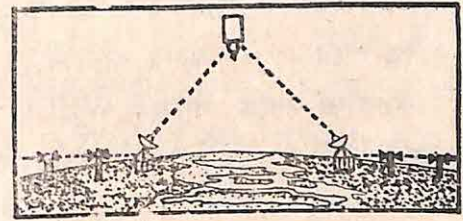
কৃত্রিম উপগ্রহের মারফৎ যোগাযোগ

আমেরিকা এখান থেকে পৃথিবীর উল্টোদিকে থাকাতে একবার প্রতিফলনে ওখানে বেতার-তরঙ্গ পৌঁছবে না। মাঝখানে বলের মতন লাফ খাইয়ে, অর্থাৎ রিলে করে আবার একবার আয়ন-স্তরে পাঠাতে হবে। রিলের কাজ পূর্বদিকে ম্যানিলা আর পশ্চিমদিকে জিব্রাল্টারের কাছে ট্যানজিয়ার্স করত কিছুদিন আগেও।

এইভাবেই বেতার যোগাযোগের শুরু হ'ল এক-দেশ থেকে আর এক দেশের মধ্যে। আমাদের দেশেও রেডিওর প্রতিষ্ঠা আর বিদেশের সঙ্গে বেতার যোগা-যোগের শুরু হ'ল একই বছরে, ১৯২৭ সালে। অবশ্য তার সঙ্গে কেব্‌ল্‌-এর কাজও চলছিল। কেব্‌ল্‌ এখনও ব্যবহার হচ্ছে কয়েকটি দেশের মধ্যে, আর হবেও।

আয়নোস্ফিয়ারের অসুবিধা

এদিকে মানুষের হ'ল 'হুঁকোমুখো হ্যাংলার' মতন স্বভাব। কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। অবশ্য এই স্বভাব

পুরোপুরি কৃষিপ্রধান দেশ থেকে ক্রমে হাঙ্গেরী এখন একটি শিল্পসমৃদ্ধ দেশ হয়ে উঠেছে ও ভারী যন্ত্রপাতি, কলকব্জা তৈরি করে বিদেশে রপ্তানী করছে। চাষআবাদ যা চলছে তা সবই সমবায়িক ভিত্তিতে। হাঙ্গেরীর আঙ্গুর বিখ্যাত, এখনও প্রায় ১৫ লক্ষ বিঘা জমিতে আঙ্গুরের চাষ হয় সেখানে।

বেলজিয়াম আর জার্মেনীর মধ্যে রয়েছে নেদারল্যাণ্ডস্ রাজ্য—হল্যাণ্ড, অ্যান্টিলেস, সুরিনাম প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য নিয়ে এই নাম। গোটা দেশটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড়পরতা মাত্র ৩৭ ফুট উঁচু। ওর বহু জায়গা—বিশেষ করে হল্যাণ্ডের বিস্তৃত অংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক নীচু। এজন্য দেয়াল বেঁধে সমুদ্রকে আটকে রেখে দেশটিকে রক্ষা করতে হয়েছে। এই দেয়ালের নাম ডাইক, আশ্চর্য কৌশলে তৈরি। এই ডাইক রয়েছে দেশটার ১৫০০ মাইল যুড়ে। হল্যাণ্ডের রাজধানী আমস্টারডাম। হেগ্ একটি বড় শহর।

কোপেনহেগেন ডেনমার্কের রাজধানী। এখানেই বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক হান্স অ্যাণ্ডারসন তাঁর অমর শিশুসাহিত্য রচনা করে আজও গোটা পৃথিবীর ছোটদের মন জয় করে রেখেছেন।

হল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক দুগ্ধজাত শিল্পে বিখ্যাত, এবং সেগুলি নানা দেশে রপ্তানীও করে।

পোল্যাণ্ডকে বলা যায় ইয়োরোপের সপ্তম বৃহৎ দেশ। আয়তনে এটি ৩১২,৬৭৭ কিলো বর্গমিটার। জনসংখ্যা সাড়ে তিন কোটির মত। রাজধানীর নাম ওয়ারশ—পোলিশ ভাষায় যার উচ্চারণ ভারশৌ। এখানকার লোকেরা প্রায় সকলেই খৃষ্টান এবং সকলেই পোলিশ ভাষাভাষী।

পোল্যাণ্ডের সত্যিকার ইতিহাস পাওয়া যায় ১ম খৃষ্টাব্দ থেকে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ড খুব শক্তিশালী রাষ্ট্র হয়ে ওঠে কিন্তু ১৮ শতাব্দীতে দেশটি রাশিয়া, প্রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়া ভাগ করে নেয়। তার পর চলতে থাকে রাশিয়ার
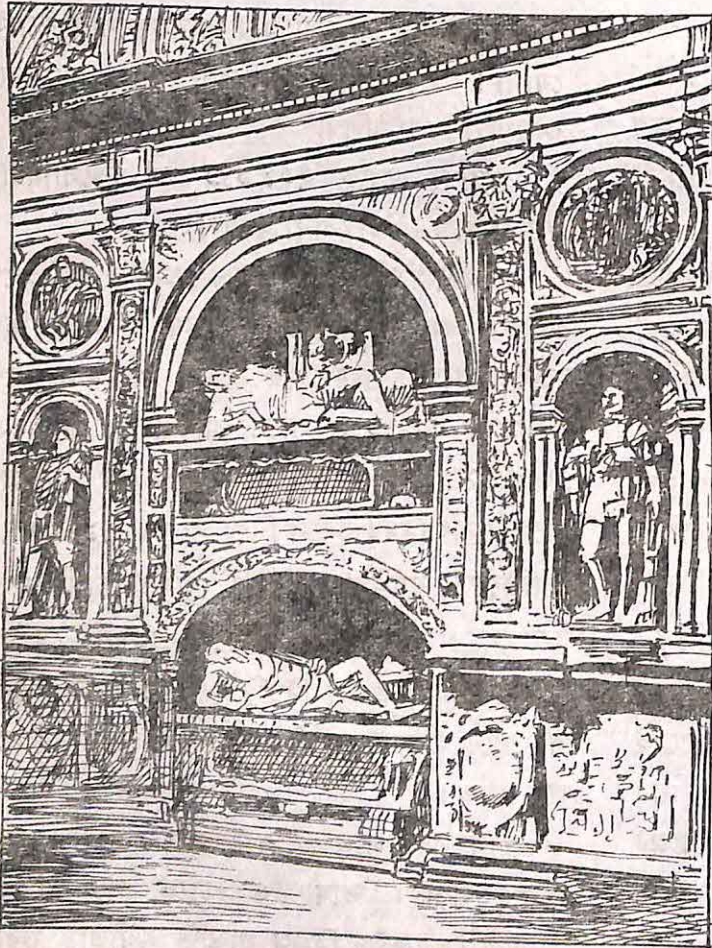
ক্র্যাকাও—ভাভেল ক্যাথেড্রালে পোলিশ রাজাদের সমাধিমন্দির

জারের প্রচণ্ড অত্যাচার। স্বাধীনতার জন্য পোলিশরা চেষ্টা চালালেও ১৯১৮র আগে অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগে এরা স্বাধীনতার মুখ দেখতে পায় নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভালো করে জেগে উঠবার আগেই ২য় মহাযুদ্ধের গোড়ায় হিটলারের নাৎসী সৈন্যেরা অতর্কিত আক্রমণে পোল্যাণ্ড দখল করে নেয়। রাশিয়াও যোগ দেয় তাদের সঙ্গে এবং দেশটা ওরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। অবশ্য তারপরই হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলে ঘুঁটি যায় ঘুরে। তবে সেই থেকে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলে পোল্যাণ্ডের দুর্ভোগ। যুদ্ধের শেষে পোল্যাণ্ড আবার সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে উঠেছে, তবে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব এখনও কিছুটা রয়ে গেছে।

দেশটা কৃষিপ্রধান বলা যেতে পারে। শতকরা ৪৫ জন লোকই চাষবাস করে দিন কাটায়। যব, গম, আলু, বিট, তামাক প্রভৃতি নানা রকম চাষ হয় এখানে। তা ছাড়া এখানে ছড়িয়ে আছে নানা রকম খনিজ সম্পদ্—কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং নানা-রকম ধাতুর আকর। এখন সরকারী প্রচেষ্টায় তাই নানারকম শিল্প, কলকারখানা চলছে, —দেশের শিল্প-সম্পদ্ও বেড়ে চলেছে। ভারী ভারী যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন, ট্র্যাক্টর্ সবই তৈরি হচ্ছে।

বেড়াবার পক্ষেও ভারি সুন্দর দেশ এই পোল্যাণ্ড। এর একদিকে রয়েছে বালটিক সাগর, একপাশে সোভিয়েত রাশিয়া, অন্যদিকে পূর্ব জার্মেনী ও চেকোস্লোভাকিয়া। বৈচিত্র্যে ভরা অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য, দফায় দফায় ঋতু পরিবর্তন ট্যুরিস্টদের কাছে একে লোভনীয় করে রেখেছে। তা ছাড়া আছে কৌতূহলোদ্দীপক নানা ঐতিহাসিক স্থান—যার ভিতর দিয়ে দেশের ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি সহজেই চোখে পড়ে। যেমন ক্র্যাকাও ভাভেল ক্যাথেড্রালে পোলিশ রাজাদের সমাধিমন্দির, রাজধানী ওয়ারশর লাজিয়েনকি উদ্যানের রাজপ্রাসাদ, আরও কত কি!

ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা দেশের ছাত্রেরা এসে পড়ে। ৪।৫টি ভারতীয় ভাষাও ওখানে পড়ানো হয়—সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ইত্যাদি। পোলিশ সাহিত্যও খুব উন্নত। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পোলিশ সাহিত্যিকেরও অভাব নেই। আর বিজ্ঞান-জগতের বিখ্যাত মাদাম কুরীও তো পোল্যাণ্ডেরই মেয়ে। তাঁর আগে নাম ছিল মানিয়া (মারিয়া) স্ক্লোডাভোস্কা। পরে ফরাসী বিজ্ঞানী পিয়েরি কুরীকে বিয়ে করার পরই তাঁর নতুন নাম হয় মাদাম কুরী। মাদাম কুরী শুধু প্রথম মহিলা নোবেল পুরস্কার বিজয়িনীই ন'ন, এ পুরস্কার পেয়েছেন তিনি দু' দু' বার। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপারনিকাস্ও পোল্যাণ্ডেই জন্মেছিলেন।
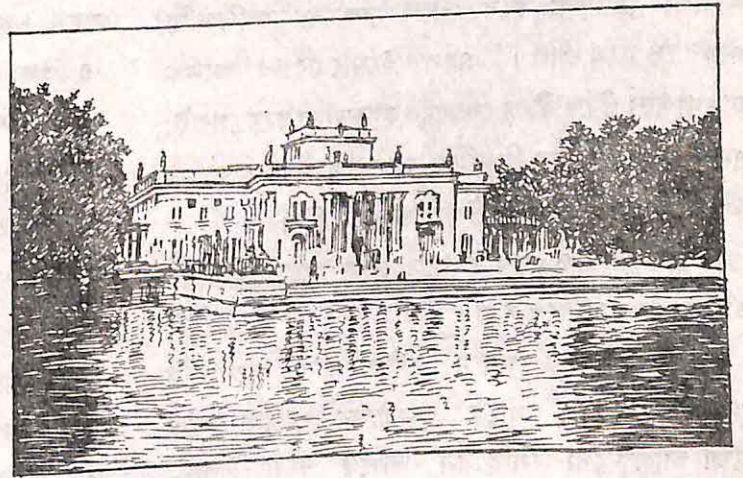
উদ্যান-রাজপ্রাসাদ, ওয়ারশ, পোল্যাণ্ড

বিজ্ঞানীদের পক্ষে মোটেই নিন্দের নয়। এর জন্যেই তো বিজ্ঞানের এত উন্নতি।

মানুষ দেখল, এইভাবে বেতার যোগাযোগ একেবারে নিখুঁত নয়। সূর্যের আলোর সঙ্গে আয়নোস্ফিয়ারের ঘনত্বও কমে-বাড়ে। সকালে একরকম, দুপুরে একরকম। শীতকালে একরকম, গরমকালে একরকম। তোমরা জান নিশ্চয় যে বেতার-তরঙ্গ, আলোক-তরঙ্গ ইত্যাদি সব তরঙ্গেরই বিভিন্ন রকমের দৈর্ঘ্য আছে। এই ঘনত্ব কমা-বাড়ার ফলে কতকগুলো দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গকে আয়ন-স্তর ঠিকমত প্রতিফলিত করতে পারে না,—আয়নার পারা উঠে গেলে যা হয়। কলকাতা থেকে পাঠানো WELL তখন হয়তো লণ্ডনে HELL হয়ে গিয়ে পৌঁছয়। কিংবা মঙ্গলগ্রহের মানুষের মত কোন প্রাণীর (যদিও সেখানে মানুষ তো নেই-ই, কোন প্রাণীও আছে বলে জানা যায় নি) ভাষার মতন আরো দুর্বোধ্য কিছু সংকেত হয়ে। চৌম্বক ঝড়, সূর্যকলঙ্ক—এসব হলে তো আরো কেলেঙ্কারি ব্যাপার! বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থাটাই বিপর্যস্ত হয়ে যাবে।

তা ছাড়া, এই যে লণ্ডনে খবর পাঠানোর প্রেরকযন্ত্র, তা দিয়ে রেঙ্গুনে খবর পাঠানো যাবে না। কারণ রেঙ্গুন হ'ল লণ্ডনের উল্টোদিকে—পূর্বে। তার মানে হ'ল, রেঙ্গুনের জন্যে আর একজোড়া প্রেরকযন্ত্র আর গ্রাহকযন্ত্রের ব্যবস্থা কর।

প্রথম অসুবিধে দূর করবার জন্য বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করলেন একটা ব্যবস্থা নিতে। তাতে কলকাতায় পাঠানো W অক্ষরটা আয়ন-স্তরের কারসাজিতে অন্য কিছু হয়ে যেতে দেখলেই লণ্ডনের প্রেরকযন্ত্র নিজের খবর পাঠানো বন্ধ রেখে একটা সংকেত পাঠিয়ে কলকাতার প্রেরকযন্ত্রকে থামিয়ে দেবে। যতক্ষণ না আয়ন-স্তর দুষ্টুমি ছাড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই সংকেত পাঠিয়েই যাবে। আর তার সঙ্গে চলবে কলকাতার আর লণ্ডনের প্রেরকযন্ত্রের (আর তার সঙ্গে গ্রাহকযন্ত্রেরও) 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা। কিন্তু এতে তো আর সমস্যার সমাধান হ'ল না। কখন আয়ন-স্তর বশে আসবে, কে জানে? ততক্ষণ যোগাযোগ বন্ধ। সেটা এক সেকেণ্ডও হতে পারে, আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টাও চলতে পারে।

কাজে এল কৃত্রিম উপগ্রহ

তখন মানুষ দেখল, আয়ন-স্তরের ওপর নির্ভর করাটা ঠিক হচ্ছে না। নাকের বদলে নরুণ পেলেও দু'টোর কাজ এক নয়। নাক নখ কাটতে পারে না, নরুণ পারে না গন্ধ শুঁকতে। মানুষ যেটা তৈরি করল, সেটা কিন্তু আয়ন-স্তরের মতনই কাজ করবে। অথচ এর প্রতিফলন ক্ষমতাও সব সময়ে সব ঋতুতে এক থাকবে। এটাই হ'ল কৃত্রিম উপগ্রহ।

আরো বড় জিনিস হ'ল, এই ব্যবস্থায় আলাদা আলাদা দেশের জন্যে আলাদা আলাদা প্রেরকযন্ত্র আর গ্রাহকযন্ত্র লাগবে না। একই জিনিস—যার নাম অ্যান্‌টেনা—সেটাই সব দেশের জন্যে প্রেরকযন্ত্র ও গ্রাহকযন্ত্রের কাজ করবে। আর সেই অ্যান্‌টেনা দেশ ও বিদেশের মধ্যে হাজার হাজার টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও-ফোটো ইত্যাদি আমদানি-রপ্তানির কাজ করবে। শুনেছি, হাঁস জল-মেশানো দুধ থেকে দুধটুকু শুধু খেয়ে নেয়। হাঁসের ঠোঁটে নাকি অ্যাসিড জাতীয় কিছু আছে যা দুধটাকে ছানা করে দেয়। বিজ্ঞানীরাও সে-রকম একটা ব্যবস্থা করলেন যাতে অ্যান্‌টেনা অন্য দেশের জন্যে পাঠানো খবরাখবর ছেড়ে দিয়ে নিজের দেশেরটাই শুধু বেছে নেয়। এই অ্যান্‌টেনাটা দেখতে কেমন? তোমাদের ছাদের টেলিভিশনের অ্যান্‌টেনার মতন নয়। তোমরা, যারা কলকাতায় টেলিফোন-ভবন দেখেছ, তারা

টেলিফোন-ভবনের মাথায় খাড়া করা বিরাট বাটির মতন একটা জিনিস দেখেছ। এই অ্যান্‌টেনাও ঠিক সেই রকম, তবে প্রকাণ্ড। তার হাঁড়িমুখ, থুড়ি, বাটি-মুখটাকে ওপর দিকে তুলে সব সময়ে সে কৃত্রিম উপগ্রহের দিকে চেয়ে থাকে সূর্যমুখী ফুলের মতন।

এখন, টেলি-যোগাযোগের জন্যে এই কৃত্রিম উপগ্রহটাই বা কেমন? আসলে এটা একটা যন্ত্র যা পৃথিবীর নানা জায়গার অ্যান্‌টেনা থেকে পাওয়া বেতার-তরঙ্গ নিয়ে সেগুলোকে জোরদার করে পৃথিবীর দিকেই ছড়িয়ে দিয়ে বলে, 'এবার যার যার জিনিস নিজে বেছে নাও।' ভূপৃষ্ঠের ছত্রিশ হাজার কিলো-মিটার ওপরে তিনটে একই রকম উপগ্রহ পাঠানো হয়েছে। পৃথিবীর কোমর বিষুবরেখা বরাবর উপগ্রহ তিনটে ঘুরে চলেছে পৃথিবীর সঙ্গে একই কৌণিক গতিতে, যাতে পৃথিবী থেকে দেখে মনে হবে ওরা আকাশে একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে, ঠিক দু'টো গাড়ি একই দিকে একই গতিতে চললে যেমন এক
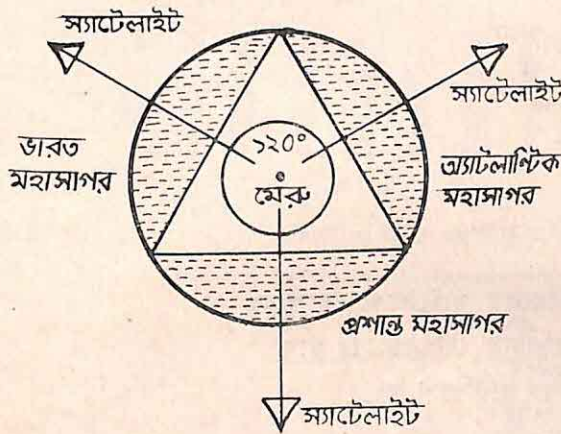
এইভাবে পৃথিবীকে ঘিরে স্থাপিত হয়েছে তিনটি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ উপগ্রহ।

গাড়ি থেকে মনে হয় পাশের গাড়িটি বুঝি চলছে না। এবার, কি ভাবে এই তিনটে উপগ্রহ আছে জান? একটা ভারত মহাসাগরের ওপরে, একটা প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে, আর একটা আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে। এরা এমনভাবে সমদূরত্বে রয়েছে যে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে কাল্পনিক রেখা টেনে কোণ আঁকলে পাশাপাশি দু'টো উপগ্রহের মধ্যে কোণ হবে ১২০° ডিগ্রি। এই তিনটে উপগ্রহকে বলে ইনটেল-স্যাট (INTELSAT)—যার পুরো নাম হ'ল ইনটারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন স্যাটেলাইট। সূর্যের আলোতেই এরা শক্তি সংগ্রহ করে।

আমাদের দেশে আপাতত বোম্বাই আর দিল্লী থেকে কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু আছে। বোম্বাইতেই প্রথম হয়েছে—১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। কাজেই কলকাতা থেকে লণ্ডনে পাঠানো টেলিগ্রাম বা টেলিফোন যাই হোক প্রথমে তারের সাহায্যে অথবা অন্য কোন উপায়ে (বেতার, মাইক্রোওয়েভ বা আমাদের দেশীয় উপগ্রহের সাহায্যে) বোম্বাই বা দিল্লীতে যাবে, তারপর সেখান থেকে ইনটেলস্যাটের সাহায্যে লণ্ডন। কাজটা অবশ্য হবে সরাসরি। কলকাতাতে ভূমি-স্টেশন না হওয়া পর্যন্ত এটাই হবে। কাজেই হরিসাধন বাবুর সঙ্গে যদি দেখা হয়, তাঁকে বলতে পার যে 'কেব্‌ল্' করা না বলে 'উপগ্রহ' করা কথাটা বললেই যুক্তিযুক্ত হবে। ইংরেজি করে বলতে চাইলে বলতে পার স্যাটেলাইট করা। তবে থাক্, এসব কথা বলার দরকার নেই। বড়দের কখনও ওভাবে বলতে নেই। তা ছাড়া তিনি হয়তো এ ব্যাপারে আরো বেশি খবরাখবর রাখেন।

ভূমি-স্টেশন কাকে বলে

'ভূমি-স্টেশন'-এর কথা বললাম, কিন্তু ওটা কী সেটাই বলা হয় নি। তোমরা হয়তো জান যে

আকাশবাণীর প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্র অর্থাৎ ট্রান্সমিটার আর রিসিভার স্টেশন ইডেন গার্ডেন্‌স্‌-এর অফিস থেকে অনেক দূরে থাকে। বিদেশে পাঠানো বেতার যোগাযোগের ট্র্যান্সমিটার ও রিসিভারও শহরের আরো বাইরে থাকে। যেমন, কলকাতার এইসব ট্র্যান্সমিটার রিসিভার আছে কাঁচড়াপাড়ার কাছে। উপগ্রহ যোগাযোগের অ্যান্‌টেনা আরো অনেক দূরে রাখতে হয়। যেখানে এই অ্যানটেনা থাকে সেটাকেই স্টেশনের সঙ্গে। কি ভাবে যোগাযোগ করা হচ্ছে নীচের ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

টেলিগ্রাফের সংকেত, পদ্ধতি ও তার ক্রমবিকাশ

এতক্ষণ সাগরপারের টেলিগ্রাফির কথা বলেছি, কিন্তু তার আগে টেলিগ্রাফ-এর সংকেত কি করে পাঠানো হয় এবং তার পদ্ধতি ও ক্রমবিকাশের
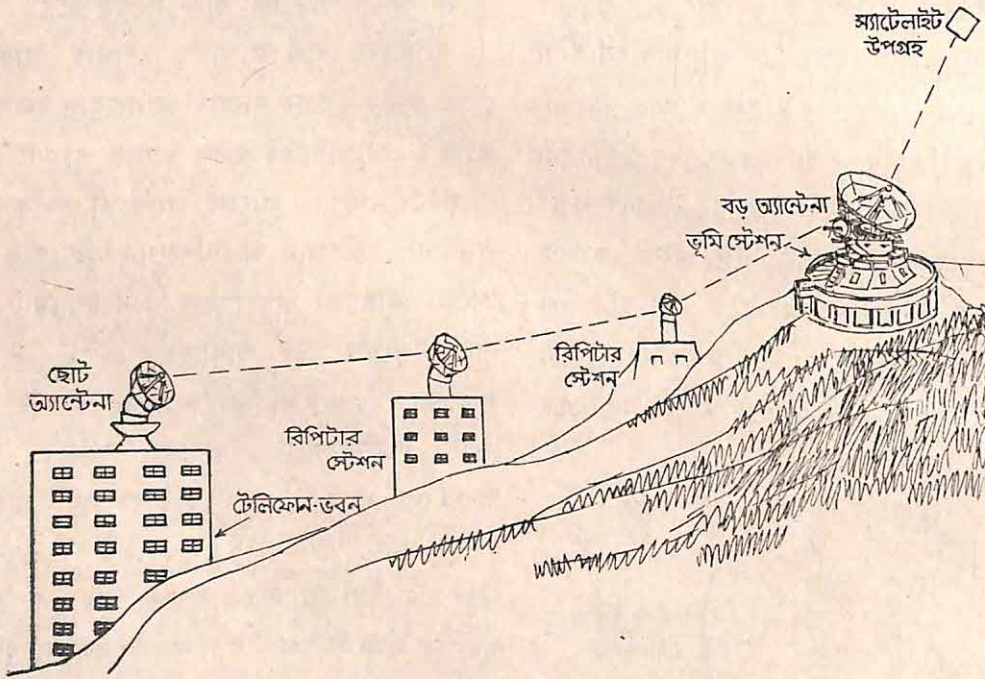
শহরের টেলিযোগাযোগ অফিস থেকে বার্তার সঙ্কেত মাইক্রোওয়েভে দূরের ভূমি-স্টেশনে পাঠানো হচ্ছে। মাঝে রিপিটার স্টেশনগুলোর কাজ সংকেতকে জোরদার করে পুনঃপ্রচারিত বা 'রিলে' করা।

বলা হয় ভূমি-স্টেশন (আর্থ্‌ স্টেশন)। বোম্বাইয়ের ভূমি-স্টেশন পুনের কাছে আরভিতে, দিল্লীর ভূমি-স্টেশন দেরাদুনে। শহরের অফিস থেকে মাইক্রোওয়েভ দিয়ে যোগাযোগ করা হয় ভূমি- কথা বলি। যদিও এটাই আগে বললে ভালো হ'ত।

"অপু দরজার কাছে গিয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিল। একটা ছোট খড়মের বউলের মত জিনিস

টিপিয়া স্টেশনের বাবু খট্-খট্ শব্দ করিতেছে। প্ল্যাটফর্ম হইতে সরিতে তাহার মন সরিতেছিল না। কিন্তু তাহার বাবা ডাকিতে আসিল। খড়মের বউলের মত জিনিসটাই নাকি টেলিগ্রাফের কল, তাহার বাবা বলিল।”
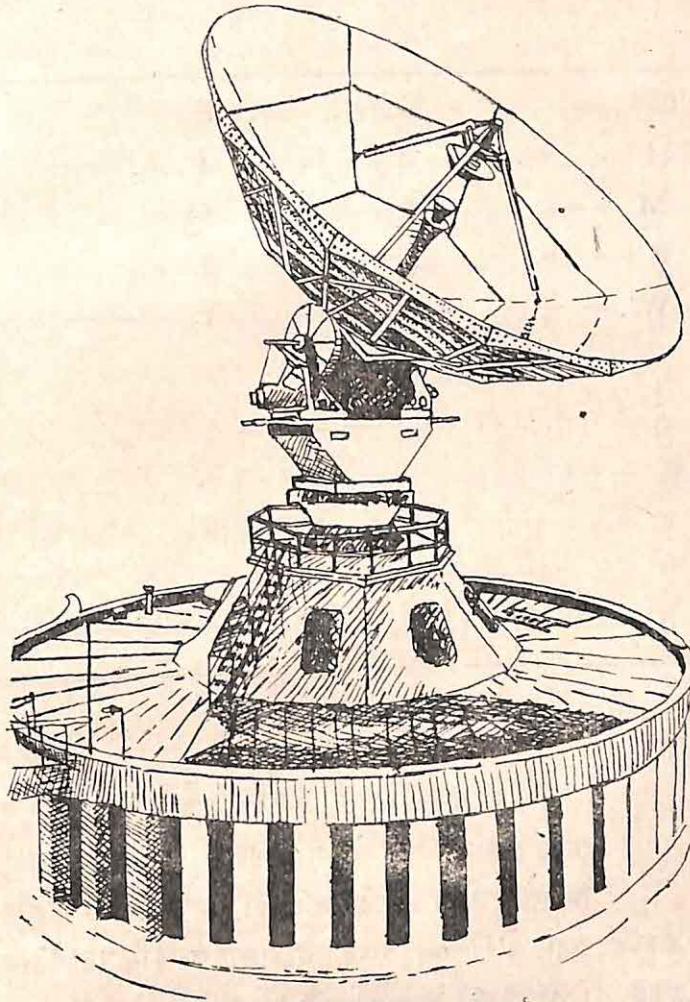
উপগ্রহ যোগাযোগের অ্যান্টেনা

'অপুর ছেলেবেলা'য় অপু যে জিনিসটা দেখেছিল সেই টরে-টক্কার কল তোমরা এখনও অনেক জায়গায় দেখতে পাবে। স্যামুয়েল মর্স্ নামে এক আমেরিকান ভদ্র-লোক কতকগুলো ডট্ আর ড্যাস্ সাজিয়ে A থেকে Z অক্ষর, 1 থেকে 0 অঙ্ক আর ফুল্‌স্টপ, কমা, কোলোন ইত্যাদি অনেক চিহ্ন তৈরি করেছিলেন। যেমন, একটা ডট্ আর একটা ড্যাস্ দিয়ে A অক্ষর। 'খড়মের বউল'-এর ওপর, প্রথমে টুক্ করে ঠুকলেই ডট্, একটু বেশি সময় (ডট্-এর দেড়গুণ সময়) টিপলেই ড্যাস্। হয়ে গেল —না, 'হ-য-ব-র-ল'-র সেই চশমা নয়—A অক্ষর। তোমরা রেডিওতেও মাঝে 'পিঁ—পিপ্ পিপ্' এরকম শব্দ শোনো না? পিঁ হচ্ছে ড্যাস্

স্যায়মুলে মর্স্ (১৭৯১-১৮৭২)

আর পিপ্ হচ্ছে ডট্। অর্থাৎ পিঁ-পিপ্ পিপ্ হল D অক্ষর। মর্স্-সহেব বানিয়েছিলেন বলে এই যাবে। পরে একজন সংকেতের ছবি দেখে দেখে লিখে নেবে বা টাইপ্ করে ফেলবে।

A. —	B — ···	C—.—.	D - ..	E .
F . . — .	G — — .	H ····	I..	J . — — —
K — . —	L . —..	M — —	N —.	O — — —
P . — — .	Q — —.—	R .—.	S···	T —
U ..—	V ··· —	W .— —	X — . . —	Y —.— —
Z — — . .				

1 . — — — —	6 — ····	= —····—
2 .. — — —	7 — — ···	? .. — — ..
3 ···· — —	8 — — — ..	ইত্যাদি।
4 ····—	9 — — — — .	
5 . . . — . .	0 — — — — —	

মর্স্-কোড বা মর্স্-সংকেত

সংকেতের নাম মর্স্-সংকেত (মর্স্ কোড)। ওপরে মর্স্-কোডের কিছুটা লিখে দেওয়া হ'ল।

এই টরেটক্কার সংকেত একজন যখন পাঠাচ্ছে, অন্য দিকে আর একজন তার যন্ত্রেও সেই একই আওয়াজ পেয়ে কানে শুনে লিখে যাচ্ছে। টেলিগ্রাফ যন্ত্রের ব্যাপারটা তোমরা, যারা বিদ্যুৎ ও চুম্বক-বিষয়ে পড়েছ, তারা ভালোভাবেই জান। এরপর কানে শোনার ওপর নির্ভর না করে একটা যন্ত্র বসানো হ'ল। লম্বা একটা কাগজের ফিতে চলতে থাকবে টেপ-রেকর্ডার বা সিনেমার ফিল্মের মতন। টেলিগ্রাফ সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে পেনের নিবের মতন একটা জিনিস নড়ে নড়ে সেই ফিতের ওপর সংকেত লিখে

কিন্তু যতই হোক, একজন মানুষ আর আঙুল নেড়ে কত তাড়াতাড়িই বা টরেটক্কা পাঠাতে পারে। মিনিটে বড় জোর কুড়ি-তিরিশটা শব্দ! তাই আবিষ্কার করা হ'ল এক রকম **ইলেকট্রিক টাইপরাইটার** (কী বোর্ড পারফোরেটর)—যার মধ্যে কাগজের ফিতের রোল থাকবে। কিছু টাইপ করলেই সেটা মর্স্-কোডের সংকেতে কাগজে ফুটো হয়ে যাবে। তারপর টেলিগ্রাফ অফিসেই একটা ট্র্যান্সমিটার যন্ত্রের চাকার তলায় সেই ফুটো করা ফিতে চালিয়ে দিলেই অন্য দেশের গ্রাহকযন্ত্রের মেশিনে চালানো তাদের কাগজের ফিতেটাও সেইভাবে ফুটো ফুটো হয়ে যাবে। তারপর সেই ফুটো-হওয়া ফিতে একটা বিশেষ রকম ছাপার যন্ত্রের মধ্যে চালিয়ে দিলে

আমাদের চেনা অক্ষরে সেগুলো বেরিয়ে আসবে। সেই ফিতে কাগজে আঠা দিয়ে এঁটে দিলেই টেলিগ্রাম হয়ে গেল। এটাও এতদিন হ'ত মর্স্-কোডে। এভাবে মিনিটে ইচ্ছে করলে দেড়শ' করে শব্দও পাঠানো যেত।

এল টেলিপ্রিণ্টার

কিন্তু মর্স্-কোড তো আর সকলে জানে না। তা ছাড়া ও-সব যন্ত্রপাতিও শুধু সেই গুটিকয়েক বিদেশে টেলিগ্রাফ পাঠানোর অফিসেই থাকত। তাই এই ব্যবস্থা ছেড়ে এমন একটা মেশিন এখন ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটা যে কোনো অফিসে বসানো যাবে, যে কেউ ব্যবহার করতে পারবে। এরই নাম টেলিপ্রিণ্টার।

'টেলি' কথাটার মানে তোমরা জান—দূর। আর প্রিন্টার মানে যা প্রিণ্ট করে বা ছাপে। অতএব, টেলিপ্রিণ্টার শব্দটার বাংলা অর্থ দূরভাষ বা দূরদর্শনের অনুকরণে বলতে পারো 'দূর-মুদ্রক'।

এই টেলিপ্রিণ্টার মেশিন দেখতেও অনেকটা টাইপ রাইটারের মতন। এতে কাগজের ফিতে না লাগিয়ে চওড়া কাগজের রোল লাগানো থাকে। নেমন্তন্ন বাড়িতে এক রকম কাগজের রোল খুলে বেঞ্চে পেতে খেতে দেওয়া হয়, দেখেছ? সেই রকম রোল। ছ'টো টেলিফোনে যে রকম সংযোগ হয়, ছ'টো টেলি-প্রিণ্টারেও সে রকম সংযোগস্থাপন করা যায়। মনে কর, তোমার কাছে একটা টেলিপ্রিণ্টার আছে আর দূরে তোমার বন্ধুর কাছে আর একটা আছে। ছ'টোতে যোগাযোগ করা হ'ল। তুমি তোমার মেশিনে A অক্ষরের চাবিতে (ইংরেজিতে "কী" বলা হয়, বাংলাতেও তাই চাবি বলছি) চাপ দিলে। তোমার মেশিনের কাগজে তা তো ছাপা হ'লই, সেই সঙ্গে তোমার মেশিন থেকে একটা বিছ্যুৎ-সংকেত বেরিয়ে তোমার বন্ধুর মেশিনে চলে গেল আর তাতে লাগানো কাগজেও A অক্ষরটা ছাপা হ'ল। আবার তোমার বন্ধু তার মেশিনে কিছু টাইপ করলে তুমিও তাই পাবে। তবে টেলিফোনে যেমন ছ'জনে একসঙ্গে কথা
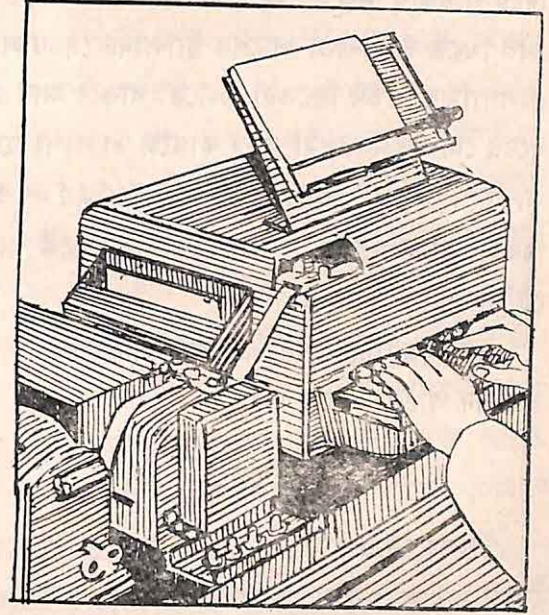
টেলিপ্রিণ্টারে বার্তা পাঠানো হচ্ছে। এখানে সরাসরি পাঠানো না হয়ে প্রথমে কাগজের ফিতেতে সংকেতছিদ্র চিহ্নিত (পাঞ্চ) হচ্ছে। পরে সেটা পাশের অটো-ট্র্যান্সমিটার মারফৎ বেতার-সংকেতে পরিণত করে মূল ট্রান্স-মিটারে পাঠানো হচ্ছে।

বললে কিছুই বোঝা যাবে না, এতেও সে রকম এক-জনকে সময় না দিয়ে একই সঙ্গে ছ'জনে টাইপ করলে সব 'হরেকরকম্বা' ছাপা হয়ে যাবে। টেলিপ্রিণ্টারের একটা ছবি ওপরে দিচ্ছি।

দেখতে পাচ্ছ, ঠিক টাইপ রাইটারের মতন। 'অক্ষর' (**LTR**) চাবি প্রথমে টিপে অন্য চাবি

টিপলে অক্ষরই আসবে। 'চিহ্ন' (FIG) চাবি টেপার পর অন্য চাবি টিপলে আসবে অঙ্ক (১, ২, ৩ ইত্যাদি) বা চিহ্ন (= ? : ইত্যাদি)। এই মেশিনেও ফুটো করা কাগজের ফিতে তৈরি করা যায়। তাতে টাইপে কিছু ভুল হয়ে গেলে একটা কায়দা করে সেটা মুছে দিয়ে পরিষ্কার নির্ভুল ফিতে বানানো যায়। তা ছাড়া সেই ফিতে ইচ্ছেমতো পাশের ট্র্যান্সমিটারে চালালে রেলগাড়ির মতন ফিতেটা চলতে থাকবে আর সেই দূরের টেলিপ্রিন্টার মেশিনের কাগজে তা ছাপা হতেও থাকবে। তবে এই সংকেত কিন্তু মর্স্ নয়। অন্য একটা নাম আছে! তবে তোমরা বলতে পারো টেলিপ্রিন্টার-কোড্।

এই পদ্ধতিতে এখন বিদেশে টেলিগ্রাফ, টেলেক্স ইত্যাদি পাঠানো হচ্ছে।

টেলেক্স

টেলেক্স আবার কি? ভাবছ হয়তো। টেলিফোনের যেমন ডায়াল থাকে, অফিসের টেলিপ্রিন্টারগুলোর পাশেও সে রকম ডায়াল দেখতে পাবে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মতো এগুলো টেলিপ্রিন্টার এক্সচেঞ্জের সঙ্গে সংযুক্ত। তাই এর নাম সংক্ষেপে টেলেক্স।

মনে কর, তোমার কাছে টেলেক্স মেশিন আছে। তুমি তোমার বন্ধুর টেলেক্স নম্বর জান। ডায়াল করলেই ('এনগেজ্ড্' না থাকলে অথবা তোমার বন্ধু মেশিন খুলে 'অফ্' করে না রাখলে) তোমার বন্ধুর মেশিনের সঙ্গে তোমার টেলিপ্রিন্টার মেশিনের যোগ হয়ে গেল। তুমি তোমার বন্ধুকে একটা খবর পাঠাবে! বন্ধু হয়তো অফিসে নেই। তুমি জানবে কি করে যে ওটা বন্ধুরই টেলিপ্রিন্টার? তাতে কি হয়েছে, মেশিনই তোমাকে বলে দেবে। তুমি 'হু আর ইউ' (WHO ARE YOU) লেখা চাবিটা টিপে দাও। দেখবে তোমার বন্ধুর মেশিনটাই তার নিজের টেলেক্স নম্বর আর কোম্পানির নামটাও ছোট করে ছেপে দিচ্ছে তোমার মেশিনের কাগজে। একে বলে আন্সার ব্যাক্ বা পরিচয়-জ্ঞাপন। এখন, তুমিও তো বন্ধুকে জানাবে তোমার টেলেক্স নম্বর আর পরিচয়। না, কষ্ট করে অত কথা টাইপ করার দরকার নেই। "হিয়ার ইজ" (HERE IS) চাবিটা টিপে দাও। তোমার মেশিনই তোমার কাজ করে দেবে। এবার তুমি হয়তো ভাবলে, বন্ধু বোধ হয় ঘরের অন্য কোনো কোণে বসে কাজ করছে। তোমার মেশিনের বেল্ চাবিটা টিপলেই তোমার বন্ধুর মেশিনে টুং-টুং করে ঘণ্টা বাজবে। বন্ধু থাকলে শুনতে পেয়ে উঠে আসত। কিন্তু এল না। বয়েই গেল। তোমার বক্তব্য তুমি টাইপ করে জানিয়ে দিয়ে সংযোগ কেটে দিলে। পরে বন্ধু এসে মেশিন থেকে টাইপ করা কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে পড়ে ফেলল। তারপর হয়তো তোমাকে ডায়াল করে উত্তর পাঠাতে বসল। টেলিফোনের মতন দু'জনার একসঙ্গে হাজির না থাকলেও কাজ হয়।

সাধারণত, যে সব টেলিপ্রিন্টার অফিসে ব্যবহার করা হয় তাতে মিনিটে সত্তরটার কাছাকাছি শব্দ পাঠানো যায়। তার বেশি তাড়াতাড়ি টাইপ করলে কিন্তু মেশিনতা পাঠাতে পারবে না।

এখন টেলিপ্রিণ্টারই শেষ মাধ্যম নয়

এই টেলিপ্রিন্টারই কি বিদেশে টেলিগ্রাফ পাঠানোর শেষ মাধ্যম? তা কি হয়? বলেছি না, সেই হুঁকোমুখো হ্যাংলার কথা। তোমার হাতে টেলিগ্রামটা দেওয়া হ'ল,—অবশ্য টেলিপ্রিন্টারের কাগজে টাইপ করেই, কিন্তু মাঝখানে কত নতুন নতুন কাণ্ড হয়েই যাচ্ছে। যেমন, ফুটো-করা কাগজের যুগ শেষ হতে চলেছে। এসেছে চৌম্বক ফিতে, কম্পিউটার

ইত্যাদি। বিদেশ থেকে কোনো টেলিগ্রাম যদি সরাসরি টেলিপ্রিণ্টারের কাগজে টাইপ করা অবস্থায় কোনোদিন পাও, তবে তাতে দেখবে প্রথম দু'-এক লাইনে কত হিজিবিজি অক্ষর আর অঙ্ক ছাপা আছে। এগুলো অবশ্য তোমার পড়ার দরকার নেই। এ-সবের বেশির ভাগই সেই কমপিউটারকে কাজে লাগানোর জন্যে। সে সব বড় গোলমেলে ব্যাপার। আমরা সাধারণ লোকে 'কেব্‌ল্‌'—থুড়ি, টেলিগ্রামটা হাতে পেয়ে শুধু নীচের কথাগুলোই পড়ব। খুশি হব যখন দেখব সুদূর আমেরিকা থেকে জন্মদিনের দিন কয়েকটা শব্দ এসেছে—"হ্যাপি বার্থ-ডে টু ইউ।"

বিজ্ঞানীর নতুন বন্ধু : লেসার

দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের বজ্র ছিল এক ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র। দধীচি মুনির অস্থি দিয়ে তৈরি এই প্রচণ্ড অস্ত্র কেবল সৃষ্টির কল্যাণের জন্যই ব্যবহার করা হ'ত। এ যুগের মানুষও এক অতি শক্তিশালী আলোক-রশ্মি আবিষ্কার করেছে যা ইন্দ্রের বজ্রের মতই অমোঘ ও ধ্বংসকারী। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের সৃষ্টি এই 'মৃত্যু-রশ্মি'র নাম 'লেসার বিম্‌'। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে মানুষ এই ভয়ংকর 'মৃত্যু-রশ্মি' এখন পর্যন্ত ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করে নি। সেজন্য আমরা এই রশ্মিকে 'মৃত্যু-রশ্মি' না বলে 'লেসার-রশ্মি' নামেই অভিহিত করব।

লেসার? লেসার কথাটার মানে কি? সত্যি, ঐ নামে কোন শব্দ ইংরেজিতে নেই। 'লেসার' কথাটি তৈরি করা হয়েছে কয়েকটি ইংরেজি শব্দের প্রথম অক্ষর নিয়ে। সম্পূর্ণ কথাটি হ'ল 'লাইট অ্যাম্‌প্লিফিকেশন্‌ অব্‌ স্টিমুলেটেড এমিশন্‌ অব্‌ রেডিয়েশন্‌' (Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation)। অত বড় একটা নাম তো সব সময় উচ্চারণ করা সুবিধাজনক নয়, তাই ঐ রকম ভাবে সংক্ষেপ করে ছোট্ট এই নামটা দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেন 'লেজার'।

লেসারের উৎপত্তি

আমরা এখন জানি যে পদার্থের অণু এবং পরমাণু হ'ল আসল শক্তির আধার। তরল ও বায়বীয় পদার্থের অণু এবং পরমাণুগুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ-বল কম থাকায় তারা সহজেই নিজেদের স্থান পরিবর্তন করতে পারে, আর কঠিন পদার্থের অণু বা পরমাণু একই জায়গায় থেকে কাঁপে। তরল, বায়বীয় অথবা কঠিন—সব পদার্থেরই অণু এবং পরমাণুর ওপর বিভিন্ন ধরণের শক্তি,—যেমন তাপ, আলোক, চৌম্বক, বৈদ্যুতিক ইত্যাদি শক্তি প্রযুক্ত হয়। পদার্থের অণু বা পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে এই সব শক্তি নিজেরা নিজেরা গ্রহণ করে নেয় অথবা সুযোগ মত বিকিরণ করে দেয়। একটি পাত্রে ফুটন্ত গরম জল রেখে যদি তার মধ্যে একটি বরফ-ঠাণ্ডা ষ্টীলের চামচে ডোবানো হয় তবে চামচেটি গরম জল থেকে তাপ গ্রহণ করে গরম হবে আর ফুটন্ত জল সেই পরিমাণে তাপ ত্যাগ করে কিছুটা ঠাণ্ডা হবে। এখানে চামচের তাপশক্তির মাত্রা বেড়ে গেল আর জলের তাপশক্তির মাত্রা সেই পরিমাণে কমে গেল। অনেক সময় কোন কোন পদার্থ নিজের আহৃত শক্তি নিজে নিজেই বিচ্ছুরিত করে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় শক্তির মানের সামঞ্জস্য ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। শক্তির এই আহরণ (বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে অ্যাব্‌জর্পশন) অথবা বিচ্ছুরণ (বিজ্ঞানের ভাষায় রেডিয়েশন) কোনও বিশেষ ধরনে হয় না।

পদার্থের অণু আবার এই সময়ে অপর অণুর সঙ্গে শক্তির আদানপ্রদান করার ফলে ব্যাপারটি আরও জটিল হয়ে ওঠে। বন্য পশুকে পোষ মানিয়ে যেমন সার্কাসে খেলা দেখানো হয় তেমনি বিজ্ঞানীরাও পদার্থের অণু ও পরমাণুকে এমনভাবে পোষ মানিয়েছেন যাতে সেগুলি তাঁদের আজ্ঞামত শক্তি আহরণ বা বিচ্ছুরণ করতে পারে।

কারা আবিষ্কার করে কাজে লাগালেন

পদার্থের অণুকে উদ্দীপিত করে রশ্মি বিচ্ছুরণের মূল নীতি প্রথম জানান বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। ১৯৫৩ সালে আমেরিকার দু'জন অধ্যাপক সি. টাউনেস ও শ্যালোভ এবং রাশিয়ার লেবেডিউ ইনস্টিটিউটের দুই বিজ্ঞানী ব্যসভ ও প্রোকোরভ এই নীতি প্রথম কাজে লাগান। ১৯৬০ সালে আর একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী টি. এইচ্. মৈনিয়ান মাধ্যম হিসাবে রুবি-স্ফটিক ব্যবহার করে প্রথম লেসার-রশ্মি তৈরি করেন। পরে 'বেল-ল্যাবরেটরিজ' হিলিয়াম ও নিওন গ্যাসের মাধ্যম ব্যবহার করে কার্যকরী লেসার-রশ্মি তৈরি করে।

কি ভাবে কাজ করে লেসার

ডায়োড্, ট্রায়োড্ ইত্যাদি ভ্যাকুয়াম টিউব অথবা ট্রান্‌জিস্‌টার বৈদ্যুতিক কারেন্ট বা বিদ্যুৎ-প্রবাহকে বাড়ায়, যাকে বলা হয় অ্যাম্‌প্লিফাই করা, আর লেসার বাড়িয়ে দেয়—অর্থাৎ অ্যাম্‌প্লিফাই করে আলোক-রশ্মিকে। প্রথম দিকে লেসার যন্ত্রে রুবি-স্ফটিক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হ'ত। অ্যালুমিনিয়াম্ অক্সাইডের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে (শতকরা ·০৫) ভাগ ক্রোমিয়াম্ মিশিয়ে এই রুবি-স্ফটিক তৈরি করা হয়। এই ক্রোমিয়ামের অণু থেকেই রুবি-লেসারের লাল রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়।

রুবি-স্ফটিকের অণুগুলির শক্তির মাত্রা বাড়ানোর জন্য বৈদ্যুতিক ও আলোক-শক্তি প্রয়োগ করা হয়। এই উত্তেজিত অণুগুলি পরক্ষণেই নিম্নতর শক্তির মানে ফিরে আসতে চেষ্টা করে। এই ফিরে আসার ফলে উদ্বৃত্ত শক্তি রুবি-স্ফটিক থেকে আলোক-রশ্মি রূপে বিচ্ছুরিত হয়। প্রথম অবস্থায় এই বিচ্ছুরণ অতি সামান্যই থাকে। লেসার যন্ত্রের মধ্যে রশ্মিটিকে দু'টি প্রায়-স্বচ্ছ আয়নায় বারে বারে প্রতিফলিত করা হয়। আয়না দু'টিকে রাখা হয় লেসার যন্ত্রের দুই প্রান্তে। লেসার যন্ত্রের ভেতরে দু'টি আয়নার মাঝে প্রতিফলনের সময় রশ্মিটি রুবি-স্ফটিকের অন্যান্য উত্তেজিত অণুকে ধাক্কা দিয়ে তাদেরও উচ্চতর শক্তির মাত্রায় নিয়ে যায় এবং তারাও ঠিক একই ভাবে পরমুহূর্তে তাদের শক্তির মান হ্রাস করে দেয়; ফলে আরও আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এইভাবে আলোকরশ্মির মাত্রা লেসার যন্ত্রের মধ্যেই ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং মুহূর্তের মধ্যেই যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন লেসার যন্ত্রের যে আয়নাটি অপেক্ষাকৃত বেশি স্বচ্ছ সেই দিক্ থেকে দমকে বেরিয়ে আসে অতি তীব্র আলোকরশ্মি। এরই নাম লেসার-রশ্মি বা লেসার বিম। রুবি-লেসারের রশ্মি লাল রঙের হয়। উপযুক্ত লেন্সের সাহায্যে এই অতি তীব্র আলোক-রশ্মিকে প্রয়োজন মত কেন্দ্রীভূত করা হয়—যাকে আলোক-বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ফোকাস্ করা।

লেসার নানা অভিনব কাজ হাসিল করছে

লেসার-রশ্মির কয়েকটি বিশেষ গুণ থাকার জন্য বিজ্ঞানীরা এই আলোক-রশ্মিকে অনেক অভিনব

কাজে লাগিয়েছেন এবং ক্রমাগত নতুন নতুন কাজে এর প্রয়োগ আবিষ্কার করছেন। লেসার-রশ্মির প্রধান গুণ হ'ল যে এই তীব্র তাপশক্তিসম্পন্ন এক রঙের আলোর রশ্মি বহুদূর পর্যন্ত ঠিক সোজা পথে চলতে পারে এবং অতি সূক্ষ্ম বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করা যেতে পারে। প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন মাধ্যমের লেসার-রশ্মি ব্যবহার করা হয়। হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের গ্রহান্তরে খবর পাঠানো থেকে শুরু করে ভূমিকম্পের পূর্ব্বাভাস সংগ্রহ করা ও বিভিন্ন এঞ্জিনীয়ারীং ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আজ লেসার-রশ্মি ক্রমেই বেশি বেশি করে প্রয়োগ করা হচ্ছে। হচ্ছে আবহাওয়া পরীক্ষার জন্যও।

লেসার-রশ্মির সাহায্যে আবহাওয়া পরীক্ষা

কার্বন ডাইঅক্সাইড মাধ্যমের লেসার-রশ্মি এঞ্জিনীয়ারিং প্রয়োগের জন্য বিশেষ উপযুক্ত। অতি সূক্ষ্ম ধাতব তার ওয়েল্ডিং করে যুড়তে এই রশ্মির যুড়ি নেই। এমন কি ভিন্ন প্রকৃতির ধাতুর তারও (যেমন অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে তামা ইত্যাদি) লেসার-রশ্মির সাহায্যে দিব্যি যুড়ে দেওয়া সম্ভব। পাল্‌স্‌ড্‌ সলিড্‌ স্টেট্‌ লেসার (Pulsed solid state Laser) রশ্মির সাহায্যে অত্যন্ত কঠিন পদার্থ যেমন অ্যালুমিনা, সিরামিক্‌স্‌, টাংস্টেন্‌, ট্যাণ্টালাম্‌, নিওবিয়াম্‌, হীরে ইত্যাদির মধ্যে নিমেষে ছিদ্র করা সম্ভব হচ্ছে। এমন কি এক ইঞ্চির চল্লিশ লক্ষ ভাগ ব্যাসেরও ছোট্ট ছিদ্র করা সম্ভব হয়েছে। লেসার রশ্মির এই ধরনের সূক্ষ্ম কাজ করার ক্ষমতা মানুষের মহাকাশ জয়ের পথে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। দশ ফুট বা পনেরো ফুট পুরু কাগজ বা কাপড়ের গাঁট অতি পরিচ্ছন্নভাবে কাটতে লেসার-রশ্মির এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের বেশি সময় লাগবে না। সেইজন্য বস্ত্রশিল্পে এই রশ্মির ব্যবহার বেড়েছে।

ইয়োরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রয়েছে পাশাপাশি আরও ছ'টি রাজ্য—স্পেন ও পোতুর্গাল। স্পেন আকারে অনেক বড়। এর আয়তন ৫০৪,৭৫০ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি। রাজধানীর নাম ম্যাড্রিড। স্পেনের উত্তর দিকে রয়েছে ফ্রান্স আর বিস্কে উপসাগর, পশ্চিমে পোতুর্গাল। পূর্বে ভূমধ্যসাগর। সেদিক্ দিয়ে ২০ মাইল গেলেই পাওয়া যাবে আফ্রিকার উপকূল।

এক সময়ে স্পেন ছিল ইয়োরোপের এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ শক্তি। তা ছাড়া ওখানকার নাবিকেরা ছিল অসম্ভব সাহসী আর তেমনি কুশলী। ওদেশেরই কলম্বাস আবিষ্কার করেন আমেরিকা। তারপর মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি দেশ জয় করে সে সব জায়গায় উপনিবেশ গড়ে তুলে স্পেন এক বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। ওদিকে ইয়োরোপেও নেদারল্যাণ্ড্স্ ও ইটালির দিকে সে হাত বাড়ায়। কিন্তু আঘাত এল ইংল্যাণ্ডের দিক্ থেকে। ইংল্যাণ্ডে তখন রাণী ১ম এলিজাবেথের রাজত্ব চলছে। স্পেনের সম্রাট্ ইংল্যাণ্ড দখল করার জন্য এক বিরাট নৌবহর পাঠালেন—যাকে বলা হয় স্প্যানিশ আর্মাডা। সেই আর্মাডা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে স্পেনের প্রতিপত্তি একেবারে কমে গেল। এরপর ইয়োরোপের অনেক জায়গা তো ধীরে ধীরে স্পেনের হাতছাড়া হয়ে গেলই, এমন কি এক সময়ে কিছুদিন নেপোলিয়নও স্পেনের ওপর তাঁর আধিপত্য খাটাতে ছাড়েন নি।

মাঝে মূররাও এসে স্পেনে ঢুকে পড়ে দীর্ঘদিন তাদের প্রভাব রেখে যায়।

এরপর আবার স্পেনে গঠিত হ'ল পুরোপুরি রাজতন্ত্র। ১৯৩১ সালে জনমতের পাল্লায় পড়ে রাজা আলফাঁসো সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য হলেন, স্পেনে গঠিত হ'ল পুরোপুরি বামপন্থী প্রজাতন্ত্রী সরকার। তাঁরা অনেক নতুন নতুন সংস্কারের প্রবর্তন করলেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর অধিকাংশই ছিল রক্ষণশীল। তাঁদের নেতার সঙ্গে লাগল সরকারের বিরোধ। ফলে শুরু হ'ল স্পেনে এক বিরাট গৃহযুদ্ধ। সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ সরকারকে সাহায্য করলেও সেনাবাহিনীর নেতা ফ্রাঙ্কোর পক্ষে ছিল তখনকার শক্তিশালী জার্মেনী এবং ইটালি। তিন বছরের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের পর ফ্রাঙ্কোই দখল করলেন স্পেনের সরকার। তিনি হলেন প্রধান মন্ত্রী, ঝোঁকটা রাজতন্ত্রের দিকেই রইল।

স্পেনকে এখন আর তেমন বড় শক্তি বলে ধরা হয় না, কিন্তু আমেরিকায় (দক্ষিণ ও উত্তর) তাদের উপনিবেশগুলি এখনও ওদের এককালীন শক্তির সাক্ষী হয়ে রয়েছে। স্প্যানিশ ভাষাও চলছে সেখানে।

স্পেনের একটি জনপ্রিয় এবং বিপজ্জনক খেলা হচ্ছে ষাঁড়ের সঙ্গে মানুষের লড়াই। ষাঁড়কে ক্ষেপিয়ে দিয়ে তারপর একটা ছোরা আর এক টুকরো রঙিন কাপড় নিয়ে তার সঙ্গে লড়াই এবং শেষ পর্যন্ত ছোরার আঘাতে ষাঁড়ের মৃত্যুতে এই খেলা শেষ হয়। খুব সাহসী এবং শিক্ষিত খেলোয়াড় ছাড়া এ খেলা দেখানো যে কী রকম বিপজ্জনক তা তো বুঝতেই পারছ!

স্পেনের প্রতিবেশী রাষ্ট্র হচ্ছে পোতুর্গাল। ছোট্ট দেশ, আয়তনে ৯২,০৭২ বর্গ কিলোমিটার। খোদ পোতুর্গালের জনসংখ্যা এক কোটিরও কম। কিন্তু হলে কি হবে, এক সময়ে এই ছোট্ট দেশটিরই ছিল প্রবল প্রতাপ। সমুদ্রে তাদের যুড়ি ছিল না। জলদস্যু হিসেবে গোটা পৃথিবী তারা তছ্‌নছ্ করে দিয়েছিল। পৃথিবীর নানা জায়গায়—

বিশেষ করে আফ্রিকায় ছিল তাদের বিরাট ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য। সে যে কত বড় তা বোঝা যায় যে মূল পোর্তুগালের দেড়গুণেরও বেশি লোক থাকত ঐ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে। আয়তনে এগুলির মধ্যে এক অ্যাঙ্গোলাই ছিল খোদ পোর্তু-গালের ২২ গুণ বড়। তা ছাড়া মোজাম্বিকও কম ছিল না। আরও নানা জায়গায়—চীনে, দক্ষিণ আমেরিকায়, এমন কি আমাদের ভারতেও ছিল ওদের উপনিবেশ। দক্ষিণ আমেরিকার বহু জায়গায় এখনও পোর্তুগীজ ভাষাতেই লোকে কথা বলে।

ভারতবর্ষেও ওরা কম অত্যাচার করে নি। গোয়া, দমন, দিউ তো বহুদিন ওদের শাসনেই ছিল। ভারত স্বাধীন হবার পর ক্ষুদ্রশক্তি পোর্তুগাল থেকে ওগুলিকে লড়াই করে উদ্ধার করতে হয়। আফ্রিকার উপনিবেশগুলিও জেনারেল স্পিনোলা কর্তৃত্ব পেয়ে একে একে স্বাধীন করে দেন।

আমাদের বাংলায়ও এক সময়ে পোর্তুগীজদের অত্যাচারের গল্প তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তবে ওদের প্রভাবও আমাদের মধ্যে কম পড়ে নি। বাংলা ভাষায় বহু পোর্তুগীজ শব্দের আমদানীই এর প্রমাণ। যেমন বোতাম, সাবান, টুপি ইত্যাদি বহু শব্দ মূলত পোর্তুগীজ হলেও এখন বাংলাই হয়ে গেছে।

ইয়োরোপের অন্যান্য উন্নত দেশগুলির মধ্যে নরওয়ে, সুইডেন, সুইট্জারল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, ফিনল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া, ইউগোস্লাভিয়া প্রভৃতিরও নাম করতে হয়।

ইউনাইটেড কিংডম্

আগে লোকে মুখে মুখে যেটাকে ইংল্যাণ্ড বলত আসলে সেটা কয়েকটি রাজ্যের সমষ্টি। তাই আজ-

কাল একে বলা হয় ইউনাইটেড কিংডম্ অব্ ব্রিটেন, সংক্ষেপে ইউ. কে.। এর মধ্যে আছে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স্, আইল অব্ ম্যান এবং চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ। তা ছাড়া উত্তর আয়ারল্যাণ্ডেরও কিছু অংশ। মূল ইয়োরোপ ভূখণ্ডের সঙ্গে ছোট্ট এক ফালি সমুদ্র,—যার নাম ইংলিশ চ্যানেল,—ওকে আলাদা করে রেখেছে। তাই গোটা দেশটাকেই বলা যায় একটা দ্বীপপুঞ্জ—যার চারদিক্‌ই সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। আয়তনে কিন্তু দেশটি এমন কিছু বড় নয়—ফ্রান্স বা জার্মেনীর অর্দ্ধেক হবে। এর মত চল্লিশটি দেশকে আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্‌স্-এর মধ্যে পুরে রাখা যায়।

কিন্তু হলে কি হবে, এই দেশের বহু লোক আজ পৃথিবীর নানা অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে নতুন নতুন নামে রাজ্যশাসন করছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রবল শক্তিশালী আমেরিকা (ইউ. এস. এ,) ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চল—বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতবর্ষেও এক সময়ে এদের উপস্থিতির কথা কে না জানে? দীর্ঘকাল,—প্রায় ২০০ বছর আমরা ঐ ছোট্ট দ্বীপ-বাসীদের শাসনে কাটিয়েছি। সংখ্যায় অনেক বেশি হয়েও ঐ মুষ্টিমেয়ের কাছে আমাদের অধীন হয়ে থাকতে হয়েছে। এটা হয়েছে কেবলমাত্র আমাদের নিজেদের মধ্যে একতার অভাবে।

ইংরেজরা আমাদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছে, শোষণ করেছে। বাণিজ্য করার নাম করে এদেশে ঢুকে ওরা একের পর এক রাজ্য দখল করে শেষে দেশের কর্তা হয়ে বসেছে। এখানকার ধনরত্ন উজাড় করে নিয়ে গিয়ে নিজেদের সম্পদ্ বাড়িয়েছে। কিন্তু কিছু ভালো কাজও করে গেছে। ওদের

ডাক্তারদের নতুন হাতিয়ার

অস্ত্রোপচারের কাজেও লেসার-রশ্মির ব্যবহার বিশেষভাবে শুরু হয়েছে। অস্ত্রোপচারের জন্য ধাতুর তৈরি অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি নিপুণভাবে লেসার-রশ্মি মানুষের শরীরের ভিতরে যে কোন অংশে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব। রশ্মির তীব্র তাপের ফলে রক্তক্ষরণ অতি সামান্যই হয়। চোখের রেটিনা সরে গেলে যথাস্থানে বসানো, হাড়ের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র করা, পেটের মধ্যে ক্ষত সারানো অথবা মস্তিষ্কের মধ্যে টিউমারের চিকিৎসা করা—সবই এখন লেসার-রশ্মির সাহায্যে সম্ভব হচ্ছে। দাঁতের চিকিৎসায়ও লেসার-রশ্মি ব্যবহার করা হচ্ছে।

আরও নানা ব্যাপারে লেসার

লেসার-রশ্মির সাহায্যে আরও নির্ভুলভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে যে আলোর গতি ধ্রুব। আঙুলের ছাপের সঠিক অনুশীলন করে অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে অথবা পুরোনো আমলের ছবি বা ভাস্কর্যের বয়স নির্ধারণ করতেও এর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। আবার যুদ্ধের সময় বহু মাইল দূরে অবস্থিত শত্রুপক্ষের অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদের ওপর লেসার-রশ্মি কেন্দ্রীভূত করে সেগুলিতে নিমেষে অগ্নি-সংযোগ করাও সম্ভব হয়েছে। তবে আশার কথা, মানুষ লেসার-রশ্মিকে এখনও ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করে সভ্যতার অগ্রগতির কাজেই প্রয়োগ করছে।

মেসার

লেসারের পরেও বিজ্ঞানীর হাতে আর একটি নতুন হাতিয়ার এসেছে "মেসার"। এটাও লেসারের মতই আদ্যক্ষর দিয়ে রচিত একটি শব্দ, শুধু গোড়ায় "লাইটের" বদলে "মাইক্রো-ওয়েভ" কথাটি বসানো হয়েছে। এগুলি আরও শক্তিশালী রেডিও-তরঙ্গ, স্ফটিকের মধ্যে পারমাণবিক শক্তি ধরে সেটাকে পরমাণু-কণা দিয়ে গরম করলে বেরিয়ে আসে। একটার সঙ্গে একটা ক্রমাগত যুড়ে যুড়ে লম্বাও করা যায়। কম্পিউটারের সাহায্যে এটি করা হয়। আজকাল ডুবো-জাহাজের দিক্ নির্ণয়ে এবং আরও নানা ব্যাপারে এটির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

র‍্যাডার

লেসারের কথা বলতে গিয়ে ঐ রকম আর একটি শব্দের কথা মনে পড়ছে যেটির নাম দেওয়া হয়েছে লেসারেরই মত কয়েকটি ইংরেজি শব্দের আদ্যক্ষর যুড়ে যুড়ে। এই নামটির সঙ্গে তোমরা হয়তো অনেকেই পরিচিত, যদিও ওর ভিতরের রহস্য হয়তো অনেকেরই জানা নেই। কথাটি হচ্ছে—"র‍্যাডার"।

কি করে ঐ নাম হ'ল? পুরো কথাটি হচ্ছে রেডিও ডিটেক্‌শন্ অ্যাণ্ড রেঞ্জিং। ইংরেজি হরফে লিখলে Radio Detection And Ranging। রেডিওর RA, ডিটেক্‌শনের D, অ্যাণ্ড-এর A এবং রেঞ্জিং-এর R, হ'ল RADAR (র‍্যাডার)।

র‍্যাডার শব্দটি, আগেই বলেছি, লেসারের তুলনায় বোধ হয় তোমাদের বেশি পরিচিত। আর নাম থেকেই ওর কাজকর্ম সম্বন্ধে একটু আভাস পাওয়া যেতে পারে।

কি করে আলোর ফুটকি আসে

একটা ট্রান্সমিটার বা প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ এক ধরনের বেতার-তরঙ্গ ছড়িয়ে বৈদ্যুতিক

স্পন্দন পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আর এ কাজটা করে একটা অ্যান্টেনা। এটা কিন্তু সাধারণ অ্যান্টেনার মত নয়,—যা নাকি আমরা টেলিভিশন-ওয়ালা বাড়ির ছাদে দেখতে পাই। এ অ্যান্টেনাটা হচ্ছে বিরাট একটা গামলার মত—যা নাকি শুইয়ে না রেখে খাড়া
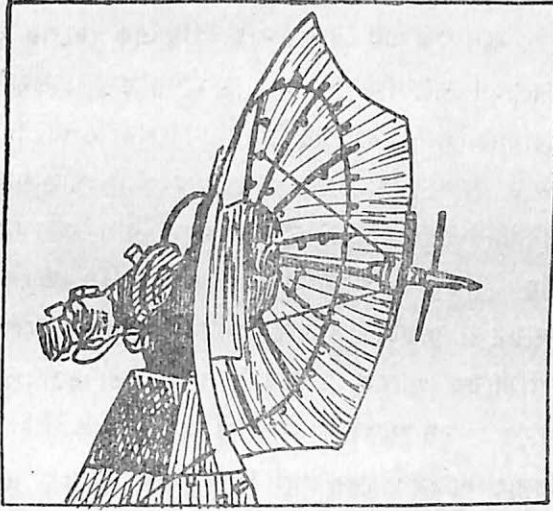
বিমান-বন্দরে র‍্যাডার যন্ত্র। অ্যান্টেনা ধীরে ধীরে ঘুরছে, সেই সঙ্গে দূরের প্লেনের সঠিক অবস্থিতি ধরা পড়ছে।

করে রাখা হয়েছে। যারা কলকাতার টেলিফোন-ভবন দেখেছ তারা ঐ বাড়ির ছাদে এ ধরনের বিরাট অ্যান্টেনা দেখে থাকবে। সাগরপাড়ের টেলিগ্রাফির কথা বলতে গিয়েও এরকম অ্যান্টেনার কথা বলা হয়েছে। এই অ্যান্টেনাগুলো আবার স্থির হয়ে থাকে না, ক্রমাগতই ঘুরছে। তবে খুব ধীরে ধীরে। প্রতি মিনিটে বড় জোর এক থেকে তিরিশ বার করে পাক খাচ্ছে। আর বৈদ্যুতিক স্পন্দনগুলোও কিন্তু নানা দিকে না ছড়িয়ে একই সরল রেখায় ছুটে চলেছে। গতিবেগ আলোর গতিবেগেরই সমান, অর্থাৎ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

এখন, বহুদূরের কোন পদার্থ—তা সে আকাশের এরোপ্লেনেই হোক বা জলের জাহাজই হোক, বা দূরের অন্য যে-কোন বস্তুই হোক,—তার গায়ে গিয়ে যদি এই তীব্রবেগে পাঠানো স্পন্দন লাগে তা হলে সেগুলো আবার ঠিকরে ফিরে আসবে এবং তার কতক এসে লাগবে সেই ঘুরন্ত অ্যান্টেনায়, যেখান থেকে স্পন্দনগুলোকে নির্দিষ্ট সোজা পথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ঐ ফিরে-আসা বেতার-স্পন্দন, যাকে বলা যায় বেতার-প্রতিধ্বনি,—তখন ধরে ফেলা যাবে এবং একটা ক্যাথোড রে টিউবের (যাকে বলা হয় অসিলোস্কোপ) সাহায্যে সেগুলো দৃশ্যমান আলোতে রূপান্তরিত হবে। টিউবের ছড়ানো অংশটিকে বলা হয় স্ক্রীন বা পর্দা, আর তার গায়ে মাখানো থাকে একটা রাসায়নিক মশলা যা নাকি আলোর স্পন্দন পেলেই জ্বল্ জ্বল্ করে ওঠে। এখানেও তাই হবে। ক্যাথোড টিউবে ঐ ঠিকরে আসা স্পন্দন, যাকে বলা হচ্ছে বেতার-প্রতিধ্বনি,—এসে পড়লেই সেখান থেকে এক ঝাঁক ইলেক্‌ট্রন এসে পড়বে রাসায়নিক মশলা-মাখানো পর্দার ওপর আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ফুটে উঠবে জ্বলজ্বলে আলোর ফুটকি,—যার নাম দেওয়া হয়েছে পিপ্। আর ঐ সমস্ত যন্ত্রটাকেই বলা হয় র‍্যাডার।

সঠিক খবর

আলোর ফুটকি র‍্যাডার-পর্দার কোন্ জায়গায় পড়েছে দেখেই বলে দেওয়া যায় ঠিক কতটা দূরের কোন্ জায়গা থেকে ঐ স্পন্দনগুলো ঠিকরে আসছে। র‍্যাডার-পর্দার কেন্দ্র থেকে আলোর ফুটকির দূরত্ব অনুযায়ী সেই বস্তুটির, যা থেকে স্পন্দন ঠিকরে আসছে,—অবস্থান জানা যাবে। যদি কাছাকাছি হয় তবে তা পড়বে পর্দার একেবারে মাঝখানে অর্থাৎ কেন্দ্রের কাছে। যদি দূরত্ব বাড়তে থাকে তবে

ফুটকিটাও আস্তে আস্তে কেন্দ্র থেকে দূরে চলে যাবে, আবার কাছে এলে চলে আসবে কেন্দ্রের কাছে।
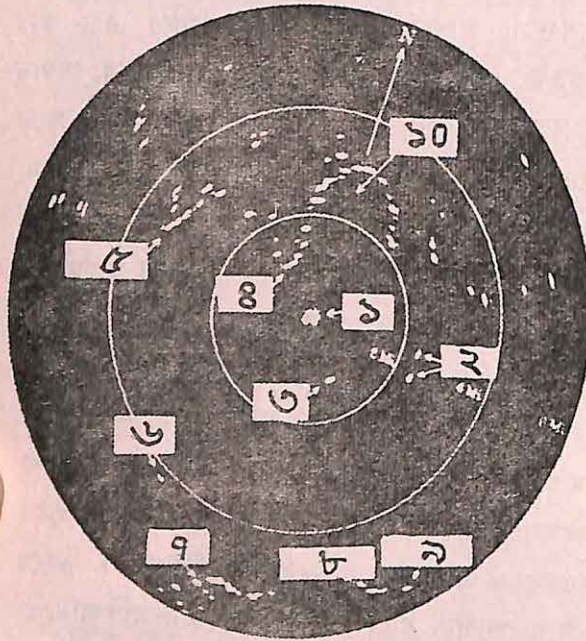
র‍্যাডার-পর্দা। আলোর ফুটকিগুলো কোন্ জায়গায় পড়ছে দেখেই বলে দেওয়া যায় ঠিক কতটা দূরের কোন্ জায়গা থেকে ঐ স্পন্দন ঠিকরে আসছে প্রতিধ্বনির মত।

এদিকে অ্যান্টেনা তো ঘুরেই চলেছে। ফলে একটু পরেই ওর কাছাকাছি অবস্থিত অন্য বস্তুর গায়েও গিয়ে আঘাত করবে তার প্রেরিত স্পন্দন। সেই স্পন্দন আবার নতুন করে ফিরে আসবে র‍্যাডারের গায়ে। ইতিমধ্যে প্রথম-দিকে-আসা আলোর ফুটকির উজ্জ্বলতা কমে গিয়ে তার কাছাকাছি আর এক জায়গায় ফুটে উঠবে জ্বলজ্বলে ফুটকি। অ্যান্টেনার ঘোরার বেগ অনুযায়ী পর্দার নানা জায়গায় ফুটকি বেরুতে থাকবে অর্থাৎ দূরের যে যে জায়গা থেকে স্পন্দন ঠিকরে আসছে তার একটা ঝক্‌মকে ম্যাপ আমরা র‍্যাডার-পর্দায় ভেসে উঠতে দেখতে পাব।

অবশ্য সব সময়ে যে বৈদ্যুতিক স্পন্দনই ব্যবহার করা হয় তা নয়, সময় সময় প্রেরক যন্ত্র থেকে স্পন্দন না পাঠিয়ে সরাসরি একমুখী বেতার-তরঙ্গও পাঠানো যেতে পারে। ফল অবশ্য এক রকমই হবে।

যুদ্ধে র‍্যাডার

মনে কর এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের যুদ্ধ বেধেছে। শত্রুপক্ষ বিমান-আক্রমণের জন্য একঝাঁক বোমারু বিমান নিয়ে বহু উঁচু আকাশের ওপর দিয়ে উড়ে আসছে। চোখে দেখা দূরে থাক, শক্তিশালী দূরবীন দিয়েও তাদের চট্ করে খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যদি এ পক্ষের সুবিধামত কোন জায়গায় একটা র‍্যাডার বসানো থাকে তা হলে ঐ র‍্যাডারের গায়েই তাদের আগমন-বার্তা ধরা পড়ে যাবে। দূর আকাশে সরাসরি সরলরেখায় পাঠানো বিদ্যুৎ-স্পন্দন তাদের গায়ে পড়ে সোজা ঠিকরে এসে পর্দার গায়ে আলোর ফুটকি তুলে ওদের উপস্থিতি, কোথায়, কত দূরে ওরা আছে, কি ভাবে এগিয়ে আসছে—সব জানিয়ে দেবে। আজকাল আবার কোন কোন র‍্যাডারের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় বিমানধ্বংসী কামানেরও যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়েছে। র‍্যাডারে ওদের আসবার খবর জানা মাত্র ওর সঙ্গে যুক্ত কম্পিউটার হিসেব করে সব জ্ঞাতব্য তথ্য একটি স্বয়ংক্রিয় বিমানধ্বংসী কামানকে জানিয়ে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অটোম্যাটিক কামান প্রস্তুত হয়ে থাকবে এবং পাল্লার মধ্যে এলেই শুরু করে দেবে গোলাবর্ষণ।

যেমন আকাশযুদ্ধে তেমনি জলযুদ্ধেও। যুদ্ধজাহাজ ভেসে চলেছে সমুদ্রের জল কেটে। ওদিকে জলের তলা দিয়ে ছুটে আসছে শত্রুপক্ষের ডুবোজাহাজ, টর্পেডো ছুঁড়ে এখনই হয়তো তারা ঘায়েল করে দেবে ঐ যুদ্ধজাহাজটাকে। কিন্তু পারবে

কি? জাহাজে বসানো আছে র‍্যাডার, সেই যন্ত্রই আগেভাগে জানিয়ে দেবে শত্রুপক্ষের ডুবো-জাহাজের বা টর্পেডোর উপস্থিতি—কোথায়, কত দূরে। তারপরই অটোম্যাটিক কামান গর্জে উঠবে জাহাজ থেকে।

শান্তির দিনেও র‍্যাডার

শুধু যুদ্ধের সময়েই নয়, শান্তির সময়েও র‍্যাডার আজকাল বিজ্ঞানীদের এক মস্ত বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাডার যে শুধু মাটিতেই বসানো হয় তা নয়,—এরোপ্লেনে, জাহাজে, যে কোন জায়গায় বসানো চলে। ধর, একটা এরোপ্লেনের এয়ারপোর্টে নামবার সময় হয়েছে। গভীর রাত্রি, তার ওপর ঘন কুয়াশা। প্লেনের চালক কিছুতেই ঠাহর করতে পারছেন না কোথায় নামবেন। প্লেন থেকে বিমানবন্দরের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল বৈদ্যুতিক স্পন্দন। সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দরের র‍্যাডার জানিয়ে দিল সমস্ত খবর—বিমানবন্দরের, তার রান্‌ওয়ের সঠিক অবস্থান। প্লেনের র‍্যাডারে তা আলোর ফুটকি হয়ে ভেসে উঠল। বিমানচালক নিশ্চিন্ত হয়ে সেই নিশানা লক্ষ করে অন্ধকার কুয়াশার মধ্যেই ঠিক জায়গায় নামিয়ে আনলেন তাঁর প্লেন।

জাহাজের বেলা তো র‍্যাডারের প্রচলন সমুদ্রযাত্রাকে আরও নিরাপদ করে তুলেছে। জাহাজেই বসানো আছে র‍্যাডার। জাহাজ তো অস্থির সমুদ্রে স্থির হয়ে ভাসে না,—কখনও এ-পাশ ও-পাশ দোলে, কখনও ওপরে নীচে টাল খায়। র‍্যাডারের সঙ্গে জাইরোস্কোপ নামে এক রকম যন্ত্র লাগিয়ে ঐ অসুবিধা দূর করে নিয়ে র‍্যাডারের আলোর ফুটকি দেখেই নাবিকেরা বুঝতে পারেন কোথায় কতদূরে আছে ডাঙ্গা, কোথায় অন্ধকারে ছুটে আসছে অন্য জাহাজ। শীতের দেশের সমুদ্রে আছে ভাসমান বরফের চাঁই—যা জাহাজের পক্ষে বিরাট বিপদের কারণ হতে পারে। তাই বলছিলাম র‍্যাডারের সাহায্যে তারও উপস্থিতি আজকাল সমুদ্রযাত্রাকে অনেক নিরাপদ করে তুলেছে। এরোপ্লেনের মত এখানেও ঘন
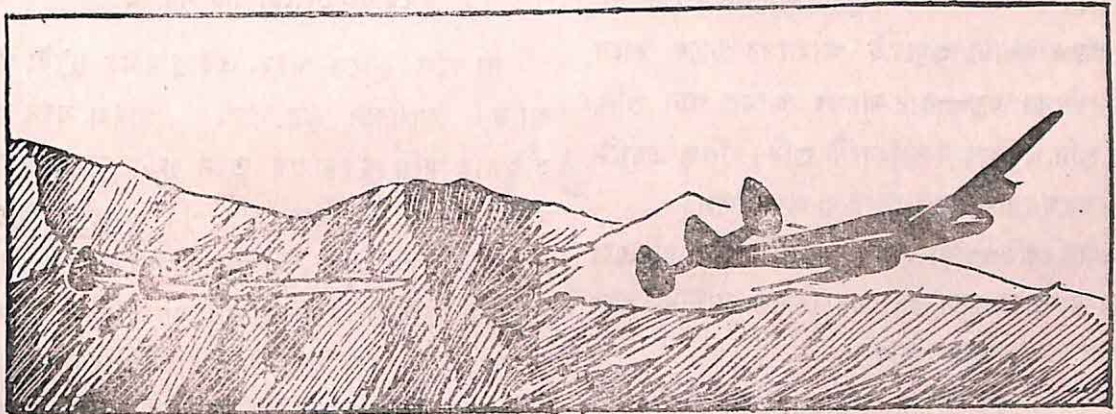
বাঁ-দিকে: একটি প্লেন ঘন কুয়াশায় পথ দেখতে না পেয়ে পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগাবার বিপদের মুখে। ডান দিকে: প্লেনের র‍্যাডার পাইলটকে বিপদের সঙ্কেত জানিয়ে দেওয়ায় সে প্লেন ওপরে তুলে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছে।

কুয়াশা, বিরূপ আবহাওয়া, ছুটে-আসা ঝড় জাহাজ চালাবার পক্ষে আর তেমন একটা বাধাই নয়—যদি তার সঙ্গে ঠিকমত র‍্যাডার বসানো থাকে।

এইভাবে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে র‍্যাডার মানুষের হয়ে কত কাজ যে করে দিচ্ছে কে তার ফর্দ দেবে?

রেডিও-ফোটো

রেডিও-ফোটো বা বেতার-চিত্র কথাটি তোমাদের এখন আর অপরিচিত নেই। গত কাল রাত এগারোটায় ইংল্যাণ্ডে যে ক্রিকেট খেলা হ'ল, তার ছবি তুমি ভোরবেলাতে উঠেই খবরের কাগজে দেখতে পেলে। আগে পাশে ছোট করে লেখা থাকত— রেডিও-ফোটো। আজকাল বাহুল্য বোধে তাও থাকে না।

রেডিও কথাটা শুনলেই আমাদের চোখে ভাসে একটা চৌকো যন্ত্র—যার মারফৎ আমরা গান শুনি, নাটক শুনি, খেলার ধারাবিবরণী শুনি। কিন্তু এখানে রেডিও অর্থে বোঝাচ্ছে বেতার বা ওয়ারলেস্।

এবার রেডিও-ফোটো কি ভাবে পাঠানো হয় এবং কি ভাবে গ্রহণ করা হয় সে বিষয়ে মোটামুটিভাবে একটু আলোচনা করা যাক।

কি ভাবে পাঠানো হয়

রেডিও-ফোটোতে একটা ছবি টেলিভিশনের মতো একবারে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। অন্য সব অবস্থা ভালো থাকলে একটা ফোটো পাঠাতে ১৫/২০ মিনিট সময় লাগে। কারণ কাজটা হয় ধীরে ধীরে— তাঁতে কাপড় বোনার মতন।

যে ফোটোটা পাঠাতে হবে সেটাকে একটা ড্রামের ওপর ক্লিপ দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। এই ড্রামটা নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে প্রতি সেকেণ্ডে একবার ঘোরে। আবার আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে পাশে সরে যায়। খুবই আস্তে আস্তে—প্রতি সেকেণ্ডে এক ইঞ্চির একশ' ভাগের এক ভাগ।
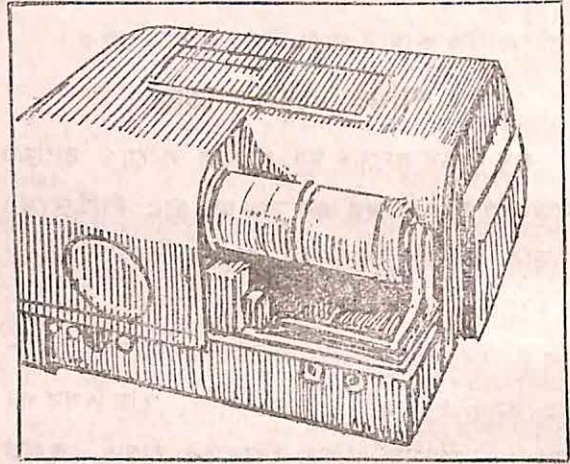
রেডিও-ফোটো পাঠাবার যন্ত্র

তা হলে বুঝতে পারছ, এই ড্রামটার দু'টো গতি আছে। অনেকটা স্ক্রুর মতো। আমরা যখন স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে স্ক্রু ঘোরাই তখন স্ক্রুটা ঘুরতে ঘুরতে সামনের দিয়ে এগিয়ে যায়—বিঁধে যায় কাঠের মধ্যে। প্রথম যুগে গ্রামোফোন রেকর্ডও নাকি এ রকম ড্রাম বা সিলিণ্ডারের মতো ছিল। সেটা ঘুরতে ঘুরতে পাশে সরে যেত, যাতে পিনটা রেকর্ডের সব জায়গার ওপর দিয়ে বুলিয়ে যেতে পারে। রেডিও-ফোটোর ড্রামটা অবিকল সেই সিলিণ্ডার রেকর্ডের মতো।

এবারে ফোটোটা তো ড্রামের ওপর আটকে দেওয়া হ'ল। ড্রামটা একটা ঢাকনার মধ্যে আছে, যাতে বাইরের কোনো আলো ওর ওপর না পড়ে। এখন পেনসিলের শীষের মতো সরু একটা রশ্মি ফোটোটার একপ্রান্তে ফেলা হ'ল। মনে কর, এটাই সেই পুরোনো যুগের গ্রামোফোনের পিন।

আলোর রশ্মি কি ভাবে পেনসিলের শীষের মতো

সরু করতে হয় তা তোমাদের বলা মানে মা'র কাছে মামার বাড়ির গল্প করা। দাত্ন বা দিদার পুরু চশমা রোদ্দুরে ধরে ছোটবেলায় দেশলাইয়ের কাঠি বা কাগজ কে না পুড়িয়েছে? হ্যাঁ, এখানেও সেইভাবেই লেন্সের সাহায্যে আলোর রশ্মি স্থচালো করে ফোটোতে ফেলা হয়।

তারপর সেই আলোটা ফোটোতে লেগে প্রতিফলিত হবে। ফোটোটার ঐ অংশ সাদা থাকলে বেশি আলো প্রতিফলিত হবে, কালো থাকলে প্রায় কিছুই প্রতিফলিত হবে না। আর মাঝামাঝি ছাই ছাই রং থাকলে রঙের ঘনত্বের অনুপাতে আলোর প্রতিফলন কম হবে। সেই প্রতিফলিত আলোটিকে লেন্সের সাহায্যে একটা ফোটো-ইলেকট্রিক সেলের ওপর ফেলা হ'ল।

পজেটিভ
নেগেটিভ
প্রেরক
গ্রাহক

(১) বাল্‌ব্, (২) লেন্স, (৩) ছবি আটকানো ড্রাম, (৪) ফোটো ইলেকট্রিক সেল।
(৫) অ্যাম্‌প্লিফায়ার, (৬) ট্রান্সমিটার, (৭) অ্যানটেনা (প্রেরণ) (৮) অ্যানটেনা (গ্রহণ)
(৯) রিসিভার, (১০) অসিলোগ্রাফ, (১১) আয়না (১২) নেগেটিভ ফিল্‌ম্ আটকানো ড্রাম।

রেডিও-ফোটো কি ভাবে পাঠানো হয়

ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক সেলে

ফোটো-ইলেকট্রিক সেলের ধর্ম তোমরা অনেকেই জান। ওর ওপর আলো পড়লে ও সেটাকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে পরিণত করে। বেশি আলো পড়লে বেশি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বেরিয়ে আসবে, কম আলো পড়লে কম আসবে। আলোর পরিমাণের অনুপাতে এই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে।

এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে যন্ত্রের সাহায্যে বেতার-তরঙ্গে পরিণত করে গ্রাহক কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ বা ট্রান্‌স্‌মিশন করা হ'ল। (এই প্রেরণ ও গ্রহণ-ব্যবস্থার বিষয়ে তোমাদের অন্য জায়গায় বলা হয়েছে।)

এইবারে রেডিও-ফোটো পাঠানো আরম্ভ হ'ল। ড্রামটা ঘুরছে—সেই সঙ্গে ছবিটাও। আলোর রশ্মি ছবির সর্বাঙ্গে বুলিয়ে যাচ্ছে গ্রামোফোনের পিনের মতো, আর সেই সঙ্গে উৎপন্ন হচ্ছে বিদ্যুৎ। ছবির রঙের গাঢ়তার কম-বেশির অনুপাতে বেতার-তরঙ্গ পাঠানো হচ্ছে এই ভাবে।

যেখানে ছবি আসছে

এখন, যেখানে ছবিটাকে গ্রহণ করা হচ্ছে সেখানে কি ঘটছে দেখা যাক। মনে কর, ছবিটা পাঠানো হচ্ছে লণ্ডন থেকে, গ্রহণ করা হচ্ছে কলকাতায়।

কলকাতায় যেখানে ছবিটা গ্রহণ করা হচ্ছে সেখানেও অন্ধকার ঢাকনার মধ্যে হুবহু একই রকমের একটা ড্রাম আছে, আর সেই ড্রামটাও একই গতিতে ঘুরছে লণ্ডনের ড্রামের সঙ্গে। ঘোরা শুরুও একই সঙ্গে। অর্থাৎ দু'টো ড্রামই আছে বিজ্ঞানের ভাষায় একই 'ফেজ'-এ—যেমন শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের দু'টো বৈদ্যুতিক ঘড়ির কাঁটা।

লণ্ডনের ড্রামের সঙ্গে এর তফাৎ শুধু এই যে লণ্ডনের ড্রামটার ওপর আছে ছবি—যেটাকে পাঠানো হবে, আর কলকাতার ড্রামে আটকানো আছে একই আকারের একটা নেগেটিভ ফিল্ম।

লণ্ডন থেকে যে বেতার-তরঙ্গ পাঠানো হচ্ছে সেটাকে প্রথমে গ্রহণ করা হচ্ছে আমাদের রিসিভারে। যন্ত্রের সাহায্যে তাকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে পরিবর্তিত করে নিয়ে আসা হ'ল অসিলোগ্রাফে। এতে একটা ছোট্ট আয়না লাগানো আছে। বিদ্যুৎ-তরঙ্গের কম-বেশি অনুপাতে অসিলোগ্রাফটিও কম-বেশি কাঁপে।

এখন, আয়নাতে আলো ফেলা হ'ল। প্রতিফলিত রশ্মিকে স্থচালো করে ঢাকনার একটি ছিদ্র দিয়ে ড্রামের নেগেটিভটার ওপর ফেলা হচ্ছে।

ওদিকে ফোটো পাঠানো তো শুরু হয়েছে। লণ্ডনের ড্রাম ফোটো সমেত ঘুরতে ঘুরতে পাশে সরে যাচ্ছে। আলোর রশ্মি যেন ছবিটার এক প্রান্ত-রেখার সমান্তরাল রেখা ধরে ধরে ছবির ওপর 'চোখ' বুলিয়ে যাচ্ছে। সেই রশ্মি প্রতিফলিত হচ্ছে ফোটোর সাদা-কালোর অনুপাতে। মানে, সাদা হলে প্রতিফলন বেশি, কালো হলে সামান্য। বেতার-তরঙ্গও তৈরি হচ্ছে সেই অনুযায়ী।

কলকাতায় সেই বেতার-তরঙ্গ ধরা হচ্ছে। তাকে ফের বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। সেই বিদ্যুৎ অসিলোগ্রাফের আয়নাকে কাঁপাচ্ছে এবং কাঁপন অনুযায়ী আলো এসে পড়ছে ফোটোর নেগেটিভের ওপর।

তা হলে বুঝতে পারছ, লণ্ডনের ছবিটার সাদা অংশে যখন আলো পড়ছে, তখন কলকাতার ফোটোর নেগেটিভটাতেও বেশি আলো পড়ছে।

এইভাবে লণ্ডনের ফোটোটা পুরোপুরিভাবে যখন এক কোণ থেকে আর এক কোণে সরে এল, তখন কলকাতার নেগেটিভটাও সরে এসেছে—তার সর্বাঙ্গে লণ্ডনের ফোটোর ছাপ নিয়ে। (ছবি ১৭০৯ পৃষ্ঠায়)

বাকিটা যে কোনও ফোটোগ্রাফারই পারে। নেগেটিভটাকে প্রথমে ডেভেলপ্ কর, তারপর সেটাকে প্রিণ্ট কর।

কিছু জ্ঞাতব্য কথা

এখন কতকগুলো জ্ঞাতব্য বিষয় বলি। রেডিও-ফোটোতে যা পাঠাবে তা সব সময় সাদা-কালোয় হওয়া দরকার। ফোটো ছাড়া টাইপ্ করা চিঠি, দলিল, নক্সা, এমন কি আঙ্গুলের ছাপও পাঠানো যায় রেডিও-ফোটো মারফৎ।

কি, রেডিও-ফোটোতে তোমার ছবি পাঠাতে ইচ্ছে করছে বুঝি? বিদেশে বন্ধু আছে? পাঠিয়ে দাও তাকে তোমার ফোটো। এমন কি দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজেও পাঠাতে পার। সে ব্যবস্থাও আছে।

তবে, ব্যাপার কি জান? খুব জরুরি দরকার থাকলে তখনই লোকে রেডিও-ফোটো পাঠায়। যেমন সংবাদপত্রের জন্য দরকার হয়। এমনি শুধু শুধু কে আর পাঠায়? যতই হোক, রেডিওর ফোটো তো আসল ফোটোর মতো অত নিখুঁত হয় না! তা ছাড়া খরচও অনেক। কাজেই তোমার ফোটোটা বরং এয়ার মেলেই পাঠিয়ে দাও।

সবশেষে একটা কথা বলে রাখি। বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে। হয়তো তোমার হাতের এই বইটা বেশি পুরোনো হওয়ার আগেই রেডিও-ফোটো আদান-প্রদানের এই ঢিমে তেতালা পদ্ধতি উঠে যাবে। তখন টেলিভিশনের পর্দায় ছবির মতন মুহূর্তে ছবিটার প্রেরণ আর গ্রহণ হবে। রঙিন ছবিও পাঠানো যাবে।

গোড়ার কথা

ভোগ করবার জন্যে মানুষে অনেক অনেক কিছু চায়। তার মধ্যে আজকাল সাধারণত মানুষ সবচাইতে বেশি চায় টাকাপয়সা।

তবে মজা এই যে টাকাপয়সা আমরা চাই বটে, কিন্তু টাকাপয়সা নিজে সোজাসুজি আমাদের ভোগে লাগে না। টাকাপয়সা খাওয়া যায় না, পরা যায় না, তা গেঁথে একটা ঘরও করা চলে না। টাকা শুধু একটা কাজে লাগে, যে কাজ আর কিছু দিয়ে হয় না—তার বদলে ভোগের জিনিস পাওয়া যেতে পারে। তাই টাকার বড় আদর।

তা হলে, যখন ভোগ করবার জিনিস পাওয়া যেত না, তখন টাকাপয়সাও ছিল না। সে একটা সময় ছিল যখন অসভ্য মানুষ নিজের ভোগের জন্য কোনও কিছু উৎপাদন করতে জানত না। তখন বেচা-কেনার কিছু ছিল না বলে টাকাপয়সাও ছিল না। তারপর মানুষ ক্রমে চাষ করতে, কাপড় বুনতে, আরও কত কি করতে শিখল। তখন অনেকেরই নিজেদের দরকারের চাইতে বেশি জিনিস ঘরে আসতে লাগল, আর সেই বাড়তি জিনিস দরকার মত বদলাবদলি করে নেওয়া আরম্ভ হ'ল। একে বলে 'বার্টার' বা বিনিময়। তখনও টাকাপয়সার দরকার দেখা দেয় নি।

ক্রমে দেখা গেল যে একজনের বাড়তি জিনিসের সঙ্গে আর একজনের বাড়তি জিনিস সোজাসুজি বদলাবদলি করবার অসুবিধে অনেক। তার চাইতে ভালো হয় যদি এমন একটা জিনিসকে ঠিক করা হয় যা দিলেই দরকার মত জিনিস পাবে, আবার সেটাই আর কারও থেকে পেলে তোমার জিনিস তুমি তার বদলে দেবে। জিনিসটা এমন হওয়া চাই যে সবাই সব সময়ে সেটা চায়, সেটা খুব টেঁকসই হয়, আর সেটাকে দরকার মত কম-বেশি করে নেওয়া চলে।

নানা দেশে এই উদ্দেশ্যে নানা জিনিসের ব্যবহার দেখা দিল। আমাদের দেশে কড়ি (একরকম প্রাণীর মসৃণ শক্ত খোলস), কোথাও বা পাথরের চাঁই, কোনও দেশে বা মরা জীবজন্তুর চামড়াকে এ কাজে লাগানো হ'ল। তাতে সুবিধে হ'ল এইভাবে ঃ

ধর, একজন জেলে তার মাছের বদলে তেল চায়। কিন্তু যে কলুর তেল আছে সে যদি মাছ না চায় তা হলে তো জেলে তেল পাবে না। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় সে মাছ চায় এমন লোকের কাছে কড়ি নিয়ে মাছটা তাকে দিয়ে দিল, তারপর সেই কড়ি কলুকে দিয়ে তার তেলটা নিয়ে নিল। কাজটা একটু জটিল হয়ে গেল বটে, কিন্তু ঠিক জিনিসটি পেতে অসুবিধে হল না। 'বার্টার' বা সোজাসুজি বদলাবদলির যুগে হয়তো জেলের মাছটাই নষ্ট হয়ে যেত।

অর্থ কাকে বলে

এও অবশ্য একরকম বদলাবদলি-ই, কিন্তু সরাসরি বদলাবদলি নয়। একে বলে 'বেচা-কেনা'। আর, যা দিয়ে বেচা কিংবা কেনা যায়, তাকে বলে 'অর্থ'

(**Money**)। অর্থ নিয়ে তার বদলে জিনিস দেওয়াকে বলে 'বেচা', আর অর্থ দিয়ে তার বদলে জিনিস নেওয়াকে বলে 'কেনা'।

আর একটু উন্নতি হলে অর্থ হিসেবে ধাতুর টুকরোর চল হ'ল। এগুলোর ওপর রাজার ছাপ দেবার নিয়ম হবার পর এদের নাম হ'ল 'মুদ্রা', মানে ছাপ-মারা জিনিস। প্রথমে মুদ্রা হ'ত প্রধানত তামা, রূপো আর সোনার। আমাদের বাংলায়ও এক সময়ে কড়ির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রার ব্যবহার আরম্ভ হ'ল। তার মধ্যে প্রধান মুদ্রা হ'ল রূপোর তঙ্কা, যার নাম পরে হ'ল টাকা। তাকে ধরা হ'ল এক কাহন অর্থাৎ ১২৮০ কড়ি বা কড়ার সমান।

কার্থেজের বণিক্‌দের সঙ্গে ব্রিটনদের 'বার্টার' বা বিনিময়
(লর্ড লিটনের আঁকা ছবি থেকে)

সেকালে বাংলা হিসেব হ'ত এই রকম—চার কড়ি বা কড়ায় এক 'গণ্ডা', কুড়ি গণ্ডায় এক 'পণ', চার পণে এক 'চোক', আর চার চোকে (অর্থাৎ ১৬ পণে) এক 'কাহন'। এক কাহন দামের মুদ্রা তো টাকা। তার পর ক্রমে চোক, পণ, পাঁচ গণ্ডার জন্যেও আলাদা আলাদা মুদ্রা হ'ল। তাদের বলত সিকি, আনি আর পয়সা। কিন্তু সবেরই দাম কড়ির সঙ্গে বাঁধা। তাই, অর্থকে চলতি কথায় বলা হ'ত 'টাকাকড়ি' বা 'টাকা-পয়সা'। সে নাম আর হিসেবও এখন বদলে গেছে।

১৯৬১ সালে ভারতে টাকাপয়সার হিসেব একেবারে বদলে দেওয়া হয়। তার আগে ছিল ৩ পাইয়ে ১ পয়সা, চার পয়সায় এক আনা আর ষোল আনায় এক টাকা। কড়ি-টড়ি অনেক কাল আগেই উঠে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৬১ সালে আনা-পাইটাই সব তুলে দিয়ে টাকাকে করা হ'ল ১০০ নয়া-পয়সার সমান। আগে ছিল ৬৪ পয়সার টাকা, এখন হ'ল ১০০ নয়া-পয়সার টাকা। সেই হিসেবই চলছে। তবে নয়া-পয়সাকেই পয়সা বলা হচ্ছে।

টাকা প্রথমে প্রায় খাঁটি রূপোর হ'ত। ক্রমে রূপোর ভাগ কমতে কমতে এখনকার টাকায় তার ছিটে-ফোঁটাও নেই—তা তৈরি হয় তামা-নিকেল মিশিয়ে।

সোনার মুদ্রা এখন আর তৈরি হয় না, কিন্তু অনেক দেশেই আগে ওর চল ছিল।

নোটের চলন শুরু হ'ল

মুদ্রা বানাবার খরচ কমানোই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এই খরচ কমাবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেশের কর্তাদের একসময় মনে হ'ল যে কাগজের ওপর মুদ্রা ছাপলে খরচ খুব কম হয়। ইংল্যাণ্ডে তাই প্রায় দেড়'শ বছর আগেই কাগজের মুদ্রা ছাপা শুরু হ'ল, আমাদের

দেশে সেই ব্যবস্থা হ'ল তার বছর ত্রিশেক বাদে। এই কাগজের টাকাকে বলা হয় 'নোট'।

কিন্তু, তুচ্ছ কাগজের ওপর ছাপা এই নোটকে সবাই মেনে নিচ্ছে কেন? তার প্রধান কারণ, দেশের সরকার এই নোটের জন্যে সব দায়িত্ব মেনে নিয়েছেন।

একটাকার নোটে একজন সরকারী বড়কর্তা সই করে বলেছেন এটাই একটা টাকা। অন্য নোটগুলোতে কিন্তু তা লেখা নেই। সেগুলোতে সই থাকে আর একজন বড়কর্তার, তাঁকে বলে 'রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর'। (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাকে বলে তা পরে বলছি।) তিনি লিখে দিয়েছেন যে "তিনি কথা দিচ্ছেন যে এই নোট নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এলে এর বদলে এত (যত টাকার নোট তত) টাকা দেওয়া হবে।" কাজেই, অন্য নোটগুলো কিন্তু ঠিক টাকা নয়, টাকা দেবার প্রতিজ্ঞাপত্র মাত্র। তাকেও আমরা টাকার মত করে চালাচ্ছি।

এ হ'ল এক নতুন জিনিস। টাকা নয়, শুধু টাকা পাবার ভরসা। নোট ছাড়া এ-রকম আরও অনেক লেখন আজকাল মানুষে টাকার বদলে ব্যবহার করে শুধু বিশ্বাসের জোরে।

চেক ও ব্যাঙ্ক

তার মধ্যে খুব চলতি একটা জিনিস হচ্ছে 'চেক'। আজকাল খুচরো বেচাকেনা ছাড়া প্রায় সব কাজেই টাকা কিংবা নোট না দিয়ে 'চেক' দেওয়া হয়। তা হয় এইভাবে। ধর, রামবাবু একটি ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছেন (ব্যাঙ্ক কি, তা পরে বলছি)। হরিবাবুকে তাঁর ১০০ টাকা দিতে হবে। কিন্তু তিনি টাকা না দিয়ে তাঁর ব্যাঙ্কের নামে একটা চিঠি দিলেন—"হরিবাবুকে ১০০ টাকা দিন"। ব্যাঙ্কের নামে এ রকম চিঠি যখন ঐ ব্যাঙ্কের দেওয়া ছাপা কাগজে লেখা হয়, তখন তাকে বলে 'চেক'। রামবাবুকে যদি হরিবাবু বিশ্বাস করেন, তা হলে তিনি টাকার বদলে ঐ চেক নিতে একটুও দ্বিধা করবেন না। একটু-খানি কাগজে লেখা ঐ আদেশটিতেই হয়তো লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ হয়ে গেল। নোটের টাকা দেবে বলে গভর্নমেণ্ট ভরসা দিচ্ছে, চেকের টাকার তো তাও নেই।

সবই বিশ্বাসের ব্যাপার। দেশের সরকারের ওপর বিশ্বাস আছে বলে টাকা, পয়সা আর নোট চলছে। আর, মানুষের ওপর বিশ্বাস আছে বলে তার অনেক বেশি গুণ টাকার লেনদেন হচ্ছে চেকে। এই বিশ্বাসের ওপরেই 'ব্যাঙ্ক' গড়ে উঠল।

আগেকার দিনে এক শ্রেণীর লোক ছিল যাদের ওপর বিশ্বাস ছিল বলে লোকে তাদের কাছে টাকা গচ্ছিত রাখত। আমাদের দেশে তাদের বলা হ'ত শ্রেষ্ঠী বা শেঠ। যেমন, মুর্শিদাবাদে ছিলেন জগৎ শেঠ বা ইয়োরোপে ছিলেন রথ্‌স্‌চাইল্ড (রোট্‌শিল্ড) বংশ। টাকাগুলো তাঁরা সুদে খাটাতেন। সম্রাট্‌রাও তাঁদের কাছে টাকা ধার নিতেন। এর পর নানারকম প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠতে লাগল, যারা একদিকে টাকা জমা নেয়, অন্যদিকে সেই টাকা অন্যকে ধার দেয়। এদেরই বলা হয় ব্যাঙ্ক।

এই ব্যাঙ্কগুলো একদিকে দেশের মানুষদের কাছ থেকে টাকা জমা নিয়ে একত্র করে, অন্যদিকে সেই টাকা তারা প্রধানত ব্যবসা করবার জন্য ধার দেয়। তাইতেই ব্যবসায়ীরা হাজার-হাজার-কোটি টাকার ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে; তাইতেই তো দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হয়।

ব্যাঙ্কে টাকা রাখবার নানারকম 'অ্যাকাউন্ট' বা হিসেব আছে। 'কারেণ্ট অ্যাকাউন্ট'-এর নিয়ম এই যে তাতে যখন যত ইচ্ছে তত টাকা রাখা যায়, আবার

যখন যত ইচ্ছে তত টাকা তুলে নিতে পারা যায়— অবশ্য, অ্যাকাউন্টে যত টাকা আছে তার বেশি সাধারণত তোলা যায় না। তারপর আছে 'সেভিংস্ অ্যাকাউন্ট'। তাতে যত টাকা রাখা হয় তার ওপর সুদ দেওয়া হয় বলে একটা উর্ধ্বসংখ্যার বেশি টাকা তাতে রাখাও যায় না আর, তা থেকে টাকা তোলা সম্বন্ধেও, কয়েকটা মানা-নিয়ম থাকে। এ ছাড়া আছে 'ফিক্স্ড্ ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট'। তাতে টাকা রাখলে তা একটা নির্দিষ্ট তারিখের আগে তোলা যাবে না। এই অ্যাকাউন্টের টাকার ওপর ব্যাঙ্ক সুদ দেয় সেভিংস্ অ্যাকাউন্টের চাইতেও বেশি। আরও অনেক রকম অ্যাকাউন্ট হতে পারে, তবে এই তিনটিই প্রধান।

আগে বলা হয়েছে চেক-এর কথা। 'ডিপোজিটর' বা 'আমানতকারী' (যে ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছে) সবাই ব্যাঙ্ক থেকেই সেই ছাপানো চেক পায়। ব্যাঙ্ক থেকে কারেন্ট বা সেভিংস্ অ্যাকাউন্টের টাকা পেতে হলে ডিপোজিটর সেই চেকের ফাঁকা জায়গাগুলিতে শুধু কাকে, আর কত টাকা দিতে হবে তা লিখে, তারিখ দিয়ে নিজের নাম সই করে দেয়। সেই চেক যে ব্যাঙ্কে নিয়ে যাবে সে-ই হাতে হাতে টাকা পাবে। একে বলে 'বেয়ারার চেক'।

কিন্তু চেকের ওপর যদি দু'টো সমান্তরাল লাইন টেনে দেওয়া হয় তবে সে চেক কেউ হাতে হাতে ভাঙাতে পারে না। একে বলে 'ক্রস্ড্ চেক'। যাকে ক্রস্ড চেকে টাকা দেওয়া হ'ল তারও একটি কারেন্ট বা সেভিংস্ অ্যাকাউন্ট যে কোনও ব্যাঙ্কে থাকা চাই। সে ঐ চেক নিয়ে নিজের অ্যাকাউন্টে দেয়, তখন তার ব্যাঙ্ক সেই চেকের টাকাটা আদায় করে এনে তার হিসবে জমা করে দেয়। তার মানে, ক্রস্ড্ চেকের টাকা কেবলমাত্র ব্যাঙ্করাই আদায় করতে পারে।

ডিপোজিটাররা রোজ যত টাকা তুলে নেয়, তা ছাড়া অনেক টাকা ব্যাঙ্কের হাতে থাকে। সে সব টাকা তারা নানাভাবে কাজে লাগায়। এক এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক এক এক রকম কাজে টাকা লাগায়। কেউ বা শুধু বাড়ি করবার জন্যে টাকা ধার দেয়, কেউ বা শুধু চাষের কাজে টাকা দিয়ে সাহায্য করে। কিন্তু সচরাচর আমরা যে সব ব্যাঙ্ক দেখি, তারা টাকা ধার দেয় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য। শিল্পবাণিজ্য গড়ে তোলবার টাকা, তার খরচ চালাবার জন্য টাকা ইত্যাদি তো তারা দেয়ই, তা ছাড়া এদের আর একটা বড় কাজ হচ্ছে ব্যবসায়ীদের বিক্রি-করা জিনিসের দাম আগে মিটিয়ে দিয়ে পরে সেই টাকাটা খরিদ্দারের কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া। টাকাটা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাওয়াতে এতে বিক্রেতার খুব সুবিধে হয়, যদিও এ কাজের জন্য ব্যাঙ্ক তার কাছ থেকে কিছু সুদ কেটে নেয়। এ ব্যবস্থা না থাকলে কোনও বড় ব্যবসা চলতেই পারত না।

ব্যাঙ্কের নানা কাজ

আর, এই ব্যবস্থা আছে বলেই, বিদেশের সঙ্গেও বাণিজ্য করা সম্ভব হয়। ধর, বিলেতের এক ক্রেতা ভারত থেকে চা কিনল। বড় বড় বেচাকেনায় দাম কখনও হাতে হাতে দেওয়া সম্ভব হয় না ; আর এ তো বিলেতের টাকা, তাই পেতে আরোই দেরী হবে। তখন ভারতের বিক্রেতা এখানেই তার ব্যাঙ্কে তার চায়ের দামের 'বিল' নিয়ে যায়। ব্যাঙ্ক, সব ঠিক আছে কি না তা দেখে নিয়ে, কিছু বাদ দিয়ে বিলের টাকাটা তাকে দেয়। বিলেতে ঐ ব্যাঙ্কের আপিস থাকে, সেখানে বিলটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সেটা হাতে পাবার পর একটা নির্দিষ্ট সময় পরে ক্রেতার ব্যাঙ্ক চায়ের দামটা দিয়ে দেবে বিক্রেতার ব্যাঙ্কের বিলেতের আপিসে।

এইখানে একটা কথা উঠবে। আমাদের দেশের কেনাবেচায় টাকা চলে, কিন্তু বিলেতে তো তা চলে না, সেখানে চলে পাউণ্ড-স্টার্লিং বা, সংক্ষেপে, পাউণ্ড। সেইরকম আমেরিকায় চলে ডলার, রাশিয়ায় রুব্‌ল্‌, জাপানে ইয়েন, ব্রহ্মদেশে চাট (**Kyat**), পাকিস্তানে রূপিয়া—এই রকম প্রত্যেক দেশের মুদ্রা আলাদা। তা হলে, বিলেতের লোক ভারতে চা কেনে কি করে? তার তো টাকা নেই, অথচ পাউণ্ড দিলে ভারতের লোক তা নেবে কেন? তা তো ভারতে চলবে না। তবে উপায়?

মাঝখানে ব্যাঙ্করা আছে বলেই এর একটা উপায় হয়েছে। ভারতের ব্যাঙ্কের যে বিলেতের আপিসের কথা বললাম, সেই আপিস বিলেতের পাউণ্ডে তার পাওনা আদায় করে, পরে ভারতের আপিস থেকে ভারতের টাকায় সেই চা-বিক্রেতাকে তার পাওনা দিয়ে দেয়—পাউণ্ড পাঠায় না, কেন না পাউণ্ড তো এখানে অচল। সেই পাউণ্ড বিলেতে রইল। তারপর যখন ভারতের কেউ বিলেত থেকে জিনিস কিনল তখন ব্যাঙ্ক করল কি, না, ভারতে তার থেকে দামটা আদায় করে নিয়ে তার বিলেতের আপিসে জানিয়ে দিল। সেই আপিস বিলেতে তার হাতে-আসা পাউণ্ড থেকে বিলেতের পাওনাদারকে দিয়ে দিল। এইভাবে হাজার হাজার দেনা আর হাজার হাজার পাওনার মধ্যে ভারতের সঙ্গে বিলেতের হিসেবের কাটাকাটি চলতে থাকে।

কিন্তু ভারতের বিক্রেতাকে যে টাকা দেওয়া হ'ল, তার বদলে বিলেতের ক্রেতার কাছ থেকে কত পাউণ্ড নিতে হবে তা ঠিক হবে কি করে? ভারতে, বিলেতে, পৃথিবীর সব সভ্য দেশে এর জন্যে একটি করে বিশেষ ব্যাঙ্ক আছে। ভারতে তার নাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ইংল্যাণ্ডে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সে ব্যাঙ্কের নাম ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। দেশের সব ব্যাঙ্কের ওপরে আর ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সব ব্যাপারে এরাই কর্তা। এই ব্যাঙ্কদের একটা কাজ হ'ল নিজের দেশের অর্থের সঙ্গে অন্য দেশের অর্থের বিনিময়ের হার থেকে থেকে ঠিক করে দেওয়া। এ-দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলে দেয় যে বিদেশী কোন্‌ মুদ্রার বদলে আমাদের ব্যাঙ্করা এ দেশের কত টাকা দেবে। দরটা ওঠানামা করে। প্রতিদিনের ঐ দরটা জেনে সেই হিসেবে বিদেশী পাওনা মেটানো হয়।

যেমন, কিছুদিন আগে ছিল ১ 'পাউণ্ডে'র দাম ১৫·২৭ টাকা, ১ আমেরিকান 'ডলারে'র দাম ৮·৮৯ টাকা। সেই রকম জার্মানীর 'মার্ক' ৩·৭৮, ফ্রান্সের 'ফ্রাঁ' ১·৭৯, ইটালীর 'লিরা' ০·০১, আরব দেশের 'দিরহাম' ২·২৮, বাংলাদেশের 'টাকা' ০·৫৭, নেপোলের 'রূপী' ০·৭১, রাশিয়ার 'রুব্‌ল' ১২·০০, আর জাপানের 'ইয়েন' ৩·২১ টাকা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ অন্য সব ব্যাঙ্কের মত নয়। দেশের গভর্নমেণ্ট প্রধানত রিজার্ভ ব্যাঙ্কেই তার টাকা রাখে। তা ছাড়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সব রকম নোট ছাপে (শুধু একটাকার নোট ছাড়া) তা আগেই বলেছি। এ কাজও অন্য কোনও ব্যাঙ্ক করতে পারে না।

ধাতুর ছোটবড় সব মুদ্রা তৈরি করা হয় সরকারী টাকশাল বা 'মিণ্ট-এ'। কলকাতায়ও একটি মিণ্ট আছে। আর, নোট ছাপা হয় মহারাষ্ট্রের নাসিক-এ।

বেশি নোট ছাপা হয় না কেন

আচ্ছা, গভর্নমেণ্ট একটা কাজ করে না কেন?

দেশে এত গরীব লোক, কাগজের দামও তো তেমন বেশি নয়,—তবে কেন অফুরন্ত নোট কাগজে ছেপে বিলিয়ে দেওয়া হয় না? দিলে তো সবাই বড়লোক হয়ে যেত, আর দুঃখকষ্ট থাকত না!

সেটা করা হয় না দু'টো কারণে। নোটের ওপর যে প্রতিজ্ঞা লেখা আছে, সেটা একটা কারণ। অত বেশি পরিমাণে নোট চালু করলে অত অজস্র কাঁচা টাকাও তার বদলে দেবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে—তা প্রায় অসম্ভব। তা ছাড়া, মানুষের সুখ তো শুধু টাকার জিনিস হতে পারে শুধু তত টাকাই চালু করতে হয়। তার বেশি বেহিসেবী ভাবে নোট ছাপলে আর টাকা বানালে সবাই বড়লোক হতে পারে, কিন্তু জিনিস তো অত নেই! যতটা আছে, তা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে, দাম বাড়বে। বড়লোক হয়েও অনেকেই জিনিস পাবে না।

এতে সুখ হয় না। সুখ হয় দেশে বেশি বেশি জিনিস পাওয়া গেলে। ভোগের জন্য নানারকমের জিনিস যত বেশি করে তৈরি হবে দেশের লোকের সুখ
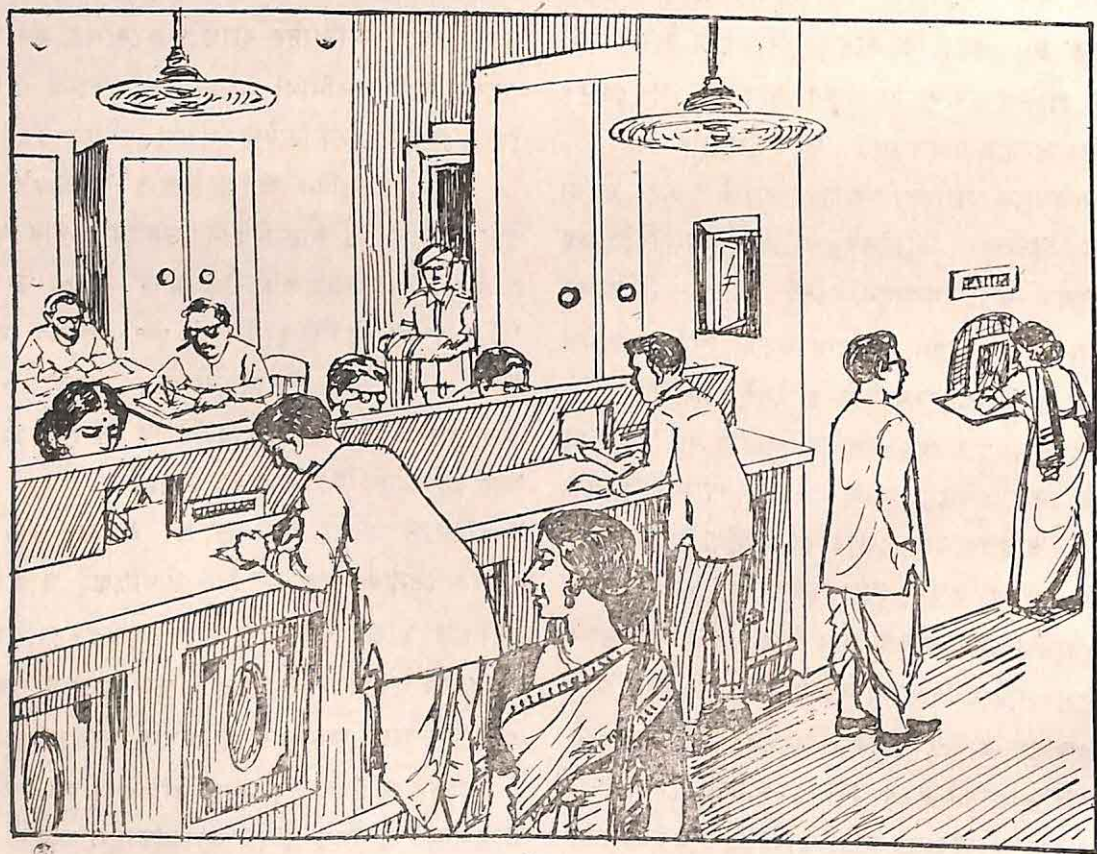
একটি ব্যাঙ্কের কাউণ্টার

টাকা পেলেই হবে না, সেই টাকার বদলে জিনিস পেলে তবেই না সুখ? তাই, দেশে সব শুদ্ধ যত তত বাড়বে। দেশে উৎপাদন বাড়ানোই হচ্ছে দেশের লোকের সুখের গোড়ার কথা।

চিত্রশিল্পের কথা

সর্বকালের—সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন চিত্রশিল্পী

ইয়োরোপের চিত্রশিল্পের কথার আরম্ভে প্রাচীন গ্রীক শিল্পীদের কথা যৎসামান্য বলে নিচ্ছি। অবশ্য সে যুগের কোন ছবিই এখনও থাকা সম্ভব নয়। গ্রীসের উত্তর-সাধক রোমের অপূর্ব চিত্রকলার যে সব বর্ণনা ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে আছে তার সব কিছুই বন্যা, অগ্নিদাহ ও বর্বরদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে। মাত্র পম্পিয়াইর ধ্বংসাবশেষ থেকে কয়েকখানি "ফ্রেস্কো" রক্ষা পেয়েছে। আজ তার মূল্য অপরিসীম।

প্রাচীন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরের নাম এপিলেস। তাঁর অনবদ্য বহু চিত্রের কথা গ্রীক সাহিত্যে পাওয়া যায়। কথিত আছে শিল্পী ছবি এঁকে বাজারের একটি কোণে ছবিগুলিকে টাঙ্গিয়ে রাখতেন—বাজারের পথ-চলতি লোকেদের দেখার জন্য। কখনও আবার নিজে একটি বড় ছবির পেছনে দাঁড়িয়ে থেকে লোকজনের মতামত শুনতেন কৌতূহলী হয়ে।

একদিন ছবি দেখতে এল এক মুচি। সে এসেই একটি ছবির জুতোর (নিশ্চয়ই স্যাণ্ডেলের) ভুল ধরে বসল। মুচি চলে গেলে চিত্রকরের নজর পড়ল সেইখানটায় যেখানটার কথা খানিক আগে মুচি বলে গেছে। চিত্রকর দেখলন ভুলটা ঠিকই ধরা হয়েছে। ছবিটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে ছবির ভুলটুকু শুধরে দিলেন তিনি। কয়েকদিন পরে মুচি এসে দেখে চিত্রকর তার কথামত ছবিটি সংশোধন করেছেন। আর যায় কোথায়? মুচির "মাথা মোটা" হয়ে গেল। সে তখন নিজেকে একজন মস্ত চিত্র-সমালোচক মনে করে টাঙ্গানো সবগুলি ছবিরই অজস্র ভুলভ্রান্তি ধরতে শুরু করে দিল।

শিল্পী আর থাকতে না পেরে ছবির পিছন থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "ভাই হে, তুমি জুতোর কারবারী, তাই জুতোর বেলা তোমার কথাটা আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু তোমার অন্য কথা আমি শুনতে রাজী নই।"

আরও একটি গল্প আছে তাঁর সম্বন্ধে। তিনি ছিলেন মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেজন্য শিল্পীর "বটে গায়" বা স্টুডিওতে তাঁর যাওয়া-আসা ছিল প্রায় হামেশাই। একদিন তিনি ছবি আঁকা সম্বন্ধে ষ্টুডিওতে বসে নানা কথা বলে যাচ্ছিলেন

অনর্গল। হঠাৎ শিল্পী তাঁর কাছে এসে কানে কানে বললেন, "বন্ধু! তুমি ছবি আঁকা সম্বন্ধে যা বলছ তা শুনে আমার ষ্টুডিওতে যে সব ছোকরারা রঙ বাটে তারাও হাসছে। কাজেই ভাই, তুমি ছবি আঁকা সম্বন্ধে কিছু না বলে যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু বল।"

ইয়োরোপের চিত্রশিল্পের আদিপুরুষ

এ তো গেল বহু পুরোনো আমলের কথা। ইয়োরোপের সুমহান্ চিত্রশিল্পীদের যে সব ছবির আমরা শুধুমাত্র "প্রিন্ট" দেখেই মোহিত হই তাঁরা সকলেই "রেনেসাঁর" অর্থাৎ "নবজাগরণ যুগের" মানুষ। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি সার্থক ছবি এঁকে চির-স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর নাম জিয়োটো। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে ইটালির ফ্লোরেন্স শহরের কাছে এক গ্রামে মেষপালকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ছোট্ট জিয়োটো বাবার ভেড়ার পাল নিয়ে চরাতে যেত মাঠে। ভেড়াগুলো চরে বেড়াত আর বালক পাথরের উপর কাঠকয়লা দিয়ে বসে বসে ভেড়ার ছবি আঁকত। একদিন তন্ময় হয়ে বালক ছবি আঁকছে, পিছন থেকে তার গায়ে মস্ত বড় কার একটা ছায়া এসে পড়ল। সে পিছন ফিরে দেখে, মাঝ-বয়সী এক দীর্ঘদেহী পুরুষ মুগ্ধদৃষ্টিতে তার ছবি আঁকা দেখছেন। এই লোকটি আর কেউ ন'ন, তখনকার ইটালির সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর জিওভেনী সিমাবো। জিয়োটোর ছবি আঁকার হাত দেখে তিনি তাকে ভর্তি করে নিলেন তাঁর ষ্টুডিওতে। এই জিয়োটোকেই বলা হয় ইয়োরোপীয় চিত্রশিল্পের আদি-পুরুষ। সমকালের সাহিত্যিক বোকাচিও তাঁর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন, "জিয়োটো যাই আঁকেন তাই সুন্দর,—ঘর, বাড়ি, মানুষ, জন্তু, ফল, ফুল—সবই যেন জীবন্ত।"
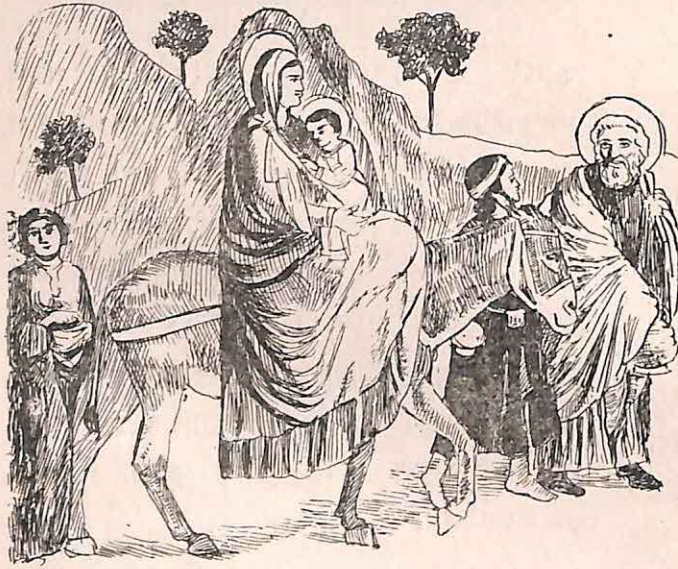
শিল্পী জিয়োটোর আঁকা মা মেরীর কোলে যীশু

টেম্পারা আর তেলরঙ

এর পরেই বলতে হয় বিখ্যাত চিত্রকর বটিচিল্লীর কথা (১৪৪৪-১৫১০)। তাঁর আঁকা "বসন্তের আগমন", "সমুদ্র থেকে ভেনাসের উত্থান" ইত্যাদি ছবি পৃথিবীবিখ্যাত। বটিচিল্লী তাঁর ছবিগুলি জিয়োটোর মত "টেম্পারা" রঙ দিয়েই এঁকে গেছেন। টেম্পারা রঙ মানে গুঁড়ো রঙের সঙ্গে ডিমের হলদে অংশ বা শিরীষের আঠা দিয়ে রঙ গুলে যে রঙ হয়। তেল রঙ আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত চিত্রকররাই এই টেম্পারা রঙ দিয়েই ছবি এঁকে গেছেন। পৃথিবীবিখ্যাত চিত্রশিল্পীরা অনেকেই ইটালিতে জন্মগ্রহণ করলেও তেল রঙ আবিষ্কৃত হয়েছে নেদারল্যাণ্ডে। তেল রঙের অবিষ্কার চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা বলা যেতে পারে।

নেদারল্যাণ্ডের দুই চিত্রকর ভ্রাতৃযুগল—বড় হুবার্ট

চিত্রকর বটিচিল্লীর আঁকা "বসন্তের আগমন"

(১৩৬৫), ছোট জন ভেনাইক (১৩৮৫)। এই দুই ভাই চিত্রজগতের যে কি উপকার করে গেছেন তা বলে শেষ করা কঠিন। অথচ এঁদের জীবনের কোন কথাই পরিষ্কার ভাবে জানা যায় না। শুধু এইটুকু মাত্র জানা যায়—যে একদিন ছোট ভাই জন একখানি ছবি এঁকে, তাতে "বানিশ" লাগিয়ে রোদে শুকুতে দেন। খানিক বাদে এসে দেখেন ছবিখানি ফেটে গেছে চৌচির হয়ে। এর পরই দু' ভাই বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিসির তেলের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে তেল রঙ অবিষ্কার করেন। জন ভেনাইকের আঁকা অনেক ছবি নানা সংগ্রহশালায় আছে। বার্লিন মিউজিয়ামে রক্ষিত তাঁর আঁকা "দি ম্যান্ উইথ্ দি পিঙ্ক্স্" নামে একজন পাদ্রীর ছবি জগৎবিখ্যাত। পাঁচশ' বছর আগের আঁকা ছবিখানির রঙের ঔজ্জ্বল্য ও ড্রইংএর মুন্সীয়ানা সত্যিই অচিন্ত্যনীয়। বড় ভাই হুবার্টের আঁকা কোন ছবি পাওয়া যায় না।

একসঙ্গে তিন মহাশিল্পী

শিল্পী বটিচিল্লী যখন বৃদ্ধ তখন ইটালিতে এল চিত্রশিল্পীদের এক প্রবল বন্যা। এমন বন্যা পৃথিবীর লোক কখনোই দেখে নি। লিওনার্দো দ্য ভিন্সী (১৪৫২-১৫১৯), মিকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪), র‍্যাফেল (১৪৮৩-১৫২০) এই তিন মহাশিল্পীর একত্র সমাবেশ এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। প্রায় একশ' বছরের মধ্যে ইয়োরোপীয় চিত্রকলার মান যে কোথায় গিয়ে উঠল তা আজ পাঁচশ' বছর পরেও লোকে ভেবে পায় না।

শিল্পী জন ভেনাইকের আঁকা "দি ম্যান উইথ্ দি পিঙ্ক্স্"

এমন অঘটন যোগাযোগ কি করে সম্ভব হ'ল কে

জানে? এই তিনজন শিল্পী আজ পাঁচশ' বছর ধরেই সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। সর্বশ্রেষ্ঠ কথাটা এখানে তিন জনের বেলাতেই সমান ভাবে প্রযোজ্য।

লিওনার্দো দ্য ভিন্সী

এই তিন মহাশিল্পীর মধ্যে লিওনার্দো দ্য ভিন্সী সকলের বড়। তিনি ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে ভিন্সী নামে ইটালির এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এঁকে শুধু একজন জগৎ-বিখ্যাত চিত্রকর বললে খুবই কম বলা হয়। তাঁর মত মহামানব পৃথিবীতে বহু যুগ পরে এক একজন দেখা দেন। তিনি দেখতে ছিলেন অদ্ভুত রকমের সুন্দর। শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনি নাকি একটা মজবুৎ ঘোড়ার পায়ের লোহার নালকে খালি হাতে অবলীলাক্রমে সোজা করে ফেলতে পারতেন। তাঁর বাচনভঙ্গী ছিল অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ ও মধুর। অত্যন্ত সাহসী, সর্বকাজে সর্বভাবে তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে পৃথক্। যদি তিনি একটি ছবিও না আঁকতেন, কেবল একজন দক্ষ ভাস্কর রূপেই পৃথিবীখ্যাত হতেন নিশ্চয়ই। যদি তিনি তূলি বা ছেনি কোনটাই না ধরতেন তবুও তিনি জগৎবিখ্যাত হতেন তাঁর বহুমুখী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য। তাঁর সমসাময়িক মানুষদের চেয়ে তিনি একশ' বছর এগিয়ে ছিলেন। রসায়ন শাস্ত্রে তিনি ছিলেন বিশেষ অভিজ্ঞ, পদার্থবিজ্ঞানেও তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। এ ছাড়া "অ্যানাটমী" বা অস্থিবিদ্যা পুস্তকেরও তিনিই সর্বপ্রথম লেখক। এই সর্বগুণান্বিত মানুষটির সম্বন্ধে আজও নতুন নতুন কথা এবং নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হতে দেখা যায়।

অল্প বয়সে এই অত্যন্ত একগুঁয়ে ছাত্রটিকে গুরু-মশাইরা এঁটে উঠতে পারতেন না; কিন্তু অসীম প্রতিভার অধিকারী এই বালককে ভালো না বেসে কোন উপায় ছিল না তাঁদের। ছবি আঁকায় ঝোঁক অত্যন্ত প্রবল দেখে তাঁর বাবা তাঁকে তাঁর এক চিত্রকর বন্ধুর কাছে ছবি আঁকার পাঠ নেবার জন্য পাঠান। শিক্ষক মশাইটি স্থানীয় গীর্জার একখানি মস্ত বড় "ফ্রেস্কো পেন্টিং" করার অর্ডার পান। ষ্টুডিওর সর্দার পড়ুয়ারাই ফ্রেস্কোখানির বিভিন্ন অংশের ড্রইং এবং রঙ করার কাজেকর্মে ব্যস্ত। বালক লিওনার্দো ঘরের এক কোণে বসে এক শীট মোটা কাগজে কয়লা দিয়ে একটি দেবদূতের মূর্তি আঁকতে আরম্ভ করেন। ছবিটি যখন শেষ হ'ল তখন গুরুমশাই ও সর্দার পড়ুয়াদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। এও কি সম্ভব—এইটুকু ছেলের এমন আঁকা? কিছুদিনের মধ্যেই লিওনার্দোর নাম লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। সেই সুনাম, সেই সুযশ চলে আসছে আজ পাঁচশ' বছর পর্যন্ত সমান ভাবে। তাঁর আঁকা বহু ছবির মধ্যে "দি লাস্ট সাপার" ও "মোনা লিসা"র নাম সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীবিখ্যাত এই মোনা লিসার নাম না শুনেছে এমন শিক্ষিত মানুষ বোধ হয় নেই। এই ছবিটি সম্বন্ধে আজও মানুষের নানা জল্পনাকল্পনা, নানা কৌতূহল। "মোনা লিসা" সম্বন্ধে ছোটখাট, টুকিটাকি খবর সারা পৃথিবীর লোক এখনও উদ্‌গ্রীব হয়ে শোনে। যে মহিলাটিকে "মডেল" করে তিনি এই ছবিটি এঁকেছেন তিনি বাস্তব জীবনে এক "ফ্লোরেনটাইন" রাজপুরুষের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। শিল্পী নানা বিষয়ের নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় এক নাগাড়ে ছবির কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি, সেজন্য অনেক দিন লেগেছিল ছবিখানি শেষ করতে। শিল্পীর নিজের কথা হ'ল ছবিটি শেষ হয় নি। মোনা লিসার মুখের রহস্যময় হাসিটুকু ধরে রাখার

জন্য শিল্পী বহু বাজীকর, গায়ক, যাদুকর, বিদূষক আমদানি করতেন তাঁর ষ্টুডিওতে। অর্থাৎ "মডেলের" মুখের হাসি সজীব রাখবার জন্য শিল্পীকেও কম পরিশ্রম করতে হয় নি!

তবু সমস্ত পৃথিবীশুদ্ধ লোক হায় হায় করে উঠল।

ছবিখানি আকারে ছোট (৩ ফুট × ২ ফুট ৪ ইঞ্চি)। চোর ছবিখানিকেই শুধু ফ্রেম থেকে খুলে নিয়েছে। মহামূল্য ফ্রেমটি দেয়ালে ঝোলানোই

মডেলের মুখের হাসি সজীব রাখবার জন্যে শিল্পীকেও কম পরিশ্রম করতে হয় নি!

এ হেন জগৎবিখ্যাত ছবি ১৯১১ সালে প্যারিসের "লুভ্যর" মিউজিয়াম থেকে গেল চুরি হয়ে। সমস্ত পৃথিবী রুদ্ধনিশ্বাসে এই খবর শুনল। চর্মচক্ষে এ ছবি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আর ক'জনেরই বা?

ছিল। আরও আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, চোর ছবিটি নিয়ে দু'দু'টি কক্ষ অতিক্রম করেছে, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমেছে, দু'টি উঠোন পার হয়েছে। অথচ এ ঘটনা ঘটেছে দিনের বেলায়—কারো নজরে

পড়ল না ! এ কি হতে পারে ? ভৌতিক রহস্য নাকি !

গ্যালারীর ডাইরেক্টর-সহ অধস্তন বারোজন কর্মচারী বরখাস্ত হলেন। শত শত পুলিস ও ডিটেক্‌টিভ সর্বত্র খোঁজখবর নেবার জন্য নিয়োজিত হ'ল। সারা বিশ্ব তোলপাড়। কিন্তু ছবি বা চোরের কোন সন্ধানই মিলল না। ছবিখানি ফিরে পাওয়ার আশা যখন সকলে এক রকম ছেড়েই দিয়েছে তখন ১৯১৩ সালের বড়দিনের সময় ফ্লোরেন্সের এক পুরোনো ছবির দোকানে একটি লোক দামী কাগজে মুড়ে একখানি ছোট ছবি বিক্রি করতে চাইল। দোকানের মালিক ছবির মোড়কটি খুলে ছবিখানি দেখেই হতভম্ব ও হতবাক্ হয়ে গেলেন। ছবিখানি যে চুরি-যাওয়া "মোনা লিসার" আসল ছবি দোকানীর সন্ধানী চোখ তা এক লহমাতেই বুঝে নিল। তারপর আর কি ? যথা নিয়মে চোর গ্রেপ্তার হ'ল। আবার মোনা লিসার মুখে নিজের জায়গায় সেই ঘরেই তার ভুবন-ভোলানো হাসি ফুটে উঠল। জগৎবাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

লিওনার্দো সর্বদাই খুব জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকতে ভালবাসতেন। অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে যখন তিনি চলাফেরা করতেন তখন তাঁকে রাজার মতই মনে হ'ত।

তাঁর শেষজীবন তিনি অতিবাহিত করেন ফরাসী দেশে। প্রথম ফ্রান্সিসের অনুরোধে ১৫১২ সালে ফরাসী রাজসভার অতিথি হয়ে ক্লাউ নগরে এক রাজার প্রাসাদের মত গৃহে তিনি অবসর-জীবন কাটাচ্ছিলেন। কিছুদিন থেকেই তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছিল না, তাই রাজা স্বয়ং এলেন তাঁকে দেখতে। রাজাকে অভিনন্দিত করবার জন্য বিছানাতে উঠে বসেই তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন ; তাড়াতাড়ি রাজা তাঁকে ধরে ফেললেন। রাজার দেহের উপরেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তিনি নিজে ছিলেন রাজাধিরাজ, রাজার মতই তাঁর জীবনের অবসান ঘটল।

মিকেল এঞ্জেলো

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের মধ্যে বয়সে দ্বিতীয় হলেন মিকেল এঞ্জেলো বুনোরোট্টি। ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে ৬ই মার্চ ফ্লোরেন্সের ক্যাপরিস্ নগরে এক অভিজাত বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন সেই শহরেরই শাসনকর্তা। ফ্লোরেন্সে তখন মেডিচি পরিবারের যুগ। সারা ইয়োরোপ যুড়ে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি। মেডিচিরা ছিলেন শিল্প, সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক।

মিকেল এঞ্জেলোর বাবা, আর পাঁচটা ছেলের বাবার মতই, ছেলে যাতে লেখাপড়া শিখে রাজকার্য অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করে ভদ্রলোকের মতই জীবন-যাত্রা চালিয়ে যেতে পারে এই রকম ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু যিনি কালজয়ী ও পৃথিবীর বিস্ময় হয়ে জন্মেছেন তাঁর চলার পথ কি এতই সরল ? মিকেল এঞ্জেলো ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকতে, ড্রইং করতে বা কাদামাটি দিয়ে মূর্তি গড়তে এমন অসম্ভব আগ্রহী ছিলেন যে অন্য কোন বিষয়ে তাঁকে কিছুতেই টেনে নিয়ে যাওয়া যেত না। লেখাপড়ায় মন নেই, একটু ফাঁক পেলেই স্কুল পালিয়ে পটুয়াদের বা পাথর-কাটা মিস্ত্রীদের বাড়ি গিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করতে লেগে যেতেন তিনি।

মিকেলের জন্মের পর থেকেই তাঁর মা ছিলেন খুবই অসুস্থ। সেজন্য স্থানীয় এক পাথর-কারিগরের

স্ত্রীকে নিয়োগ করা হয়েছিল শিশু মিকেলকে বুকের দুধ দেবার জন্য। পরবর্তী জীবনে শিল্পী এই পাথর-কারিগরের স্ত্রী, তাঁর ধাত্রীমায়ের দুধের দৌলতেই ভাস্কর হয়েছেন বলে গর্ব অনুভব করতেন।

শেষ পর্যন্ত তাঁর বাবা তাঁকে শিল্পী ঘারলেণ্ডিওর "বটেগায়" বা স্টুডিওতে ভর্তি করে দিতে বাধ্য হন। বালকের হাতের কাজকর্ম দেখে গুরু ও তাঁর সর্দার শিষ্যরা চুপচাপই রইলেন। গুরুদক্ষিণার পরিবর্তে শিষ্যকে কিছু হাত-খরচা দিয়ে স্টুডিওতে রেখে দিলেন মাত্র। মিকেলকে যে কাজ করতে দেওয়া হ'ত তা তিনি এমন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতেন যা কেউ ভাবতেও পারত না। কপি করার সময় কোন্‌টি আসল আর কোন্‌টি কপি তা বুঝতে গেলে মাথা খাটাতে হ'ত।

একদিন মিকেল এঞ্জেলোর তৈরি একটি গ্রীক মূর্তির কপি মেডিচি পরিবারের তখনকার প্রধান লরেঞ্জো ডি মেডিচির নজরে পড়ে গেল। এই লরেঞ্জো ডি মেডিচি নিজে ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক। শিল্প, সাহিত্য, গ্রীক, রোমান মূর্তি ও প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহে তিনি ছিলেন একজন অদ্বিতীয় উৎসাহী পুরুষ। তাঁর বিশাল সংগ্রহশালা দেখবার জন্য দেশবিদেশের বহু গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্বদা ভিড় জমাতেন তাঁর গৃহে। সে গৃহে আর ছিলেন একজন বৃদ্ধ ভাস্কর বার্তোলদো, তাঁরও নাম তখন ছিল সর্বজনবিদিত। লরেঞ্জো ডি মেডিচি, বালক মিকেলের প্রতিভায় মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে তাঁকে পাঁচশ' ডুকাট মাসিক বেতন ও মেডিচি পরিবারের একজন হয়ে বাস করবার আমন্ত্রণ জানালেন, ভাস্কর বার্তোলদোর কাছে শিক্ষানবীশও করে দিলেন তাঁকে। বালক মিকেলও তাঁর মনোমত

মিকেল এঞ্জেলোর তৈরি "প্রস্তরীভূত অশ্রু" ("পিয়েতা")

কাজ পেয়ে দিবারাত্রি পাথর কাটার কাজে বিভোর হয়ে রইলেন। বৃদ্ধ গুরুও শিষ্যের কাজে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে তাঁর সমস্ত বিদ্যা অকাতরে তাঁকে দান করতে লাগলেন। মেডিচির সভায় গুণী, জ্ঞানী, রসিক, ব্যক্তিদের সাহচর্যে এসে মিকেল এঞ্জেলো দিনে দিনে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁর কপালে বেশিদিন সুখ ছিল না। যখন তাঁর মাত্র সতেরো

বছর বয়স তখন লরেঞ্জো ডি মেডিচি মারা যান। তাঁরও সুখের দিনের অবসান হয়। পরবর্তী মেডিচি
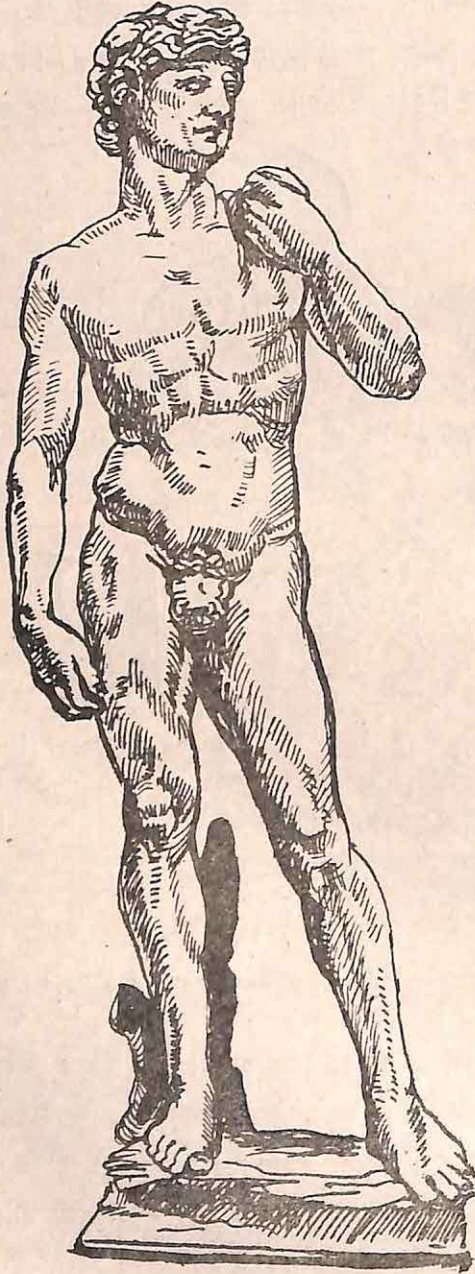
মিকেল এঞ্জেলোর গড়া "ডেভিডের" মূর্তি

হলেন পিয়ারো। তাঁর শিক্ষা ও সাহিত্যে কোন অনুরাগই ছিল না। তিনি মিকেলকে একটি বরফের মূর্তি তৈরি করার হুকুম দিলেন। মিকেল এতদিন মেডিচি পরিবারের একজনের মত হয়েই ছিলেন, পিয়ারোর আমলে সম্পর্কটা বদলে গিয়ে অনেকটা প্রভু-ভৃত্যের মতই হয়ে উঠল। শিল্পীর এটা অসহ্য বোধ হ'ল, তিনি ফ্লোরেন্স ছেড়ে চলে এলেন বোলোগনায়। এখানে তিনি পুরোনো গ্রীক প্রথায় একটি ছোট ঘুরন্ত কিউপিডের মূর্তি তৈরি করেন। মূর্তিটি সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁর জীবনীকার ভ্যাসারী বলেছেন, কিন্তু মূর্তিটি পাওয়া যায় নি। আরও নানা ছোটবড় মূর্তি এখানে তিনি করেছেন। হঠাৎ একদিন এই সব ছোট-খাট কাজ ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর বিস্ময় রোমের সেণ্ট পিটার্স গীর্জার জন্য "পিয়েতা"র (মা মেরীর কোলে মৃত যীশুর মূর্তির) অর্ডার পান কার্ডিনাল গ্রোজলের কাছ থেকে। এই "পিয়েতা" মূর্তিটির পরিকল্পনাও সম্পূর্ণ নতুন। মেরী মা'র কোলে শিশু যীশুর ছবি সে যুগের প্রায় সব শিল্পীই এঁকে গেছেন, কিন্তু যুবতী মেরী মাতার কোলে পূর্ণাবয়ব যীশুর মূর্তি কেউই কখনো পরিকল্পনা করেন নি। এই মূর্তিটিকে "প্রস্তরীভূত অশ্রু" (পাথর-হয়ে-যাওয়া চোখের জল) বলে পরবর্তী সমালোচকরা আখ্যা দিয়েছিলেন। এই মূর্তি নিয়ে মিকেলকে অবশ্য বহু বিরূপ সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছিল। আজও এই কাজটির জন্য সমস্ত শিল্পীজগৎ অবাক্ বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

১৫০১ খৃষ্টাব্দ। মিকেল তখন মাত্র ছাব্বিশ বছরের যুবক। বিখ্যাত "ডেভিডের" মূর্তি তৈরি করার জন্য তিনি চলে এলেন ফ্লোরেন্সে। এবার এইখানেই তাঁর সঙ্গে লিওনার্দো দ্য ভিন্সীর দেখাশোনা হয় ও পরে তাঁর সঙ্গে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়েন।

এ চক্রান্ত ছিল কুচক্রীদের। তাঁরা যদি বন্ধুভাবাপন্ন হ'তেন তবে দুই যুগন্ধর পুরুষের বন্ধুত্বে পৃথিবী হয়তো আরও বিস্ময়কর সৃষ্টির সন্ধান পেত। তা আর হ'ল না। "ডেভিডের" কাজ শেষ করেই তিনি পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের আহ্বানে রোমে চলে যান।

পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস তাঁর নিজের সমাধিসৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা করার জন্য তাঁকে ডেকেছিলেন। এ প্রথা তখন প্রচলিত ছিল। মিকেল সানন্দে কাজটি গ্রহণ করলেন, কারণ তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন একটা বিশাল বড় কিছু করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। বিশাল সেই সমাধিমন্দিরের পরিকল্পনা, তার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও নানা ধরনের অলঙ্করণের মোহ তাঁকে অস্থির করে তুলল। শুধুমাত্র ড্রইং ইত্যাদি করতেই বহু সময় ব্যয় হ'ল। তার পর আছে ভালো মার্বেল পাথর কেনা। তাতেও বহু অর্থ খরচ হয়ে গেল তাঁর নিজের ট্যাঁক থেকেই। কারণ অগ্রিম কোন অর্থ পোপ তাঁকে দেন নি। অবস্থা যখন এমন ভয়াবহ তখন ব্রামান্টি নামে একজন ভাস্কর, যে ছিল ওদের ভাষায় 'পরামর্শদাতা';—মিকেল এত বড় একটা কাজ একাকী করবে, এতে এত অর্থের ও পৃথিবীযোড়া সম্মানের অধিকারী হবে সে একা,—এ আর তার সহ্য হ'ল না। পোপের কাছে গিয়ে দিনের পর দিন,—"নিজের সমাধি নিজের করে যাওয়া মহাপাপ"—এ যেন পোপ না করেন এই বোঝাতে লাগল। পোপ শেষ পর্যন্ত ব্রামান্টির কথায় সমাধির কাজ বন্ধ করে দিলেন, এমন কি মিকেল ভ্যাটিকানে গিয়ে যখন পোপের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন তখন তাঁকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। গাঁটের সমস্ত পয়সা খরচ করে ফিরে এলেন তিনি ফ্লোরেন্সে।

এখানে এসেও তাঁর নিস্তার নেই। কারণ তাঁর পরিবারের অবস্থা তখন গেছে পড়ে, আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে অর্থের জন্য পাগল করে তুলল। তিনি ঐ অবস্থায় যা পারেন, ধার-দেনা করেও পরিবারের প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। কিন্তু তাতেও আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে রেহাই দিল না।

মিকেল ছিলেন অবিবাহিত; একটিমাত্র ভৃত্য নিয়ে ছিল তাঁর সংসার। পোশাকপরিচ্ছদ যৎসামান্য, বন্ধুবান্ধব বলতেও কেউ বড় বিশেষ ছিল না।

হঠাৎ আবার পোপের আহ্বান—তাঁকে আবার রোমে যেতে হবে এক্ষুনি। পোপের নাম শুনেই, তিনি যাবেন না কিছুতেই বলে স্থির করলেন। কিন্তু সকলেই "মহামান্য" পোপকে অগ্রাহ্য করাটা ভালো কাজ হবে না বলে মন্তব্য করল। গেলেন তিনি আবার পোপের দরবারে। এবার পোপ এক অদ্ভুত কাজের ভার দিতে চাইলেন মিকেলকে। তাঁর উপর আদেশ হ'ল ভ্যাটিকানের "সিস্‌টাইন চ্যাপেলের" ছাদে ও দেয়ালে ফ্রেস্কো আঁকবার ভার তাঁকে নিতে হবে। বিস্মিত মিকেল বললেন, "আমি ভাস্কর, পাথরের কাজ করি, ছবি আমি আঁকবো কি করে? বরং আপনি এ কাজটি শিল্পীবন্ধু র‍্যাফেলকে দিন।" কিন্তু পোপ নির্বিকার। এটাও তাঁর ঈর্ষ্যান্বিত শত্রু-দেরই নিখুঁত পরিকল্পনা। পোপের আদেশ অমান্য করা সম্ভব নয়। ছবি আঁকতে গিয়ে শিল্পী হবেন চরম অপমানিত। ঐটাই ছিল তাদের চক্রান্তের মূল সূত্র।

শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঐ কার্যভার গ্রহণ করতে হ'ল। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দ হতভাগ্য শিল্পী লিখলেন, "আমি ভাস্কর, এই সুমহান্ গীর্জার ছবি আঁকতে আরম্ভ করলাম।"

পুরো চার বছর একাকী সেই সুমহান্ শিল্পী এই মস্ত বড় গীর্জার কাজ করে গেলেন অশেষ ধৈর্য ধারণ করে। পোপ কিছু কিছু সাহায্যকারী শিল্পীকে

পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাজে সহায়তা করার জন্য। কিন্তু তাদের হাতের কাজ দেখে একদিন তিনি মারধোর করে তাড়িয়ে দিলেন সকলকে। সম্পূর্ণ একাকী এই মানুষের অসাধ্য কাজ, যা করতে অন্তত দশ বছর লাগার কথা, তা চার বছরে শেষ করলেন মিকেল। তাতেও কি পোপ সন্তুষ্ট? প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে কড়া তাগাদা লাগিয়েছেন, এবং এত দেরী না করতে রোজই উপদেশ দিয়েছেন। ছাদের ছবি আঁকতে গিয়ে শিল্পীকে ভারার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে ছবি আঁকতে হয়েছে। এতে তাঁর ঘাড়ের, রগের ও মাংসপেশীর উপর এমন চাপ পড়ে যে বহুদিন পর্যন্ত কিছু পড়তে গেলে সেটিকে মাথার উপরে না ধরলে তিনি কিছুই দেখতে পেতেন না। এই গুরুভার কাজের চাপে সাঁইত্রিশ বছর বয়সেই তিনি অন্ধ এবং কুঁজো হয়ে গিয়েছিলেন। তার উপরে অর্থের জন্য আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে কড়া তাগাদা, পোপের অসৌজন্যমূলক ভাষণ ও আচরণে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে তিনি ছবির কাজ শেষ হয়েছে বলে ঘোষণা করায়, শত্রু-মিত্র যে যেখানে ছিল সকলেই এসে সে ছবি দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও হতবাক্ হয়ে রইল। মহান্ চিত্রশিল্পী র‍্যাফেল তাঁর ছবি দেখে মন্তব্য করেছিলেন, "ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, এই ছবি দেখার সৌভাগ্য থেকে তিনি আমাকে বঞ্চিত করেন নি।"

এ তো গেল ভালো ভালো কথা। কিন্তু তখনও দুর্ভাগ্যের অনেকখানি বাকি। হঠাৎ পোপ জুলিয়াস মারা গেলেন। ছবি আঁকার মজুরীর সামান্য সামান্য মাঝে মাঝে তাঁকে দেওয়া হয়েছে, মোট অর্থ কাজ শেষ হলে পাবেন বলে কথা ছিল। পরবর্তী পোপের কাছ থেকে সেই অর্থ আর আদায় হ'ল না। আবার শূন্য হাতে বাড়ি ফিরলেন শিল্পী সেই সব আত্মীয়স্বজনের কাছে।

মিকেল এঞ্জেলোর আঁকা একখানি জগৎবিখ্যাত ফ্রেস্কো

ফ্লোরেন্সে এসে তিনি তাঁর পুরোনো পৃষ্ঠপোষক লরেঞ্জো ডি. মেডিচির সমাধিক্ষেত্রের নানা অলঙ্করণ, নানা মূর্তির কাজকর্ম করে নিজেকে কর্মরত রাখার চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় আবার এল রোম থেকে "কড়া আহ্বান"—আবার সেই পোপের কাছ থেকে। "সিস্‌টাইন চ্যাপেলের" মূল প্রার্থনা-ঘরের বৃহৎ দেওয়ালে পৃথিবীর বৃহত্তম ফ্রেস্কো "লাস্ট জাজ্‌মেণ্ট" আঁকার।

শিল্পীর বয়স তখন একষট্টি বছর। তিনি কাজ আরম্ভ করলেন, এবং "পৃথিবীর বিস্ময়" "লাস্ট জাজ্‌মেণ্ট" শেষ হ'ল পাঁচ বছর পরে।

দারুণ পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে, কিন্তু আশ্চর্য, তার পরেও তিনি অনেক দিন বেঁচে ছিলেন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে উননব্বই বছর বয়সে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে সমকালীন জীবনীকার ড্যাসারীর কাছ থেকে জানা যায়,—রাত্রিতে তাঁর ঘুম আসত না। তিনি শক্ত কাগজ দিয়ে এক রকম টুপি তৈরি করে, তার উপরে মোমবাতি বসিয়ে সেই ম্লান আলোতেই পাথর কেটে মূর্তি গড়ে চলতেন রাতের পর রাত। এইভাবে এক সময় তাঁর জ্বর হ'ল; কিন্তু তাঁর অনুগত ভৃত্য তাঁকে বিছানায় শোয়াতে পারে নি। তিন দিন পরে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় তিনি বিছানায় গেলেন, এবং সেদিনই বিকেলে তিনি দেহত্যাগ করলেন। মৃত্যুকালে শুধু এক বিশ্বস্ত ভৃত্য ছাড়া বড় বিশেষ কেউ কাছে ছিল না। তাঁর চরিত্রের মধ্যে সর্বক্ষণ একটা অসম ভাব ছিল। বহু অর্থ তিনি উপার্জন করেছেন। নিজে তা ভোগ না করে, অকৃতজ্ঞ আত্মীয়স্বজনদের সুখী করতে চেষ্টা করে গেছেন। গোপন দানও ছিল তাঁর প্রচুর। তিনি বাস করতেন নোংরা পরিবেশে এবং কৃপণের মত। তাঁর ভক্ত শিষ্য, অনুরাগীরা তাঁর অমানুষিক প্রতিভার এককণাও গ্রহণ করতে পারে নি। আজ পর্যন্ত দেহভঙ্গিমার নব নব রূপায়ণে তিনিই একক কারিগর হয়ে আছেন, কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়।

মিকেল এঞ্জেলোর আর একখানি ফ্রেস্কো
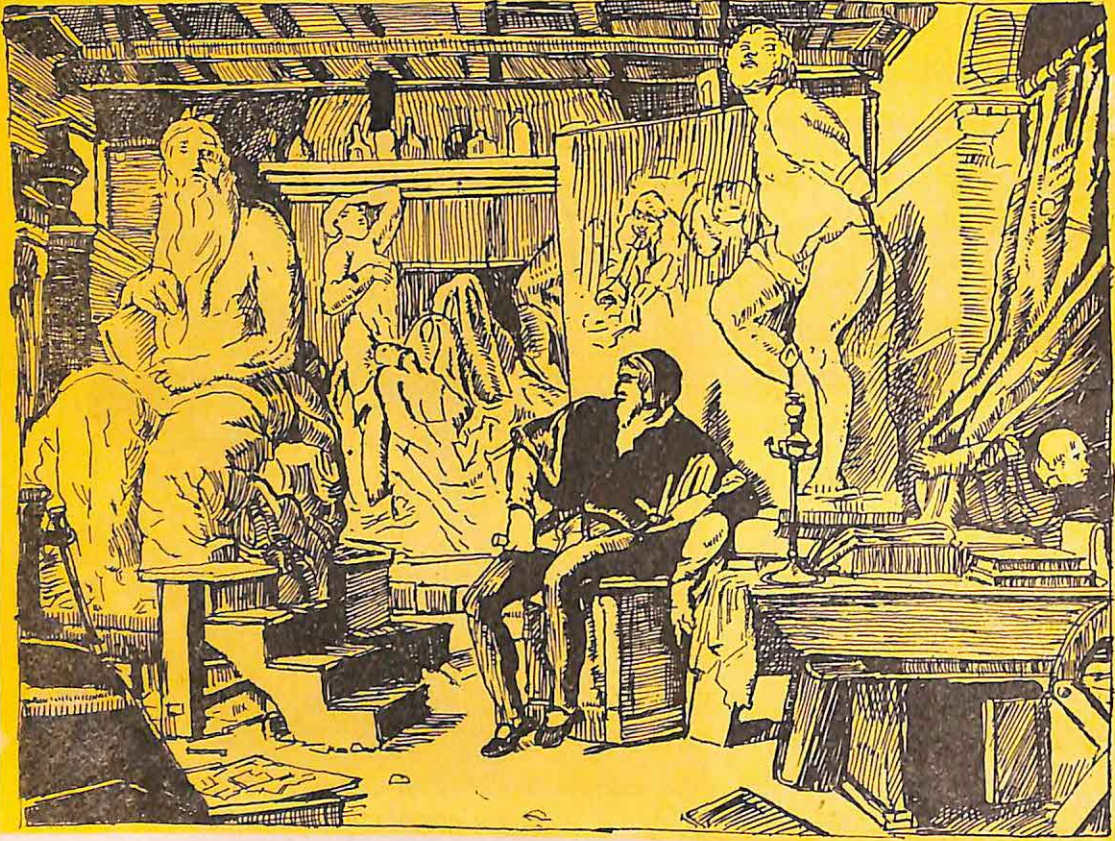
নিজের ষ্টুডিওতে মিকেল এঞ্জেলো

র‍্যাফেল

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে বয়সে তিন নম্বর ছিলেন র‍্যাফেল। মিকেল এঞ্জেলোর জীবন দীর্ঘ, অসুখী ও বহুপ্রকার ঝঞ্ঝাটপূর্ণ, র‍্যাফেলের জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত, আনন্দময় ও বাধাবিঘ্ন-রহিত।

পৃথিবীর শিল্পরসিক বহু গুণী-জ্ঞানীর মতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এই তিন চিত্রশিল্পীদের মধ্যে র‍্যাফেলের কৃতিত্বই নাকি সব চাইতে বেশি। তাঁরা বলেন, র‍্যাফেলের স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত ছবিগুলি যে কী অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন তা বোঝা যায় যখন দেখা যায় একদিকে বহুমুখী প্রতিভাধর শিল্পী ও বিজ্ঞানী লিওনার্দো দ্য ভিন্সীর কাজ ও অন্যদিকে মিকেল এঞ্জেলোর অতুলনীয় চিত্রকলা ও জীবন্ত ভাস্কর্য। পাশাপাশি পৃথিবীর এই দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মধ্যে একই সময়ে, একই পরিবেশে, এবং তার চেয়েও বড় কথা—এই দু'জনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে, তৃতীয় শ্রেষ্ঠত্বের গোরব অর্জন করা কত কঠিন ও কতখানি শক্তির প্রয়োজন তা পরিমাপ করা অসম্ভব।

১৪৮৩ সালে গুড ফ্রাইডের দিনে অর্থাৎ প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে) ৬ই এপ্রিল মধ্য ইটালির আর্বিনো

শহরে এক বিখ্যাত চিত্রকরের ঘরে র‍্যাফেল জন্মগ্রহণ করেন। ছবি আঁকার প্রথম পাঠ তাঁর বাবার কাছ থেকেই তিনি পান, পরে তিনি ফ্লোরেন্সে গিয়ে পাঠ শেষ করেন। তাঁর বাবা গীর্জার বেদীতে ফ্রেস্কো আঁকার কাজে দক্ষ ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই র‍্যাফেল বাবার সঙ্গে কাজ করে কৃতিত্ব অর্জন করেন। দেখতে র‍্যাফেল ছিলেন অত্যাশ্চর্য সুপুরুষ। তাঁর ছেলেবেলার নিজের হাতে আঁকা নিজেরই একখানি প্রতিকৃতি (সেল্‌ফ্ পোর্ট্রেট) লুভ্যর মিউজিয়ামে আছে। তাঁকে দেবদূতের মত সুন্দর (বিউটিফুল অ্যাজ্ অ্যান্ এঞ্জেল) বলা হ'ত। সেই সুন্দর মুখের কথাবার্তা ছিল ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, আর ব্যবহার ছিল অতি মনোরম। কাজেই তাঁকে একবার যে দেখেছে সেই ভালো না বেসে পারত না।

তিনি যখন রাস্তা দিয়ে চলতেন, তাঁর ভক্ত, শিষ্য ও অনুরাগীরা চলত সঙ্গে সঙ্গে। সর্বত্র তিনি সম্মান, আদর ও অভ্যর্থনা পেতেন অজস্রভাবে।

ধর্মীয় ছবি, বিশেষত মেরী মাতা ও শিশু যীশুর ছবিই তিনি এঁকে গেছেন—নানা ধরনের, নানা আকারের। সেই জীবন্ত ও ঐশীভাবাপন্ন ছবিগুলি দেখে দর্শকেরা মেরী মাতার কোলে বসা সেই দেবশিশুরই যেন সান্নিধ্য লাভ করে।

শিশুকালেই র‍্যাফেলের মা মারা গেলে বাবা আবার বিয়ে করে সংসারী হন। তাঁর যখন বারো বছর বয়স তখন পিতাও গত হন। বিমাতা তাঁকে খুব ভালো চোখে দেখতেন না, কাজেই র‍্যাফেলকে তাঁর নিঃসন্তান মামার আশ্রয়ে চলে যেতে হয়। মামা তাঁকে বিখ্যাত চিত্রকর পেরুজিনের কাছে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করে দেন। একুশ বছর বয়সে পেরুজিনের ষ্টুডিও থেকে বের হয়ে এসে র‍্যাফেল নিজেই এক চিত্রশালা স্থাপন করেন।

র‍্যাফেল সম্বন্ধে একটি গল্প তাঁর জীবনীকাররা অনেকেই প্রকাশ করেছেন নানভাবে ও নানারূপে। গল্পটি হ'ল, একদল দস্যু বা চোর খবর পেয়েছিল যে শিল্পীর ঘরে অনেক মণিমুক্তা ও হীরেজহরতের সংগ্রহ আছে। কেউ বলে দিনে, কেউ বলে রাতে তারা দল বেঁধে গিয়ে ষ্টুডিওতে হানা দেয়—চিৎকার
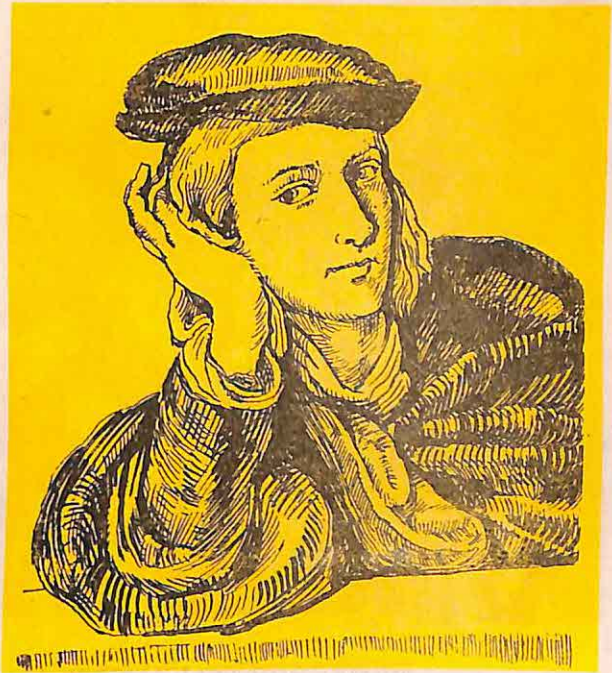
র‍্যাফেলের নিজের হাতে আঁকা নিজেরই ছবি

চেঁচামেচি করতে করতে। কিন্তু যাঁর ঘরে ডাকাতি হতে যাচ্ছে তিনি ছবি আঁকায় এতই তন্ময় যে ঐ বীভৎস চিৎকারের কিছুই তাঁর কানে যাচ্ছে না—তিনি ধ্যানী যোগীর মত ছবিতে রঙের উপর রঙ চাপিয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে আছেন। হঠাৎ ডাকাতদের সব চিৎকার স্তব্ধ হয়ে গেল। তারা নিশ্চুপ হয়ে, হাঁটু

গেড়ে বসে বুকে ক্রস্ চিহ্ন আঁকতে আরম্ভ করে দিল। হঠাৎ কি জন্যে যেন শিল্পী পিছন ফিরে দেখেন তাঁর ঘরে বহু দর্শক এসেছে। তিনি আঁকা ছেড়ে উঠে তাদেরকে ছবির তাৎপর্য বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

র্যাফেলের আঁকা একখানি মাতৃমূর্তি

আমার মনে হয় এ গল্প সম্পূর্ণ সত্য, আর এ শুধু র্যাফেলের ছবির বেলাতেই খাটে।

আর একটি গল্প এইঃ পোপ লিওর একখানি পুরো চেহারার (লাইফ সাইজ) ছবি এঁকেছিলেন র্যাফেল। ছবিখানি পোপের খাস কামরায় দেয়ালে টাঙ্গানোর কথা ছিল কিন্তু তখনো টাঙ্গানো হয় নি বলে দেয়ালে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। পোপের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকেই মনিবকে একেবারে সামনেই দাঁড়ানো দেখে, মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাবার কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলেন যে সেটি পোপ ন'ন, র্যাফেলের আঁকা পোপের সাম্প্রতিক ছবি।

জীবনে তিনি যে সম্মান, অর্থ, ভালোবাসা পেয়ে গেছেন তা অভূতপূর্ব। রোমের পর পর দুই পোপই ছিলেন তাঁর গুণগ্রাহী।

১৫১৪ সালে র্যাফেল রোমের সেণ্ট পিটার্স্ গীর্জার স্থপতি নিযুক্ত হন। এইসঙ্গে পোপ তাঁকে রোমের পুরোনো সমস্ত ধর্মমন্দির ও গীর্জার প্রধান কর্মকর্তা ও তদারককারীর পদে অধিষ্ঠিত করেন। এই কাজের ভার গ্রহণ করার পরে তাঁকে নানা স্থানে ভ্রমণ করতে হয়েছিল নানা অসুবিধার মধ্যে। অতিরিক্ত উৎসাহে তিনি দেশের পুরাকীর্তি সংরক্ষণ ও সংস্কারের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। কিন্তু অত পরিশ্রম সহ্য হ'ল না। তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন।

প্রতিদিন তাঁর রোগশয্যার পাশে নগরের শ্রেষ্ঠ গুণী, জ্ঞানী, রাজপুরুষ এবং পোপের প্রতিনিধিদের আসা-যাওয়া চলতে লাগল। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে সেই "গুড্ ফ্রাইডের" দিনেই তিনি তাঁর অসম্পূর্ণ ছবিখানি দেখতে দেখতে চিরনিদ্রায় অভিভূত হন। অর্থাৎ তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দুইই হয়েছিল "গুড্ ফ্রাইডের" দিনে।

মাত্র ৩৭ বছরের জীবনে তিনি এত বিশাল বিশাল

ছবি, এত ছোটখাট ও মাঝারি মাপের ছবি, এত স্কেচ, এত ড্রইং কি ভাবে করে গেলেন তা বুদ্ধির অগম্য।

টিসিয়ান

এ তিনজন ছাড়া পরবর্তী যুগের আরও একজন চিত্রকরের নাম না করলে চিত্রশিল্পের কাহিনীর অঙ্গহানি হবে। তিনি হলেন, "এ গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান্ অব্ আর্ট" (চিত্রজগতের অতি প্রবীণ ব্যক্তি) নামে সুপরিচিত টিসিয়ান (১৪৭৭-১৫৭৬)। তিনি যখন মারা যান তখন তিনি সত্যিই গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান্ই ছিলেন—একশ' বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন তিনি। সেই বয়সেও তাঁর চোখ ও মস্তিষ্ক সজাগ ও সতেজ ছিল। তাঁর এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, এমন সুঠাম দেহ ছিল যে শত বছর পরেও তাঁর বেঁচে থাকাটা মানুষের কাছে আশ্চর্যের বিষয় বলে মনে হ'ত না। ছবি আঁকতে আঁকতে প্লেগ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। সুবিখ্যাত "জর্জিওনোর" ছাত্র ছিলেন তিনি। যখন তিনি ভেনিসের রাজ-দরবারের চিত্রকর মনোনীত হন

টিসিয়ানের আঁকা বিখ্যাত "দি ট্রিবিউট্ মানি"
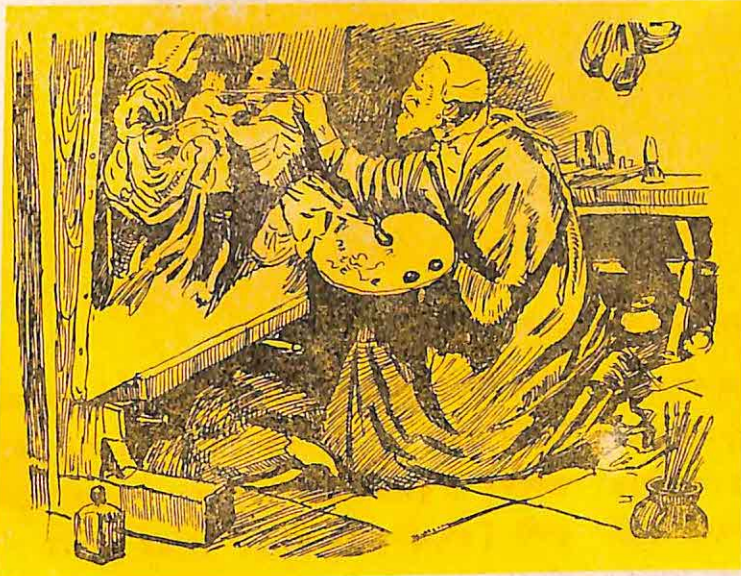
টিসিয়ান পচানব্বই বছরেও ছবি এঁকে চলেছেন

তখন তাঁর বয়স ত্রিশেরও কম। সেই থেকেই তিনি সারাজীবন সুখ, সৌভাগ্য ও আনন্দময় জীবন প্রায় রাজসুখেই অতিবাহিত করে গেছেন। মিকেল এঞ্জেলোর মত তাঁকে কোন ঝঞ্ঝাট ও কষ্ট পেতে হয় নি একদিনের জন্যও।

বিশেষজ্ঞদের মতে ইয়োরোপীয় চিত্র-শিল্পের জগতে ছিলেন দু'টি প্রধান স্তম্ভ। একটি মিকেল এঞ্জেলো, দ্বিতীয়টি টিসিয়ান। মিকেল এঞ্জেলো দেখিয়ে গেছেন কি ভাবে "ড্রইং" ও "কম্পোজিশন" করতে হয়, আর টিসিয়ান শিখিয়ে গেছেন ছবিতে কি করে রঙ

দিতে হয়। এই বৈচিত্র্যই তাঁর সমস্ত ছবির বৈশিষ্ট্য।

টিন্‌টোরেটো

টিসিয়ানের ছাত্র "টিন্‌টোরেটো",—গুরুর সবচেয়ে সেরা ছাত্র। এত তাড়াতাড়ি তিনি কাজ করতে পারতেন যে লোকে ভাবত বোধ হয় তাঁর কোন অলৌকিক শক্তি আছে।

নির্ধারিত দিনে শিল্পীরা এসে দেখলেন যে টিন্‌টোরেটো তাঁর পূর্ণ মাপের সুসম্পূর্ণ সুন্দর ছবিখানি প্রার্থনা-ঘরের ছাদে লাগিয়ে দিয়ে এসেছেন। এ দেখে শিল্পীরা রেগে আগুন। টিন্‌টোরেটো হেসে উত্তর দিলেন, "কে আবার স্কেচ্ করার হাঙ্গামার মধ্যে যায় ভাই? হাঙ্গামা একবারেই চুকিয়ে দিয়েছি।"

কাজ যে খুবই ভালো হয়েছে তা সকলেই স্বীকার
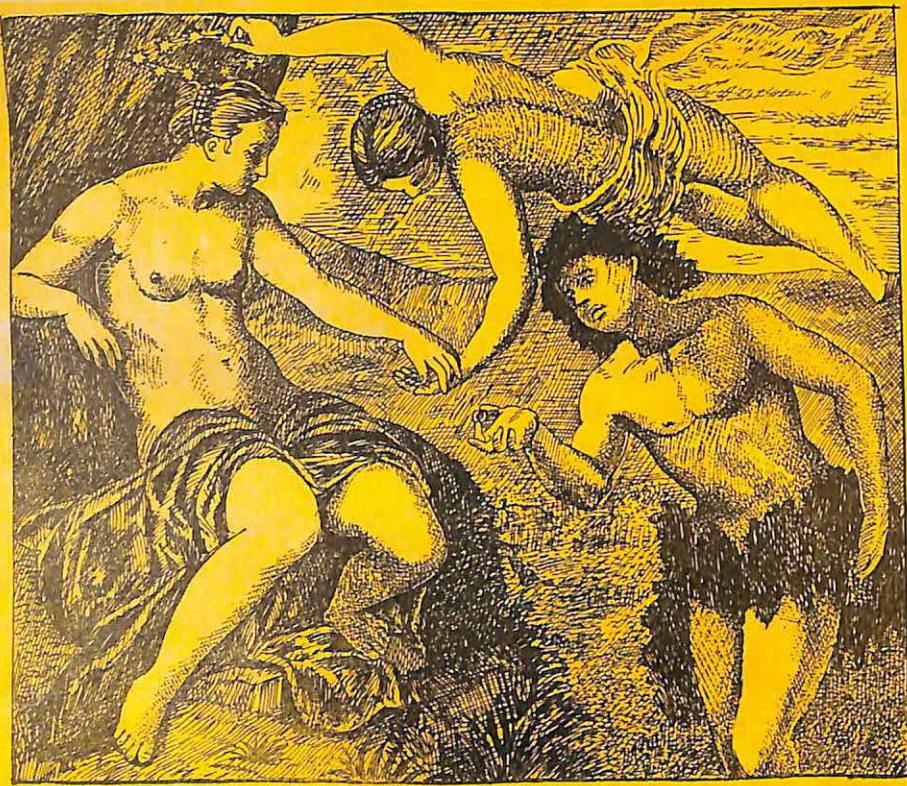
শিল্পী টিন্‌টোরেটোর আঁকা একখানি বিখ্যাত ছবি

একবার দেশের সব চিত্রকরদের ডাকলেন সন্ রক্কো গীর্জার প্রধান ধর্মযাজক গীর্জার প্রার্থনা-সভাঘরের ছাদের ফ্রেস্কো করার জন্য। এক মাস পরে স্কেচ দিতে হবে। সকলে চলে গেলে, প্রার্থনা-ঘরের ছাদের একটি নিখুঁত মাপ নিয়ে বাড়ি চলে এলেন টিন্‌টোরেটো।

করায় টিন্‌টোরেটো তাঁর প্রাপ্য অর্থ পেয়ে গেলেন। টিন্‌টোরেটোর আঁকা একখানি ছবি (যীশু তাঁর ভক্তদের পা ধুইয়ে দিচ্ছেন) পৃথিবীর বৃহত্তম অয়েল পেন্টিং (৮৪ ফুট × ৩৪ ফুট)। তিনিই ধর্মীয় ছবি আঁকার শেষ মহান্ চিত্রশিল্পী।

কোরিয়ার রূপকথা

সিম বং সা আর সিম চুং

অনেক—অনেক দিন আগে কোরিয়া দেশের এক অঞ্চলে বাস করত একটি অন্ধ লোক ; নাম তার সিম বং সা। একমাত্র মেয়ে সিম চুং ছাড়া অন্ধ লোকটির আর কেউই ছিল না এ দুনিয়ায়। জন্মের পরই সিম চুং তার মাকে হারিয়েছিল। ওর বাবা মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে বাড়ি বাড়ি একটুখানি দুধ ভিক্ষা করে বেড়াত। পাড়াপড়শীরা সাধ্যমত তাকে দুধ দিয়ে সাহায্যও করত।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। সিম চুং এখন আর নেহাৎ ছোট্টটি নেই। তার বয়স এখন ষোল। বড়লোকদের বাড়িতে কাজ করে করে সে যে পয়সা রোজগার করে তা দিয়েই বাপ ও মেয়ের মোটামুটি দিন চলে যায়।

সিম চুং প্রতিদিন সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে সেই সন্ধ্যেবেলা। কিন্তু একদিন বেশ রাত হয়ে গেছে। সিম চুং তখনো ফিরে আসে নি দেখে ওর বাবা মহা চিন্তায় পড়ে গেল। এক সময় সে বেরিয়ে পড়ল মেয়ের খোঁজে। অন্ধ মানুষ, তায় আবার রাতের আঁধার। পথ ঠিক করতে না পেরে সে হঠাৎ একটা গর্তে পড়ে গেল। সে পথ দিয়ে সে সময়ে যাচ্ছিলেন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তিনি অন্ধ সিম বং সাকে গর্ত থেকে তুলে দিলেন। তার পর তার দুঃখের কাহিনী শুনে বললেন যে সে যদি তিনশ' বস্তা শস্য নিয়ে নিকটবর্তী বৌদ্ধ মন্দিরে পূজো দেয় এবং প্রার্থনা জানায় তবে তার চোখ ভালো হয়ে যাবে।

সন্ন্যাসীর কথা শুনে সিম বং সা'র বুক থেকে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। সে খুবই গরীব। তিন শ' বস্তা শস্য যোগাড় করা তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কাজেই তার চোখের দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার আশাও কম।

সিম চুং বাবার কাছে সব কথা শুনল। দুঃখে তার

বুক ফেটে যেতে চাইল। সে তার বাড়ির বাগানে ছোট্ট একটি বেদী তৈরি করল। রোজ সেখানে সে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা জানাত দেবতাদের উদ্দেশ্যে, —তোমরা আমার বাবার দৃষ্টিটুকু ফিরিয়ে দাও।

দিন যায়। একদিন সিম চুংএর কানে গেল—একদল নাবিক একটি ষোল বছরের সুন্দরী মেয়ে খুঁজছে। নাবিকেরা নানকিং শহরে যাবে জাহাজ বোঝাই জিনিসপত্তর নিয়ে ব্যবসা করতে। কিন্তু সমুদ্রের দেবতা তাদের ওপর ভারি রুষ্ট। সে জন্যে সমুদ্রকে পূজো দিয়ে খুশি করতে হবে। আর এ পূজোর প্রধান উপকরণ হচ্ছে একটি ষোল বছরের সুন্দরী মেয়েকে সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া। এও শোনা গেল যে সর্বসুলক্ষণা এ ধরনের একটি মেয়ে পেলে তারা তার জন্যে যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত।

সিম চুং নাবিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করল। নিজেকে সে আহুতি দিতে প্রস্তুত। বিনিময়ে নাবিকেরা তাকে দেবে তিনশ' বস্তা শস্য। এ শস্য দিয়ে বৌদ্ধ মন্দিরে পূজো দেওয়া হবে। এরপর তার বাবা ফিরে পাবে তার দৃষ্টিশক্তি। নাবিকেরা সিম চুংএর জন্যে সমবেদনা জানাল। এমন সুন্দর একটি কুমারী মেয়েকে সাগরে বিসর্জন দিতে তাদের মন চাইছিল না। কিন্তু তারা নিরুপায়।

যথাসময়ে তিনশ' বস্তা শস্য দিয়ে বৌদ্ধ মন্দিরে পূজোর ব্যবস্থা হ'ল। সিম চুংকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে পরবর্তী পূর্ণিমার রাতে তাদের জাহাজ ছাড়বে—গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে। সিম চুং যেন সেদিনের জন্যে তৈরি থাকে।

নাবিকেরা চলে যেতে সিম চুং তার বাবাকে জানাল যে সে বৌদ্ধ মন্দিরে তিনশ' বস্তা শস্য দিয়ে পূজোর ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করে ফেলেছে।

সিম বং সা তো অবাক্।—'কোথায় পেলে তুমি এত শস্য?'

বাবার কাছে কোনোদিন মিথ্যে কথা বলে নি সিম চুং। আজ বলল, অবশ্য বাধ্য হয়েই। বলল, 'মন্ত্রীর বাড়িতে আমি পুরোপুরি সময়ের একটা কাজ পেয়েছি। তারাই দিয়েছে তিনশ' বস্তা শস্য অগ্রিম হিসেবে।'

'মন্ত্রীর বাড়ির কাজে তুমি কবে থেকে লাগছ?'

'আগামী মাসের পূর্ণিমার দিন থেকে।'—কোনো মতে জবাব দিল মেয়ে।

পূর্ণিমার দিন ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল। মাঝে মাঝে ভয়ে কেঁপে ওঠে সিম চুংএর অন্তর। নিজেকে বিসর্জন দেওয়ার জন্যে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি হ'ল বাবার জন্যে। তার অবর্তমানে কে দেখবে তার বাবাকে? ছুনিয়ায় যে তার কেউ নেই এক মেয়ে ছাড়া! বাবার ছেঁড়া জামাকাপড়, টুপি প্রভৃতি যত্ন করে সেলাই করল সে; তারপর সে সব কেচে ভাঁজ করে রাখল। বাবা যাতে কষ্ট না পায় সেজন্যে এমনি নানা ধরনের টুকিটাকি কাজ সেরে নিল সিম চুং ক'দিন ধরে।

ক্রমে পূর্ণিমার দিন এল। আগের রাতে সেলাই করতে বসে তার দু'চোখ জলে ভরে গেল। এক সময় সে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'ছোটবেলা মাকে হারিয়েছি। মা আজ স্বর্গে। শীঘ্রই দেখা হবে মা'র সঙ্গে। সে যখন বাবার কথা জিজ্ঞেস করবে কি জবাব দেব আমি? আমার অবর্তমানে বাবা আমার ভিখারী হয়ে যাবে আবার।'

এক সময় রাত শেষ হ'ল। পূবের আকাশে দেখা দিল নতুন সূর্য। সম্ভবত এটিই সিম চুংএর জীবনের শেষ দিন।

নাবিকেরা খবর পাঠাল, জাহাজ ছাড়তে তাদের আর দেরী নেই।

সিম চুং যত্ন করে বাবার জন্যে খাবার তৈরি করল। খেতে দিল বাবাকে। বৃদ্ধ এখনো জানে না কি সর্বনাশ তার হতে চলেছে। সে বলল, 'ভারি চমৎকার রান্না হয়েছে আজ তোমার।'

এ কথায় সিম চুং আর ধরে রাখতে পারল না নিজেকে, কেঁদে উঠল সে। বাবা তো অবাক্।—'কি হয়েছে তোমার?' এ কথায় সিম চুং বাবার দু'হাত জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে সে সব কথা প্রকাশ করল বাবার কাছে।

সিম বং সা হতবাক্ হয়ে গেল সব শুনে। অনেক কষ্টে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বলল, 'কেন তুমি এ কথা আমাকে এতদিন বল নি? তুমি যখন নিতান্তই শিশু তখন তোমার মা চলে গেছে। তোমার মুখ চেয়েই আমি এতদিন বেঁচে আছি। আজ তুমিও চলে যাচ্ছ! আমার আর বেঁচে থেকে কি লাভ?'

মেয়েকে বুকে জড়িয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কেঁদে ভাসিয়ে দিল সিম বং সা। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

এদিকে জাহাজে মালপত্তর বোঝাইএর কাজ শেষ হয়েছে। নাবিকেরা তাড়া লাগাচ্ছে। আর দেরী করা সম্ভব নয়।

সিম চুং চোখের জল মুছে তৈরি হয়ে নিল শেষ বিদায়ের জন্যে। সিম বং সা'র জ্ঞান ফিরে এসেছে, কিন্তু সে এত দুর্বল যে কথা বলার শক্তিটুকু পর্যন্ত তার নেই।

শান্ত সমুদ্র। জাহাজ ছুটে চলেছে তর্ তর্ করে। কিছু সময় এমনিভাবেই কাটল। কিন্তু শীগগিরই

আমার আর বেঁচে থেকে কি লাভ?

চারদিক্ অন্ধকার হয়ে উঠল। সহস্র দানবের বিকট হুঙ্কারে ছুটে এল ঝড়। ফুঁসে উঠল সমুদ্র। চতুর্দিক্ থেকে পাহাড়প্রমাণ ঢেউ গ্রাস করতে এল জাহাজটাকে। করুণ আর্তনাদে নাবিকেরা ভয়ে কাঁপতে লাগল। তারা বলল, 'আর তো দেরী করা চলে না। সিম চুংকে এক্ষুনি ছুঁড়ে দাও সমুদ্রের খিদে মেটাতে।'

কথাগুলো কানে যেতেই প্রথমটা ভয়ে কেঁপে উঠল সিম চুংএর অন্তর। কিন্তু তা সাময়িক। কথার খেলাপ

করবে না সে। সে সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে পড়ল উত্তাল সমুদ্রবক্ষে। একবার শুধু হাত তুলে বলল, 'বাবা, বিদায়! মা, আমি আসছি তোমার কাছে।'

হঠাৎ এক জলদেবতা সিম চুংকে কোলে তুলে নিলেন।

কিন্তু সিম চুংএর পা সমুদ্রের জল ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। হঠাৎ এক জলদেবতা সিম চুংকে কোলে তুলে নিলেন। চারিদিকে মাছেরা সব ভিড় করে দাঁড়াল। তারপর তারা তাকে নিয়ে হাজির করল পাতালপুরীতে সমুদ্রের রাজার রাজপ্রাসাদে। সিম চুংএর সৌন্দর্য ও লাবণ্য দেখে রাজা খুব খুশি হলেন। তিনি তাকে নিজের মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করলেন। এখন থেকে সিম চুং হ'ল সমুদ্রপুরীর রাজকন্যা। তার সব রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হ'ল। রাজার আদেশে সিম চুং-এর সমুদ্রের বুকে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে পদ্মফুলের ব্যবস্থা করা হ'ল। প্রস্ফুটিত পদ্মফুলে বসে সিম চুং ঘুরে বেড়াতে লাগল সাগরের বুকে।

কিন্তু এত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকেও সিম চুংএর মন তার অন্ধ বাবার জন্যে হাহাকার করে উঠত মাঝে মাঝে।

পদ্মফুলে বসে ঘুরে বেড়ানোর সময় তাদের নিজেদের দেশের রাজপুত্রের চোখে পড়ল একদিন সিম চুং। রাজপুত্র সে সময়ে তার প্রমোদতরীতে করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সমুদ্রের বুকে। তার রূপ দেখে রাজপুত্র মুগ্ধ হয়ে গেল। তারপর এক শুভদিন দেখে রাজপুত্রের সঙ্গে সিম চুংএর বিয়ে

সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানোর জন্য পদ্মফুলের ব্যবস্থা করা হ'ল।

হয়ে গেল। দুই রাজবাড়িতে চলল মহা ধুমধাম। সিম চুং রাজপুত্রকে চুপি চুপি বলল, 'আমার ইচ্ছে—আমাদের এই বিয়ে উপলক্ষে একদিন রাজ্যের সব অন্ধদের নিমন্ত্রণ করা হোক রাজবাড়িতে।'

তাই করা হ'ল। দলে দলে অন্ধরা আসতে লাগল। সিম চুং সকলকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। কিন্তু কোথায় তার বাবা সিম বং সা? দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে সিম চুংএর। যখন সব আশা সে প্রায় ত্যাগ করেছে তখন হঠাৎ দেখতে পেল তার বাবাকে—সিম বং সাকে। আনন্দে, উত্তেজনায় নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না সিম চুং। সে ছুটে গিয়ে তার বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে বলল, 'বাবা, বাবা, আমি তোমার মেয়ে সিম চুং।'

সিম বং সা'র বিস্ময়ের আর সীমা নেই। দু'হাতে সে জড়িয়ে ধরল তার বড় আদরের মেয়েকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার চোখের দৃষ্টি ফিরে এল। সে তার চোখের সামনে সর্বপ্রথম দেখতে পেল তার মেয়েকে—তার একান্ত আদরের সিম চুংকে।

বাবা ও মেয়ের দু'জোড়া চোখ থেকে একসঙ্গে অঝোরে ঝরে পড়তে লাগল আনন্দাশ্রু।

জাপান দেশের রূপকথা

সুসানোর গল্প

তিন ভাইবোন—তিনজনই দেবতা। সবচেয়ে বড় ভাই হলেন চন্দ্রদেব, তারপর বোন সূর্যের দেবী, আর সবচেয়ে ছোট ভাই হচ্ছে সমুদ্রের দেবতা। তাঁরই নাম সুসানো।

বড় ভাই আর বোন বয়সে সুসানোর চাইতে অনেক বড়। সুসানো ছোট বলে সবাই তাঁকে একটু বেশি আদর দিতেন। আর তার ফলে, দেবতা হয়েও, সুসানো হয়ে উঠলেন ভীষণ দুষ্টু; এমন সব কাজ করে বসতেন যা দেবতাদের পক্ষে মানায় না।

বড় ভাই স্নেহের চোখে সে সব ক্ষমা করলেও সুসানোর দিদি কিন্তু সেগুলি উড়িয়ে দিতে রাজী ছিলেন না। ছোট ভাইকে ডেকে তিনি প্রায়ই নানা উপদেশ দিতেন—"ও-রকম করতে নেই। ওসব দুষ্টুমি করে পৃথিবীর মানুষেরা, দেবতাদের কি ওসব সাজে? তাতে তাদের সম্ভ্রমহানি হয়।"

সুসানো বলতেন, "একটু ফূর্তি, একটু আমোদ—এসব করলে যদি দোষ হয় তা হলে দেবতা না হয়ে মানুষ হলেই বোধ হয় আমার ভালো হ'ত।"

দিদি বলতেন, "ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই। দেবতাদের মুখ দিয়ে অমন কথা বেরুলে তা কোনদিন ফলেও যেতে পারে। তখন নিজেই পস্তাবে।"

বড় ভাই বোনকে শান্ত করবার চেষ্টা করতেন। সুসানোকেও বলতেন, "ছিঃ, দিদির সঙ্গে অমন করে কথা বলতে নেই।"

বোন বলত, "না না, তুমি জান না দাদা, ও প্রায়ই পৃথিবীতে যেতে শুরু করেছে। এখানে ও আমাকে আর আমার সহচরী অন্যান্য দেবীদের নিয়ে নানা রকম ঠাট্টা-তামাসা করে। ওখানে গিয়েও যদি তাই করে তা হলে দেবতাদের বদ্‌নাম হবে। শেষ পর্যন্ত অন্য দেবদেবীরা হয়তো চিরকালের জন্য ওকে মর্ত্যেই পাঠিয়ে দেবেন, স্বর্গে আর ঢুকতেই দেবেন না। মাত্র একজনের জন্য সমস্ত দেবতারা তাঁদের মানসম্ভ্রম খোয়াতে রাজী হবেন কেন?"

এর পর দিদি চলে গেলেন সূর্যলোকে আর দাদা চলে এলেন চন্দ্রলোকে। দিদির অনেক কাজ। সারাদিন সূর্যকে জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব তো তাঁরই। কেবল সন্ধ্যার পর তিনি একটু ঘুমোতে যান। সূর্যও

অমনি নিবে যায়। ভোরে উঠে আবার তাঁকে জ্বালিয়ে দিতে হয়। তখন শুরু হয় দিন।

দাদারও কাজ আছে। তবে তাঁর আবার বিশ্রামটা নিতে হয় দিনের বেলায়। তাই দিনের বেলা চাঁদকে দেখা যায় না। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই আস্তে আস্তে তাকে জাগিয়ে তোলেন চন্দ্রদেব। সূর্যের মত প্রখর আলোয় নয়, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায়। তাঁর স্বভাবটাও যে অমনি স্নিগ্ধ!

সুসানো সমুদ্রে চলে আসেন। কিন্তু সেখানে তাঁর কাজ বলতে শুধু খেলা—যত রাজ্যের জল-জীবদের সঙ্গে খেলায় মেতে থাকেন তিনি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এও ভারি একঘেয়ে লাগে। সুসানো ভাবেন, যাই, একবার দাদা-দিদির সঙ্গে দেখা করে আসি। শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি চলে এলেন সূর্যলোকে।

যতই বকাবকি করুন, ছোট ভাই তো! দিদি ভারি খুশি। সুসানোকে তাঁর সোনালী প্রাসাদে আদর করে নিয়ে গিয়ে বসালেন, দু'জনে একসঙ্গে বসে হাল্কা সোনালী রঙের চা খেলেন। তারপর দিদি ভাবলেন, ভাইকে একটু উপদেশ দেওয়া দরকার।

"দিন কয়েক ধরে আমি লক্ষ করছি, সমুদ্রে ভীষণ জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে। এত বড় ঢেউ এর আগে আমি কখনও দেখি নি! এ নিশ্চয় তোমার কাজ?"

"ওঃ, সেই ব্যাপারটা? ও কিছু না, আমি আর তিমিরা মিলে বাজী ধরেছিলাম কে কত বড় ঢেউ তুলতে পারে। তারই পরীক্ষা চলছিল। আমিই কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিতেছি, ওরা হেরে গেছে।"

"বড় কীর্তিই করেছ! আর এক সপ্তাহ ধরে যে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি চলছিল সেও তো বোধ হয় তোমারই কাজ?"

"ঝড়বৃষ্টি কোথায়, ও তো জল ছিটানো! আমি শুশুকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডিগবাজী খাচ্ছিলাম জলে। ও বেটারাও ডিগবাজীর পাল্লায় আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে নি। আর, এক সপ্তাহ বলছ কেন, মোটে তো সাড়ে পাঁচ দিন!"

"ছিঃ, ওসব কি দেবতাদের মানায়? খেলো হয়ে যেতে হয় সকলের সামনে। তুমি তো আর এখন ছোট্টটি নও। তুমি কি শুধু খেলাই কর, ঘুমোও কখন? আমি তো সন্ধ্যার পরই শুয়ে পড়ি। তোমারও তাই করা উচিত। দাদা রাতে জেগে থাকে, তাই দিনের বেলা ঘুমিয়ে নেয়।"

সুসানোর এত উপদেশ ভালো লাগছিল না। তিনি ঠিক করলেন দিদিকে জব্দ করে এর শোধ নেবেন। প্রাসাদের একটা বড় ঘরে একদল ছোটখাট দেবী, যারা নাকি দিদির সহচরী,—তাঁতের সামনে বসে রেশমী কাপড় বুনছিল। সুসানো হঠাৎ গিয়ে তাঁত-গুলো সব উল্টে দিলেন আর রেশমগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে লাগলেন। তারপর সব রেশম নষ্ট হয়ে গেলে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলেন।

দিদির আর সহ্য হচ্ছিল না। তিনি দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে ওকে তক্ষুনি বেরিয়ে যেতে বললেন। সুসানো বললেন, "বেশ, দাদার কাছেই তা হলে যাই।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর তা হ'ল না। দেবতারা চট্ করে সব খবর জানতে পারেন, সুসানোর কাণ্ডকলাপও তাঁরা জেনে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে ঠিক করলেন এ-রকম লোককে দেবতা বলে আর মানা হবে না। ওকে মানুষদের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হবে —চিরকালের মত।

তাই করা হ'ল। সুসানোর হাত থেকে সমুদ্রও কেড়ে নেওয়া হ'ল।

দেবলোক ছেড়ে চিরকালের জন্য মর্ত্যবাসী হয়ে থাকতে হবে শুনে সুসানোও খুব দমে গেলেন। কিন্তু উপায় নেই। এখানে দাদা-দিদির কোন হাত নেই, সমস্ত দেবতারা মিলে তাঁকে এই শাস্তি দিয়েছেন।

সুসানো তখন ভাবলেন যদি যেতেই হয় জাপানে গিয়ে থাকব। কারণ পৃথিবীতে জাপানের মত সুন্দর দেশ আর নেই। আগেও তিনি কতবার এখানে ঘুরে বেড়িয়ে গেছেন।

জাপানে চলে এলেন সুসানো। সুবিধামত একটা থাকবার জায়গা খুঁজে বার করতে হবে। একটা নদীর ধার দিয়ে দিয়ে তিনি চলতে লাগলেন।

খানিক দূর গিয়ে দেখেন একটা পাথরের ওপর বসে তুই বুড়োবুড়ী হাপুস নয়নে কাঁদছেন।

সুসানো দাঁড়িয়ে গেলেন, "কি হয়েছে আপনাদের? এত কাঁদছেন কেন?"

"কাঁদব না? আমাদের যে আর কেউ রইল না!" বলে আবার কান্না শুরু করলেন তাঁরা তেমনি ভাবে।

সুসানো অনেক চেষ্টা করে জানতে পারলেন, এখান থেকে বহু দূরের এক হ্রদে একটা বিরাট ড্রাগন বাস করে। তার আটটা মাথা, আর ভীষণ হিংস্র সেই ড্রাগনটা। প্রতি বছর এই দিনে সে এখানে আসে আর একটি করে সুন্দরী মেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে খেয়ে ফেলে। বুড়োবুড়ীর ছিল আটটি মেয়ে। হিংস্র ড্রাগন তাদের সাতটিকেই এর আগে খেয়ে ফেলেছে। ছোটটি, যে নাকি বোনেদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী, সে-ই একমাত্র বাকি ছিল। আজ ড্রাগন আসবে এবং নির্ঘাৎ তাকেই নিয়ে চলে যাবে।

বুড়োবুড়ী হাপুস নয়নে কাঁদছেন।

সুসানো বললেন, "আপনারা কাঁদবেন না, আমি একজন দেবতা। খুব বড় দেবতা না হলেও দেবতাই। আমাকে অন্য দেবতারা স্বর্গ থেকে নির্বাসন দিয়েছে— আমি মাটির মানুষদের ভালোবাসি বলে। যাই হোক, আমি চেষ্টা করব আপনাদের ও আপনার মেয়েকে যে ভাবেই হোক রক্ষা করতে। চলুন আপনাদের বাড়ি।"

বুড়োবুড়ী সুসানোকে তাঁদের বাড়ি নিয়ে এলেন, তাঁদের মেয়েটির সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিলেন। সুসানো দেখলেন বুড়োবুড়ী মিথ্যে বলেন নি, সত্যি তাঁদের মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী। শুধু সুন্দরী নয়, সুশীলা বলেও মনে হ'ল তাকে। এমন মেয়েকে ড্রাগন ধরে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলবে এ কথা ভাবাও যায় না।

"আচ্ছা, বলতে পারেন ঐ ড্রাগনটা মানুষ ছাড়া আর কি খেতে ভালোবাসে?"

মেয়েটিই উত্তর দিল এবার। বলল, "শুনেছি বীন দিয়ে তৈরি সুরুয়া খেতেও নাকি খুব ভালোবাসে।"

"আপনি কি ঐ সুরুয়া তৈরি করতে জানেন?"

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল। সুসানো বললেন, "তা হলে চটপট অন্তত আট বালতি সুরুয়া তৈরি করে ফেলুন, ড্রাগন আসবার আগেই। তারপর সেই গরম গরম সুরুয়া বালতি করে দরজার কাছে সাজিয়ে রাখুন।"

মেয়েটি ক্ষিপ্রহস্তে কাজে লেগে গেল। বুড়োবুড়ীও হাত মেলালেন। দেখতে দেখতে সুরুয়ার মিষ্টি গন্ধে সমস্ত ঘর ম ম করে উঠল।

ব্যবস্থানুযায়ী বালতিগুলো দরজার কাছে সাজিয়ে রেখে ওঁরা সবাই লুকিয়ে রইলেন।

একটু পরেই গর্জন করতে করতে ড্রাগন এসে হাজির। সত্যি, ভয়ঙ্কর তার চেহারা। আটটা মাথায় আট জোড়া চোখ একসঙ্গে যেন জ্বলছে। আটটা নাক দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দ বেরুচ্ছে। আটটা জিভ লক্ লক্ করছে লোভে। অর্থাৎ সুরুয়ার গন্ধে ড্রাগন মুগ্ধ। মেয়েটিকে খাবার আগে সে প্রাণ ভরে এই গরম গরম আট বালতি সুরুয়া খেয়ে নিয়ে খিদেটাকে আরও চাঙ্গা করে নেবে।

সত্যি, ড্রাগন আর দেরী না করে আটটি মুখ আটটি বালতিতে ঢুকিয়ে দিয়ে চোঁ চোঁ করে খেতে শুরু করে দিল। সুসানোও অমনি পেছন দিক্ থেকে এসে তাঁর ধারালো তলোয়ার নিয়ে তার গলার তলা দিয়ে চালিয়ে দিলেন। ড্রাগনের আটটা মাথাই কেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তবু, আরও নিশ্চিন্ত হবার জন্য, সুসানো তার শরীরটাকেও তলোয়ার দিয়ে চিরে দিলেন। রক্তে ঘর ভেসে গেল।

চোঁ চোঁ করে খেতে শুরু করে দিল।

হঠাৎ সুসানো দেখলেন ড্রাগনের লেজের ভিতর কি একটা ঝক্‌মক্ করছে। আরে, এ যে একটা মণি-

মুক্তাখচিত তলোয়ারের বাঁট! এটা এখানে এল কি করে?

একটানে তলোয়ারটা টেনে নিলেন তিনি। এ তলোয়ার দেশের রাজার হাতেই মানায়।

ড্রাগন মারা পড়েছে খবর পেতেই বাড়িতে আনন্দ-কোলাহল জেগে উঠল।

সুসানো বুড়োবুড়ীর সামনে এসে বললেন, "ড্রাগন তো মারা গেছে, এখন আমি আপনার মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাই।"

"কিন্তু আপনি তো দেবতা! আমরা মানুষ।"

সুসানো বললেন, "না, আমি আর দেবলোকে ফিরে যেতে চাই না, এই মানুষের মধ্যেই আমি বেঁচে থাকতে চাই। সুন্দর দেশ জাপান, এর সঙ্গে কোনও দেশের তুলনা হয়?"

তার পর? তারপর আর কি, এ কথার পরও কি আর কেউ বিয়ে না দিয়ে পারে? সুসানো সেই সুন্দরী জাপানী মেয়েটিকে বিয়ে করে পৃথিবীতেই সুখে বাস করতে লাগলেন। জাপানের সবাই তাঁকে ভালবাসত। তিনি যে আসলে মানুষ ন'ন,—দেবতা, এ কথা তারা ভাবতেও পারত না।

আর সেই তলোয়ারটা? হ্যাঁ, সেটা সুসানো দেশের রাজাকেই উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আরব দেশের রূপকথা

সওদাগরের কাণ্ড

এক ছিল ধনী সওদাগর, অনেক টাকার মালিক। তার একটি মাত্র ছেলে, সেও লেখাপড়া শিখতে বিদেশে গেছে। থাকার মধ্যে আছে এক ক্রীতদাস।

বুড়ো সওদাগর একদিন দারুণ অসুখে পড়ল। সে তখন পাড়ার লোকদের ডেকে বলল, "আমার যাবার সময় হয়েছে। আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি এই ক্রীতদাসটিকে দিয়ে যাচ্ছি। আমার ছেলে ফিরে এলে তাকে এ থেকে শুধু একটিমাত্র জিনিস বেছে নিতে দেওয়া হবে। কিন্তু একটির বেশি নয়।"

লেখাপড়া হয়ে গেল, সওদাগরও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। ক্রীতদাস তো ভারি খুশি। এই বিরাট সম্পত্তির সবটাই এখন তার।

যথাসময়ে সওদাগরের ছেলে দেশে ফিরল। সঙ্গে তার গুরু। ফিরেই, বাপের কাণ্ডের কথা শুনে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল।

যাই হোক, শর্তমত ক্রীতদাস পাড়ার লোকদের ডেকে, সওদাগরের কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত সম্পত্তি একটা ঘরে সাজিয়ে, মনিবপুত্রকে ডেকে বলল, "এ থেকে যে কোন একটা জিনিস আপনার প্রাপ্য, ইচ্ছেমত বেছে নিন।"

কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা বাছবে? সবাই অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগল। ছেলেটি কিন্তু একটুও ভাবল না, গুরুর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সে সরাসরি চলে গেল ক্রীতদাসটির কাছে। তার হাত ধরে বলল, "বাবার সম্পত্তির মধ্যে এও তো একটি, আমি একেই বেছে নিলাম।"

সওদাগর যে কতখানি বুদ্ধিমান্ ছিল এবার সবাই তা বুঝতে পারল। কারণ ওদেশের তখনকার আইন অনুযায়ী ক্রীতদাসদের কোন পৃথক্ সম্পত্তি থাকতে পারে না। তার যা কিছু সবই তার মনিবের প্রাপ্য।

বিনুনি-কাটা ডাইনী

(রুশ দেশের গ্রাম্য রূপকথা)

দু'টি বোন। বড়টির নাম লাগা আর ছোটটির নাম দি-ইউ। তাদের কোন ভাইটাই ছিল না। থাকবার মধ্যে ছিল দুই বুড়ো বাপ-মা। দু'জনেই এত বুড়ো যে কোন কিছুই করতে পারত না, সব কিছুই করতে হ'ত লাগা আর দি-ইউকে।

লাগা ছিল ছেলেদের মতই ওস্তাদ্ শিকারী। তীর-ধনুক আর বর্শা নিয়ে রোজ শিকারে বেরোত আর শিকার-করা সেই সব মাংস বাড়িতে বসে রান্না করত দি-ইউ। সে বাইরে বেরুত না, ঘরের যাবতীয়

এক কিম্ভূতকিমাকার চেহারার বুড়ী

কাজ তাকেই তো করতে হ'ত। বাইরে বেরুবার সময় কোথায় ?

এরই মধ্যে একদিন ওদের বুড়ো বাবা-মা দু'জনেরই জীবনের শেষ দিন এসে গেল। যতই বয়স হোক, বাবা-মা তো! তাঁদের হারিয়ে দুই বোন নিজেদের খুবই নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগল।

কিন্তু, যতই নিঃসঙ্গ হোক, ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না, নিয়তিকে মেনে নিতেই হবে। তা ছাড়া শিকার না করলে খাবেই বা কি ? তাই দিন দুই বাদে চোখের জল মুছে লাগা আবার তীর-ধনুক আর বর্শা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বনের উদ্দেশে।

তখন শীতকাল। সর্বদাই প্রায় তুষারপাত হচ্ছে। ভোরের দিকে শীতটা যেন আরও বেশি। কিন্তু লাগা তা গ্রাহ্য করল না। ভোর হবার আগে বেরুতে না পারলে ভালো শিকার পাওয়া কঠিন তা সে জানত।

লাগা চলে গেলে দি-ইউ ঘরের দরজা এঁটে সংসারের খুঁটিনাটি কাজে মন দিল। দিদি এলে তারপর রান্না চড়াবে।

একটু পরেই মনে হ'ল দরজার বাইরে কার পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে দরজায় খুট্ খুট্ শব্দ।

এখন আবার কে এল রে বাবা! দি-ইউ দরজা খুলতেই দেখে এক কিম্ভূতকিমাকার চেহারার বুড়ী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ীর মাথায় একটা লম্বা টুপি আর নাকটা পাখির ঠোঁটের মত টিকোলো এবং ছুঁচলো। শুধু তাই নয়, বুড়ীর হাতপায়ের নখগুলোও যেন কেমন বাঁকা বাঁকা—যেমন জন্তু-জানোয়ারদের হয়। সে নখ বাঁকা হলেও তা যে বেশ ধারাল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু এ কী

চেহারা বুড়ীর! রোগা, লম্বাটে, শরীরে মাংস আছে বলে মনেই হয় না, চামড়া যেন হাড়ের সঙ্গে মিশে গেছে। পা ছু'টোও তেমনি লিকলিকে, অনেকটা পাটকাঠির মত। যখন হাঁটে, মনে হয় বুঝি কোন পুরোনো গাছের গায়ে হাওয়া লেগে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে।

বুড়ী এসেই একবার দি-ইউএর দিকে ভালো করে নজর দিয়ে দেখে নিল। তারপর বলল, "বাছা, এই বুঝি তোমার ঘর? তুমি বুঝি একাই এখানে থাক? তা বেশ বেশ। আমি হাঁটতে হাঁটতে বড় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি, তোমার ঘরে একটু জিরিয়ে নিই, কেমন?" ব'লেই, উত্তরের অপেক্ষা না করেই, ঘরে ঢুকে একেবারে দি-ইউএর পাশে মেঝেতেই হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

তারপর আরও ছু'-চারটে কথা হ'ল। দি-ইউ বললে, সে একা থাকে না, তার দিদিও এখানে থাকে। তবে সে বাড়ি নেই, শিকার করতে গেছে।

"বল কি! মেয়েমানুষ শিকার করতে গেছে?" বুড়ী অবাক্ হবার ভঙ্গী করে বলল, "তা হলে তো তোমাকেই বোধ হয় সংসারের সব কিছু সামলাতে হয়। তাই তো দেখছি তোমার অমন সুন্দর চুল-গুলি কেমন উস্কোখুস্কো নোংরা দেখাচ্ছে। চুলে নজর দেবার সময়টুকুও পাও না বুঝি? তা বাছা একটা চিরুনী দাও না, আমি তোমার চুল আঁচড়ে ফের আবার বিনুনি বেঁধে দিচ্ছি। এমন সুন্দর চুল কেউ এভাবে রাখে? ছিঃ।"

দি-ইউ একটা চিরুনী এগিয়ে দিতেই বুড়ী সযত্নে তার চুলগুলি খুলে, আঁচড়ে ফের আবার বিনুনি বেঁধে দিল। তারপর হঠাৎ, কি কৌশলে, চিরুনীটা মাথায় চেপে ধরার অছিলায়, একটা কাঁটার মত কি জিনিস তার মাথায় বিঁধিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দি-ইউর মনে হ'ল তার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, সে আর চোখ খুলে রাখতে পারছে না। দেখতে দেখতে সে সেইখানেই ঢুলতে ঢুলতে মাটিতে শুয়ে পড়ল আর পরক্ষণেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

বুড়ী এবার উঠে জামার ভিতর থেকে একটা কাঁচি বার করে ক্যাঁচ করে দি-ইউএর বিনুনিটা কেটে নিল, তারপর তাকে ঠেলে ঘরের কোণে একটা মাচার নীচে শুইয়ে দিয়ে হন্ হন্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল গভীর জঙ্গলের দিকে।

এদিকে সন্ধ্যার একটু আগেই দি-ইউএর দিদি লাগা শিকার নিয়ে ঘরে ফিরল। কিন্তু কই, দি-ইউ গেল কোথায়? রোজ এই সময়টায় লাগা ঘরে ঢুকতেই সে এসে দিদিকে জড়িয়ে ধরে, অথচ আজ তো তার পাত্তাই নেই! লাগা দি-ইউএর খোঁজে রান্নাঘরে এল। দেখল উনুনের আঁচ কখন জ্বলে জ্বলে নিবে গেছে, সামান্য একটু ধোঁয়াও বেরুচ্ছে না। অথচ রোজ এর আগেই তার বোন উনুনে আঁচটাঁচ দিয়ে সব তৈরি করে রাখে যাতে রান্নার দেরী না হয়।

বিস্মিত লাগা এদিক্ ওদিক্ খুঁজতে লাগল। প্রচণ্ড শীতে দরজার সামনে বেশ খানিকটা তুষার জমে গিয়েছিল। হঠাৎ সে লক্ষ করল সেই বরফের ওপরে কতকগুলি অদ্ভুত পায়ের ছাপ। মানুষের পা বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু এত সরু সরু লম্বা লম্বা পায়ের ছাপ কি কোন মানুষের হয়?

আবার সে চলে এল ঘরের ভিতর, আর তার পরেই তার নজরে পড়ল ঘরের কোণে মাচার নীচে দি-ইউ দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছে।

ভীষণ রাগ হ'ল লাগার। চেঁচিয়ে বলল, "আমি

সেই ভোর থেকে সারা দিন খেটেখুটে শিকার করে নিয়ে এলাম আর মহারাণী দিব্যি আরামে ঘুম লাগাচ্ছেন? রান্নাবান্নার কোন উত্যোগই নেই! বেরিয়ে আয় ওখান থেকে।"

কিন্তু দি-ইউ তবু কোন সাড়া দিচ্ছে না। লাগা

হাতের মুঠোয় ধরা আছে একটা ধারাল বর্শা

তখন রেগেমেগে তাকে হিড় হিড় করে মাচার তলা থেকে টেনে আনল। তার পরই তো তার চক্ষুস্থির। সে দেখল বোনের শরীর হিমের মত ঠাণ্ডা, আর তার মাথায় কে যেন বিনুনি বেঁধে দিয়ে তার প্রায় সবটাই কেটে নিয়ে গেছে।

তবে কি দি-ইউ বেঁচে নেই? কে এই সর্বনাশ করে গেল? তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। দরজার কাছে বরফে যার পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই তারই এ কাজ।

লাগা একটুক্ষণ কেঁদে নিল। তারপর ভাবল, এখন কাঁদলে তো তার বোনকে বাঁচানো যাবে না। আগে সেই অজানা লোকটাকে—তা সে মেয়েই হোক কি পুরুষই হোক,—খুঁজে বার করতে হবে, জানতে হবে সমস্ত ব্যাপারটা। তারপর তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়ে হলেও তার মত ওস্তাদ্ শিকারী এ অঞ্চলে কমই আছে, আর তার গায়ে জোরও নেহাৎ কম নয়!

বরফের ওপর পায়ের ছাপ বরাবর চলে গেছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। লাগা তাই অনুসরণ করে চলতে লাগল। কাঁধে তার ধনুক ঝুলছে, পিঠে তূণ ভরা তীর, আর হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা আছে একটা ধারাল বর্শা।

চলেছে তো চলেছেই, পায়ের দাগ আর শেষই হয় না। ক্রমে সন্ধ্যা গভীর হয়ে এল। এখনই চারদিক্ ঘন অন্ধকারে ঢেকে যাবে, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তখন পথ চলা আর সম্ভব হবে না। একটা আশ্রয় চাই।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল, অল্প দূরে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে কুঁড়েঘরের দরজার কড়া নাড়তে লাগল।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। লাগা দেখল, প্রায় তারই বয়সী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কী বিষণ্ণ তার মুখ! মুখে যেন রক্তের লেশও নেই এমনি ফ্যাকাশে সে মুখ। মেয়েটির পরনের পোশাকও অত্যন্ত ময়লা। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এখানে সে অত্যন্ত অযত্নে রয়েছে, কোন সুখ নেই তার মনে।

লাগা বলল, "আমি জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি, অন্ধকারে এখন কোথায় যাব? রাতটা এখানে একটু থাকতে চাই।"

মেয়েটি গম্ভীরভাবে বলল, "বুঝেছি। কিন্তু তুমি বড় ভুল জায়গায় এসে পড়েছ। এখানে একটা দুষ্টু ডাইনী বুড়ী থাকে। সে অল্পবয়সী মেয়ে দেখলে পরেই তার চুলের বিনুনি কেটে নেয়; এক একটা বিনুনি যোগাড় করলে তার নাকি দশ বছর করে আয়ু বাড়ে। কত মেয়ের বিনুনি যে সে কেটে এনেছে তার ঠিক নেই। বিনুনি কেটেই সে ছেড়ে দেয় না, সেই মেয়েরা যাতে কোন প্রতিশোধ নিতে না আসতে পারে সে জন্য তাদের সে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দেয়। সে ঘুম আর জীবনে ভাঙ্গে না। তোমাকে দেখলেও সে তাই করবে। দেখতে রোগা প্যাঁকাটির মত হলেও অসম্ভব তার ক্ষমতা। আমি তার বাড়ির সব কাজ করে দেব বলে সে আমাকে এখানে এনে আটকে রেখেছে। একটা কাজের মেয়ে চাই তো! তাই এখনও আমাকে কিছু করে নি। কিন্তু তোমাকে তাই বলে সে ছেড়ে দেবে না।"

লাগা তার বর্শার ওপর ভর দিয়ে বলল, "ও সব ডাইনী বুড়ী-টুড়ি আমি বুঝি না। ও আমার বোনেরও বিনুনি কেটে নিয়ে এসেছে, বোনটিও বেঁচে নেই। আমি এসেছি যে ভাবে পারি এর প্রতিশোধ নেবই নেব। ডাইনীটার সম্বন্ধে তুমি আর কিছু জান তো বল।"

মেয়েটি বলল, "বুড়ীর একটা হাড়ের তৈরি ছোট্ট বাক্স আছে, দেখতে ভারি সুন্দর। শুনেছি এই বাক্সেই আছে তার যত কিছু যাদুর চাবিকাঠি। তাই সে কখনও বাক্সটা কাছ-ছাড়া করে না, রাত্রে ঘুমুবার সময়েও মাথার নীচে বাক্সটা রেখে দেয়।"

লাগা আর কোন কথা বলল না। লাগা জানত ঐ জঙ্গলে বরফের নীচে এক রকম লম্বা লম্বা ঘাস জন্মায়। তার মধ্যে কেউ শুয়ে থাকলে বাইরে থেকে সে কারুর নজরে পড়ে না। সে তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং একটু পরেই স্তূপাকার সেই ঘাস এনে মাচার নীচে বিছিয়ে দিল। তার পর তার মধ্যে গিয়ে শুয়ে রইল। তাকে আর তখন কেউ দেখতে পাচ্ছিল না।

একটু পরেই হাওয়ার মত শোঁ শোঁ শব্দ তুলে ডাইনী ঘরে ঢুকল। ঢুকেই ছুঁচলো নাকটা একটু কুঁচকে বলল, "ঘরে কেউ এসেছে নাকি? মনে হচ্ছে বাইরের লোকের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি! বল্ না ছুঁড়ি, কে এসেছে?"

মেয়েটি বলল, "তোমার যেমন কথা। এখানে আবার কে আসবে? একটু আগে যে বিনুনিটা কেটে এনে রেখে গেলে গন্ধটা তারই। টাটকা কাটা তো, তাই মানুষের গায়ের গন্ধ বলে ভুল হচ্ছে।"

ডাইনী বলল, "ও, বুঝেছি। ঠিক তাই। মেয়েটার বয়স কম তো, তাই গন্ধটা এখনও যায় নি। এমন বিনুনি পাওয়া ভাগ্যের কথা। আমার আয়ু আরও দশ বছর তো বাড়লই, আরও বেশি বাড়তে পারে।"

"মেয়েটির কি হ'ল? সে কি সত্যিই মারা যাবে?"

"যাবে কি রে!—গেছে। তবে হ্যাঁ, এই বিনুনিটা নিয়ে যদি তার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আবার লাগিয়ে দেওয়া যায় তা হলে সে বেঁচে উঠতে পারে। কিন্তু তা তো আর হবার নয়, এ বিনুনি এখন আমার সম্পত্তি। যাক গে, শীগ্‌গির কি রান্না করেছিস খেতে দে, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে। আজ যা পরিশ্রম গেছে!"

মেয়েটি খাবার এনে দিল। বুড়ী এক নিঃশ্বাসে তা সাবাড় করে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল আর পরক্ষণেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নাক ডাকাতে লাগল।

এবার লাগা উঠে এল। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল বুড়ীর দিকে; তারপর আলগোছে, অতি কৌশলে বুড়ীর মাথার নীচে থেকে সেই হাড়ের বাক্সটা বার করে নিল। বুড়ী ঘুমের ঘোরে টেরও পেল না।

এবার লাগা আর সেই মেয়েটি সন্তর্পণে বাক্সটা ঘরের বাইরে এনে পাথর ঠুকে ঠুকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলল, তার পর ভাঙ্গা টুকরোগুলি চার-দিকে ছড়িয়ে দিল। আর, আশ্চর্য কাণ্ড, টুকরোগুলি সঙ্গে সঙ্গে মাছি আর মশা হয়ে উড়ে চলে গেল।

বুড়ী তখনও ঘুমুচ্ছে। দি-ইউএর কাটা বিনুনিটা আরও অনেকগুলি বিনুনির সঙ্গে এক জায়গায় জড় করা ছিল, কিন্তু লাগার সেটা চিনে নিতে অসুবিধে হ'ল না। লাগা বিনুনিটা সন্তর্পণে তুলে নিল, সেই মেয়েটিও তুলে নিল বাকি বিনুনিগুলো; তার পর আর মুহূর্ত মাত্র দেরী না করে তু'জনে সেই অন্ধকারের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল বাইরের জঙ্গলে।

খুঁজতে খুঁজতে ভোরবেলা তারা এসে পৌঁছল লাগাদের বাড়িতে। বিনুনিটা নিয়ে দি-ইউএর চুলের সঙ্গে জুড়ে দিতেই সে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসল। লাগাকে দেখে বলল, "তুমি কতক্ষণ এসেছ? আমি আচমকা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কী ঘুমটাই না পেয়েছিল! এ মেয়েটি কে?"

লাগা বলল, "ও আমাদের বন্ধু। এখন থেকে আমরা তিনজনই একসঙ্গে থাকব। আমি বাইরে গেলে তোকে আর একা থাকতে হবে না। ও-ও তোর সঙ্গে ঘরের কাজকর্মে তোকে সাহায্য করতে পারবে। ভারি ভালো মেয়ে।"

সেই থেকে ওরা তিনজনে নিশ্চিন্তে ওখানে বাস করতে লাগল। নতুন বন্ধু পেয়ে তু'জনেই খুশি।

আর সেই ডাইনী বুড়ীটা? বাক্স হারাবার সঙ্গে সঙ্গে তার জারিজুরিও সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার যে শেষ পর্যন্ত কি হ'ল কেউ জানতেই পারল না। হয়তো এর পর আর তার বেঁচে থাকার কোন উপায়ই ছিল না। ক্রমে সবাই তাকে ভুলে গেল।

রূপকথা

রূপকথাকেই বলা যায় কথাসাহিত্যের আদি জননী। আমরা যাকে এখন গল্প, কহানী বা কিস্‌সা বলি তার সবেরই শুরু হয়েছিল এই রূপকথা দিয়ে এবং শুধু আমাদের দেশেই নয়—পৃথিবীর সর্বত্র। লোকের মুখে মুখে এই রূপকথা ছড়িয়ে পড়ত এক দেশ থেকে আর এক দেশে—দেশ-কাল-পাত্র ভেদে একটু পরিবর্তিত আকারে। তাই দেখা যায় এক-দেশের রূপকথার সঙ্গে অন্য দেশের রূপকথার আশ্চর্য মিল রয়েছে।

এই সব প্রচলিত রূপকথা কোনও লিখিত ভাষায় রচিত হয় নি—লোকের মুখে মুখে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। কে বা কারা যে এর কোন্‌টার রচয়িতা তা যেমন কারো জানা নেই, তেমনি কে বা কারা যে কি ভাবে এর পরিবর্তন করলেন—সংযোজন করলেন তাও নেই কারুর জানা।

এ যুগের রূপকথা-লেখকেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই সব কথাসাহিত্য সংগ্রহ করে এনে নিজের ভাষায় ও ভঙ্গীতে ওদের নতুন করে রূপ দিয়েছেন।

রঙ্গালয়ের কথা

শুরুর আগের কথা

নাটকের ভূত একবার ঘাড়ে চাপলে তাকে নাকি সহজে ছাড়ানো যায় না। তখনকার দিনের শান্তি-নিকেতনের অভিনয়ের কথাই ধরা যাক না কেন।

সামনে এনট্রান্স, অর্থাৎ এখন যাকে তোমরা সেকেণ্ডারি বা মাধ্যমিক পরীক্ষা বল, সেই-পরীক্ষা তখন দরজায় কড়া নাড়ছে। তা নাড়ুক। রবীন্দ্র-নাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সেদিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। কোথায় পরীক্ষার আগে সকাল-দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যে ঘাড় নীচু করে দুলে দুলে আর পাঁচজনের মত পড়া মুখস্থ করবে, তা নয় ছেলেরা চলল এখন নাটকের রিহার্সাল দিতে। অবশ্য ছেলেদের আর দোষ কি? স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথই যদি ছেলেদের নাটক করতে উৎসাহ দেন তা হলে কার আর কি বলার থাকতে পারে? এই সম্পর্কে রবীন্দ্র-পুত্র রথীন্দ্রনাথ 'পিতৃস্মৃতি' নামক স্মরণীয় গ্রন্থে যা লিখেছেন, রঙ্গালয়ের কথা ও নাটকের নানা মজাদার সব গল্প শোনাবার আগে সেই মজার কথাবার্তা কিছু শোনা যাক। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন: "তখন আমাদের না ছিল স্টেজ, না পোশাক-পরিচ্ছদ বা অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম। উৎসাহ দিয়ে আমরা এই সমস্ত অভাব পূরণ করে নিয়েছিলাম। তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল খুবই কম, তাই সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায় ও আমি—এই তিনজনকে একাধারে প্রধান উদ্যোক্তা, প্রযোজক ও কুশীলবরূপে অবতীর্ণ হতে হ'ল। এনট্রান্স পরীক্ষা তখন নিকটবর্তী, তবু নিয়মিত আমাদের মহড়া চলল। আমাদের অধ্যাপকেরা আতঙ্কিত হয়ে বাবার কাছে দরবার করলেন যে অভিনয়ের পরিকল্পনা যদি অগৌণে বাতিল না করা হয় তা হলে পরীক্ষায় পাস করার আশা সুদূরপরাহত। বাবা কিন্তু এঁদের কথায় কান দিলেন না। মহড়া চলতে লাগল আগের মত।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো—নাটক অভিনয়ের ব্যাপারে মাস্টার মহাশয়দের আপত্তি পরবর্তী কালেও মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু বাবার প্রশ্রয়ের দরুণ তাঁরা খুব বেশি সুবিধা করতে পারতেন না।”

এতক্ষণ এই যে নাটকের প্রসঙ্গ বলা হ'ল, তার সময় খুব একটা দূরের নয়, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আর নাটকটি ছিল রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'। কিন্তু নাটকের বা নাট্যশালার এই জনপ্রিয়তা বা অগ্রগতি খুব একটা সহজে হয় নি। বহু মানুষের ত্যাগ-সাধনা ও প্রতিভার সমাহারে বাংলা তথা ভারতবর্ষের নাটক ও নাট্যশালা দিনে দিনে রূপান্তরের পথ পেরিয়ে যে রূপ নিয়েছে তার ইতিহাস কম বিচিত্র নয়।

রঙ্গালয় ও নাটক

রঙ্গালয়ের উৎপত্তির প্রাথমিক ইতিহাস এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে কিছু বলা হয়েছে। এখানে আমরা সাধারণভাবে রঙ্গালয়ের পরিচয় ও সেই সূত্রে অভিনীত নাটক ও নাট্যাশিল্পীবৃন্দের সঙ্গে পরিচিত হব।

নাটকের কথায় দরকারী একটা কথা মনে পড়ে গেল। নাটক কিন্তু নিছক আমোদ-প্রমোদ নয়, নেহাৎ মজাও নয়। ভালো নাটকের অভিনয় দেখা যেন সমাজকেই দেখা। নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই, সংসারের মানুষ কেমন ভাবে তার নানা অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। বিখ্যাত অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী এই সম্পর্কে যে দামী কথা বলেছেন তা জেনে রাখলে নাটক বা অভিনেতার গুরুত্ব সম্পর্কে ভালো ধারণা হবে। তিনি বলেছেন, অভিনেতার কাজ খুবই কঠিন। চোখ মেলে দেখতে হবে, হঠাৎ রেগে গেলে লোকের চোখমুখ কেমন হয়, হঠাৎ আনন্দসংবাদ পেলে মানুষ কেমন উল্লসিত হয়ে ওঠে। দেখতে হবে, মায়ের কান্নায়
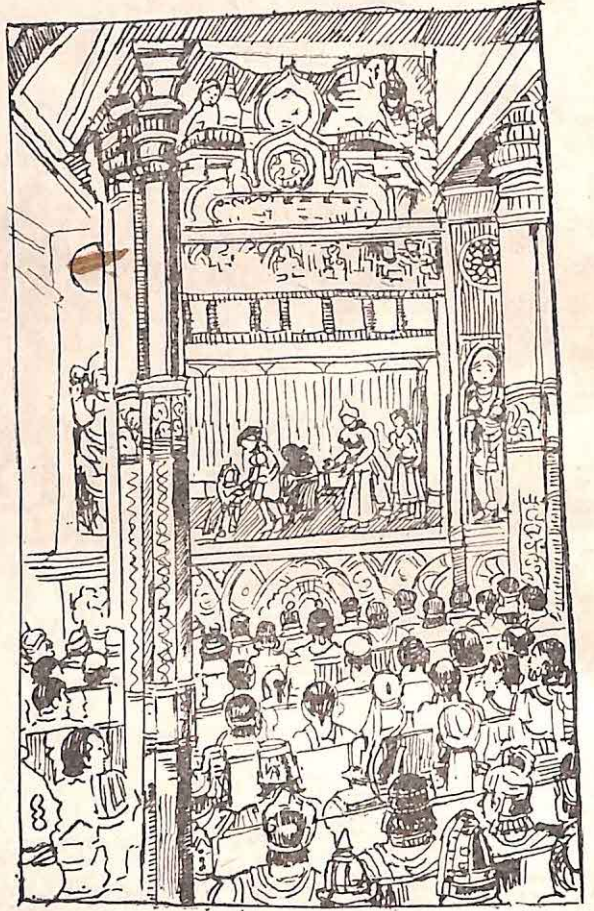
প্রাচীন ভারতীয় মঞ্চ
(শিল্পী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসরণে)

আর বাবার কান্নায় কোথায় তফাৎ। নাটক আমাদের সংসারের এই সব-কিছুই দেখিয়ে দেয়। নাটকে আসল-নকল সব একাকার।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে নাটককে বলা হয়েছে দৃশ্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য হ'ল সেই কাব্য যা অভিনীত হয়। সুতরাং অভিনয়ের দিকে লক্ষ রেখেই রচনা করা হয় নাটক। শুধু পাঠ্যরূপে যে নাটক রচিত

হয় তার সাহিত্যিক মূল্য কিছু থাকলেও অভিনয়ের দিক্ দিয়ে তেমন মূল্য নেই। নাট্যকার নাটকে রসের সৃষ্টি করেন, অভিনেতা সেই রস ফুটিয়ে তোলেন আর দর্শক সেই রস উপভোগ করেন। বুঝতেই পারছ, নাটকের সার্থক রসসৃষ্টি এই তিন শ্রেণীর লোকের পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে।

কিন্তু নাটক অভিনয়ের জন্য চাই রঙ্গালয়। একে নাট্যশালাও বলা হয়। এই নাট্যশালা, তার নাটক, নাট্যশিল্পী আর তাঁদের অভিনয় নিয়েই আমাদের এখনকার গল্প।

রঙ্গালয়ের আদিযুগ

রঙ্গালয়ের আদিযুগের কথায় গ্রীক নাট্যশালা, রোমান নাট্যশালার কথা তোমরা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে পড়েছ। ভারতীয় নাট্যশালার কথাও সেখানে কিছু কিছু আছে।

একটা কথা কিন্তু প্রথমেই জেনে রাখা ভালো যে ভারতবর্ষে নাটকের অভিনয় এবং রঙ্গালয়ের উৎপত্তিকাল সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে মনে রাখতে হবে, এই বিষয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা-গবেষণার এখনও দরকার আছে। ভারতবর্ষের নাট্যকলা সম্পর্কে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া যাবে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে। এই স্মরণীয় বইটি শুধু নাটকের নয়—অভিনয়শিল্প, নৃত্য-সঙ্গীত এমন কি অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কেও অতি প্রয়োজনীয় প্রামাণিক রচনা।

প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার উৎপত্তি কখন হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে ঋগ্বেদের সংবাদ বা আখ্যান সূক্তগুলিতে যে কথোপকথন আছে তা থেকেই নাটকের ধারণা জন্মেছিল—কয়েকজন পণ্ডিত এই মত পোষণ করেন। আবার পাশ্চাত্য পণ্ডিত পিশেল মনে করেন, সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত পুতুলনাচ থেকেই নাটকের ধারণা জন্মেছিল। অপর পণ্ডিত হিল্লেব্রাণ্ড বলেন, নাটকের অনুকরণেই বরং পুতুলনাচের প্রবর্তন হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছায়ানাটক থেকে যে নাট্যকলার উদ্ভব হয়েছিল, কোনোর ও লুডার্স এমন কথাও বলেছেন। নাট্যকলার মূলে বসন্তোৎবের অবদানের কথাও বলা হয়ে থাকে। পণ্ডিত রিজওয়ে মনে করেন, পরলোকগত পূর্বপুরুষের আত্মার উদ্দেশে বিহিত অনুষ্ঠানের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপই নাটক। কীথ্ প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত মনে করেন, ধর্ম বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানই নাট্যকলার উৎস। এঁদের মতে রামায়ণ-মহাভারতের ব্যাপক আবৃত্তি এবং কৃষ্ণলীলার নাটকীয় ঘটনাবলী নাট্যকলার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭—৩২৬) পরে এদেশে যে গ্রীক নাটক অভিনীত হয় ও গ্রীক থিয়েটারের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়—এমন কথাও ওয়েবর প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত বলেছেন। এঁরা এ-ও বলেছেন, ছোটনাগপুরে রামগড় পাহাড়ে আর সীতাবেঙ্গা গুহায় গ্রীক থিয়েটারের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। ভারতবাসী নাকি তখন থেকেই অভিনয় অভ্যাস করেন।

এই সব মতামত সম্পর্কে এর পক্ষে-বিপক্ষে অনেকে অনেক কথাই বলেছেন। তবে কতকগুলো প্রমাণ থেকে এমন কথা বলা যেতে পারে যে গ্রীক আগমনের অনেক আগে থেকেই আমাদের ভারতবর্ষে নাটকের প্রচলন ছিল।

নাট্যশাস্ত্র যে অতি বিস্তৃত, ভরতের বই ছাড়াও

দৌলতেই আমরা শিক্ষাদীক্ষায় এত অগ্রসর হতে পেরেছি, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, ওদের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও অন্যান্য নানা গুণ গ্রহণ করেছি। এক কথায় ওরা ভারতবর্ষকে একেবারে পাল্টে দিয়ে গেছে। নইলে, তার আগে দীর্ঘকালের মুসলিম রাজত্ব ধরে তো চলছিল এক রকম অন্ধকারের যুগ। কিন্তু এ-সবও এখন পুরোনো কথা। এখন আমরাও ওদের মতই এক স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী।

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসও আমরা অনেকেই মোটা-মুটি ভালো করেই জানি। আড়াই হাজার বছর আগে, অর্থাৎ বুদ্ধদেবের আমলেও ও-দেশটিকে মোটেই তেমন সভ্য দেশ বলা যেত না। তখন ওর নাম ছিল ব্রিটেন এবং ওখানকার লোকদের বলা হ'ত ব্রিটন। এখনও ব্রিটেন নামটা আছে এবং ওখানকার লোকেরাও নিজেদের ব্রিটীশ বলেই পরিচয় দেয়, কিন্তু আসলে ওদের এখন নানা জাতের সংমিশ্রণ বলা চলে। খ্রীঃ পূ ৫৫ অব্দে রোমান সেনাপতি জুলিয়াস্ সীজার ব্রিটেন আক্রমণ করে ওদেশটা নিয়ে আসেন রোমান-দের দখলে। চারশ' বছর রোমানদের অধীনে থাকার পর রোমান শক্তি নিস্তেজ হবারপর তারা ব্রিটেন ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু পর পর নানা জাতি—পিক্ট, জুট, অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন প্রভৃতি জাতের লোকেরা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অ্যাংলো-স্যাক্সনরাই রাজ্যটি দখল করে রাখে। তার পর আসে ডেনমার্ক। ডেন রাজারা ইংল্যাণ্ড জয় করে নেন। তার পর ফ্রান্সের উপকূলের নরম্যাণ্ডির রাজা উইলিয়াম দি কঙ্কারার ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে এসে বসেন। এই ভাবে বারে বারে নানা দেশের লোক এসে ছড়িয়ে পড়ে দেশটিতে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, এক ইংরেজ কবি যে লিখেছিলেন—"রুল ব্রিটানিয়া, রুল দি ওয়েভ্ স্, ব্রিটন্ স্ শুড্ নেভার বি স্লেভ্ স্" (ব্রিটানিয়া, শাসন করে যাও, সমুদ্র শাসন করে যাও, ব্রিটনরা কখনও কারও ক্রীতদাস হবে না।)—কথাটা একে-বারে ভুয়ো।

নানা বংশ ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসে রাজত্ব করে গেছে। রাণী ১ম এলিজাবেথের সময়টাকে বলা যায় ওখানকার স্বর্ণযুগ। শিল্পে, সাহিত্যে ও নানা দিকে ইংল্যাণ্ডের খ্যাতি তখন প্রচুর। এই সময়েই মহাকবি শেক্সপীয়ারের আবির্ভাব হয়। স্পেনের রাজা ২য় ফিলিপ তাঁর বিরাট নৌবহর স্প্যানিশ আর্মাডা পাঠিয়ে দেন ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করতে, কিন্তু সে আর্মাডাও ধ্বংস হয়ে যায়।

এর পরই কিন্তু ইংল্যাণ্ডে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। রাজার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অলিভার ক্রমওয়েল প্রটেক্টর উপাধি নিয়ে দেশ শাসন করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই আবার ওখানে ফিরে আসে রাজতন্ত্র। তারপর রাজা ২য় জেম্স্‌কেও সরিয়ে ডাচ্ রাজা অরেঞ্জ-বার উইলিয়ামকে নিয়ে আসা হয় তাঁর জায়গায়। তারপর জার্মেনীর হানোভার রাজ-বংশ এসে ইংল্যাণ্ডে রাজত্ব করতে থাকে। এক কথায়, কত দেশের কত রাজবংশ এসে যে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসে গেছে তার প্রায় হিসেব নেই।

কিন্তু পুরোনো ইতিহাসের কথা থাক, আমরা আরও কাছাকাছি যুগের কথায় আসি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য করতে এসে কি ভাবে ভারত দখল করল সে কথা তো আমরা সবাই জানি। জানি ১৭৫৭ সালের সেই পলাশীর যুদ্ধের কথা। আর তার ঠিক একশ' বছর পরে হ'ল সিপাহী বিদ্রোহ,—যাকে এখন বলা হয় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ। বিদ্রোহ মিটে গেলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ইংল্যাণ্ডের

মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজে শাসনভার গ্রহণ করলেন।

ভিক্টোরিয়া ৬০ বছরের ওপর ইংল্যাণ্ডের মহারাণী ছিলেন। তাঁর সময়টাকেও ইংল্যাণ্ডের একটি

মহারাণী ভিক্টোরিয়া (পরিণত বয়সে)

স্বর্ণযুগ বলা যায়। ইংরেজশক্তি তখন সমস্ত পৃথিবীময় তার সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে, গড়ছে উপনিবেশের পর উপনিবেশ। যদিও আমেরিকা তাদের হাত-ছাড়া হয়ে গেছে অনেক আগেই, তবুও বলা হ'ত ব্রিটীশ রাজত্বে কখনও সূর্য অস্ত যায় না। অর্থাৎ গোটা পৃথিবীময় এমন ভাবে তার রাজত্ব ছড়িয়ে ছিল যে একদিকে যখন সূর্য অস্ত যেত অন্য দিকে তখন হ'ত সূর্যোদয়।

ভিক্টোরিয়ার পর তাঁর নাতি পঞ্চম জর্জের আমলে হয় প্রথম মহাযুদ্ধ। ইংরেজ পক্ষ বিজয়ী হলে তাদের প্রতাপ বেশ বেড়ে যায়। তারপর ষষ্ঠ জর্জের রাজত্বকালে হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এবারেও ইংরেজ পক্ষ জয়ী হলেও তাদের প্রতাপ আস্তে আস্তে কমে আসছিল। যুদ্ধের পর এক এক করে তারা তাদের সাম্রাজ্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ভারত প্রভৃতি দেশ স্বাধীন হয়ে যায়, স্বাধীন হয় আফ্রিকারও ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অনেক দেশ। তবে সকলকে একত্র একটা বাঁধনে রেখে দেয় ব্রিটীশ কমন্‌ওয়েল্‌থ্, যা পরে নাম বদলে হয় শুধু কমন্‌ওয়েল্‌থ্।

এ-সবও তো গেল ইতিহাসেরই কথা। এখনকার ইউনাইটেড কিংডমের কথায় ফিরে আসছি।

আয়তনে ৮৮,৭৬৪ বর্গ মাইল, জনসংখ্যাও সাড়ে পাঁচ কোটির মত। রাজধানীর নাম লণ্ডন। তা ছাড়া আরও বড় বড় শহর আছে। যেমন বার্মিংহাম, গ্ল্যাসগো, লিভারপুল, ম্যাঞ্চেস্টার, শেফিল্ড, লীড্‌স্, এডিনবরা, ব্রস্টল ইত্যাদি। ভাষা ইংরেজি, তবে ওয়েল্‌স্ এবং স্কটল্যাণ্ডের কথ্য ভাষায় সামান্য একটু তফাৎও আছে।

পৃথিবীতে যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশে এখনও রাজারাণী আছেন ইউনাইটেড কিংডম তার একটি। এখনকার রাণী হচ্ছেন দ্বিতীয় এলিজাবেথ। তাঁর স্বামী প্রিন্স ফিলিপকে আগে বলা হ'ত ডিউক অব্ এডিনবরা। (আগে রাণীর স্বামীকে বলা হ'ত প্রিন্স কন্‌সর্ট। ভিক্টোরিয়ার স্বামীকেও তাই বলা হ'ত।) প্রিন্স ফিলিপ কিন্তু রাজা ন'ন, গ্রীস দেশের লোক; তবে রাণীর স্বামী হিসেবে ইংরেজই হয়ে গেছেন।

রাজা বা রাণী থাকলেও তাঁদের ক্ষমতা বলতে কিছু নেই, সমস্ত ক্ষমতাই ব্রিটীশ পার্লামেন্টের,—যার কর্তৃত্ব রয়েছে প্রধান মন্ত্রীর ওপর। তবে ইংল্যাণ্ডের লোকেরা

এ-সম্পর্কে আরো যে সব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লেখা হয়েছিল—এ থেকেই তা প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন সময়ে লিখিত ধনঞ্জয়ের 'দশরূপক', বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ', রূপ গোস্বামীর 'নাটকচন্দ্রিকা', সুন্দর মিশ্রের 'নাট্য-প্রদীপ', নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয়দর্পণ', সাগর নন্দীর 'নাটকলক্ষণরত্নকোষ' সারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশন' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'র কথা একটু আগে বলেছি। এর রচনা বা সংকলন-কাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে নানা মত। সম্ভবত দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতাব্দীতে এটি রচিত। তবে ভারতীয় নাট্যকলার উদ্ভব ও ক্রম-বিকাশে এই বইটির স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। এবং এই বিষয়ে এই বইটিই প্রাচীনতম।

যেমন আগে ভাষার উৎপত্তি হয়, পরে রচিত হয় ব্যাকরণ, তেমনিই আগে নাটকের উদ্ভব, তেমনিই পরে নাট্যসূত্র ও নাট্যশাস্ত্রের রচনা—এইটেই স্বাভাবিক ক্রম। তাই এই সূত্রেই বলা যায়, ভরতের নাট্য-শাস্ত্রের আগেই নাটক এসেছে। আর, তা ছাড়া, প্রাচীন বৌদ্ধধর্মগ্রন্থেও নাট্যরঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভগবান্ বুদ্ধ রাজগৃহে বসে আছেন; তাঁর দুই শিষ্য উপতিষ্য আর মৌদ্গল্যায়ন সবার সামনে অভিনয় করছেন।

এসব থেকেই, বুঝতেই পারছ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতবর্ষে নাট্যকলার সাধনা চলে এসেছে। নাটক ও রঙ্গালয় তো বটেই, প্রাচীন ভারতে অভিনয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেরও সংবাদ পাওয়া যায়। তারপরে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ এবং ভারতবর্ষের নাটক ও অভিনয়ে গ্রীক প্রভাবের কথা তো একটু আগেই তোমাদের বলা হয়েছে।

কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের নাটকের গৌরবময় ধারা একদিন ম্লান হয়ে এল। মুসলমানদের ধারাবাহিক আক্রমণ ও ভারতজয় ভারতবর্ষের নাট্য-কলার অধঃপতনের কারণ বললে ভুল বলা হবে না মোটেই। ভারতের যে সব রাজা-মহারাজা কবি-শিল্পীদের বড় সমর্থক ছিলেন, মুসলমানদের আক্রমণে তাঁরা যে কোথায় গেলেন! অবশ্য মুসলমান আক্রমণের আগে থেকেই নাটক তথা সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে অবক্ষয়ের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না। তবে মুসলমান আক্রমণ এই অবনতিকে যেন আরো এগিয়ে দিল। মোট কথা, নাটকের এই হীন অবস্থা নাট্যশালায়ও সংক্রামিত হ'ল। এবং আস্তে আস্তে ভারতের নাটকাভিনয়ের ধারা শেষ হয়ে এল।

কিন্তু 'শেষ নহে যে, শেষ কথা কে বলবে।' রাজা যায়, রাজা আসে। এবারে এল ইংরেজ। ইংরেজের মধ্যবর্তিতায় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটল। আর, এ কথা বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে না, বাংলা নাট্যকলা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলা-দেশের নিবিড় পরিচয়ের অন্যতম ফসল। অর্থাৎ বাংলা রঙ্গালয়ে বিদেশী রঙ্গালয়ের প্রভাবের কথা কোনোমতেই ভোলা যাবে না।

যাত্রা : বাঙ্গালীর নাট্যসম্পদ্

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত বাংলা থিয়েটারের সম্পর্ক অনেক দূরের হলেও, ইংরেজের আগমনের আগে কি তা হলে বাংলায় কোন নাট্যসম্পদ্ ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। আর তা হ'ল যাত্রা। বাংলার

নিজস্ব নাট্যঐতিহ্য বলতে আমরা যাত্রাকেই বুঝব। শিশিরকুমার ভাদুড়ী বলতেন, আমাদের দেশের যাত্রাই ছিল আমাদের দেশের মাটির জিনিস। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা কী রূপ নিতে পারে সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ইচ্ছে তাঁর ছিল। কিন্তু সে সুযোগ তিনি পান নি। গিরিশচন্দ্র ঘোষও পেশাদার নটের বৃত্তি গ্রহণের পরেও বহুবার যাত্রার উন্মুক্ত আসরে অভিনয় ক'রে যাত্রার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছেন।

যাত্রা কথাটি কিন্তু অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে এসেছে। অতীতে কোনও দেবতার লীলা উপলক্ষে মানুষজন এক জায়গা থেকে অন্য আর এক জায়গায় গমন করে নাচ-গানের সঙ্গে সেই দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করত। একেই বলা হ'ত যাত্রা। সুতরাং প্রথমত যাত্রা বলতে উৎসব উপলক্ষে গমনের ব্যাপারটি অপরিহার্য ছিল, তা বোঝা যাচ্ছে। তারপরে, কালের গতিকে, কোনো জায়গায় গমন না ক'রে এক জায়গাতেই বসে দেবতার লীলা অভিনয় হ'ত। এখানে বলে রাখি, বৈদিক যুগ থেকেই দেবতার সামনে নাচ-গানের প্রচলন চলে আসছে। পৌরাণিক যুগেও দেবতার স্নান-উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও উৎসবের প্রচলন ছিল। বৌদ্ধযুগে অনুষ্ঠিত হ'ত রথোৎসব। এই রথোৎসবের শোভাযাত্রায় নাচ-গান, ক্রীড়াকৌতুক থাকত। বৌদ্ধধর্মের পর বাংলাদেশে শৈব ও সূর্যপূজার প্রচলন হয়েছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, সূর্যপূজার উৎসব সর্বাপেক্ষা আদি উৎসব আর এই-উৎসব থেকেই অন্যান্য পূজার উৎপত্তি। সূর্যদেবতা যে অতি প্রাচীনকালেই শিব-ঠাকুরে রূপান্তরিত হয়ে যান, এমন কথাও পণ্ডিতদের লেখায় পাওয়া যায়। শিবোৎসব থেকে ক্রমে নাটক ও যাত্রার উদ্ভব হয়েছিল, এ রকম অনুমান অসঙ্গত নয়। মঙ্গলগান, লোকসঙ্গীত, পালাগান প্রভৃতির মধ্যেও যাত্রার অঙ্কুর ছিল। রামাই পণ্ডিতের শূন্য-পুরাণে, ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে ধর্মপূজা উপলক্ষে নৃত্য-গীত ও বাদ্যের কথা পাওয়া যায়। মঙ্গলচণ্ডীর পূজাতেও নাচ-গানের প্রচলন ছিল। মনসার

পাঁচালী গানের মূল গায়ক
ডান হাতে মন্দিরা, বাঁ হাতে চামর, পায়ে নূপুর

ভাসানও খোল-মন্দিরা সহযোগে পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে গাওয়া হ'ত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণলীলার আদি নাট্যরূপের সন্ধান মিলবে। এই কাব্যগুলির সংলাপ ও গান

থেকে পরবর্তীকালের যাত্রাগানের যে প্রেরণা এসেছিল সে-কথা নাট্যঐতিহাসিক বলেছেন। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক ঝুমুর ও ধামালী গানেও লৌকিক নাচ-গানের ধারা বহমান। যাত্রার ওপর এই সব নৃত্যগীতের প্রভাবের কথা অস্বীকার করা যায় না। রামায়ণ-মহাভারতের নানান্ ঘটনা নিয়ে লৌকিক গান ও অভিনয়ের ধারা অতি প্রাচীনকাল থেকে বাঙালীকে আনন্দ দিয়ে এসেছে। এখানে পাঁচালী সম্পর্কে সামান্য দু'কথা বলে নিই। আগে মঙ্গলগান ও রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি পাঁচালী-ছন্দে গাওয়া হ'ত। পাঁচালীর মধ্যে একজন মূল গায়ক গান করতেন। তাঁর ডান হাতে মন্দিরা, বাঁ হাতে চামর আর পায়ে থাকত নূপুর। তাঁর সঙ্গে দোহার থাকতেন। থাকতেন মৃদঙ্গবাদক। পাঁচালীর প্রচার-প্রসারের ফলে আর পালাগান দীর্ঘ হবার জন্য একজন মূল গায়কের জায়গায় দু'জন বা তারও বেশি গায়ক ও অভিনেতার আগমন ঘটল। ক্রমে ক্রমে পাঁচালীর মধ্যে বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি দেখা দিল। নাটকের ইতিহাসকারের মতে, কালক্রমে এই পাঁচালী থেকেই জনপ্রিয় যাত্রাগানের উদ্ভব হ'ল।

যাত্রাভিনয়ে চৈতন্যদেব

এখানে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কথা না বললেই নয়। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলে থাকেন, বাঙালী 'যাত্রা' পেয়েছে চৈতন্যদেবের কাছ থেকে। তাঁর আগে যে যাত্রার অভিনয় হ'ত তার প্রমাণ 'চৈতন্য-ভাগবতে' আছে। তবে এই যাত্রার চেহারা কেমন ছিল তা জানবার উপায় নেই। সন্ন্যাস-গ্রহণের আগে চন্দ্রশেখরের বাসভবনের আঙিনায় তিনি 'দানলীলা' অভিনয় করেন। মহাপ্রভু রাধার ভূমিকা আর অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস যথাক্রমে কৃষ্ণ, যোগমায়া ও নারদের ভূমিকা গ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর প্রভাবে প্রাচীন যাত্রার মধ্যে অনেক রূপান্তর সাধিত হয়েছিল। তবে উনবিংশ শতাব্দীর আগে নাট্যাভিনয়-অর্থে 'যাত্রা' কথাটির প্রচলন হয় নি বলেই মনে হয়। কিন্তু 'উৎসব' অর্থে 'যাত্রা' শব্দের ব্যবহার সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীন কাল থেকেই শোনা যাচ্ছে। তবে মহাপ্রভুর সময়ে বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সব জায়গাতেই কৃষ্ণযাত্রার ব্যাপ্তি ঘটতে থাকে। চৈতন্য-দেবের পরে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যাত্রাকে 'কালীয়দমন' নামে অভিহিত করা হ'ত। এর প্রবর্তক শিশুরাম। যাত্রাগানের আর এক বিখ্যাত মানুষ হলেন গোবিন্দ অধিকারী। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, মধুসূদন কান গোবিন্দ অধিকারীর সমসাময়িক বিখ্যাত যাত্রা-রচয়িতা। কৃষ্ণযাত্রা ছাড়াও রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, কালীয়দমন যাত্রা, মনসার ভাসান যাত্রাও সেই সময় প্রচলিত ছিল।

সখের দল

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সখের যাত্রাদলের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটল। এই নতুন যাত্রার মধ্যে নাটকীয় উপাদান ধীরে ধীরে প্রবেশ করল। আগের সব যাত্রায় থাকত দেব-দেবীর কাহিনী। এবারে যেন মানুষের কথা বলবার দিকে ঝোঁক দেখা গেল। এর মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। প্রথম বিদ্যাসুন্দর দল গঠন করেন বরানগরের ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর অভিনয় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। তার পরের কাহিনী খুব একটা সুখের নয়। মুসলমান রাজত্ব শেষ হয়েছে কিন্তু ইংরেজ

রাজত্বও আসন পাতে নি। রাজ্যের মধ্যে অরাজকতা, অশান্তি। সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা। যা হবার তাই হ'ল। মানুষের রুচি ক্রমেই নীচের দিকে নামতে লাগল। এই সময়ে মানুষের নিম্নরুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাঁচালী, হাফ আখড়াই, তর্জা এবং যাত্রা-গানের ব্যাপক চর্চা হতে লাগল। এ যেন সব কিছু শেষ হবার আগের অবস্থা।

এখানে কিন্তু একটা দরকারী কথা ব'লে রাখি। আগেকার যাত্রার পালা-রচয়িতা বা অধ্যক্ষরা আধুনিক নাট্যকারদের মতো বিদ্বান্ বা পণ্ডিত না হলেও তাঁরা ছিলেন ভক্ত এবং বোধবুদ্ধি ও পরিণত চিন্তাভাবনার অধিকারী। তাঁদের রচিত পালা ও গানগুলো দর্শক-শ্রোতাদের খুবই তৃপ্তি দিত। শোনা যায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের মধুর কণ্ঠের গান শুনে হাজার হাজার শিক্ষিত মানুষ আত্মহারা হয়ে চোখের জলে ভেসেছেন। তখনকার যাত্রাপালার ভাব-ভাষা ছিল সহজ। দর্শক-শ্রোতাদের মন ভরে যেত তাতে। এই সব কারণে প্রাচীন যাত্রার মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষার কাজটুকু সার্থকভাবেই হতে পারত।

যে কথা বলছিলাম। আস্তে আস্তে যাত্রার মধ্যেও বিকৃতি আসতে থাকে। তারপরে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নতুন সৃষ্ট রঙ্গমঞ্চ ও তার নাটকের প্রভাব এসে পড়ে যাত্রার ওপর। যাত্রার রূপ পাল্টে গেল। এতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। কেননা সমাজের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটে থাকে। যাত্রার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

যাত্রার পরিবর্তিত রূপের নাম গীতাভিনয়

এই গীতাভিনয় যাত্রার পালাগান আর নাটকের মাঝামাঝি একরকমের অভিনয়। রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও নাটকের শুরু হবার পরে যাত্রার জনপ্রিয়তা কমে যাবার কথা একটু আগেই বলেছি। রঙ্গালয় বা নাট্যশালা তৈরি করতে অনেক টাকাপয়সার দরকার। তাই সকলের দ্বারা এত খরচখরচা করে নাট্যশালা তৈরি করা সম্ভব ছিল না। একটা কিছু তো করতেই হয়। তাই করা হ'ল। তবে নাটকের মত এতে অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ সবই রইল। সামঞ্জস্যপূর্ণ কাহিনীও রইল। শুধু রঙ্গমঞ্চের মত দৃশ্যপট রইল না। আর এতে গানের আধিক্য আরও বেশি দেখা গেল।

নতুন প্রকৃতির এই যাত্রা অপেরা বা গীতাভিনয় নামে জনপ্রিয় হ'ল। এখন তোমরা যে-যাত্রা দেখ তা এই অপেরার মতই।

মতিলাল রায় ও মুকুন্দদাসের যাত্রা

যাত্রার কথা বলতে গেলে এই দু'জন খ্যাতনামা শিল্পী-গায়ক-অভিনেতা-নাট্যকারের নাম না করলেই

নাট্যকার মতিলাল রায়

নয়। মতিলাল জন্মগ্রহণ করেন বর্ধমান জেলার ভাত-শালা গ্রামে, ১২৪৯ সালে। জোড়াসাঁকো থানায়

কেরানীর কাজ, তারপরে শিক্ষকতা, তারপরে জি. পি. ও-তে চাকরি—এইরকম নানা জায়গায় চাকরি করে অবশেষে যাত্রার দল বাঁধেন তিনি। তাঁর যাত্রার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এবং, শুনলে অবাক্ হবে, যাত্রার দল করে মতিলাল জমিদারীও করে-ছিলেন। যাত্রার দল করে এমন নামডাক আর টাকা রোজগার আর কোনও যাত্রাশিল্পীর কপালে জুটেছে কিনা সন্দেহ। যাত্রার পালা রচনায় এঁর খ্যাতি ছিল খুবই। বহু বিখ্যাত যাত্রাপালার রচয়িতা ইনি। ঈশ্বর গুপ্তর 'সংবাদ প্রভাকর'-এ ইনি মাঝে মাঝে কবিতাও লিখতেন। কেশবচন্দ্র সেনের বাসভবনে মতিলালের 'নিমাইসন্ন্যাস' পালা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণও মতিলালকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করেন। যাত্রাগানের জন্য 'কাব্যকণ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত হন তিনি।

চারণকবি মুকুন্দদাসের নাম নানা কারণে ভোলা যাবে না। এঁর জন্ম ১২৮৫ বঙ্গাব্দে। এঁর আসল নাম

চারণ কবি মুকুন্দদাস

যজ্ঞেশ্বর দে। ছেলেবেলা থেকেই গানের দিকে এঁর প্রচণ্ড ঝোঁক। গান রচনার ব্যাপারে তাঁর অসাধারণ স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। বরিশালে স্বামী রামানন্দের সংস্পর্শে এসে তিনি কৃষ্ণভক্ত হয়ে ওঠেন। রামানন্দই তাঁর নাম দেন মুকুন্দদাস। অর্থাৎ মুকুন্দের দাস। স্বদেশী আন্দোলনে মুকুন্দদাসের যাত্রাগান বাংলায় আলোড়ন তুলেছিল বললে বেশি বলা হবে না। যাত্রা রচনায় মুকুন্দদাসকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। বাংলার গ্রামে গ্রামে মুকুন্দদাস তাঁর প্রাণ-মাতানো দৃপ্ত কণ্ঠে যাত্রাগান পরিবেশন করে মানুষের মনে নতুন শক্তি এনেছিলেন। যখন তিনি গাইতেন—

> "দাঁড়া রে বাঙালী, আপনা ভুলিয়া
> সাজাই বাংলা নতুন সাজে।
> মাভৈঃ ওঠ রে বাঙালী বীর,
> কতকাল রবি নত করি শির?
> শুনেছি রে জয় বাঙালী জাতির
> অনাহত শব্দ ধ্বনির মাঝে।"

তখন নিদ্রিত বাঙালীর রক্তে দোলা না লেগে পারত না। মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রার বৈশিষ্ট্য ছিল, গানের সঙ্গে তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে দর্শক-শ্রোতাদের আবেগের মূল ধরে নাড়া দিতেন। স্বদেশী যাত্রার মহান্ শিল্পী মুকুন্দদাসকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের জেলখানায়ও অনেকদিন ঘানি টানতে হয়েছিল। এ ছাড়া অন্যান্য অমানুষিক নির্যাতন তো ছিলই। জেল থেকে ছাড়া পাবার পরেও এই বিপ্লবী শিল্পীর কাজ থেমে থাকে নি। নানান্ বাধা সত্ত্বেও তিনি স্বদেশী যাত্রার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। এমন দিনও গেছে যখন আসরে তিনি গান গাইছেন তখন পুলিশ তাঁকে লাঠির আঘাতে জর্জরিত করেছে। কিন্তু মুকুন্দদাসকে দাবিয়ে রাখা সহজ কাজ ছিল না।

'মাতৃপূজা' পালা যখন তিনি প্রথম অভিনয় করেন তখন সারা বাংলায় সে কী উন্মাদনা! ১৯৩৪-এর ১৮ মে এই দেশপ্রেমিক জনপ্রিয় শিল্পীর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স ৫৮ বছর। যাত্রার ইতিহাসে মুকুন্দ-দাস অমর—অম্লান।

চিৎপুরের অন্ধকার

সেই কোন্ কালে যে যাত্রার প্রচলন হয়েছিল, তা কিন্তু লুপ্ত হ'ল না। ইংরেজ শাসন, রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা, নাটকের জনপ্রিয়তা, সিনেমার প্রভৃতি মানুষের আগ্রহ যাত্রার পথরোধ করল নিশ্চয়ই এবং যাত্রাকেও মাঝে যাত্রার অভিনয় দেখা গেল। তারপরে ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগ যাত্রাশিল্পের ধারাকে যেন আরো খণ্ডিত করল। বাংলার যাত্রাশিল্পের প্রাণকেন্দ্র চিৎপুরে নেমে এল ঘন কালো মেঘ।

এর কারণও অবশ্য আছে। শুধুমাত্র রামায়ণ-মহাভারত আর পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে আবর্তিত হতে হতে যাত্রার সব রসদ যেন ফুরিয়ে এল। নতুন যুগ, নতুন সমস্যার কথা এই সময়কার যাত্রায় প্রকাশ পেল না। তা ছাড়া, পোশাক-আশাক এবং প্রয়োগ-সংক্রান্ত উপকরণের অভাব, যুগোপযোগী ও আধুনিক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা—এই সবই যেন যাত্রা-

যাত্রার আসর

থমকে দাঁড়াতে হ'ল। কিন্তু তার প্রাণভোমরাটি যেন শেষ হয়েও হ'ল না। গ্রামের পূজামণ্ডপে মাঝে

গানের সমাপ্তিকে দ্রুত থেকে দ্রুততর করছিল। অথচ এই চরম দুর্দিনেও যাঁরা চিৎপুরে যাত্রার গদিঘরে ম্লান

হয়ে বসে থাকতেন তাঁদের অনেকেরই কিন্তু যাত্রার প্রতি ভালোবাসা ছিল, দরদ ছিল, কিন্তু পথের সন্ধান বুঝি জানা ছিল না। তাই চোখের সামনে যাত্রার,—যাকে ভারতের অভিনয়ধারার আসল প্রতিনিধি বললেই সঠিক বলা হয়,—তার পরিণতি ঘনিয়ে আসতে দেরী হ'ল না।

তখন শহরের শিক্ষাভিমানী বহু মানুষ কলকাতার যাত্রার আসরে বসতে লজ্জা বোধ করতেন। যাত্রাকে গেঁয়ো বলতে তাঁরা আনন্দ পেতেন বেশি। গ্রামের পালা-পার্বণে মাঝে-সাঝে যাত্রাপালার গান হলেও ভারতীয় নাটকের জনক যাত্রার মর্যাদাবৃদ্ধি ও নবজন্মের কোনও সম্ভাবনা দেখা গেল না। ভারতের এই প্রাচীন নাট্যশিল্পের মর্মান্তিক পরিণতি দেখে অনেকেই বোধ হয় চোখের জল ফেলেছিলেন।

যাত্রার জয়যাত্রা

কিন্তু চিরকাল কি আর অন্ধকার থাকে? ক্যালেণ্ডারের পাতা তো একভাবে অনড় হয়ে থাকে না। এইভাবেই দুঃখ-হতাশা ও ভয়ের আঁধার পেরিয়ে এসে গেল ১৯৬১। শহরে নাটকের জোয়ার। সিনেমার চটুল হাতছানি। ঠিক এই সময়েই দরজায় কড়া নাড়ল ১৯৬১। অর্থাৎ শোভাবাজার রাজবাড়ির সেই ঐতিহাসিক যাত্রা-উৎসব।

হ্যাঁ, ঐতিহাসিকই বটে। অবহেলিত, মুমূর্ষু ও অচ্ছুৎ হিসেবে চিহ্নিত যাত্রাকে নিজস্ব মহিমায় সগৌরবে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে তাকে মৃত্যুর ভয়াবহ হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কয়েকজন শিল্পদরদী মানুষ ধার-দেনা করে, নিজেদের স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে শোভাবাজার রাজবাড়িতে ১৯৬১-তে যে বিরাট যাত্রা-উৎসবের আয়োজন করেছিলেন তা যাত্রার নব জীবনলাভের এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস। সত্যি কথা বলতে কি, তখন থেকেই কলকাতার মানুষ যেন যাত্রার প্রাণভোমরার সন্ধান পেয়ে বাঁচলেন। শিক্ষিত বিদ্বান্ মানুষের কাছে যাত্রা আর অচ্ছুৎ হয়ে রইল না।

যাত্রার এই নবজন্মলাভের পেছনে নিশ্চয়ই অনেকের অবদান আছে। কিন্তু প্রবোধবন্ধু অধিকারীর সক্রিয় ভূমিকা ও নেতৃত্বের কথা কোনো দিন ভুলবার নয়। সেই সময় বহু খ্যাতনামা শিল্পীও যাত্রাকে নাটক বলতে চান নি। এতে যাত্রার প্রতি অবজ্ঞাই দেখানো হয়। কিন্তু প্রবোধবন্ধু পাহাড়সমান বহু বাধা তুচ্ছ করে, যাত্রাকে জাতশিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে সফল হন। প্রবোধবন্ধুর যুক্তি ছিল যথার্থ। তিনি বলেছিলেন, যাত্রা আসলে মডার্ন আর্ট। সে কখনো থেমে থাকে নি। সময়, সভ্যতা আর মানুষের রুচিকে অবলম্বন করে যাত্রার উপস্থাপনা, বক্তব্য, রীতি ইত্যাদি পাল্টাচ্ছে। মানুষের জীবনে যাত্রার যোগাযোগ গভীর। সুতরাং যাত্রাকে নাটক বলে স্বীকার না করার পেছনে কোনো কারণ থাকার কথা নয়। নাটকের মত পাকা ঘরে উঠে না এলেও যাত্রার নাটকত্ব তাতে মারা যায় না। বরঞ্চ জনগণের মধ্যে নীল আকাশের নীচে এর অবস্থিতির জন্য যাত্রাকে জনমানস বুকের কাছেই রেখেছে। সে যাই হোক, প্রবোধবন্ধুর জেদ-ভালোবাসা আর নিরন্তর চেষ্টার ফলে শোভাবাজার রাজবাড়ির যাত্রা-উৎসব কী অভাবনীয় কাণ্ডটাই না ঘটাল তার সাক্ষী ছিলেন অনেকেই। বর্তমান লেখকও কিশোর-বয়সে সেই যাত্রা-উৎসব দেখতে লাইন দিয়েছিল। বেশ মনে আছে, ছোট জায়গা, কিন্তু কত লোক! আরো মনে আছে, যাত্রা হতে হতে মাঝপথে একটু

বন্ধ থাকত। কেননা রাজবাড়িতে সন্ধ্যারতি হচ্ছে।

যে কথা বলছিলাম। যাত্রা-উৎসবের সাফল্যের দলিল এখনকার যাত্রা। এখন যাত্রা কত উন্নত! তার কাহিনী-বিন্যাস, সাজপোশাক, আলো, অভিনয়ধারা —সব কিছুই এখন মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখছে। 'গেঁয়ো' বলে যাত্রাকে আর অবহেলার উপায় নেই। এখন যাত্রার আসরে দশ-পনেরো হাজার মানুষের উপস্থিতি অতি সাধারণ ঘটনা। বিখ্যাত দল নট্ট কোম্পানীর যাত্রার আসরে পঞ্চাশ হাজার মানুষের আগমনও এখন হচ্ছে। সিনেমা-থিয়েটারের নামীদামী শিল্পীরা এখন যাত্রায় অভিনয় করতে লজ্জা পাচ্ছেন না। অনেকেই ইতিমধ্যে যোগদান করেছেন। সোজা কথায়, যাত্রা হ'ল ন্যাশনাল থিয়েটার, এবং শিল্পের ক্ষেত্রে যাত্রা এখন অন্যতম প্রধান ইন্‌ডাস্ট্রী। প্রচুর টাকা এখন যাত্রায় লগ্নী করা হচ্ছে। এক সময় থিয়েটার আর সিনেমা যাত্রার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে এবং যাত্রার আধুনিকীকরণের অভাবের সুযোগ নিয়ে যাত্রার শেষ শয্যা রচনার কাজ প্রায় সমাধা করে ফেলেছিল, কিন্তু এখন যাত্রাই এদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।

এই সবের মূলেই প্রবোধবন্ধু এবং কয়েকজন ভারতীয় সংস্কৃতিপ্রেমিক দরদী মানুষ। প্রবোধবন্ধুকে 'যাত্রাবন্ধু' বললে তাই বেশি বলা হবে না। বড় ফণীবাবু একবার প্রবোধবন্ধুর হাত নাকি কপালে ছুঁইয়ে বলেছিলেন, 'আপনাকে যিনি পাঠিয়েছেন, যিনি প্রেরণা আর উদ্যম দিয়েছেন আপনার মধ্যে, দিয়েছেন আশ্চর্য সৎসাহস এবং শক্তি সেই মহাশক্তিধরকে প্রণাম জানাই।' এ সব যাত্রা-উৎসবের ঠিক আগের কথা। যাত্রা-উৎসবের সাফল্য সম্পর্কে প্রবোধবন্ধুর প্রস্তাবে যখন অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন তখনই এক ফাঁকে যাত্রার সম্রাট্ ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ এই কথা বলে প্রবোধবাবুকে প্রেরণা দিয়েছিলেন। ফণীবাবু তাঁর দূরদৃষ্টি ও ভালোবাসা দিয়ে বুঝিয়েছিলেন—যাত্রাকে নতুন করে জাগাবার

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

প্রয়োজন, নইলে যাত্রার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বড় ফণীবাবুর আশা-আকাঙ্ক্ষা শুধু সফলই হয় নি, সার্থক-ভাবেই তা পূর্ণ হয়েছে।

দৃশ্যপটহীনতা, সঙ্গীতে গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদি যাত্রার নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যা বোধ হয় অনেকের কাছেই ধরা পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু অধরা থাকে নি। রবীন্দ্রনাথ যাত্রাকে তাই ভীষণ পছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন—"আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐ জন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা

বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।” কাব্যরস, যেটা আসল জিনিস, সেটাই অভিনয়ের সাহায্যে যাত্রায় পাওয়া যায় বলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল।

যাত্রার শিল্পী

বাস্তবিকই, যাত্রার মধ্যে এই কাব্যরস তথা জীবনের রসের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই একেবারে আদি থেকে আজ পর্যন্ত কত সৃজনশীল ব্যক্তি এই অভিনয়কলার সঙ্গে নিজেদের নাম যুক্ত করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। আদিযুগের কত নাম-না-জানা প্রতিভাধর শিল্পী এবং তারপরে শিশুরাম অধিকারী ও তাঁর উত্তরসাধক রূপে শ্রীদাম, সুবল, পরমানন্দ,

ফণিভূষণ মতিলাল

গোবিন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে (গোপালচন্দ্র দাশ), মদন মাস্টার, নারায়ণ মাস্টার, লোকনাথ দাশ, মতিলাল রায়, মুকুন্দদাস এবং তারও পরে সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বড় ফণীবাবু), ফণিভূষণ মতিলাল (ছোট ফণীবাবু), সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হরলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ যাত্রায় নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক ও শিল্পীবৃন্দ যাত্রার জন্য সর্বস্ব পণ করে আমাদের ঋণী করে রেখেছেন।

এঁদের পরেই নাম করতে হয় সূর্যকুমার দত্ত, প্রভাত বসু, ভোলা পাল, পঞ্চু সেন, পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় বসু, শিব ভট্টাচার্য এবং তারপরে স্বপনকুমার, তপনকুমার, রাখাল সিংহের নাম বিশেষ ভাবে মনে পড়ে।

উল্লেখযোগ্য অন্যান্য অভিনেতা হলেন—বিজন মুখোপাধ্যায়, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ দাশগুপ্ত, সুজিৎ পাঠক, শেখর গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তিগোপাল, মোহন চট্টোপাধ্যায়, সমীর লাহিড়ী, সনৎ বসু, অমিয় বসু, পান্না চক্রবর্তী, দিলীপকুমার, গুরুদাস ধাড়া, শিবদাস মুখোপাধ্যায়, অনাদি চক্রবর্তী, আনন্দময়, শম্ভু সিংহ, পাহাড়ী ভট্টাচার্য, দীপেন চট্টোপাধ্যায়, নির্মল মুখোপাধ্যায়, মাখন সমাদ্দার, দ্বিজু ভাওয়াল, চন্দ্রশেখর দে প্রমুখ। এঁদের মধ্যে পুরাণে পারদর্শী মোহন চট্টোপাধ্যায় পৌরাণিক যাত্রাপালার পরিচালনা ও অভিনয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

আগেকার যাত্রায় পুরুষরাই মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। বছর কুড়ি আগেও বেশ কিছু পুরুষ অভিনেতাকে দেখা গিয়েছে নারীচরিত্রে অভিনয় করতে। আদর করে এঁদের ‘গুঁফোরাণী’ ব’লে কেউ কেউ সম্বোধন করে থাকেন। পুরোনো দিনের অভিনেতাদের কথা না বলে এই শতকের কয়েকজন ‘গুঁফোরাণীর’ কথা বলে নিই। প্রথমেই বিনোদরাণীর

নাম মনে আসে। হুগলী জেলার অধিবাসী বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী 'বিনোদরাণী' রূপে যাত্রায় রাণী-মহারাণী-রাজকুমারী প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করে খুব নাম করেছিলেন। এঁর পরে নাম করতে হয় নিতাইরাণী (নিতাইপদ গঙ্গোপাধ্যায়), ছবিরাণী (শ্যামাপদ রায়), বাবলিরাণী (প্রকৃতি ভট্টাচার্য), চপলরাণী (চপল ভাদুড়ী ; অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রভা দেবীর ছেলে), পুতুলরাণী (শম্ভু নায়েক), শতদলরাণী (সুনীলচন্দ্র রায়), হরিগোপালরাণী (হরিগোপাল দাস) ও কাঞ্চনের (মণীন্দ্র নন্দী)।

এখন আর গুঁফোরাণীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এখন মহিলাচরিত্রে মহিলারাই অভিনয় করছেন। মহিলা অভিনেত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন—জ্যোৎস্না দত্ত, বীণা দাশগুপ্তা, তারারাণী পাল, চিত্রা মল্লিক, বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্নাকুমারী, মধুশ্রী দেবী, মিতা চট্টোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা গঙ্গোপাধ্যায়, লতা দেশাই, ছন্দা চট্টোপাধ্যায়, রুমা দাশগুপ্ত, কল্যাণী ঘোষ।

যাত্রায় গানের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তরকারীতে যেমন নুন, যাত্রায় তেমনি গান। গান ছাড়া যাত্রার কথা ভাবা যায় না। বর্তমানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় সুরকার হলেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য (বড়)। অধিকাংশ যাত্রাগানই এখন এঁর মনমাতানো সুরে ভরে আছে। এই প্রতিভাসম্পন্ন সুরকার যাত্রাগানের অন্যতম সম্পদ্। অন্যান্য সুরকারদের মধ্যে পঞ্চানন মিত্র, অজয় দাস, রঘুনাথ দাস উল্লেখযোগ্য।

যাত্রাপালার রচয়িতা

যাত্রাপালা-রচনায় সাম্প্রতিক কালে যশের শিখরে উঠেছিলেন পালাসম্রাট্ ব্রজেন্দ্রকুমার দে। উচ্চশিক্ষিত ও শিক্ষাবিদ্ এই প্রতিভাবান্ নাট্যকার আঠারো বছর বয়সে (জন্ম ১৯০৭) 'স্বর্ণলঙ্কা' নামে প্রথম যাত্রানাট্য রচনা করেন। এর পরে জনপ্রিয় বহু যাত্রা-নাটক

নাট্যকার ব্রজেন দে

রচনা করে মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন। সোনাই দীঘি, রাজা দেবীদাস, বিদ্যাসাগর, লোহার জাল, মহীয়সী কৈকেয়ী, নটী বিনোদিনী, বাঙালী, বর্গী এল দেশে, সীতার বনবাস, মায়ের ডাক ইত্যাদি যাত্রাপালা তাঁর স্মরণীয় সৃষ্টি।

যাত্রাভিনেতা ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের কথা একটু আগে বলেছি। পালাকার হিসেবেও তিনি বিখ্যাত। তাঁর বেশ কয়েকটি পালা,—যেমন মুচির ছেলে, রামানুজ, শকুন্তলা, চন্দ্রধর নানান্ যাত্রাদলে অভিনীত হয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছিল খুব। বর্তমানের

অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় যাত্রাপালা-রচয়িতার নাম ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়। বর্তমান সমাজ ও জীবনের

নাট্যকার ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

নানা সমস্যা নিয়ে তিনি যাত্রাপালা রচনা করছেন। রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ-ইতিহাসও তাঁর যাত্রা-পালার অন্যতম বিষয়। একটি পয়সা, সতী একাবতী, পদধ্বনি, অশ্রু দিয়ে লেখা, সাহারার কান্না, কি পেলাম, কান্না ঘাম রক্ত, অচল পয়সা, পঙ্গপাল, তাজমহল, ধর্মসিংহাসন এই সব নামকরা যাত্রাপালাগুলি তাঁর প্রতিভার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আরও যাঁরা পালা রচনায় খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁরা হলেন নন্দগোপাল রায়চৌধুরী, সত্যপ্রকাশ দত্ত, আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইলাল নাথ, তুলেন্দ্র ভৌমিক, শম্ভু বাগ, দেবেন্দ্রলাল নাথ, বীর সেন, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশ মুখোপাধ্যায়, মানস দত্তগুপ্ত, সুনীল চৌধুরী, মধু গোস্বামী প্রমুখ। পৌরাণিক পালা-রচনা ও পরিচালনায় পুরাণরত্ন দুলাল চট্টোপাধ্যায় সুনামের অধিকারী।

যাত্রার দল

শ্রোতা দর্শকের ওপর যাত্রার অসাধারণ প্রভাবের কথা রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কথা যে কতটা সত্যি তা এখনকার যাত্রার আসরে বসলে বোঝা যায়। এখন অনেক-গুলো যাত্রাসংস্থা যাত্রার প্রচার-প্রসার ও উন্নতির কাজে যুক্ত আছে। এদের মধ্যে সত্যম্বর অপেরা, নট্ট কোম্পানী, নবরঞ্জন অপেরা, নিউ গণেশ অপেরা, নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা, তরুণ অপেরা, জনতা অপেরা, অম্বিকা নাট্য কোম্পানী, ভারতী অপেরা, মাধবী নাট্য কোম্পানী, নিউ আর্য অপেরা, নিউ প্রভাস অপেরা, শিল্পীতীর্থ, অগ্রগামী, নাট্যতীর্থ যাত্রাসংস্থা, তারা মা অপেরা, মোহন অপেরা, মুক্তমঞ্চ, সত্যনারায়ণ অপেরা, আনন্দলোক, গণনাট্য, সুশীল নাট্য কোম্পানী, মঞ্জরী অপেরা, তপোবন, অনামিকা যাত্রা ইউনিট, অপ্সরা অপেরা, লোকরঙ্গ, আর্য অপেরা,

নরেশ মিত্র

শ্রীদুর্গা অপেরা, নাট্যতীর্থ, লোকরঞ্জন যাত্রা ইউনিট, বিনোদিনী নাট্য কোম্পানী, সোনালী অপেরা, রানার যাত্রা ইউনিট, বর্ণপরিচয় যাত্রাসংস্থা,

বঙ্গলোক, কল্পতরু যাত্রাসংস্থা, যোগমায়া অপেরা, বিশ্বজয়ী অপেরা, পরমা এণ্টারপ্রাইজ, চন্দ্রলোক অপেরা, বিশ্বরূপ যাত্রাসংস্থা, যাত্রালোক, গন্ধর্ব অপেরা, দিগ্বিজয়ী অপেরা, নব অম্বিকা নাট্য কোম্পানী প্রভৃতি যাত্রাদলের নাম মনে পড়ে। যাত্রার এই নবজীবন-প্রাপ্তির পরে সিনেমা-থিয়েটারের বহু নামকরা শিল্পী-পরিচালক-সুরকার যাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং আছেন। এঁদের মধ্যে নরেশ মিত্র, মহেন্দ্র গুপ্ত, কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী, মঞ্জু দে, উৎপল দত্ত, দিলীপ রায়, বসন্ত চৌধুরী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মায়া দে, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, শ্যামল সেন, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, বিভাস চক্রবর্তী, শৈলেশ গুহ নিয়োগী, শ্যামল মিত্র, কেতকী দত্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গেছে। কিন্তু প্রতি দশকেই কোনো-না-কোনো প্রতিভা-বান্ শিল্পী বা যাত্রাদরদী অধিকারী বা দল-মালিক যাত্রার জন্য সর্বস্ব পণ করে জনসাধারণের বুকের এই সম্পদ্‌কে আজও পরম মমতা ও শ্রদ্ধায় রক্ষা করে আপামর বাঙালীকে অশেষ ঋণে বেঁধে রেখেছেন। এঁদের মধ্যে বর্তমানে অনেকে জীবিত নেই, অনেকে আছেনও। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার শোভাবাজার রাজবাড়ির যাত্রা উৎসবের সময় থেকেই প্রবোধবন্ধুকে সহযোগিতা করে আসছেন। অর্থাৎ নানা অবস্থায় ও নানা ভাবেই এঁরা বাংলার এই প্রাচীন নাট্যসম্পদ্‌কে বুকের মধ্যে আগলে রেখেছেন। সাম্প্রতিক কালে যাত্রার এই জয়যাত্রার পেছনে এঁদের ত্যাগ ও অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন—সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়, মাখনলাল নট্ট, সূর্যকুমার দত্ত, হরিপদ বায়েন, গোষ্ঠবিহারী ঘোষ, শৈলেন মোহান্ত।

দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্রে আজকাল যাত্রা নিয়ে নানা আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছে। আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দলোক' এই কাজে প্রথম এগিয়ে আসেন। সূত্রধার ছিলেন এর পরিচালক। তারপর যুগান্তর, বসুমতী, আজকাল ও বর্তমান পত্রিকাও যাত্রার জন্য পৃথক্ বিভাগ করেন। যাত্রার প্রচারের মধ্যেও বেশ নতুনত্ব চোখে পড়ছে। খবরের কাগজে

যাত্রার আসর—আর একটি দৃশ্য

প্রথম পাতায় বা ভেতরের পাতায় খুব বড় বড় বিজ্ঞাপন নিশ্চয়ই তোমাদের নজর এড়ায় নি। রঙিন

বিজ্ঞাপনও যে না থাকছে তা নয়। বিজ্ঞাপনের এই চমকে বা নতুনত্বে নট্ট কোম্পানির নাম সবার আগে মনে পড়ে। যাত্রার এই প্রচার পরিচালনায় অভিনবত্বের দাবীদার প্রবোধবন্ধু, গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ ও আরো কয়েকজন। গৌরাঙ্গ ঘোষ 'সোনার দাগ' নাম দিয়ে চলচ্চিত্র-শিল্পীদের জীবনীও রচনা করেছেন। এটি চলচ্চিত্রের গবেষণা-গ্রন্থও বটে।

থিয়েটার

সংস্কৃত নাটকের শুরু কবে থেকে হয়েছিল তা নিয়ে বেশ মতভেদ আছে। তবে খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দী থেকে যে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল— এ সম্পর্কে মতভেদ কিন্তু কম। তা না হয় হ'ল। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের তেমন যোগ ছিল না। নাটকও অভিনয় হ'ত হাতে গোণা যায় এমন কিছু অভিজাত মানুষের সামনে। এর পরে মুসলমানদের হাতে ভারতবর্ষ অধিকৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত নাটকেরও বিলুপ্তি ঘটে। মুসলমান রাজত্বে নাটক ও নাট্যশালার কোনো উন্নতি তো ঘটলই না, যে সব রাজারা সংস্কৃত নাটকের ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন মুসলমান রাজত্বে সেই রাজারাও যেন কোথায় হারিয়ে গেলেন। কিন্তু নাট্যরস আস্বাদ করার ইচ্ছা তো মানুষের থাকবেই। তাকে তো তরবারি দিয়ে বন্ধ করা যায় না। সুতরাং মানুষ ছুটলেন যাত্রার আসরে। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে সাধারণ-অতিসাধারণ মানুষ এত দিন নিজেদের প্রাণের কথা শুনতে না পেয়ে অস্বস্তিতে ভুগছিলেন, এবারে নাটকের অভাবে যাত্রার মধ্যে তাঁরা তাঁদের আশা-আনন্দ-বেদনার কথা পেয়ে গেলেন। দুরন্ত ইচ্ছা-আগ্রহ আর ভালোবাসায় যাত্রাকে তাঁরা মাথায় তুলে নিলেন। যাত্রার এই ইতিহাসের কথা একটু আগেই তোমাদের বলেছি। সুতরাং এ-প্রসঙ্গ আর এখানে আনছি না।

এবারে আমাদের গল্পের বিষয় নাটক আর নাট্যশালা। সোজা কথায়, থিয়েটার নিয়ে গল্প।

নাটকের প্রথম দিক্‌কার কথা এবং একাল পর্যন্ত যাত্রার খবরাখবর মোটামুটিভাবে শোনানো হ'ল। কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে আসার পর থেকে আমাদের বহুদিনকার আদর্শ ও সংস্কার যে ভাবে বদলে গেল আর তার ফলে যে নাটক সৃষ্টি হ'ল, এবারে আমরা সেই সব গল্পই করব।

প্রাচীনকালে ধর্মসাধনা ও কলাচর্চা যেন গায়ে গা লাগিয়ে চলত। এই ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই উদ্ভব হয়েছিল নাট্যকলার। বলা হয়ে থাকে, ভারতীয় নাটকের মূলও প্রাচীন ধর্মের মধ্যে নিহিত। বেদের অনেক স্তোত্র কথাবার্তার আকারে রচিত। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় (কেমব্রিজ সংস্করণ) বলা হয়েছে, বেদের এইসব স্তোত্রই নৃত্যগীতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাটকের মত রূপ নিয়েছিল। বৈদিক যুগের পরে রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক জায়গায় নাটকের উল্লেখ দেখা যায়। বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত অধ্যাপক ডঃ কিথ অবশ্য বলেছেন, রামায়ণ-মহাভারতের বিশেষ বিশেষ অংশের আবৃত্তি থেকেই ক্রমে ক্রমে নাটকের উদ্ভব হয়।

এই লেখার প্রথম দিকে (১৭৫০ পৃষ্ঠা) বলেছি এবং তোমাদের বোধ হয় মনেও আছে যে নাটকের হীন অবস্থা আর তার জন্য নাট্যাভিনয়ের অবনতি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান-প্রভুত্ব ভারতে নাটক ও তার অভিনয়ের প্রাণপ্রবাহকে প্রায় থামিয়ে দিল।

এখানে তোমাদের একটু বলে রাখি, দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে দেশের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির যোগাযোগ অবশ্যই থাকবে। দেশের শাসকের সহযোগিতা-অসহযোগিতা, শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা বা অবহেলা—এই সব কিছুই প্রভাবিত করে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে। মুসলমান-শাসনে সহযোগিতার অভাবে নাটকের উন্নতি দূরে থাক, যেমন দিন দিন অবনতি ঘটল, তেমনি বাংলা রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার পিছনে ইংরেজি রঙ্গালয়ের প্রভাব কার্যকর হ'ল। এর আগে প্রাচীন ভারতীয় নাট্য-কলার যে সব কথা বলেছি, বাংলা নাট্যকলার সঙ্গে তার সম্পর্ক কিন্তু অনেক দূরের। মনে রেখো, বাংলা নাট্যকলা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে দেশের নিবিড় পরিচয়ের অন্যতম ফসল। কেননা ইতিমধ্যে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। যাত্রার আসর ছেড়ে বাঙালী দর্শক এবারে এসে বসলেন বিদেশী ধরণের রঙ্গালয়ে। একটা কথা কিন্তু একেবারেই ভুলো না, আধুনিক ভারতবর্ষের নাট্যকলার ইতিহাসে বাংলাদেশের দাবী প্রথম ও প্রধান, এবং এখনও পর্যন্ত কলকাতা শহরের বাইরে ভারতবর্ষের আর কোনো শহরে এমন নিয়মিতভাবে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় কিনা সন্দেহ।

বাংলা থিয়েটারকে দু'টো পর্বে ভাগ করলে বোধ হয় বুঝবার সুবিধে হতে পারে।

আগেই বলেছি, ইংরেজ আসার পর আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে আস্তে আস্তে পরিবর্তন আসতে থাকে। ধীরে ধীরে সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল স্থানান্তরিত হ'ল কলকাতার দিকে। ইংরেজ যখন এসেছিল তখন বাংলার অর্থনৈতিক প্রাচুর্য ছিল ভালোই। অর্থনৈতিক অসুবিধে না থাকার জন্য বাঙালী তার সাংস্কৃতিক জীবনকে নানাভাবে প্রকাশ করতে পেরেছিল, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে তার নিদর্শন পাওয়া যাবে। এই সংস্কৃতি ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। আর তার একটা নিজস্ব ছাঁদও ছিল। ইংরেজ আসার আগে আমাদের বাংলার সংস্কৃতির রূপটা কেমন ছিল?

জমিদারের বিশাল নাটমণ্ডপে ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় অনুষ্ঠিত হ'ত রামায়ণ-মহাভারতের পাঠ। হ'ত রামায়ণ গান, কথকতা, কীর্তন। গ্রামের বারোয়ারীতলায় নানা উৎসব আর পূজাপার্বণ উপলক্ষে বসত যাত্রাগানের আসর, গানের জলসা। আর বাড়ির অন্দরমহলে হ'ত নানান্ ব্রত-অনুষ্ঠান। পূজোর সময় হ'ত সারি গান, জারি গান। একজন পণ্ডিত যথার্থই বলেছেন, ইংরেজ-পূর্ব যুগে বাংলার মানুষের নিজস্ব একটা লোকসংস্কৃতি ছিল। তখনকার বাংলার অর্থনৈতিক জীবন ছিল গ্রামাশ্রয়ী। আর এর সাংস্কৃতিক জীবনের ধারাও তেমনি গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হচ্ছিল। লোক-সংস্কৃতির প্রাণবন্ত ধারা সেদিন সমাজের একটা বড় অংশকে উদ্বেল করেছিল।

কিন্তু সব কিছুর মত সাংস্কৃতিক জীবনেরও পরিবর্তন হয়। আমাদের ভারতবর্ষে নাটকের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। আর একটা কী বিরাট পরিবর্তন হ'ল জান? —সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল স্থানান্তরিত হয়ে এল কলকাতায়।

প্রথম নাটশ্যালা

প্রথম বাংলা নাট্যশালার জন্ম হ'ল এই কলকাতায়। এখন যেখানে এজরা স্ট্রীট, তখন সেটা ছিল ডুমুরতলা। পঁচিশ নম্বর ডুমুরতলায় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার মানুষ হেরাসিম লেবেডফ সর্বপ্রথম

নাট্যশালার দরজা খুললেন। এই নাট্যশালার নাম বেঙ্গলী থিয়েটার। লেবেডফ সাহেব গোলকনাথ দাশকে দিয়ে দু'টি ইংরেজি প্রহসনের অনুবাদ করিয়ে একটি প্রহসন অভিনয় করান। ১৭৯৫-এর নভেম্বরে কলকাতায় এই নাটক অভিনীত হ'ল, আর এই দিনেই হ'ল প্রথম নাট্যশালার জন্ম। ইংরেজি 'দি ডিস্‌গাইজ' নাটকের বাংলা অনুবাদ ক'রে লেবেডফ নাটকের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ দেখালেন তা ভুলবার নয়। ১৭৯৬-এর ২১ মার্চ এই নাটকটি আবার অভিনীত হয়। তারপর বিলেত চলে গেলেন লেবেডফ। তাঁর থিয়েটারও গেল বন্ধ হয়ে।

এইভাবে দীর্ঘকাল কেটে গেল। বাঙালীর কোনও নাট্যশালা নেই। যাত্রা, পাঁচালী, হাফ আখড়াই, কবি-গান সবই আছে—কিন্তু বাঙালীর নাট্যশালা নেই।

তারপরে প্রায় পঁয়তিরিশ বছর বাদে বাঙালীর প্রথম নাট্যশালা হ'ল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে, তাঁরই নারকেলডাঙার বাগানবাড়িতে। ১৮৩১-এর ২৮ ডিসেম্বর শেক্‌স্‌পীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের অংশবিশেষ আর ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' বাংলায় অনুবাদ করে এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়। তখনকার বহু গণ্যমান্য মানুষ অভিনয়কালে উপস্থিত ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এই থিয়েটারের নাম ছিল হিন্দু থিয়েটার। এখানে কিন্তু মনে রাখতে হবে, কি লেবেডফ, কি প্রসন্নকুমার—এঁদের কোনো নাট্য-শালাতেই খাঁটি বাংলা নাটকের অভিনয় হয় নি, হয়েছিল অনূদিত নাটকের অভিনয়।

তা হলে বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় হ'ল কোথায়? এবং কবে?

শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু তাঁর বাড়িতেই একটি নাট্যশালা খুললেন। আর অভিনয় হ'ল এখানেই। এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো, নবীনচন্দ্র বসু সেখানেই থাকতেন বলে জানা যায়। এখানে, এই নাট্যশালায় বছরে চার-পাঁচটি বাংলা নাটক অভিনীত হলেও বাংলা নাট্যশালা ও নাটকের ইতিহাসে এর যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। বাংলা উপাখ্যান বিদ্যাসুন্দর এখানে নাটকের আকারে অভিনীত হয়। সেদিন তারিখ ছিল ৬ অক্টোবর, ১৮৩৫। অভিনয়ের দিন এই নাটক দেখতে নানা জাতি ও ধর্মের প্রায় এক হাজার দর্শক হাজির ছিলেন। কিন্তু বাঙালীর উদ্যোগে প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় কখন শুরু হয়েছিল তা শুনলে অবাক্ হবে। হ্যাঁ, অভিনয় শুরু হয়েছিল রাত বারোটার একটু আগে, আর শেষ হয়েছিল পরের দিন সকাল সাড়ে ছ'টায়।

এই সবই কিন্তু শখের থিয়েটার।

এর পরে ১৮৫৭। আশুতোষ দেবের (সাতুবাবু) বাড়িতে ৩০ জানুয়ারি অভিনীত হ'ল 'শকুন্তলা'। তারপরে দ্বিতীয়বার অভিনীত হ'ল ২২ ফেব্রুয়ারি। এখানে 'মহাশ্বেতা' নাটকেরও অভিনয় হয় ৫ সেপ্টেম্বর (১৮৫৭)।

তারপরে ১৮৫৭-র মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ। নতুনবাজারে রামজয় বসাকের বাড়িতে অভিনীত হ'ল রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক। এই নাটকটিই প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক—যা প্রথমবার কলকাতায় অভিনীত হ'ল। এই নাটকের পর থেকেই যেন বাঙালীর নাটকের প্রতি আগ্রহ বেড়ে গেল। বড়বাজারে গদাধর শেঠের বাড়িতে এই নাটকের তৃতীয়বার অভিনয়ের সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দর্শক-আসনে বসে নাটক দেখেছিলেন। সেদিন এই নাটকের জন্য কলকাতায় সে কী উত্তেজনা,

কী উৎসাহ! পুরোনো কাগজপত্রে তা লেখা আছে।

রামনারায়ণ তর্করত্ন

এইসব সখের নাট্যশালা দিন দিন বাড়তেই লাগল। এখানে-ওখানে তখন ইংরেজি নাটকেরও অভিনয় চলছিল। কিন্তু বাংলা নাটক দেখে বাঙালীর যেমন আনন্দ, তেমনটি আর কোথায় পাবে? সুতরাং এই সখের নাট্যশালা একদিকে যেমন বিকশিত হ'ল, অন্যদিকে মানুষের মধ্যে আগ্রহ-উৎসাহ-আনন্দের মাত্রাও বাড়তে লাগল।

কালীপ্রসন্ন সিংহের চেষ্টায় বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে বেণীসংহার ও বিক্রমোর্বশী অভিনীত হ'ল। স্বয়ং কালীপ্রসন্ন এই দু'টি নাটকেই চমৎকার অভিনয় করে প্রচুর হাততালি পেলেন। এসব ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ১৮৫৮-তে পাইকপাড়ার রাজারা প্রচুর টাকাপয়সা খরচ করে তাঁদের বেলগাছিয়ার বাগান-বাড়িতে চমৎকার এক নাট্যশালা তৈরি করলেন। ৩১ জুলাই সেখানে অভিনীত হ'ল 'রত্নাবলী' নাটক। বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং বহু মান্যগণ্য লোক অভিনয় দেখতে উপস্থিত ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তকেও দেখা গেল দর্শকের আসনে। আর এই রত্নাবলীর অভিনয় দেখতে দেখতেই মাইকেল তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে যা বলেছিলেন তা প্রায় ইতিহাস হয়ে আছে। পুরো কথাবার্তায় আর যাচ্ছি নে। তাঁদের কথার সারমর্ম হ'ল, 'রত্নাবলীর' মত একটি নগণ্য নাটকের জন্য রাজারা এত টাকা খরচ করছেন, সেটা খুবই দুঃখের কথা। গৌরদাস বলেছিলেন, এ ছাড়া আর উপায় কি? ভালো নাটক পেলে কি আর 'রত্নাবলী' অভিনয় করতুম? আর, তা ছাড়া, বাংলা ভাষায় নাটকই বা কই? বন্ধুর কথা শুনে মধুসূদন বললেন তিনি নাটক লিখবেন।

যা কথা তাই কাজ। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মধুসূদন লিখে ফেললেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এই নাটক প্রথম অভিনীত হ'ল ১৮৫৯-এর ৩ সেপ্টেম্বর। 'শর্মিষ্ঠা'য় তখনকার দিনের এক বিখ্যাত অভিনেতা মাধব্যের ভূমিকায় অভিনয় করে-ছিলেন। 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনায় মধুসূদনের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে প্রহসন লিখতে অনুরোধ করলেন। মধুসূদন সে-অনুরোধ রাখলেন।

কয়েক বছর বাদে পাথুরেঘাটা রাজবাড়িতে নতুন এক নাট্যশালা খুললেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। নাম পাথুরেঘাটা রঙ্গনাট্যালয়। সেখানে বিদ্যাসুন্দর অভিনীত হ'ল ১৮৬৫-র ৩০ ডিসেম্বর। এর কয়েক মাস আগে শোভাবাজার থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটিতে ১৮৬৫-র ১৮ জুলাই মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হ'ল।

এর পরের নাট্যশালার নাম জোড়াসাঁকো নাট্যশালা। এই নাট্যশালার সঙ্গে সারদাপ্রসাদ

গঙ্গোপাধ্যায়, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম জড়িয়ে আছে। এখানে প্রথম অভিনীত হয় মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণকুমারীতে সেজেছিলেন কৃষ্ণকুমারীর মা। এখানে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক' পর পর ন' বার অভিনীত হয়েছিল। বুঝতেই পারছ, তখনকার দিনে একটি নাটকের এতবার অভিনয় নাটকের জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে। তা ঠিকই। এই নাটকের অভিনয়ে কলকাতায় সাড়া পড়ে গেল। গোপাল উড়ের যাত্রা শুনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে এই নাট্যশালা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

তৈরির কথা মনে হয়েছিল। 'নবনাটকে'র অভিনয় যে কত উঁচুদরের হয়েছিল, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তোফীর কথা থেকে তা বুঝতে পারবে। তিনি বলেছেন— 'এই অভিনয় দেখিয়া অভিনয় সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু দেখিবার, শুনিবার ও জানিবার বাকি ছিল তা সম্পূর্ণ হইয়া গেল।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে এই নাট্যশালা সম্পর্কে অনেক কথা আছে। 'নবনাটকে' নটী সেজেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেহারা ছিল দেখবার মত। যেদিন অভিনয় করতেন, বাড়ির মেয়েরাই ভেতর থেকে তাঁকে সাজিয়েগুজিয়ে দিতেন। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ চমৎকার মানাত তাঁকে। দেখে কার বোঝার সাধ্যি যে ইনি আসলে মহিলা ন'ন, পুরুষ মানুষ?

একদিন এক মজার ঘটনা ঘটল। সেই কথাই বলি। নাটক দেখতে এসে হাইকোর্টের জজ সীটনকার সাহেব একদিন সোজা ঢুকে পড়লেন সাজ-ঘরে। লালমুখো সাহেব চোখমুখ আরো লাল করে 'বেগ্ ইয়োর পার্ডন্, জেনানা জেনানা' বলতে বলতে প্রায় লাফাতে লাফাতে পড়ি-মরি করে সাজঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ব্যাপারটা কি হয়েছে বুঝতে পারছ তো? সাজঘরে তো আসলে জেনানা কেউ নেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই তো এমন নিখুঁত সেজেছেন যে সাহেব তাঁকে জেনানা ভেবে সাজঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভালো নাটকও লিখেছেন। সে কথা পরে বলছি।

যে সময়ের কথা বলছি তখন মহা উৎসাহ আর প্রবল আগ্রহে কলকাতার বৌবাজার, গরাণহাটা, ভবানীপুর, কয়লাঘাটা, আড়পুলি প্রভৃতি জায়গায় নাটকের অভিনয় হচ্ছে। এ সবই কিন্তু সখের নাটক। এ-ব্যাপারে মফঃস্বলও পিছিয়ে ছিল না। কলকাতায় নাটকের অভিনয় প্রচলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলের ধনী মানুষেরাও নাটকের অভিনয়ের জন্য উৎসাহিত হতেন।

কলকাতার চারপাশে যখন এরকম নাটকের জোয়ার, তখন বাগবাজারের কয়েকজন যুবকের মনেও নাটক করার ইচ্ছে জাগে। এঁদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর আর অর্ধেন্দুশেখর মুস্তোফীর নাম বিশেষভাবে মনে পড়ে। বাগবাজারের এঁদের এই সখের নাট্যশালাই পরে কলকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ের চেহারা নেয়।
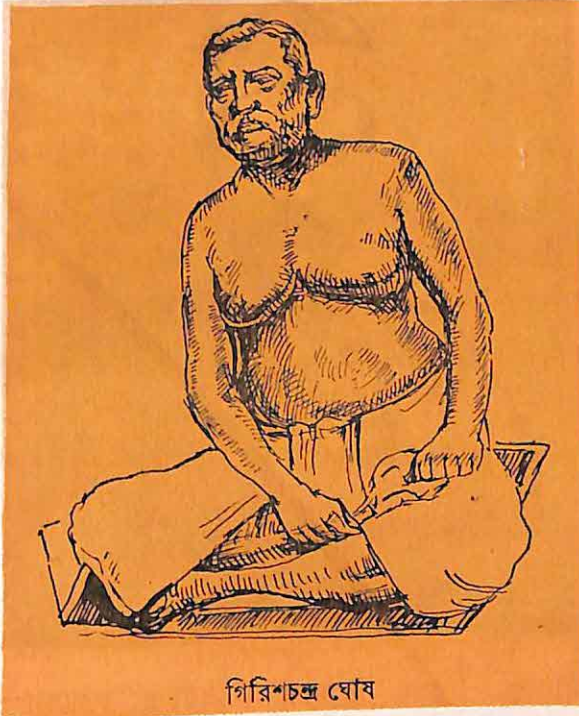
গিরিশচন্দ্র ঘোষ

প্রথমে এর নাম ছিল বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার। পরে নাম বদলে হয় শ্যামবাজার নাট্যসমাজ। ১৮৬৮-র সপ্তমী পূজোর রাত্রে বাগবাজারের এই সখের দল প্রথম অভিনয় করেন দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'। পরেও এই দলের আরো অভিনয় হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র সেজেছিলেন নিমচাঁদ। এর পরে এঁদের 'লীলাবতী' অভিনয় এতই ভালো হয়েছিল যে বহু মানুষই এই নাটক দেখতে ছুটে এলেন। কিন্তু এলেই তো হবে না, সকলকে দেখানোর মতো জায়গার যে খুব অভাব! তা ছাড়া থিয়েটারের সাজসরঞ্জাম কেনবার জন্যও তো টাকা চাই। পাড়ার লোকের চাঁদা চেয়ে কত দিন আর থিয়েটার চালানো যায়?

তখন ঠিক হ'ল, এবার আর পরের টাকা সাহায্য নিয়ে থিয়েটার নয়। এবার থেকে টিকিট বেচে থিয়েটার চালাতে হবে। নাট্যশালাকেও এর ফলে স্থায়ী করা যাবে।

এই যে টিকিট বেচে থিয়েটার দেখানোর কথা বলা হ'ল, এটা কিন্তু রঙ্গালয়ের জগতে একটা বিরাট জানালা খুলে দিল। আমরা এতক্ষণ বাঙালী-পরিচালিত যে নাট্যশালার কথা বলে চলেছি, সেই নাট্যশালার ইতিহাসকে দু'টো যুগে ভাগ করে নিয়ে আমরা এগুতে পারি। প্রথমটা হচ্ছে (এতক্ষণ যা বললুম) সখের থিয়েটারের যুগ। অর্থাৎ এখানে যে কেউ পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে থিয়েটার দেখার সুযোগ

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী—একটি বিশেষ ভূমিকায়

পেতেন না। বিশেষ বিশেষ নিমন্ত্রিত মানুষ, বন্ধু-বান্ধব-প্রিয়জন—এই রকম নির্বাচিত কিছু মানুষই এই

খুবই রাজভক্ত, তাই রাণীকে তারা খুবই সম্মান করে। বর্তমানে প্রধান মন্ত্রী হচ্ছেন মিসেস্ থ্যাচার। ইনিই ও-দেশের প্রথম মহিলা প্রধান মন্ত্রী। পার্লামেণ্টে হু'টো সভা (হাউস) আছে। একটি হচ্ছে হাউস অব লর্ড্স্—সম্ভ্রান্ত জমিদার লর্ড্দের নিয়ে তৈরি—

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ

যাঁরা বংশানুক্রমিক ভাবে এই পদ পেয়ে আসছেন। তা ছাড়াও ঐ গোত্রীয় কিছু কিছু ব্যক্তিগত লর্ড্ উপাধিধারীরাও আছেন, আছেন ক্যাণ্টারবেরি ও ইয়র্কের আর্ক বিশপ। এঁরা ছাড়াও ২৪ জন বিশপ্ আছেন এই সভায়। আসল ক্ষমতা কিন্তু অন্য সভার—যাকে বলা হয় হাউস অব্ কমন্স্। এঁরাই জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসেন। সমস্ত পার্লামেণ্টের সদস্য-সংখ্যা এখন ১০৮০ তার মধ্যে হাউস অব কমন্স্-এর সদস্য-সংখ্যাই ৬৩০। এঁদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের সিংহভাগ হলেও, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েল্স্, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড—সকলেরই নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি আছেন এই সভায়।

ইংল্যাণ্ডের,—আরো ভালো করে বললে ইউ-নাইটেড কিংডমের,—অতীত গৌরব এখন অনেকটা হ্রাস পেলেও এখনও পৃথিবীতে সে একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র। ইংরেজি ভাষার মত সমৃদ্ধ ভাষা পৃথিবীতে কমই আছে। সমস্ত পৃথিবীর নানা অঞ্চলে এখনও লোকে এই ভাষাতেই কথা বলে। তা ছাড়া ইংরেজি সাহিত্যের মত উন্নত সাহিত্যও পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে এই দেশের লোকেরা পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন, এখনও যে দিচ্ছেন না তা বলা চলে না। শিল্পে, বাণিজ্যে এর অগ্রগতির কথাও ভুলবার নয়। এখানকার কয়লা এবং লৌহসম্পদ্ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তারই ফলে নানা রকম ভারী শিল্প, এঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, রাসায়নিক শিল্প, বস্ত্রশিল্প প্রভৃতি কত কী-ই না গড়ে উঠেছে এখানে এবং দেশবিদেশে তা রপ্তানী করে ওরা মুনাফা লুটছে প্রচুর। তাই বলা হয় ইংরেজরা প্রধানত বণিকের জাত। চাষবাসও যে
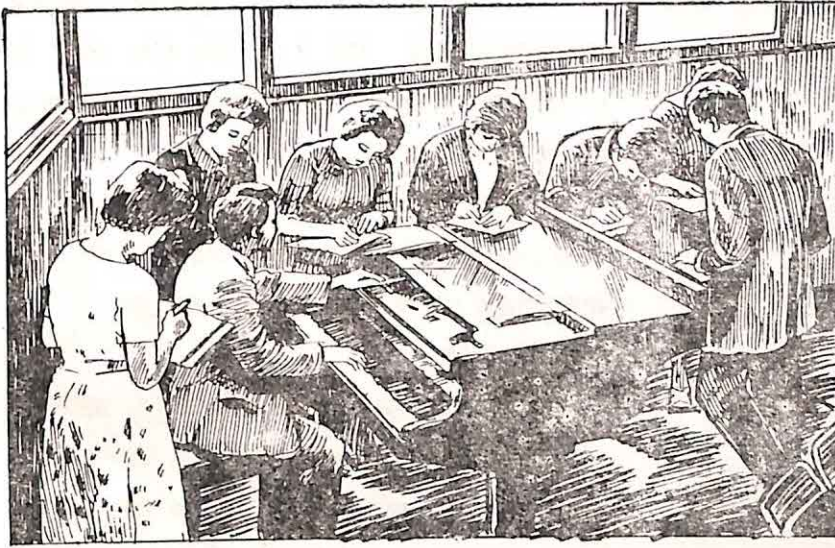
আধুনিক ইংল্যাণ্ডের ছাত্রছাত্রীদের একটি গানের ক্লাস

হয় না তা নয়, উন্নত প্রণালীতেই হয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও ওখানকার লোকেদের তাতে পেট ভরে না—বাইরে থেকে প্রচুর খাবার (কাঁচা এবং তৈরি) আমদানী করতে হয়।

তা ছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নানা বিদেশী এসে এখানে ঘর বাঁধছে। ওদের মধ্যে রয়েছে প্রচুর আফ্রিকান, বাংলাদেশী, পাকিস্তানী, ভারতীয় এবং আরও এখানকার-ওখানকার লোক—যা এখন ওদের বেশ সমস্যায় ফেলেছে। একদল উঠতি-যুবক তো বিদেশীদের নাজেহাল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সরকারও এ বিষয়ে বেশ চিন্তিত।

ইউনাইটেড কিংডমে কিন্তু দ্রষ্টব্য জিনিসের অভাব নেই। যেমন আছে ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থল, তেমনি আছে আধুনিক নানা দেখবার জিনিস। রাজধানী লণ্ডন টেম্‌স্ নদীর ওপর। ঐ নদীরই ধার ঘেঁষে রয়েছে ব্রিটীশ পার্লামেণ্ট ভবন—যেখানে দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক নানা কর্মসূচী, আইনকানুন তৈরি হচ্ছে। রাণী এলিজাবেথ থাকেন ঐতিহাসিক বাকিংহাম প্যালেসে। টাওয়ার অব্ লণ্ডন আর একটি দেখবার জিনিস। এ ছাড়া আছে বিখ্যাত লণ্ডন জু, হুইপস্নেড জু, সাফারি অভয়ারণ্য, মাদাম তুসোর মিউজিয়াম, বৃটিশ মিউ-জিয়াম—যার সঙ্গে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগারের একটি। অন্যান্য শহরেও দ্রষ্টব্যের অভাব নেই। তা ছাড়া ওখানকার গ্রামগুলিও দেখবার মত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নয়নাভিরাম গাছপালা আর সুদৃশ্য পথঘাট। দেখলে এবং তুলনায় আমাদের দেশের
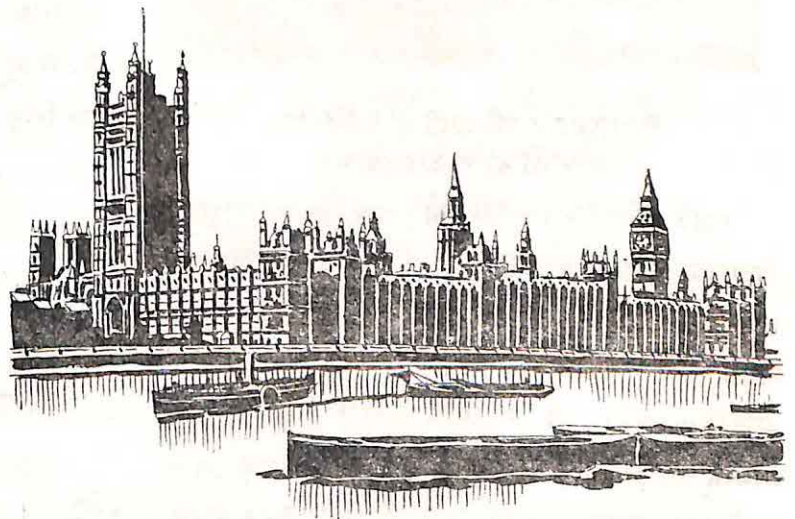
টেম্‌স্ নদীর ধারে ব্রিটীশ পার্লামেণ্ট ভবন

সব সখের থিয়েটার দেখতে পারতেন। এই যুগের সময়টা উনিশ শতকের গোড়ার দিক্ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় যুগটাকে বলতে পারি সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগ। অর্থাৎ আমরা এখন স্টার, রঙমহল, বিজন থিয়েটার, তপন থিয়েটার প্রভৃতি থিয়েটার হলে মাঝেসাঝে টিকিট কিনে যে-থিয়েটার দেখি, সেই যুগ। আর এই যুগের সময়টা হচ্ছে ১৮৭২-এর ডিসেম্বর মাস থেকে আজ পর্যন্ত।

এতক্ষণ তোমাদের প্রথম যুগ অর্থাৎ সখের নাট্যশালার কথা বললুম। এবারে বলব দ্বিতীয় যুগের কথা। মানে সাধারণ রঙ্গালয়ের গল্প।

সখের থিয়েটার ও প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়

একটু আগেই তোমরা জেনেছ, বাগবাজারের সেই কয়েকজন নাটকপ্রিয় যুবকের সখের থিয়েটার থেকেই সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্ম। চিৎপুরে মধুসূদন সান্যালের বাড়ির উঠোন মাসিক চল্লিশ টাকায় ভাড়া নিয়ে তৈরি হল স্টেজ। নাটকের নাম 'নীল-দর্পণ'। নাট্যকারের নাম দীনবন্ধু মিত্র। প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৭ ডিসেম্বর ১৮৭২। সেদিন টিকিট বিক্রি করে উপার্জন হল ছ'শো টাকা। এর পাঁচদিন বাদে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এই নাটকের প্রশংসা করে অনেক কথা লিখল। এর পর থেকেই বাংলা নাটকের আর এক নতুন যাত্রা শুরু হ'ল। 'নীলদর্পণ' নাটক বাঙালী তথা ভারতবাসীকে নতুন প্রেরণা দিল আর ইংরেজ হ'ল ক্ষিপ্ত। আজ এই একশো তেরো বছর বাদেও 'নীলদর্পণে'র জনপ্রিয়তা মোটেই কমে নি। 'নীলদর্পণ' পরে সিনেমাও হয়েছে। 'নীলদর্পণে'র দ্বিতীয় অভিনয় হয়েছিল ঐ বছরের ২১ ডিসেম্বর। টিকিট বেচে আয় হয়েছিল চারশো পঞ্চাশ টাকা।

নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়েই সাধারণ রঙ্গালয়ের বা পাবলিক থিয়েটারের উদ্বোধন হ'ল। আর একটা কথা। এই 'নীলদর্পণ'ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম গণনাটক।
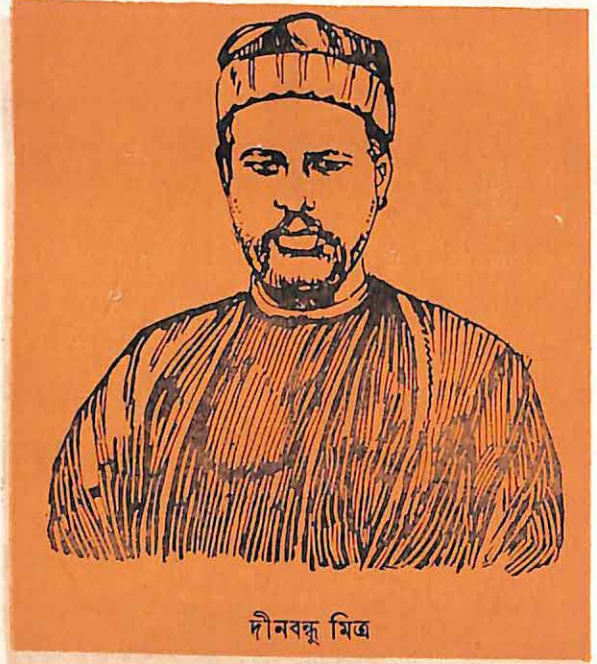
দীনবন্ধু মিত্র

দীনবন্ধু মিত্রের উদ্দেশ্যে গিরিশচন্দ্র বলেছেন—"মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করিতে সাহস করিত না। এই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।"

এর পরে ন্যাশনাল থিয়েটার দু'ভাগে ভাগ হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ যে-দলে রইলেন সেই দলেরই শেষ পর্যন্ত ন্যাশনাল থিয়েটার নাম বহাল রইল। অন্য দলের নাম হ'ল হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার। পরে নাম হয় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। সে যাই হোক, 'নীলদর্পণ' প্রসঙ্গে আর একটা জরুরি কথা হ'ল, এই-নাটকের অভিনয় দিয়েই (২৯ মার্চ,

১৮৭৩) থিয়েটারে সাহায্য-রজনীর সূচনা হয়। ১৮৭৩-এর ৭ ডিসেম্বর এই দু'দলই মহাসমারোহে তাদের বার্ষিক উৎসব করল। ১৮৭২-এর ডিসেম্বরে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার আর ১৮৭৩-এর আগস্ট মাসে বেঙ্গল থিয়েটার নামেও আরো দু'টো থিয়েটার খোলা হয়েছিল।

এই লেখা পড়তে পড়তে তোমরা ধর্মদাস সুরের ছবি দেখতে পাবে। ধর্মদাস সুর ন্যাশনাল থিয়েটারের
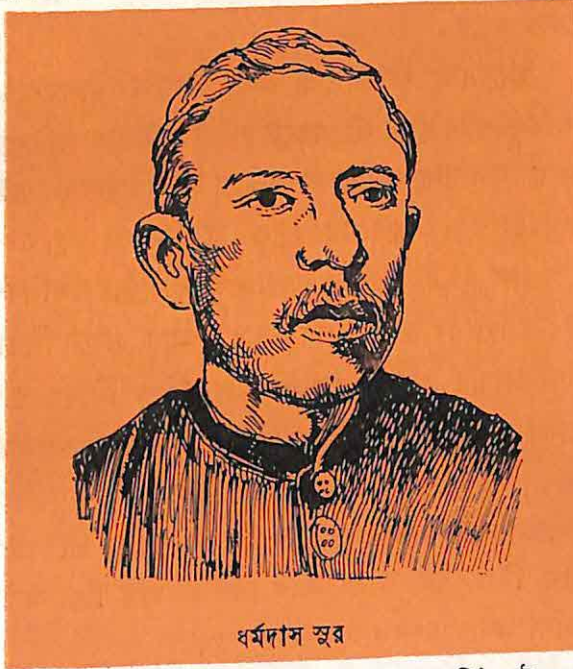
ধর্মদাস সুর

সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয়ের সময় শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বিরাট বাড়ির উঠোনে যে স্টেজ বাঁধা হ'ল, তা তৈরি করেছিলেন ধর্মদাস সুর। তা ছাড়া, দৃশ্যপটও তৈরি হ'ল তাঁর তত্ত্বাবধানে। দলের স্টেজ ম্যানেজার ছিলেন তিনিই। আর সবচেয়ে দরকারী কথা হ'ল, বাংলা সাধারণ নাট্যশালার প্রথম মঞ্চশিল্পী এই ধর্মদাস সুর। ধর্মদাস পরে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজার হয়েছিলেন। এখানেই 'শত্রুসংহার' নাটকে একটি ছোট চরিত্রে প্রথম অভিনয় করেন (১২ ডিসেম্বর ১৮৭৪) বিনোদিনী—পরে যিনি বিখ্যাত অভিনেত্রী

বিনোদিনী

হয়ে বাংলা নাটকে আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার বাংলার ও ভারতের নানা জায়গায় অভিনয় করে বেড়াচ্ছে। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী এই দলে আছেন। ধর্মদাস সুর তো আছেনই। নানা অভিনয়, অনেক সাফল্য, নানা ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সময়ও গড়িয়ে যেতে থাকে। এতদিন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিক ছিলেন ভুবনমোহন নিয়োগী। শেষ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রকে তিনি ইজারা দিলেন এই থিয়েটার। গিরিশচন্দ্র তারপরে দায়িত্ব নিয়ে গ্রেট ন্যাশনালের 'গ্রেট' কথাটি বাদ দিয়ে আগের নাম ন্যাশনাল থিয়েটারই রাখলেন। এবারে গিরিশচন্দ্র প্রথমেই অভিনয় করলেন মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ। নাট্যরূপ দিলেন গিরিশচন্দ্র নিজে। মেঘনাদ ও রাম দু'টি চরিত্রেই অভিনয় করলেন তিনি।

কাগজে লেখা হ'ল—"স্পষ্ট কথা বলিতে কি, গিরিশবাবুর মত অভিনেতা বোধ করি বঙ্গ নাট্যশালায় নাই।" মেঘনাদবধের পরে নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় করলেন তিনি। অল্প সময়ের মধ্যেই গিরিশচন্দ্রের ন্যাশনাল থিয়েটার আসর জমিয়ে দিল। তারপরে আরো কয়েকটি নাটক অভিনয়ের পর শেষ পর্যন্ত দেনার দায়ে নীলামে উঠল ন্যাশনাল থিয়েটার। এই থিয়েটার কিনে নিলেন এক মাড়োয়ারী। নাম প্রতাপচাঁদ জহুরী।

এই যে এতক্ষণ ন্যাশনাল থিয়েটার এবং অন্যান্য থিয়েটারের কথা বললুম, তার মধ্যে, নিশ্চয়ই তোমরা ভোলো নি, বাগবাজারের কয়েকটি দুঃসাহসী নাট্যপ্রিয় যুবকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ন্যাশন্যাল থিয়েটারই প্রথম পেশাদারী থিয়েটারের পত্তন করেছিল। এই 'ন্যাশনাল' নামটি দিয়েছিলেন নবগোপাল মিত্র। ন্যাশনাল থিয়েটারের পুরো নামটি এতক্ষণ বলা হয় নি। সেটি হ'ল 'দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি'। নামের ধরণটা ইংরেজি ধাঁচের। গিরিশচন্দ্রের সময়ের পেশাদার থিয়েটারগুলোর সব নামই ইংরেজি ধরণের। যেমন এমারেল্ড, কোহিনূর, স্টার, মিনার্ভা ইত্যাদি। তবে আসল কথাটা হ'ল, ১৮৭২-এর ৭ ডিসেম্বর, শনিবারের আগে বেশির ভাগ নাটকই অভিনীত হ'ত ধনী মানুষদের বাসভবনে বা বাগানবাড়িতে। এই সব সখের প্রয়াস নাটকের উন্নতি ও প্রসারের পেছনে অনেকটা কাজ করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সখের অভিনয় দেখে সাধারণ মানুষের নাট্যপিপাসা যেন মিটেও মিটছিল না। আর তা ছাড়া, আগেই বলেছি, সকলের সে সব নাটক দেখার সুযোগও থাকত না। নানা কারণেই তাই সাধারণ রঙ্গালয় বা পাবলিক থিয়েটার বা পেশাদারী থিয়েটারের প্রয়োজন যেন বড় হয়ে দেখা দিল। ১৮৭২-এর ৭ই ডিসেম্বর সেই প্রয়োজনকেই বাস্তব চেহারা দিল। একটা কথা এখানে বলে রাখি। এই ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যজগতে নতুন ইতিহাস তৈরি করল। তবে ১৮৭২-এর আগের সখের থিয়েটারের মৃত্যু কিন্তু হ'ল না। এখনও নানা ক্লাবে, অফিসে এই সখের থিয়েটার বেঁচে আছে।

ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম প্রয়াস 'নীলদর্পণে' অর্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী একাই চারটি ভূমিকায় অভিনয় করে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই থিয়েটারের কাজকর্মের প্রতি মনোমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র আর অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষের ভালোবাসা, উৎসাহ আর সহযোগিতা ছিল বলবার মত। এখনকার পাবলিক থিয়েটারের প্রথম শ্রেণীর টিকিটের দাম পনেরো টাকা। তখন কত ছিল? বলি শোনো। কলকাতার এই প্রথম পাবলিক থিয়েটার ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম শ্রেণীর টিকিটের দাম ছিল এক টাকা, আর দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল আট আনা অর্থাৎ এখনকার পঞ্চাশ পয়সা।

মনে আছে বোধ হয়, একটু আগে বলেছিলুম, প্রতাপচাঁদ জহুরী কিনে নিলেন ন্যাশনাল থিয়েটার—যা গিরিশচন্দ্র ইজারা নিয়েছিলেন ভুবনমোহন নিয়োগীর কাছ থেকে। তারপর তা আবার দেনার দায়ে নীলামে ওঠায় অবশেষে কিনে নিলেন প্রতাপচাঁদ।

প্রতাপচাঁদ পাকা ব্যবসায়ী। তিনি বুঝলেন, ভালো ভাবে থিয়েটার চালাতে গেলে গিরিশচন্দ্রের মত একজন সুযোগ্য ম্যানেজার দরকার। গিরিশচন্দ্র

তখন একটা কোম্পানীতে চাকরি করেন। মাইনে দেড়শো টাকা। কিন্তু নাটকের প্রতি গভীর ভালো-বাসার টানে দেড়শো টাকার চাকরি ছেড়ে প্রতাপচাঁদের ডাকে তাঁর থিয়েটারে একশো টাকায় ম্যানেজারের কাজ নিলেন। কিন্তু এখানে ভালো নাটক না পাওয়ায় নিজেই তখন নাটক লিখতে বসলেন। তাঁর নাটক আনন্দে রহো, রাবণবধ, সীতার বনবাস, অভিমন্যুবধ, লক্ষ্মণবর্জন, সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, সীতাহরণ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হ'ল এখানে। এখানে গিরিশচন্দ্র অভিনয়ও করতেন। থিয়েটার ভালোই চলতে লাগল। কিন্তু প্রতাপচাঁদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত এই থিয়েটারও ছেড়ে দিলেন গিরিশচন্দ্র। এলেন 'স্টার থিয়েটারে'। গুর্মুখ রায়ের টাকায় স্টার থিয়েটারের জন্ম হলেও অভিনেত্রী বিনোদিনীর বিরাট আত্মত্যাগ ছাড়া এর জন্ম হ'ত কিনা সন্দেহ।

গিরিশযুগ

১৮৮৩-এর ২১ জুলাই গিরিশচন্দ্রের লেখা 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়েই স্টার থিয়েটারের যাত্রা শুরু। তারপর এই থিয়েটারের হাতবদল হ'ল। এই স্টার থিয়েটারেই 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখতে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। স্টারের তখন খুবই প্রতাপ। তারপর নানা ঘটনার পরে গিরিশচন্দ্র এলেন মিনার্ভা থিয়েটারে। ১৮৯৩-এর ২৮ জানুয়ারি গিরিশচন্দ্রের লেখা শেক্সপীয়ারের 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ নিয়ে খোলা হ'ল মিনার্ভা থিয়েটার। গিরিশচন্দ্র হলেন ম্যাকবেথ। এর পরে আরো নাটক। গিরিশচন্দ্র একাধারে নাট্যকার ও অভিনেতা। চারিদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ছে। বহু নাটক লিখেছেন তিনি। তা প্রায় পঁচাত্তরটি তো হবেই। 'প্রফুল্ল' তাঁর নামকরা নাটক। আর আছে কালাপাহাড়, জনা, আবুহোসেন, মায়াবসান, বলিদান, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম, ছত্রপতি শিবাজী, শঙ্করাচার্য, অশোক, তপোবল, নসীরাম প্রভৃতি নাটক।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্র একটি যুগ তৈরি করে গেছেন। তিনি নিজেই যেন একটি প্রতিষ্ঠান। নাট্যকার হিসেবে, অভিনেতা হিসেবে আর নাট্য-শিক্ষক ও অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি নাট্যশালার সৃষ্টি ও পুষ্টির জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। সোজা কথায় বলা যায়, বাংলা থিয়েটারে অভিনেতা-কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে, ইংরেজিতে যাকে অ্যাক্‌টর-ম্যানেজার বলা হয় সেই দিক্ থেকে, গিরিশচন্দ্রই শ্রেষ্ঠ। তাঁর যুগকে গিরিশযুগ বলে পণ্ডিতেরা চিহ্নিত করেছেন। তিনি যেন একটি ধারা। আর তাঁর বড় কৃতিত্ব হ'ল, 'নাট্যশালাকে ধনীর জলসাঘর থেকে বার করে এনে সাধারণ মানুষের অর্থের ওপর দাঁড় করানো।' এ ছাড়াও, মঞ্চপরীক্ষার আধুনিকতম উপকরণগুলিও তিনি যে ভাবে কাজে লাগিয়েছেন, একালের খ্যাতিমান্ অভিনেতা উৎপল দত্ত তার উচ্চপ্রশংসা করেছেন। তিনি ঠিক কথাই বলেছেন যে আঙ্গিক ও রূপরীতির প্রশ্নে গিরিশচন্দ্রের পরীক্ষা বিস্ময়কর। তখনকার মঞ্চের নানা অসুবিধের মধ্যেও 'গিরিশ যা চিন্তা করে গেছেন, আমাদের ধারণায় এখনো পর্যন্ত বাংলা নাট্যশালায় কোনো পরিচালক তার পরিধি অতিক্রম করতে পারেন নি। গিরিশের মঞ্চপরীক্ষা আমাদের সম্পদ্, ঐশ্বর্য।'

গিরিশচন্দ্রের (জন্ম ১৮২৯, মৃত্যু ৯.২.১৯১২) নাটকে জাতীয় এবং দেশীয় ভাবই থাকত বেশি।

সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক—সব রকম নাটকই তিনি রচনা করেছেন। তাঁর প্রতিভা ছিল বিচিত্র ও বহুমুখী। বাংলা নাটকে 'গিরিশযুগ' বলে যে-সময়টিকে চিহ্নিত করা হয় তার দ্বারাই তাঁর প্রতিভার গুরুত্ব ও অসাধারণত্ব বোঝা যাবে। 'ফাদার অব নেটিভ স্টেজ' বলেও তাঁকে সম্মান জানানো হয়। শিল্পী হিসেবেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। বাস্তবিকই, গিরিশচন্দ্র যেন একাই ছিলেন একটি যুগ। আর নাটকই ছিল তাঁর প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি। রাজকৃষ্ণ রায় ছিলেন গিরিশচন্দ্রের পূর্ববর্তী আর এক নাট্যকার।

অন্যান্য প্রখ্যাত শিল্পী

সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই গিরিশচন্দ্র যেমন বাংলার রঙ্গমঞ্চে দীপ্ত সূর্যের মত বিরাজ করছিলেন, তেমনি তাঁকে ঘিরেও বেশ কয়েক-জন প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতা তাঁদের অভিনয়ের দ্বারা
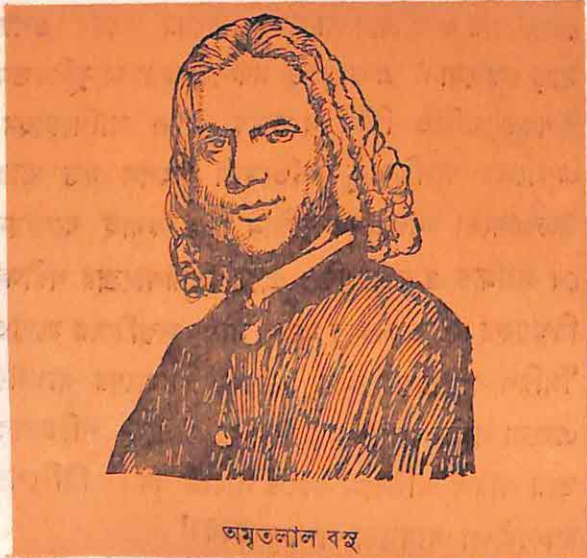
অমৃতলাল বসু

বাঙালীর মন জয় করে চলেছিলেন। এঁদের মধ্যে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু প্রমুখ অভিনেতার নাম বিশেষ ভাবে বলতে হয়।

অর্ধেন্দুশেখর শুধু অভিনেতাই ন'ন, অভিনয়-শিক্ষকও বটে। তিনি একাধারে নট ও নাট্যাচার্য। খুব ছোট, নগণ্য ভূমিকায় অভিনয় করেও তিনি

তিনকড়ি দাসী

মাতিয়ে দিতেন। অভিনয়ের ব্যাপারে তিনি আশ্চর্য শক্তির অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন ভূমিকায় তিনি বিভিন্ন কণ্ঠস্বর ব্যবহার করতেন। রসিক পুরুষও তিনি কম ছিলেন না। অভিনয় করতে করতেই দর্শকদের নানা টীকাটিপ্পনীর এমন মুখের মত সরস জবাব দিতেন যে হাসিতে হল্ প্রায় ফেটে যাবার জোগাড় হ'ত। এমন সুরসিক ক্ষুরধারবুদ্ধি অভিনেতা খুব কমই জন্মেছেন এখানে। একটা গল্প শোন তা হলে।

অভিনয় করতে করতে অর্ধেন্দুশেখর জোর গলায় ডাকছেন—'হরে, হরে!' কিন্তু হরের দেখা নেই। অর্ধেন্দুশেখর রাগের ভান করে আরো জোরে

ডাকলেন—'হরে, হরে!' তখন হ'ল কি, গ্যালারি থেকে একজন দর্শক মজা করে বলল,—'আজ্ঞে যাই।' এই কথা শুনে অর্ধেন্দুশেখর তখন সেই দর্শকটির দিকে তাকিয়ে বললেন—'ও গুয়োর ব্যাটা, তুমি ওখানে বসে আছ?'

উনষাট বছর বয়সে এই বিখ্যাত নট মারা যান।

অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল

অমৃতলাল মিত্র

মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, মতিলাল সুর, তিনকড়ি দাসী, তারাসুন্দরী, বিনোদিনী এবং গিরিশচন্দ্রের পুত্র দানীবাবুও শিল্পী হিসেবে দেশজোড়া নাম কিনেছিলেন। নাট্যজগতে এঁদের অবদান এমনই উল্লেখযোগ্য যে আজও এঁদের অনেকের জীবনী নিয়ে যাত্রা-থিয়েটার হচ্ছে। নট্ট কোম্পানীর 'নটী বিনোদিনী' যাত্রা একালের জনপ্রিয় যাত্রা। তারাসুন্দরীর জীবনী নিয়েও হয়েছে। অর্ধেন্দুশেখরের জীবনী নিয়ে 'রঙ্গসভা' করেছে 'নটশেখর অর্ধেন্দুশেখর'।

তারাসুন্দরী

নাট্যকার হিসেবে অমৃতলাল বসুর নাম বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হয়। ইনি ছিলেন গিরিশচন্দ্রের শিষ্য। কিন্তু নাটক রচনায় অন্য পথ নিয়েছিলেন। বিবাহবিভ্রাট, বাবু, বৌমা, চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে, একাকার, খাসদখল, তাজ্জব ব্যাপার ইত্যাদি প্রহসন লিখে ইনি অমর হয়ে আছেন। অপরেশ মুখোপাধ্যায়ও আর এক বিখ্যাত নট ও নাট্যকার।

অমৃতলাল বসুর আগে আর এক প্রতিভাবান্ নাট্যকার প্রহসন লিখে খ্যাতি পেয়েছেন। ঐতিহাসিক নাটকও লিখেছেন তিনি। এঁর নাম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি রবীন্দ্রনাথের জ্যোতি-দাদা। পুরুবিক্রম, সরোজিনী, অশ্রুমতী, স্বপ্নময়ী প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক আর কিঞ্চিৎ জলযোগ, এমন কর্ম আর করব না (পরে 'অলীকবাবু' নামে প্রকাশিত হয়), হিতে বিপরীত, দায়ে পড়ে দার-পরিগ্রহ প্রহসনগুলি নাট্যজগতের সম্পদ্। এই সময়-

কার আরো কয়েকজন নাট্যকার হলেন কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরলাল রায়, উপেন্দ্রনাথ দাস, উমেশ-চন্দ্র গুপ্ত এবং প্রমথনাথ মিত্র।

নাটকের কথা বলতে বলতে নাট্যকারের কথাও কছু শোনা গেল। সময় আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। এবারে এলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। এঁদের কলমে যেন ঐতিহাসিক নাটকের সোনার যুগ লেখা হ'ল। গিরিশচন্দ্র বা অমৃতলাল বসুর মত দ্বিজেন্দ্রলাল প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছলেন না বটে, কিন্তু তাঁর প্রহসন, পৌরাণিক ও ঐতহাসিক নাটকগুলির জনপ্রিয়তা ছিল খুবই। বিরহ, প্রায়শ্চত্ত, পুনর্জন্ম, সীতা, ভীষ্ম, চন্দ্রগুপ্ত, মেবার-পতন, দুর্গাদাস, নূরজাহান সবই জনপ্রিয় নাটক। তাঁর 'সাজাহান' নাটকের জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের তুলনা মেলা ভার। 'সাজাহান'-এ অহীন্দ্র চৌধুরীর সাজাহান-চরিত্রের অভিনয় তো প্রবাদ হয়ে আছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রায় সব রকমের নাটকই লিখেছেন। গীতনাট্য, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকেই তাঁর প্রতিভার পরিচয়। তিনি 'আলিবাবা' গীতিনাটক রচনা করেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই রকম জনপ্রিয় গীতিনাট্য খুব কমই আছে। 'আলাদিন'-ও কম জনপ্রিয় নয়। তাঁর পৌরাণিক নাটক ভীষ্ম, নরনারায়ণ এবং ঐতিহাসিক নাটক প্রতাপাদিত্য ও আলমগীর জন-সমাদরে ধন্য হয়েছে। এর মধ্যে 'আলমগীর'-এর জনপ্রিয়তার বুঝি তুলনা নেই! আলমগীরের ভূমিকায় শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয় সোনার জলে লেখা থাকবে।

এর মধ্যে অনেক রঙ্গালয় তৈরি হ'ল। সেখানে অভিনীত হ'ল বহু নাটক। ওরিয়েন্টাল থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার, এমারেল্ড থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, স্টার থিয়েটার—এইসব থিয়েটারে তখনকার নামকরা সব অভিনেতারাই প্রায় অভিনয় করেছেন।

বাংলা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের একচ্ছত্র আধি-পত্যের যুগ হ'ল ১৮৮০ থেকে ১৯০৪। এর পরে আর এক অনন্যপ্রতিভা বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। তাঁর নাম শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

শিশিরযুগ

গিরিশচন্দ্রের মত শিশিরকুমারও অভিনয়ে যুগ সৃষ্টি করলেন। অভিনয়, প্রয়োগ ও অন্যান্য কলা-কৌশলে নাট্যজগতে বিরাট আলোড়ন তুললেন এই উচ্চশিক্ষিত অভিনেতা। ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের অভিনয় থেকেই তিনি সকলের নজর কাড়তে থাকেন। তারপর ইংরেজির অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি অভিনয়কেই জীবনের ব্রত করেন। ১৯০৯-এর ৭ মার্চ 'হ্যামলেট' নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ১৯১০-এ গিরিশচন্দ্রের

'বুদ্ধদেব' নাটক ও ১৯১১-তে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে অভিনয় করে দর্শকদের মোহিত করেন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী

চাণক্যের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নাকি বলেছিলেন, ইতিহাসের চাণক্য

আলমগীরের ভূমিকায় নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী

আমার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই নাটকে নরেশ মিত্র নেমেছিলেন কাত্যায়নের ভূমিকায়।

এই অভিনয়ের ঠিক দু'মাস আগে গিরিশোত্তর যুগের শক্তিমান্ অভিনেতা, গিরিশচন্দ্রের পুত্র দানীবাবু মিনার্ভায় চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় করে আলোড়ন তুলেছিলেন। চাণক্যের ভূমিকায় দানীবাবু আর শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয় আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। শিশিরকুমার জন্মেছেন হাওড়ার সাঁত্রাগাছিতে। ১৮৮১, ২ অক্টোবর। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এম. এ পাশ করেন। সে সময়ে ইউনিভারসিটি ইন্স্টিটিউটে যে সব নাটক অভিনীত হয়েছে তার সবগুলির নাট্যশিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু। শিশির-প্রতিভার বিকাশের ব্যাপারে এই অধ্যাপকের অবদান ভুলবার নয়। এই সময় যে দু'-চারটি শৌখীন নাটকাভিনয়ের

চাণক্যের ভূমিকায় দানীবাবু

কথা শোনা যেত, তাদের মধ্যে ওল্ড ক্লাব আর ক্যালকাটা ইভনিং ক্লাবেরই নামডাক ছিল বেশি।

পেশাদার মঞ্চে যোগ দেবার আগে শিশিরকুমার

বেশ কয়েকটি নাটকে অভিনয় করে দর্শকদের নজরে আসেন। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, বাগবাজারের সখের থিয়েটার থেকে জন্ম নিয়েছিল সাধারণ রঙ্গালয় বা কমার্শিয়াল থিয়েটার। তারপর আস্তে আস্তে এই সাধারণ রঙ্গালয়ের অবনতি শুরু হ'ল। চিরকাল তো সব কিছু সমান তালে চলে না। সাধারণ রঙ্গালয়ের এই অবনতির সময়েই শৌখীন অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে সামনে রেখে প্রতিভাসম্পন্ন এক অভিনেতার দল সাধারণ রঙ্গালয়কে আবার নতুন জীবন দান করলেন।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

শিশিরকুমার যখন নাট্যমঞ্চে এলেন তখন আগের যুগের নামকরা অভিনেতা হিসেবে একমাত্র দানীবাবুই বেঁচে ছিলেন। অমৃতলাল বসু নাটক থেকে অবসর নিয়েছেন। দানীবাবু ছিলেন প্রাক্-শিশিরযুগের নামকরা অভিনেতা। (মৃত্যু ১৯৩২) দানীবাবুর যুগকে মনে রেখে তাঁর আগের যুগকে আমরা এইভাবে ভাগ করতে পারি। গিরিশযুগ হ'ল ১৮৮০ থেকে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৯৭ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত হ'ল অমরেন্দ্রনাথ দত্তের যুগ। আর দানীবাবুর যুগ হ'ল ১৯০৬ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত। এবং এর পর থেকে টানা বত্রিশ বছর পর্যন্ত শিশিরযুগ।

শিশিকুমারের নটজীবন ছিল সুদীর্ঘ। নাট্যমন্দির, নব-নাট্যমন্দির আর শ্রীরঙ্গম্—এই তিনটি পর্যায়ে নানা রসের, নানা স্বাদের বহু নাটক অভিনয় ও প্রযোজনা করে তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষের থিয়েটারের ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করলেন। পৌরাণিক,

একটি বিশেষ ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী
(হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, চোখে অদ্ভুত চাহনি।)

সামাজিক আর ঐতিহাসিক—এই তিনটি ধারার অভিনয় নিয়েই তিনি নানা পরীক্ষা করেছেন। সঙ্গে

সঙ্গে বহু অভিনেতাও সৃষ্টি করেছেন। ১৯২৪ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত বাংলা থিয়েটারে তাঁর ছিল একাধিপত্য।

শিশিরকুমার ভাতুড়ীর সময়ে বা কিছু পরে আর যাঁরা অভিনেতা হিসেবে নাম করেছিলেন তাঁরা হলেন—যোগেশ চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তারাসুন্দরী, প্রভা দেবী, ছবি বিশ্বাস, নিভাননী, রাণীবালা, সন্তোষ সিংহ, সরযূবালা, চারুশীলা, মহেন্দ্র গুপ্ত, রবি রায়, ভূমেন রায়, রাজলক্ষ্মী (বড়), নীহারবালা, জহর গাঙ্গুলী, মলিনা দেবী, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্ত, মিহির ভট্টাচার্য, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনকড়ি চক্রবর্তী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়—এই রকম আরো কেউ কেউ।

বাংলা থিয়েটারে এক সময়ে মঞ্চশিল্পে নানা অভিনবত্ব এনেছিলেন অমরেন্দ্র দত্ত। এর পরে নতুন করে আর এক বিপ্লব ঘটালেন সতু সেন। এখন তোমরা যে রিভল্‌ভিং স্টেজ বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চ দেখ, ইনিই তার প্রবর্তক। ১৯৩৩-এর ১৫ এপ্রিল 'মহানিশা' নাটকে সতু সেন এই রিভল্‌ভিং স্টেজের প্রবর্তন করেন। এ ছাড়াও নাটকের সেটের পরিকল্পনা ও রচনার জন্যও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আজকের মঞ্চব্যবস্থায় তাঁর অবদান অনেকখানি।

জাতীয় নাট্যশালা তৈরির জন্য শিশিরকুমারের ভাবনার অন্ত ছিল না। কিন্তু তাঁর সে-ইচ্ছা পূরণ হয় নি। তাই ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' উপাধি তিনি গ্রহণ করেন নি। তা ছাড়া তাঁর মত সম্মানিত অভিনেতার পক্ষে ঐ উপাধিটি গ্রহণযোগ্যও হয়তো ছিল না। বাংলা রঙ্গমঞ্চের এই অবিস্মরণীয় অভিনেতা ১৯৫২ সালের ৩০ জুন সংসার-রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেন।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা থিয়েটার

এই লেখার শুরুতেই নাটকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসার কথা তোমাদের বলেছি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শৌখীন অভিনেতা। অভিনয় তাঁর পেশা ছিল না, কিন্তু নেশা ছিল। তিনি যখন প্রথম মঞ্চে অভিনয় করতে আসেন তার কয়েক বছর আগেই

বাল্মীকিপ্রতিভায় বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

বাঙালীর সাধারণ রঙ্গালয়ের উদ্বোধন হয়েছে। পরে রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীতও হয়েছে। কিন্তু আধুনিক কালের রঙ্গমঞ্চের কথা বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের অবদানের কথা

ভোলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ শুধু নাটক লিখে বা অভিনয় করেই থেমে থাকেন নি, নাটকের পরিচালনা, মঞ্চ-পরিকল্পনা ও তার আধুনিক প্রয়োগের জন্যও তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। অভিনেতা হিসেবে তো তাঁর তুলনা নেই। শিশিরকুমার ভাদুড়ী বলেছেন, রবীন্দ্রনাথই দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। স্টেজের ওপর হাত ও আঙুল নিয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। হাত ও আঙুলের ব্যবহারই সবচেয়ে শক্ত কাজ এবং সে কাজে পূর্ণ দক্ষতা ছিল কবির।

রবীন্দ্রনাথ অনেক নাটক যেমন রচনা করেছেন, অভিনয়ও করেছেন বহু নাটকে। রাজা ও রাণী নাটকে (১৮৮৯) রাজার ভূমিকায়, 'বিসর্জন'-এ রঘুপতি (১৮৯০) ও পরে জয়সিংহ, 'বৈকুণ্ঠের খাতায়' কেদার (১৮৯৭), 'ফাল্গুনী'তে অন্ধ বাউল (১৯১৫), 'ডাকঘর'-এ ঠাকুরদা (১৯১৭), কলকাতার রঙ্গমঞ্চে 'শারদোৎসব'-এ সন্ন্যাসী (১৯২২), 'তপতী'তে বিক্রম (১৯২৯), 'অরূপরতন'-এ ঠাকুরদার (১৯৩৫) ভূমিকায় তাঁর অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় সোনার অক্ষরে লেখা আছে। এইসব ভূমিকায় তিনি একাধিকবার অভিনয় করেছেন। অতি তরুণ বয়সে 'বাল্মীকিপ্রতিভায়' বাল্মীকিরূপে তাঁর অভিনয়ও বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। শিল্পী ও অভিনয়ের দল নিয়ে দেশে-বিদেশেও তিনি অভিনয় করে প্রচুর যশ পেয়েছেন। শিশিরযুগ থেকে রবীন্দ্রনাথ-রচিত নাটকের অভিনয়ের যে প্রবাহ চলছে, আজও তার ধারা থামে নি। সাম্প্রতিক কালে রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয়ে 'বহুরূপী' সংস্থা সুনাম অর্জন করেছে।

গণনাট্য ও নবনাট্য আন্দোলন

শিশিরকুমার বাংলা নাটকে যে গতি, আঙ্গিক-কুশলতা ও প্রয়োগ-নিপুণতার প্রকাশ ঘটালেন, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল না। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে থেকেই সাধারণ রঙ্গালয়ে কেমন যেন অবসাদ আর অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। ওদিকে, সিনেমার নেশায় থিয়েটারের প্রতি মানুষের আগ্রহও বেশ কম। সমাজের অবস্থা পাল্টে যাচ্ছে দ্রুত। চারের দশকে গণনাট্য ও তারপরে নবনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নব-জীবনবাদী ও অদম্য উৎসাহী কিছু নাট্যামোদী যুবক নাট্যজগতে আবার যে উন্মাদনা, আলোড়ন ও জীবন-রসের সৃষ্টি করলেন তা কোনোদিন ভুলে যাবার নয়। যুদ্ধের আঘাত আর মন্বন্তরের বিভীষিকা যখন বাংলার সমাজকে প্রায় চরম সর্বনাশের দিকে নিয়ে গিয়েছিল তখনই সমাজকে বাঁচাবার জন্য প্রবল এক সংগ্রামী শক্তি এই নাট্য-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল। কৃষক-শ্রমিক ও উপেক্ষিত সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবার ও সংগ্রাম করবার নতুন প্রেরণা খুঁজে পেল। শহরে, গ্রামেগঞ্জে, দূরে—বহুদূরের অবজ্ঞাত জায়গায় নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের মহান্ শিল্পীরা যে আনন্দ, প্রেরণা, সাহস ও জীবনের কথা শোনালেন তা আলাদা করে বলার মত বিষয়। প্রয়োগরীতি ও মঞ্চ-আঙ্গিকের নতুনত্ব এই নাট্যআন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রঙিন পোশাক, আলোর বাহার, বড় বড় সেট—এ সব কিছুই রইল না; তার বদলে পেছনে ঝুলতে লাগল ছেঁড়া চট। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' চিরাচরিত আঙ্গিকে আনল বিরাট পরিবর্তন। তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' ও 'ছেঁড়া তার' এবং পরে

আরো বহু নাটক ও নাটকের সংস্থা এই আন্দোলনকে জোরদার করল। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের 'রাহুমুক্ত' যাত্রাপালাটির নামও এখানে মনে পড়ছে।

গ্রুপ থিয়েটার

গণনাট্য ও নবনাট্যের পরে এখন গ্রুপ থিয়েটার সকলের নজর কেড়েছে। গ্রুপ থিয়েটারও নিছক নাটকের সংস্থা নয়। গ্রুপ থিয়েটার একটি আন্দোলনেরও নাম। গণনাট্য ও নবনাট্য আন্দোলনে এমন অনেক প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী-অভিনেতা-গায়ক-লেখক-প্রয়োগশিল্পী ছিলেন যাঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে স্বনামে খ্যাত হয়েছেন এবং অনেকেই গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আজও বাংলা নাটককে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। পেশাদার থিয়েটারের পাশাপাশি গ্রুপ থিয়েটারের বহু নাটক যে ভাবে দর্শকদের প্রশংসা ও ভালোবাসা পেয়ে যাচ্ছে তা বাংলা নাটকের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়েরই নতুনতর দিক্। এই সব গ্রুপ থিয়েটারের অনেকেই সাফল্যের মুখ দেখেছে, তথাপি এমন বহু গ্রুপ থিয়েটার আছে যেগুলি অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বহু অসুবিধের মধ্যেও, শুধুমাত্র নাটকের প্রতি তীব্র ভালোবাসার তাগিদেই, অভিনয়-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছে। দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়, গ্রুপ থিয়েটারের বেশ কয়েকটি নাটক বাংলা নাটকের ইতিহাসে চিরকালের জন্য স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে।

বহুরূপী, লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ (এল. টি. জি.—পরে পি. এল. টি), শৌভনিক, রূপকার, সুন্দরম্, ক্যালকাটা থিয়েটার, নান্দীকার, চেতনা, পিপ্‌ল্‌স্ অ্যালবাম থিয়েটার, অনুশীলন, ছদ্মবেশী, অচলায়তন, থিয়েট্রন, নাট্যসংস্থা, পথিক, চতুরঙ্গ, গন্ধর্ব, বৈশাখী, অভ্যুদয় নাট্যসংস্থা, মাস্ থিয়েটার, চতুর্মুখ, শ্রীমঞ্চ, থিয়েটার ইউনিট, শিল্পীমহল, সাজঘর, দশরূপক, রূপদক্ষ, গিরিশ সংসদ, রূপান্তরী, চলাচল, উদয়াচল, আনন্দ থিয়েটার, নান্দীমুখ, চেনামুখ, চার্বাক, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, থিয়েটার কমিউন, শূদ্রক, সায়ক, সৃজনী, নিউ থিয়েটার্স গ্রুপ, সমীক্ষণ, নাট্যায়ন, থিয়েটার সেণ্টার, ভ্রমর প্রভৃতি গ্রুপ থিয়েটারগুলির নাম করা যেতে পারে,—যারা নাটকের মাধ্যমে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনা, শিল্প-আঙ্গিক ও প্রয়োগের সৌকর্য ও অভিনবত্বে কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

নাটকের শিল্পী ও পরিচালক

গিরিশচন্দ্র, কেশব গঙ্গোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু মুস্তোফী, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিনোদিনী, দানীবাবু, অমর দত্ত, শিশির ভাদুড়ী, সরযূবালা, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মহেন্দ্র গুপ্ত, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, এবং তারও পরে তুলসী লাহিড়ী, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, কুমার রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (তপন থিয়েটার), রবি ঘোষ, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণ রায় প্রমুখ অভিনেতার নাম বিশেষভাবে মনে পড়ছে। এঁদের অনেকেই পরিচালকরূপেও খ্যাত হয়েছেন।

নাট্যমঞ্চ

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রথম বাংলা নাটক 'নীলদর্পণ' চিৎপুরে মধুসূদন সান্যালের বাড়ির উঠোনে সাময়িক

স্টেজ তৈরি ক'রে অভিনীত হলেও, পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে কলকাতায় অনেকগুলো থিয়েটারের স্টেজ তৈরি হয়ে বাংলা নাটকের জয়যাত্রাকে সহজ করে। কলকাতার এখনকার অনেক সিনেমা হল্ই তখন থিয়েটারের হল্ হিসেবে চিহ্নিত ছিল। আগে নানা মানুষের বাড়িতে বা বাড়ির উঠোনে বা কোনো খোলা জায়গায় স্টেজ তৈরি করে অভিনয় হ'ত। কোনও সাধারণ রঙ্গালয়েরই নিজের বাড়ি ছিল না। বেঙ্গল থিয়েটারই প্রথম থিয়েটার, যার নিজের রঙ্গমঞ্চ ছিল। এখানে একটা কথা বলে রাখি। এই বেঙ্গল থিয়েটারেই মহিলার ভূমিকায় সর্বপ্রথম মহিলারাই অভিনয় করেন। এর আগে পুরুষেরাই অভিনয় করতেন মহিলার ভূমিকায়। মাইকেল মধুসূদনই এঁদের পরামর্শ দিয়েছিলেন—তোমরা মেয়েদের নিয়ে থিয়েটার চালু কর। মেয়েদের ভূমিকায় মেয়েরা না নামলে থিয়েটার কিছুতেই ভালো হবে না। সেই থেকেই থিয়েটারে মহিলারা আসতে শুরু করলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম। তাঁর মৃত্যুর পরে (২০ এপ্রিল, ১৯০১) এই থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার পর ও-বাড়িতে নানা দল থিয়েটার খুলেছে। এরা হ'ল—অরোরা, ইউনিক, ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল, থেস্পিয়ান টেম্পল, প্রেসিডেন্সি থিয়েটার এবং আরো অনেকে। এ ছাড়াও আরো বহু থিয়েটারের সৃষ্টি হ'ল—যেখানে নানা সময়ে নানা নাটকের অভিনয় হ'ত। এমারেল্ড, মিনার্ভা, অরোরা, স্টার, বীণা, সিটি, বেঙ্গল, রসা, কোহিনূর, ক্লাসিক, কর্জন, গ্র্যাণ্ড, আলফ্রেড থিয়েটারের নাম এখানে মনে পড়ে যায়। তারপরে আরো কত! নাট্যমন্দির, আর্ট থিয়েটার, কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার, নবনাট্যমন্দির, শ্রীরঙ্গম্, রঙমহল, কালিকা থিয়েটার ইত্যাদি।

বর্তমান রঙ্গমঞ্চ

সম্প্রতি বেশ কয়েকটি রঙ্গমঞ্চ কলকাতায় তৈরি হয়েছে। পুরোনো থিয়েটার কিছু কিছু তো আছেই, তা ছাড়া এমন কয়েকটি মঞ্চ সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে যেখানে অন্যান্য অনুষ্ঠানে নাটকও অভিনয় করা হয়ে থাকে। যে সব রঙ্গমঞ্চে বর্তমানে নিয়মিত বা অনিয়মিত অভিনয় হয়ে থাকে সেগুলি হ'ল স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা, রঙমহল, বিশ্বরূপা, তপন থিয়েটার, সারকারিনা, থিয়েটার সেণ্টার, বিজন থিয়েটার, রঙ্গনা, অহীন্দ্র মঞ্চ, সুজাতা সদন, কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, মুক্ত অঙ্গন (নিবেদিতা দাস ও বীরেশ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত), প্রতাপ মঞ্চ। এ ছাড়া রবীন্দ্রসদন, শিশিরমঞ্চ ও ফাইন আর্ট্স্ আকাদেমির মঞ্চ তো আছেই। গিরিশচন্দ্রের নামাঙ্কিত নাট্যমঞ্চ বাগবাজারে তৈরি হচ্ছে। ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউট মঞ্চটি আগুনে পুড়ে যাবার পর নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

নাট্যকার

মাইকেল মধুসূদনের আগে বাংলা নাটকের সার্থক ও পরিপূর্ণ চেহারা দেখা যায় নি। তাঁর আগে যে সব নাটক লেখা হয়েছে সেগুলিকে ঠিক নাটক বলা যাবে কিনা ভেবে দেখবার বিষয়। তবে সেগুলিকে নাটকের আভাস বলা যেতে পারে। সে যুগের নাট্যকারদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন আর কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম সকলের আগে মনে আসে। বাংলা নাটকের সূচনা থেকে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছর পর্যন্তও শেক্স্পীয়ারের নাটককে আদর্শ ধরেই নাট্যকারেরা নাটক রচনা করতেন।

মৌলিক বাংলা নাটকের প্রাথমিক পর্বে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' ও তারাচরণ সিকদারের 'ভদ্রার্জুন'-এর বিশেষ স্থান আছে। 'কীর্তিবিলাস' বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিয়োগান্ত নাটক। 'ভদ্রার্জুন' কেবলমাত্র প্রথম মৌলিক বাংলা নাটকই নয়, প্রথম সার্থক নাটকও বটে। এই ছু'টি নাটকেরই রচনাকাল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ।

কিন্তু বাংলা নাটকের দুরবস্থা দেখে মধুসূদন খেদ প্রকাশ করলেন—

"অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

মধুসূদন নাটকের এই অভাব পূরণ করবার জন্য নিজেই এগিয়ে এলেন নাটক রচনায়। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত নাট্যকারেরাই কোনো না কোনো সময়ে নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বা সংস্পর্শে এসে নাটক লিখতে প্রেরণা পেতেন। মধুসূদনও বেলগাছিয়া থিয়েটারে ও এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন। অনেক নাটক তিনি লেখেন নি, কিন্তু যে ক'খানি লিখেছেন তা বাংলা মঞ্চের সম্পদ্ বলা চলে। দীনবন্ধু মিত্র আর এক স্মরণীয় নাট্যকার। এঁর নাটক 'নীলদর্পণ'-এর কথা আগেই বলেছি। সধবার একাদশী, জামাই বারিক এঁর অন্য ছু'টি স্মরণীয় নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকের মধ্য দিয়ে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত বীরত্ব-কাহিনী তুলে ধরেছিলেন। এঁর সময়কার আরো কয়েকজন নাট্যকার হলেন—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরলাল রায়, উপেন্দ্রনাথ দাস, উমেশচন্দ্র গুপ্ত ও প্রমথনাথ মিত্র।

নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র ঘোষের কথা তো আগেই বলেছি। তিনি একাধারে নট ও নাট্যকার। তিনি নাট্যাচার্য। তিনি প্রায় পঁচাত্তরটি নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর নাটকে দেশীয় ও জাতীয় ভাবই বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। উৎপল দত্ত গিরিশচন্দ্রের নাটককে বাংলা নাট্যশালার মহান্ ক্লাসিক বলেছেন। অমৃতলাল বসু গিরিশচন্দ্রের শিষ্য হয়েও নাটক-রচনায় আলাদা পথ নিয়েছিলেন। তরল ও হাল্কা জীবনের বিপর্যয়, বিকৃতি ও অসঙ্গতির দিকে দৃষ্টি রেখেই তাঁর নাটক। এঁর 'বাবু', 'ব্যাপিকা-বিদায়', 'খাসদখল' নাটক আজও অভিনীত হয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গিরিশচন্দ্রের পর স্মরণীয় দুই নাট্যকার। পদার্থ-বিজ্ঞান আর রসায়ন শাস্ত্রের এম.এ, ক্ষীরোদপ্রসাদ কলেজের অধ্যাপনার আসন ছেড়ে নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ভক্তি-ধর্মমূলক নাটক রচনায় তাঁর হাত ছিল পাকা। তাঁর 'আলিবাবা' গীতিনাট্যটি আজও জনপ্রিয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও বিখ্যাত নাট্যকার। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। প্রহসনও রচনা করেছেন তিনি। সাজাহান তাঁর বিখ্যাত নাটক সে কথা তো আগেই বলেছি।

বাংলা নাটকের সব দিকেই রবীন্দ্রনাথের অবদান বিশেষভাবে বলার বিষয়। তাঁর সম্পর্কেও আগে কিছু বলেছি। তাঁর নাটকের প্রধান গুণ অনবদ্য ও তুলনাহীন ভাষা। নাট্যকার হবার আগেই তিনি অভিনেতা হয়েছিলেন। মঞ্চশিল্পে তাঁর নতুন ভাবনাচিন্তা আজকের নাটকে অনেকখানি প্রতিফলিত। তাঁর নাটকের সংখ্যা পঞ্চাশটি। হাস্যকৌতুক আর ব্যঙ্গকৌতুকের কুড়িটি নাটিকাও আছে।

রবীন্দ্র-পরবর্তী নাট্যকার

বাংলা নাটকের চূড়ান্ত উন্নতি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। আধুনিক নাট্যকারেরা কেউই তাঁদের বিশিষ্ট ভাব, মত, রীতি ইত্যাদির দ্বারা নাটকের জগতে তেমন কোনো যুগান্তর আনতে না পারলেও বাংলায় নাটক এখনও লেখা হচ্ছে। এঁদের কারো কারো দু'-একটি নাটক মোটামুটি জনপ্রিয় হয়তো হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর আগে দীনবন্ধু-গিরিশচন্দ্র-অমৃতলাল-

সাহিত্যিকদের অভিনয়
'শেষরক্ষার একটি দৃশ্যে শৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অখিল নিয়োগী

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ নাট্যকারেরা যেমন সমসাময়িক কালে নাটকের জগতে আন্দোলন-আলোড়ন সৃষ্টি করে রঙ্গজগৎকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন, রবীন্দ্র-পরবর্তী নাট্যকারেরা ঠিক তেমন ভাবে না করলেও এঁদের মধ্যে প্রতিভাসম্পন্ন নাট্যকারের অভাব নেই। বর্তমানে নাটকের কলা ও রীতিতে যে পরিবর্তন এসেছে এঁরা তা অনুসরণ করে থাকেন। ইয়োরোপে যুগপ্রবর্তনকারী নাট্যকার ইবসেনের রীতির সঙ্গে রবীন্দ্ররীতি এঁরা অনুসরণ করেছেন।

রবীন্দ্র-পরবর্তী এই সব নাট্যকারদের মধ্যে মন্মথ রায়, যোগেশ চৌধুরী, মহেন্দ্র গুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নিশিকান্ত বসুরায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অয়স্কান্ত বক্সী, জলধর চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বনফুল প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

যুদ্ধোত্তর নাটক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রভাব আর আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রবিপ্লব আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে তছ্‌নছ করে দিয়েছিল। দেশবিভাগের ফলে অভাবিত দুর্যোগের সামনে দাঁড়াতে হ'ল। মানুষের মূল্যবোধ, নীতি-সংস্কার—সব কিছুই বদ্‌লে যেতে লাগল সঙ্গত কারণেই। পঞ্চাশের মন্বন্তর বাংলায় অভিশাপের মত দেখা দিল। এই অবস্থার স্মরণীয় নাটক 'নবান্ন', 'ছেঁড়াতার'। নাট্যকার যথাক্রমে বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী। সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী', দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা', ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' নাটক দেশবিভাগের দুঃখকষ্ট-সঙ্কটের কাহিনী। এই সময়কার অন্যান্য প্রসিদ্ধ নাট্যকার হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কিরণ মৈত্র, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, বীরু মুখোপাধ্যায়, বাদল সরকার, ধনঞ্জয় বৈরাগী, সুনীল দত্ত, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রমেন লাহিড়ী, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র প্রভৃতি।

উপন্যাসের নাট্যরূপ

নামকরা গল্প-উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা বহুদিন থেকেই চলে আসছে। আমাদের এখানে নাট্যশালা স্থাপিত হবার পরে মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলি অভিনয় ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করা হয়েছিল। এখনও হয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নাট্যরূপ রঙ্গমঞ্চে দেখা গেছে। শরৎচন্দ্রের পরবর্তী অনেক ঔপন্যাসিকের উপন্যাসেরও নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে,—যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু এঁদের উপন্যাসের নাট্যরূপ। শরৎচন্দ্র নিজেও তাঁর কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। যোগেশ চৌধুরী 'চরিত্রহীন', বিধায়ক ভট্টাচার্য 'মেজদিদি', 'বৈকুণ্ঠের উইল' ও 'বিপ্রদাসে'র নাট্যরূপ দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দেবার কাজে সবচেয়ে খ্যাতি পেয়েছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, নিষ্কৃতি, কাশীনাথ, পরিণীতা, শ্রীকান্ত প্রভৃতি উপন্যাসকে তিনি নাটকের রূপ দেন। আধুনিক বহু লেখকের উপন্যাসেরও তিনি নাট্যরূপ দিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের প্রথম নাটক ছিল 'বিরাজ বৌ'। ১৯১৮-র ৩ আগস্ট। নাট্যরূপকার ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'বিজয়া' শরৎচন্দ্র নিজেই করেছিলেন। মিনার্ভায় 'চন্দ্রনাথ' প্রথম অভিনীত হয় অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায়। নাট্যরূপ এঁরই। পরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রও চন্দ্রনাথের নাট্যরূপ দেন। 'পথের দাবী'র নাট্যরূপ দেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

সাহিত্যিকদের অভিনয়

'স্বর্গীয় সাহিত্য সমাবেশ' নাটকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকায় শৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগরের ভূমিকায় অখিল নিয়োগী, দীনবন্ধু মিত্রের ভূমিকায় মন্মথ রায়, স্বর্ণকুমারী দেবীর ভূমিকায় অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা চট্টোপাধ্যায়।

তারাশঙ্করের কবি, আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসের নাট্যরূপ কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম'-এরও নাট্যরূপ দেন

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। এ ছাড়া আরো বহু উপন্যাসের নাট্যরূপ নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়েছে এবং হচ্ছে।

সাহিত্যিকদের অভিনয়

বহু শিল্পী-কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার নাট্যমঞ্চের সঙ্গে জড়িত থেকে যেমন নাটক রচনা করেছেন, তেমনি অনেকে সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ও করেছেন। শুধু তাই নয়, এঁদের মধ্যে অনেকে অভিনয় করে প্রচুর খ্যাতিও পেয়েছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এঁরা সকলেই নাট্যকার ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির শৌখীন নাট্যমঞ্চে, শান্তিনিকেতনে এবং আরো নানা জায়গায় রবীন্দ্রনাথ তো অভিনয় করেইছেন; তিনি ছাড়া অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী, অসিতকুমার হালদার ও আরো অনেকে অভিনয় করেছেন। পরবর্তীকালে নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত, উৎপল দত্ত অভিনয় করেছেন, নাটকও লিখেছেন। কিন্তু সাহিত্যিকদের দিয়ে অভিনয় করাবার জন্য তাঁদের একত্র করে, রিহার্সালের ব্যবস্থা করে, নাটক অভিনয় করাবার কৃতিত্ব অখিল নিয়োগীর আগে আর কেউ করেছেন ব'লে জানা নেই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বা ঠাকুরবাড়ি-আয়োজিত নাটকাভিনয়ে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-অধ্যাপকরাই বেশি সংখ্যায় অংশ নিতেন, সে-কথা ভোলা উচিত নয়। অখিল নিয়োগী (স্বপন-বুড়ো) সব পেয়েছির আসরের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রতি বছরই একজন সাহিত্যিককে সংবর্ধনা জানাতেন এবং সাহিত্যিকদের অভিনয়ের আয়োজন করতেন। এই অভিনয়ের জন্য আলাদা ক'রে নাটক লেখানো হ'ত। এরকমই দু'টি নাটক,—মন্মথ রায়ের 'মরা হাতি লাখ টাকা' ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভাড়াটে চাই' নাটকে অভিনয় করলেন (মহাজাতি সদনে) নরেন্দ্র দেব, মন্মথ রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অখিল নিয়োগী, সাগরময় ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, কুমারেশ ঘোষ, বারি দেবী, মৌমাছি প্রমুখ

শিশুসাহিত্যিকদের অভিনয়

শিশুসাহিত্য পরিষদ-আয়োজিত 'ভাড়াটে চাই'এর একটি দৃশ্য (ছিদাম মুদীর শোকসভা)
বাঁ দিক্ থেকে: ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য (চেয়ারে বসে), কুমারেশ ঘোষ (মাইকের সামনে), অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো) ও ধীরেন্দ্রলাল ধর (চেয়ারে বসে), দেবকুমার বসু। পেছনে আরও কয়েকজন।

সাহিত্যিকবৃন্দ। প্রায় তিরিশ বছর আগে অভিনীত এই অভিনয় শহর কলকাতায় আলোড়ন তুলেছিল।

সাহিত্যিকদের অভিনয়ের ব্যাপারে আর একটি সংস্থা এগিয়ে এসেছিল। নাম—শিশুসাহিত্য পরিষদ্। এদের প্রথম অভিনয় রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আয়োজিত (স্থান ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ) এই অভিনয়ে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুনির্মল বসু, রবীন্দ্রলাল রায়, উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও আরো অনেকে অংশ নিয়েছিলেন। পরে এই সংস্থা 'চিকিৎসা সংকট', 'শেষরক্ষা', 'রাতারাতি', 'বজ্রমণি', 'অবাক্ জলপান', 'ডাকঘর', 'ভাড়াটে চাই' প্রভৃতি নাটক অভিনয় করে বেশ নাম করেছিল। এই সব নাটকে অভিনেতা ছিলেন নরেন্দ্র দেব, উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, সুকমল দাশগুপ্ত, অখিল নিয়োগী, ননীগোপাল মজুমদার, কুঞ্জবিহারী পাল, কুমারেশ ঘোষ, ধীরেন্দ্রলাল ধর, শিশিরকুমার মজুমদার, মঞ্জিল সেন, সলিল লাহিড়ী, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ—যাঁরা ছোটদের জন্য লেখেন। এই রচনার লেখকও (পলাশ মিত্র) বাদ যান নি।

ছোটদের নাটক

প্রত্যেক মানুষকে তাঁর ছেলেবেলা কাটিয়েই বড় হতে হয়। বড় মানে বয়স্ক হতে হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার, বড় হয়ে ছোটদের কথা ভাববার লোক তেমন একটা পাওয়া যায় না। এতক্ষণ ধরে এত পাতা যুড়ে নাটকের যে সব কথা বললাম, তাতে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, ছোটদের নাটকের কথা একেবারেই নেই। থাকবে কি ক'রে? ছোটদের নাটক কি তেমন একটা আগ্রহ-উৎসাহ বা ভালোবাসার সঙ্গে অভিনয় করে ছোটদের আনন্দ দেবার জন্য কেউ কোনো দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন? ছোটদের নাটকের এই অভিনয়ের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অবদান সবচেয়ে বেশি। ছোটদের জন্য তিনি যেমন নাটক লিখেছিলেন, তেমনি এই সব নাটক আবার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ছোটদের, তাঁর প্রিয় 'ধরার শুভ্র প্রাণগুলি'র জন্য আনন্দনাড়ুর ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। এইসব নাটকের মধ্যে মুকুট, শারদোৎসব, ফাল্গুনী, ডাকঘর ইত্যাদির নাম অবশ্যই করতে হয়। তারপরে বহুদিন শূন্যতা।

এরপর বঙ্কিম দাশগুপ্তও কয়েকখানি স্ত্রীচরিত্রহীন ছোটদের নাটক লেখেন যা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। যেমন সিরাজের স্বপ্ন। সুনির্মল বসু, শিবরাম চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, অখিল নিয়োগী, লীলা মজুমদার, ধীরেন্দ্রলাল ধর, সুকমল দাশগুপ্ত—এঁরাও কিছু কিছু ছোটদের উল্লেখযোগ্য নাটক লিখেছেন যা অনেক স্কুলের ছেলেমেয়েরা অভিনয় করে আনন্দ পেয়েছে। অভিনীত হয়েছে বেতারেও। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণের গল্প নিয়ে কয়েকখানি বিজ্ঞানভিত্তিক ছোটদের নাটকও বেতারে অভিনীত হয়ে সুনাম অর্জন করেছে। সুকুমার রায়ের 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'অবাক্ জলপানের' নাম অবশ্য আগেই করতে হয়।

অবশেষে সংগঠনগত ভাবে ছোটদের নাটকের এই অভাব দূর করতে এগিয়ে এল শিশুরঙমহল বা সি. এল্. টি। পুরো ভাগে রইলেন শিশুদের প্রকৃত দরদী বন্ধু সমর চট্টোপাধ্যায়। বহু অসুবিধার মধ্যে এখানে-ওখানে সাময়িক মঞ্চ তৈরি করে, নিজে নাটক লিখে তিনি ছোটদের জন্য নাচে-গানে-ভরা যে সব নাটক হাজির করলেন তা এক কথায়

অভাবিত। রঙবাহারী পোশাক, নাচের ছন্দ, গানের সুর আর অভিনয়ের যাছতে মনপ্রাণ ভরে গেল ছোটদের। সারা কলকাতায় তখন সি. এল্. টি'র নাম। বাংলা ও ভারতের বাইরেও গেল এদের দল। তারপর ধীরে ধীরে তারা আরো বড় হ'ল। নিজেরা বাড়ি তৈরি করল, নাটকের পাকা মঞ্চ তৈরি করল; নাম দিল 'অবন মহল'। শিশুসাহিত্যের যাতুকর অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুরের নামে এই হল্ কলকাতা তথা পশ্চিম-

সি. এল্. টি-র ভালোবাসা ভুলবার নয়। অবন পটুয়া, মিঠুয়া, জিজো, ত্বষ্টু ইঁতুর, অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা' ইত্যাদি এদের জনপ্রিয় নাটক।

ছোটদের নাটকের মহান্ কাজে আর একটি সংস্থা যুক্ত আছে। এর নাম শিশুরঙ্গন। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু এরই মধ্যে শিশুদের মনে আশা-আনন্দ-বিশ্বাস-ভালোবাসা জাগাবার জন্য যে নাটক অভিনয় করিয়েছে তা এক কথায় অনবদ্য।
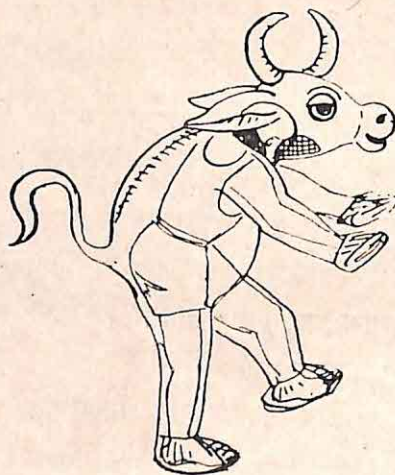
ছোটদের অভিনয়
শিশুরংমহল বা সি. এল. টি. কর্তৃক অভিনীত শিশুনাটকের রূপসজ্জার কৌশল

বঙ্গের শিশুদের এক গর্বের বস্তু। সমর চট্টোপাধ্যায় নিজে যেমন ছোটদের জন্য নাটক লিখলেন, অন্য নাট্যকারদের দিয়েও তেমনি নাটক লিখিয়ে অভিনয় করালেন। ছোটদের জন্য সমর চট্টোপাধ্যায় তথা

এদের অভিনীত নাটকের নামগুলি হ'ল—অরুণ-বরুণ-কিরণমালা, মিতুল নামে পুতুলটি, আমার নাম টায়রা, দত্যিদানার ছানা, ভালুক নিয়ে ভেলকি, যাহুর দেশে জগন্নাথ, টোরা-বাদশা, বাগডুম সিং, আবু ও

দস্যু-সর্দার, পিরামিডের দেশে। এদের 'খুদে যাযাবর ইসতাসি' নাটককে খুদে দর্শকদের সামনে হাজির করবার জন্য এরা কী নিষ্ঠা-ভালোবাসা আর প্রয়োগনিপুণতা দেখিয়েছিল তা এদের নাটক না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। কোনো কোনো নাটকে চল্লিশ-পঞ্চাশজন খুদে শিল্পীও থাকে, কিন্তু কোনো খুঁত নেই। অভিনয় এদের খুব ভালো। বাহারী পোশাকে, গানের সুরে-ছন্দে আর অভিনয়ের যাদুতে এরা ছোটদের জন্য যে আনন্দযজ্ঞের ব্যবস্থা করেছে তা দেখে বড়রা, যাঁদের মনপ্রাণ এখনো তাজা,—তাঁরাও প্রচুর আনন্দ পেয়ে থাকেন। এদের নিজস্ব মঞ্চ নেই, তাই মঞ্চ নির্মাণের জন্য এরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কয়েকজন উৎসাহী তরুণকে নিয়ে নাট্যকার ও পরিচালক শৈলেন ঘোষ ও সংস্থার সভাপতি কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যে মহৎ কাজে হাত দিয়েছেন তার সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের কারণ নেই।

'নাট্যায়ন'-প্রযোজিত 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' একটি সুন্দর নাটক। বিভিন্ন মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে এরা এই নাটকটি অভিনয় করে সকলের ভালোবাসা পাচ্ছে। 'গিরিশ সংসদ'-এর 'আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ' ছোটদের নাটকের জগতে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। সুনীল দাশগুপ্ত-পরিচালিত ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের এই মজাদার নাটকটির অভিনয় মোটেই নিয়মিত নয়, কিন্তু নাটকটি যখনই অভিনীত হয় তখনই ছোটদের আনন্দের সীমা থাকে না। অমল মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত এই নাটকের গানগুলিও শোনবার মত। (এই প্রবন্ধকার পলাশ মিত্রও এর অন্যতম গীতিকার।) ছোটদের আর একটি নাটক 'আবু হোসেন'। আনন্দ থিয়েটার এর অভিনয়ের আয়োজন করে থাকে। এটিও একটি সফল নাটক। 'তেপান্তর' গোষ্ঠীর ছোটদের নাটকের কথাও এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। নির্মলেন্দু গৌতমের লেখা এই ছোটদের নাটকগুলো টেলিভিশনেও হয়তো তোমরা দেখেছ। এ ছাড়া পুতুল-নাটকও কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে।

এতক্ষণ ছোটদের নাটকের যে তালিকা দিলাম তা থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ছোটদের জন্য

ছোটদের অভিনয়
শিশুরঙ্গন-প্রযোজিত, শৈলেন ঘোষ-রচিত ও পরিচালিত 'টোরা-বাদশা' নাটকের একটি মুহূর্ত

আরো নাটক দরকার। এই দেশে অনেক কিছু না থাকার মত ছোটদের নাটকেরও খুবই অভাব।

শিশুনাট্যের একটি মঞ্চ কি নাটকের শহর কলকাতাতে হতে পারে না? কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিরসিক প্রত্যেক মানুষের কাছে শিশুসমাজের পক্ষ থেকে এই দাবী কি করা যায় না যে তাঁদের প্রত্যেকের সামান্য দানে শিশু-নাট্যমঞ্চ তৈরি হয়ে ছোটদের আনন্দে ভরিয়ে দিক?

সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম ছোটদের নাটক

সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম বাংলা নাটক যে 'নীলদর্পণ' তা তোমরা জেনেছ। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ যে ৭ ডিসেম্বর, ১৮৭২, তা-ও তোমাদের অজানা নয়। নাটক কোথায় হয়েছিল এবং অন্যান্য আরো খবরাখবরও তোমাদের জানিয়েছি। ছোটদের নাটক নিয়েও তো এতক্ষণ কিছু কথা শুনলে। কিন্তু ছোটদের সাধারণ রঙ্গালয়ে, অর্থাৎ টিকিট বিক্রি করে প্রথম যে নাটক অভিনীত হয়েছিল, সে-কথা এবারে বলব।

ছোটদের জন্য এই নাটকটির নাম হ'ল 'ফুলের আয়না'। রূপকথার ভিত্তিতে রচিত এই নাটকটি নরেন্দ্র দেবকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। নরেন্দ্র দেব পরে শিশুসাহিত্য পরিষদের সভাপতি হয়েছিলেন এবং সম্পাদক হিসেবে তাঁর সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে যাই হোক, 'ফুলের আয়না' অভিনীত হয়েছিল স্টার থিয়েটারে, নাট্য-মন্দিরের প্রযোজনায়। এই অভিনয় হয়েছিল ১৯৩৪-এর প্রথম দিকে। 'ফুলের আয়না' নাটকটি মঞ্চে খুব বেশিদিন চলে নি, কিন্তু এদেশে শিশিরকুমার ভাদুড়ীই যে সাধারণ রঙ্গালয়ে ছোটদের জন্য প্রথম নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন তা কখনই ভোলা যাবে না।

এর পরও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বেশ কয়েক মাস ধরে আর একটি ছোটদের নাটক নিয়মিত অভিনীত হয়—কালিকা থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে। নাটকটির নাম 'বিষ্ণুশর্মা', লিখেছিলেন অখিল নিয়োগী (স্বপন-বুড়ো), কিন্তু অভিনয়ে নেমেছিলেন তখনকার খ্যাতনামা অভিনেতারা। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলি নিয়ে এই নাটকটি রচিত হয়েছিল।

জনপ্রিয় নাটক : তখন

নাটক, নাট্যশালা ও শিল্পীর নানা গল্প, তার ইতিহাস, বিবর্তনের কথা আমরা প্রায় শেষ করে এনেছি। যাঁরা নাটক মঞ্চস্থ করেন, নাটকের সাফল্যের জন্য তাঁদের ভাবনার শেষ থাকে না। দর্শক তো পাঁচ-দশ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে নাটক দেখেই খালাস। কিন্তু দর্শকের সামনে সার্থকভাবে নাটকটিকে হাজির করবার জন্য কত পরিশ্রম, সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তার ইতিহাস লিখলে এই বিশ্বকোষের একটা গোটা খণ্ড শেষ হয়ে যাবে। কে আর চান নাটক খারাপ হোক, দর্শক গালমন্দ করুন? কিন্তু যা ভাবা যায় তা আর হয় না। সাধ্যমত, যা করার সব কিছুই করা হয়। তথাপি বহু নাটক নানা কারণে দর্শকদের তৃপ্তি দিতে পারে না। আবার এমনও দেখা গেছে, প্রায় ত্রুটিহীন নাটকও দর্শক নেন না। কোন্ নাটক যে কখন দর্শকদের ভালো লাগবে তা বলা সহজ কথা নয়। এও দেখা গেছে, নাটকটি ভালোই হ'ল, দর্শক-সমালোচক সকলেই নাটকের জয়গান গাইলেন, কিন্তু নাটকটি অর্থ পেল না। অর্থাৎ ভালো নাটক

দর্শকদের প্রশংসা পাওয়া সত্ত্বেও, লক্ষ্মীর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'ল।

এখানে এমন কিছু নাটকের নাম দেওয়া হ'ল যেগুলি জনপ্রিয়তার বিচারে বেশ ভালোভাবেই উৎরে গেছে। প্রথম প্রথম আগ্রহ-ঔৎসুক্য সবই ছিল, কিন্তু ১৮৫৭-র মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নাটকে সেদিন ছিল কলকাতায় প্রবল উৎসাহ-উত্তেজনা। এর পরে মধুসূদনের নাটক নিয়েও আগ্রহ ছিল। তারপরে ১৮৬৭-তে জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় রামনারায়ণের 'নব-নাটক' জনপ্রিয় হয়েছিল। এই নাটকে নটী সেজেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' (প্রথম অভিনয় ১১ মে, ১৮৭২) আর একটি জনপ্রিয় নাটক। এই নাটক দেখতে এসে বহু লোককে হতাশও হতে হয়েছে।

সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' নানা সময়ে, নানা স্থানে অভিনীত হয়ে প্রশংসা পেয়েছিল। এই নাটক ঢাকা শহরেও (১৮৭৩-এর মে মাসে) প্রচুর প্রশংসা পেয়েছিল। লক্ষ্ণৌয়ে 'নীলদর্পণ' দেখতে উপস্থিত ছিলেন বহু দর্শক। যাকে বলে লোকে লোকারণ্য। গিরিশচন্দ্রের অনেকগুলি নাটক জনপ্রিয় হয়েছিল। স্টার থিয়েটারে 'কমলে কামিনী', 'চৈতন্যলীলা', 'বুদ্ধদেবচরিত' প্রবল প্রতাপে অভিনীত হ'ল। মিনার্ভায় 'ম্যাকবেথ' জনসাধারণের হৃদয় জয় করতে পারল। 'প্রফুল্ল' নাটকটিও জনপ্রিয় হয়েছিল খুবই। স্টারে এ নাটকে যোগেশের ভূমিকায় নামতেন অমৃতলাল বসু। গিরিশচন্দ্রই তাঁকে শিখিয়েছেন যোগেশের ভূমিকা। 'প্রফুল্ল' নাটক নিয়ে নানা ইতিহাস। মিনার্ভা ও স্টারে একই সময়ে 'প্রফুল্ল' নাটক অভিনীত হয়েছিল। মিনার্ভায় যোগেশ গিরিশচন্দ্র, স্টারে যোগেশ অমৃতলাল। গুরু আর শিষ্য। দু'জায়গাতেই প্রচুর ভিড়। অসাধারণ জনপ্রিয়তা। পরবর্তী যুগে এই রকম একই সময়ে মাইকেল মধুসূদনকে নিয়ে রচিত দু'টি নাটকের একটিতে শিশির ভাদুড়ী, অন্যটিতে অহীন্দ্র চৌধুরী মাইকেলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'র নাট্যরূপ 'সরলা'ও কম জনপ্রিয় হয় নি। গিরিশচন্দ্রের আর একটি অসাধারণ জনপ্রিয় নাটক সিরাজদ্দৌলা। প্রথম অভিনয় ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এই নাটক দেখতে একদিন মিনার্ভায় উপস্থিত ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের নাটক দেখতে বহু বিখ্যাত মানুষ উপস্থিত থাকতেন। 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখতে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। 'চৈতন্যলীলা' তখনকার দিনের একটি জনপ্রিয় নাটক। এই নাটক দেখে পরমহংসদেব বলেছিলেন, 'আসল নকল এক দেখলাম।' 'চৈতন্যলীলা'র জনপ্রিয়তা আজও অব্যাহত। সুনীল দাশগুপ্ত-পরিচালিত গিরিশ সংসদের 'চৈতন্যলীলা' এখনকার কালের একটি জনপ্রিয় নাটক। এই লেখকও এর অন্যতম গীতিকার।

স্টারে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী সেজেছিলেন বিক্রমাদিত্য ও রডা। 'নীলদর্পণ' নাটকে উড সাহেব সাজতেন ইনি। 'রাজসিংহ', 'নসীরাম', 'রাবণবধ', 'খাসদখল', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' বেশ জনপ্রিয় ছিল। 'সাজাহানে' ঔরংজেব সাজতেন দানীবাবু, 'চন্দ্রগুপ্তে' চাণক্য। প্রথম দিকে 'আলিবাবা' তেমন দর্শক না টানলেও পরে ভিড় উপ্‌চে পড়েছে। ক্লাসিক থিয়েটারের এই নাটকটির তখন জয়জয়কার।

'আলিবাবা'য় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সাজতেন হুসেন। 'আলিবাবা' থেকে অমরেন্দ্রনাথের লাভ হয়েছিল লাখ টাকার ওপর। গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবগৌরব'ও জনপ্রিয় হয়েছিল বেশ। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের কথা যে বলছিলুম, মনে রেখো, স্টেজে সর্বপ্রথম আসল সরঞ্জামের ব্যবহার তিনিই চালু করেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর তো বহু নাটকই জনপ্রিয় হয়ে দর্শকদের মন ভরিয়েছিল। শৌখীন শিল্পীরূপে শেষ অভিনয় তিনি করেন ১৯২১-এর মাঝামাঝি সময়ে। সাধারণ থিয়েটারে তাঁর প্রথম অভিনয় ১৯২১-এর ১০ ডিসেম্বর,—ম্যাডান কোম্পানির বাংলা নাটক 'আলমগীর'-এ নামভূমিকায়। প্রথম দিনের অভিনয়-রাত্রি থেকেই তিনি জনচিত্ত জয় করলেন। প্রথম রাতে তেমন ভিড় হয় নি, পরে প্রচুর দর্শক আসতেন। যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' দেখে দেশবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র উচ্চ প্রশংসা করলেন। 'সীতা' দেখে সারা কলকাতা,—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষায়, "বসন্ত-প্রলাপে অশোক-পলাশের মত আনন্দ-উত্তাল হয়ে উঠেছে।" 'আলমগীরে' শিশিরকুমার আলমগীর, 'সীতা'য় রাম আর 'চন্দ্রগুপ্তে' চাণক্য। শিশিরকুমার-অভিনীত প্রফুল্ল, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, ষোড়শী, জনা, মন্ত্রশক্তি, পথের দাবী, সাজাহান, সধবার একাদশী, মিশরকুমারী, বৈকুণ্ঠের খাতা, রমা, বিরাজ বৌ, রীতিমত নাটক, চিরকুমার সভা, নর-নারায়ণ, কর্ণার্জুন, গৈরিক পতাকা, সিরাজদ্দৌলা, মাইকেল—প্রায় সব ক'টি নাটকই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত (প্রথম অভিনয় ২৪.১২. ১৯৩০) মন্মথ রায়ের 'কারাগার'-এর জনপ্রিয়তা ব্রিটিশ সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছিল। 'মুক্তির ডাক' নাটকটি ছিল বাংলা একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তক। এর জনপ্রিয়তাও কম ছিল না। আরো অনেক নাটকই জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু সব তো এখানে লেখা সম্ভব নয়!

জনপ্রিয় নাটক ঃ এখন

এখন, মানে শিশিরকুমারের পর। টাকার অভাবে শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গম্ বন্ধ হয়ে গেল ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে শেষ অভিনয় হয়েছিল ঐ বছরের ২৪ জানুয়ারি। নাটক ছিল 'প্রফুল্ল'। ২৭ জানুয়ারি শ্রীরঙ্গম্ ত্যাগ ক'রে তাঁকে চলে আসতে হয়। মঞ্চে তাঁর সাজানো বাগান সত্যিই শুকিয়ে যায়। এখনকার বিশ্বরূপা থিয়েটারই তখনকার শ্রীরঙ্গম্।

সাধারণ রঙ্গালয়ের নামগুলি তোমাদের আগেই জানিয়েছি। এই সব রঙ্গালয়ে এখন, অর্থাৎ শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মৃত্যুর কিছু আগে ও পরে যা অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে বেশ কিছু নাটক জনপ্রিয় হয়েছে। পেশাদার মঞ্চের বাইরেও গ্রপ থিয়েটারের দ্বারা অভিনীত কয়েকটি নাটকও জন-প্রিয়তার নিরিখে উত্তীর্ণ হয়েছে। পেশাদার-অপেশাদার যে সব নাটক জনপ্রিয় হয়েছে সেগুলি হ'ল (গণনাট্য ও নবনাট্য আন্দোলনের নাটকের কথা আগেই বলা হয়েছে, সে-প্রসঙ্গ আর তাই আনছি না)—রক্তকরবী, ডাকঘর, চার অধ্যায়, মুক্তধারা, পুতুল খেলা, কাঞ্চনরঙ্গ, রাজা ওয়েদিপাউস, অঙ্গার, তিতাস একটি নদীর নাম, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, কল্লোল, ফেরারী ফৌজ, অলীকবাবু, ইন্দ্রজিৎ, গোরা, নীলদর্পণ, ডাকবাংলো, শেষ সংবাদ, চলচিত্ত-চঞ্চরি, ব্যাপিকাবিদায়, শ্যামলী, ক্ষুধা, সেতু, এরাও

মানুষ, আরোগ্যনিকেতন, একমুঠো আকাশ, শ্রীকান্ত, পরিণীতা, তাপসী, শ্রেয়সী, একক দশক শতক, সাহেব বিবি গোলাম, কবি, শেষলগ্ন, উল্কা, চক্র, অনর্থ, দুই মহল, বারোঘণ্টা, নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র, শের আফগান, মঞ্জরী আমের মঞ্জরী, তিন পয়সার পালা, মারীচ সংবাদ, জগন্নাথ, ফুটবল, পরবাস, রোশন, জতুগৃহ, রামনাম কেবলম্, এবার রাজার পালা, আগুনের পাখি, জুলিয়াস সীজারের শেষ সাত দিন, মাননীয় বিচারকমণ্ডলী, রাজদর্শন, বাবু, চৈতন্যলীলা, ব্যারিকেড, টিনের তলোয়ার, কৃষ্ণকান্তের উইল, নহবৎ, সমাধান, সব ঠিক হ্যায়, পন্ত লাহা, আঁধারে আলোয়, বিষবৃক্ষ, নাগপাশ, তীর, আজকের সাজাহান, স্বদেশী নক্সা, নরক গুলজার, সাজানো বাগান, সুবর্ণগোলক, নাম-বিভ্রাট, কথা কও, এন্টনি কবিয়াল, দাঁড়াও পথিকবর, অমর কণ্টক, নাম জীবন, শ্রীমতী ভয়ঙ্করী, জয় মা কালী বোর্ডিং, অঘটন, কনে বিভ্রাট প্রভৃতি। এই সব নাটকের জনপ্রিয়তায় কোনো বিভ্রাট নেই বলেই মনে হয়।

নৃত্যনাটকের অভিনয়ে গত কয়েক দশক ধরে 'ভারতীয় শিল্পী পরিষদ্' যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, তা এক কথায় অভিনব। প্রচলিত নৃত্যনাটক বা ড্যান্স ড্রামা থেকে এদের প্রযোজিত নৃত্যনাটকগুলির পার্থক্য অনেকখানি। গীতিনাট্য-যাত্রা-নাটক-নৃত্য-নাট্য ইত্যাদি নানা ধরনের শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এদের নৃত্যনাটক সম্পূর্ণ এক নতুন শিল্পপ্রকরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সর্বজনপ্রিয় সাহিত্যিক-দাদা পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, খ্যাতনামা ক্রীড়া-সাংবাদিক রাখাল ভট্টাচার্য আর নৃত্যশিল্পী অতীনলাল এই সংস্থার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এর সভাপতি হলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও নাট্যকার ডক্টর বিষ্ণুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম. ডি., পি.-এইচ. ডি।

বাংলা ও বাংলার বাইরে এদের নাটকগুলি দর্শকদের অভিনন্দনে ধন্য হয়েছে। রাষ্ট্রপতি-ভবনে অনুষ্ঠিত (১৭.২.১৯৬৫) এদের 'শ্রীচৈতন্য' নৃত্য-নাট্য দেখে তখনকার রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন্ অভিভূত হয়েছিলেন এবং শিল্পীবৃন্দকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেছিলেন। অতীনলালের প্রয়োগপরিকল্পনায় এদের নৃত্যনাট্য শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ, রামায়ণ, আলিবাবা, খুবাই নদীর ঘাট, মহুয়া খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার কয়েকটি নাটকও জনপ্রিয় হয়েছে।

এবারে যবনিকা

না, আর নয়। নাটক নিয়ে, রঙ্গালয় নিয়ে, শিল্পী ও তাঁদের অভিনয় নিয়ে এতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে নানা গল্প করা গেল। অনেক কথা হয়তো বলা হ'ল না। আবার কোন কোন ফর্দ হয়তো বেশি বড় হয়ে গেল। নাটক যাঁরা করেন তাঁদের অনেকের জীবনও যে নাটকের মতই আমাদের আকর্ষণ করে, রঙ্গমঞ্চের আলোয় তাঁরা অভিনয় করে দর্শকদের আনন্দ দিলেও তাঁদের মনের গভীরে যে কত কান্না, সে-খবর অনেক সময়েই আমাদের অজানা থেকে যায়। বার্ধক্য নটের ভীষণ শত্রু। 'দেহ পট মনে নট সকলি হারায়।' গিরিশচন্দ্রের এই কথা একশো ভাগই সত্য। কিন্তু তবু নাটক হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, নাটকের দ্বারা লোকশিক্ষা হয়। নাটক একটা জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা ও কৃষ্টির পরিচয় দেয়। এই নাটকের জন্য কত শিল্পী, নাট্যপ্রেমিক মানুষ,

কত নাট্যসংস্থা আত্মত্যাগের সুমহান্ উদাহরণ রেখে গেছেন তা স্মরণ করেও আনন্দ হয়, প্রেরণা জাগে।

মানুষ যাতে নাটক দেখতে আসেন, নাটকের প্রতি যাতে তাঁদের আগ্রহ-উৎসাহ বাড়ে, তার জন্য নাট্য-শিল্পীদের কত চেষ্টা! থিয়েটারে ভিড় বাড়াবার জন্য চুনিলাল দেব সেই করে মিনার্ভায় দর্শকদের উপহার দেবার ব্যবস্থা করলেন। এরও আগে ন্যাশনাল থিয়েটার উপহার দিয়েছিল—আংটি, আয়না, কানের দুল, রুমাল, সাবান, সেণ্ট, আরো আরো কত কি! নাকছাবি, আংটি দিয়েছে এমারেল্ড থিয়েটার। নাটকের দর্শকদের জন্য লটারিও করেছে ন্যাশনাল থিয়েটার। উপহারের জিনিসগুলো শুনলে অবাক্ হবে। সেগুলি ছিল—একটা ছাতা, এক কাঁদি কলা, বেশ বড় দু'টো বিলিতি কুমড়ো। হ্যাঁ, সত্যি তাই। আর কি থাকত? শুনলে আরও অবাক্ হবে। থাকত এক বস্তা কয়লা। আর থাকত বই।

ক্ল্যাসিক থিয়েটার মধুসূদনের গ্রন্থাবলী উপহার দিলেন দর্শকদের। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, এমন কি রবীন্দ্রনাথের কিছু বইও উপহারের তালিকা থেকে বাদ গেল না। শব্দকল্পদ্রুমও ছিল উপহারের তালিকায়। বই উপহারের প্রতিযোগিতায় মিনার্ভা আর ক্ল্যাসিক থিয়েটার ছিল সবার আগে। উপহারের আশায় এই দুই থিয়েটারে তখন কী ভিড়!

হ্যাঁ, এই হ'ল থিয়েটার নিয়ে গল্প। গল্পের কথা যখন এল তখন থিয়েটার চলাকালীন এক বিখ্যাত অভিনেতা যে-কাণ্ড করেছিলেন তার গল্প বলেই যবনিকা ফেলব।

অভিনয় হচ্ছে 'নবীন তপস্বিনী' নাটক। বিখ্যাত অভিনেতা যোগেন্দ্রনাথ মিত্র পাল্কী-বাহকের ভূমিকায়। কাঁধে গামছা, গলায় মালা, মালকোঁচা মেরে কাপড় পরা। মাথায় বাহকের মত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল।

চতুর্থ অঙ্কের ড্রপ্ পড়েছে। বাজনা বাজছে। পঞ্চম অঙ্কের শুরুতেই বাহকের বেশে যোগেন্দ্রনাথকে প্রবেশ করতে হবে।

থিয়েটারের ভেতরে একধারে তামাকের সরঞ্জাম নিয়ে বসে আছে ও-বাড়ির ভৃত্য। স্টেজে উঠবার আগে যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ভাবলেন, এক ছিলিম তামাক খেয়ে নিয়ে শরীরে একটু ফূর্তি এনে স্টেজে ওঠা যাবে। সেই চাকরটিকে বললেন, 'ওরে, চট্ করে এক ছিলিম দিয়ে যা তো!'

যোগেন্দ্রনাথের মেক্ আপ্ এমন নিখুঁত ছিল যে চাকরটি তাঁকে চিনতে না পেরে তাঁকে তার সমগোত্র ভেবে যোগেন্দ্রনাথের মুখের ওপর জবাব দিল,—'খুব যে বাবু হয়ে গেছিস! অত তামাক খেতে ইচ্ছে হলে নিজে তামাক সেজে খা না।'

চাকরের কথা শুনে রাগে ফেটে পড়লেন যোগেন্দ্রনাথ।—'তোর এত বড় সাহস, আমাকে তুই তামাক সাজতে বলিস!' এক চড় মারলেন চাকরটাকে। চাকরটিও ছাড়বার লোক নয়, সেও গলাধাক্কা দিল যোগেন্দ্রনাথকে। যোগেন্দ্রনাথ এবারে বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন চাকরটির পিঠে। চাকরটি করল কি, যোগেন্দ্রনাথের চুল ধরল মুঠো করে। আর সঙ্গে সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথের মাথার পরচুলাটা চলে এল চাকরটির হাতে।

পরচুলাটা উঠে আসায় এন্‌জিনীয়ার যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের আসল পরিচয় বুঝতে পেরে তাঁর পা দু'টো জড়িয়ে ধরে তখন চাকরটির সে কী কাঁপুনি আর কান্না!

না, আর নয়। আমাদের রঙ্গালয়ের কথা আপাতত শেষ। এবারে যবনিকা।

আইন কানুনের কথা

আইনকানুন

কথায় বলে 'আইনকানুন'। আসলে কিন্তু দু'টি কথারই অর্থ এক। আইন শব্দটি এসেছে ফার্সী থেকে, কানুন শব্দটি এসেছে আরবী থেকে। পরবর্তীকালে ও দু'টি বাংলাভাষারই অঙ্গ হয়ে গেছে।

সকলের পক্ষে সব আইন জানা সম্ভব না হলেও, সব দেশেই এমন কতকগুলো আইন থাকে যা না মানলে শাস্তি পেতে হয়। যেমন আইনে বলা আছে চুরি করা অপরাধ এবং এই অপরাধ যে করবে তাকে শাস্তি পেতে হবে। তাই, ওই আইন অনুসারে, যারা চুরি করে তারা শাস্তি পায়। আবার কোন বিষয় নিয়ে কারো সঙ্গে কারো বিবাদ বাধলে তারা আইনের আশ্রয় নিয়ে তার ফয়সালা করে। বিচারের জন্য থাকে আদালত। সেখানে বিচারকের কাছে আইনের ব্যাখ্যা করার জন্য বাদী প্রতিবাদী দু'পক্ষই এক বা একাধিক আইন-জানা লোকের সাহায্য নেয়। এঁরাই হচ্ছেন উকিল। উকিলের কেরামতিতে অনেক সময় মামলা ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। দোষী লোক খালাস পেয়ে নির্দোষকে শাস্তি পেতে হয়। উকিলের পেশাকেই বলা হয় আইন-ব্যবসা। সব দেশেই উকিল আছেন। আমাদের বাঙ্গালীদের মধ্যেও অনেক বড় বড় উকিল হয়ে গেছেন। যেমন রাসবিহারী ঘোষ, ব্যারিস্টার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড সিংহ), চিত্তরঞ্জন দাশ, আরও কত!

একটা দেশের ভিতরে যেমন কতকগুলো আইন থাকে, তেমনি পৃথিবীর সব দেশের জন্যও কতকগুলো আইন আছে। তাকে বলে আন্তর্জাতিক আইন।

আইন কি করে তৈরি হ'ল

ইংরেজিতে কা-স্টম্ বলে একটা কথা আছে। কথাটার বাংলা মানে হ'ল 'প্রথা'। আইনের সব চাইতে বড় উৎস হ'ল এই প্রথা। প্রথার উদ্ভব হয় মানুষের আচরণ, অভ্যাস, ব্যবহার বা রীতিনীতি থেকে। মানুষের মনে একান্ত স্বাভাবিক ভাবে—বা অত্যন্ত ধীর, সতর্ক বিবেচনা ও চিন্তা থেকে যে বিধি-নিয়ম জন্মলাভ করে তাকেই আমরা বলি রীতিনীতি। ইংরেজিতে এরই নাম 'ইউসেজ'। রীতিনীতি বা ইউসেজ দানা বেঁধে তৈরি হয় 'প্রথা'। অনেকদিন ধরে কোন রীতিনীতি প্রচলিত থাকলে কালে কালে তাই রূপান্তরিত হয় প্রথায়।

প্রথার উৎপত্তি অনুসন্ধান করা একটা কঠিন ব্যাপার। সব প্রথাকেই বিচারকরা 'আইন' হিসেবে মেনে নেন না। পাঁচটি শর্ত পূরণ হলে তবেই প্রথাকে আইনের মর্যাদা দেওয়া হয়। অন্য ভাবে বলা যায়, 'প্রথা'-কে 'আইন' হতে হলে তাকে হতে হবে প্রাচীন, নির্দিষ্ট, যুক্তিভিত্তিক এবং বিরতিহীন। তা ছাড়া

তা কোন লোকহিতকর নীতির পরিপন্থী হলে চলবে না।

আইন সম্বন্ধে কয়েকজন বড় বড় পণ্ডিত, যাঁরা ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত হয়েছেন,—তাঁরা যা সংজ্ঞা দিয়েছেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদেরকে ভালো বাংলায় বলা হয় ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্।

যাই হোক, সাধারণ ভাবে বলা যায়, আদালতের সিদ্ধান্তের ভিতর দিয়ে অথবা আইনসভায় গৃহীত প্রস্তাবের সাহায্যে প্রথা আইনের মর্যাদা লাভ করে।

এই যে প্রথার কথা বলা হ'ল, তা আবার দু'রকম হতে পারে। এক,—স্থানীয়, এবং দুই,—বিশ্বব্যাপী।
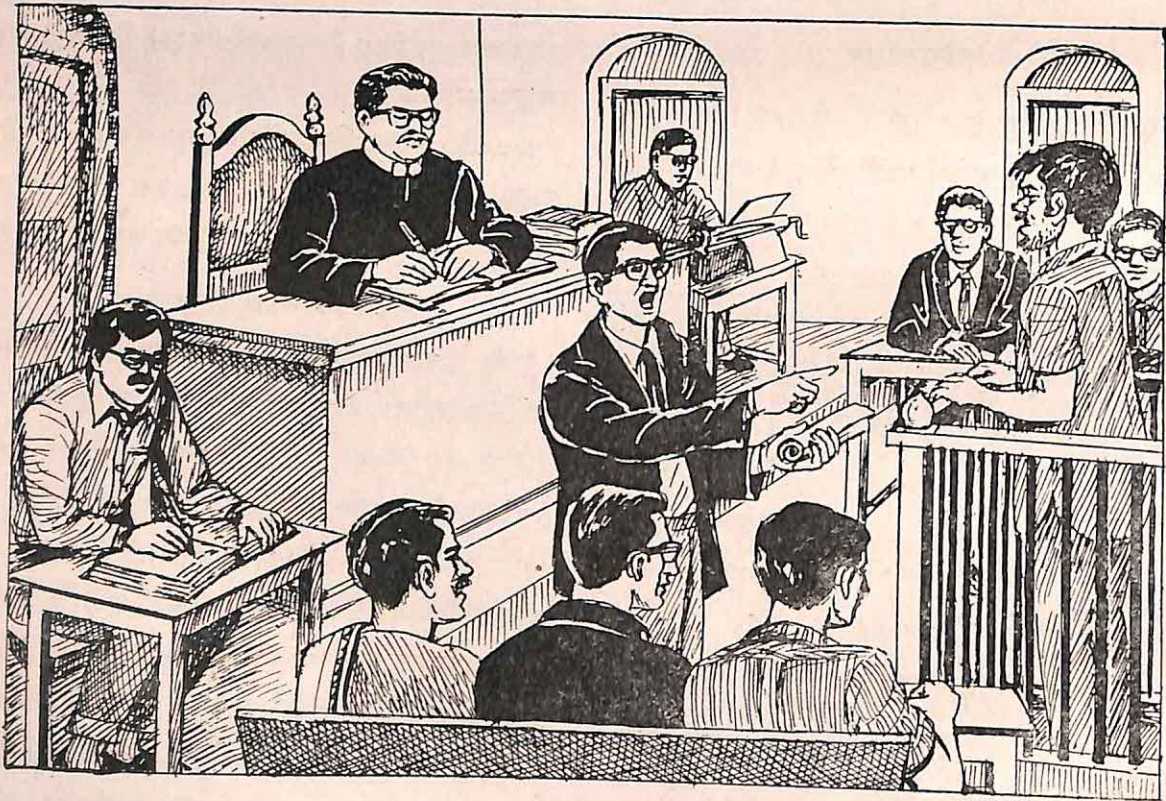
একটি আদালতের দৃশ্য
উকিল সাক্ষীকে জেরা করছেন, বিচারক নোট্ করে চলেছেন ;—সবেরই সূত্র আইনকানুন।

এইরকম একজন বিখ্যাত ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্ অস্টিনের মতে 'প্রথা'-কে আদালত 'আইন' হিসেবে স্বীকৃতি দিলে তবেই তা আইনের মর্যাদা পায়। আর একজন বড় ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্ হল্যাণ্ড কিন্তু এই মত মানেন না। তিনি মনে করেন, আদালতের স্বীকৃতি পাওয়ার আগেই কোনও প্রথা আইন হিসেবে গণ্য হতে পারে।

এ-ছাড়াও আছে 'পারিবারিক প্রথা' এবং 'জাতীয় প্রথা'।

শুধু প্রথা থেকেই কি আইনের জন্ম হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর হ'ল, 'না'। প্রথা ছাড়া আইনের অন্যান্য উৎসও আছে। এই 'উৎস'গুলি হ'ল—সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন, আদালতের সিদ্ধান্ত

এবং চুক্তিভিত্তিক আইন—যার অপর নাম "কনভেনশনাল" আইন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আইনের 'উৎস' মোট চারটি।

ব্যবহারশাস্ত্র বা জুরিসপ্রুডেন্স

জুরিসপ্রুডেন্স কথাটা এসেছে লাতিন 'জুরিস' এবং 'প্রুডেনশিয়া' শব্দ দু'টো থেকে। 'জুরিস' কথাটার মানে হ'ল 'আইনবিষয়ক' এবং 'প্রুডেনশিয়া' কথাটার মানে হল 'জ্ঞান'। সুতরাং বলা যায়, যে বিজ্ঞান থেকে আমরা আইনবিষয়ক জ্ঞান আহরণ করি তারই নাম জুরিসপ্রুডেন্স। বাংলায় (এবং সংস্কৃতেও) তাকে বলা হয় ব্যবহারশাস্ত্র। যেমন, যুদ্ধ পরিচালনাসংক্রান্ত জ্ঞানের নাম 'রে মিলিটারিস প্রুডেনশিয়া'। আইন বা 'ল' কথাটার অর্থ অবশ্য খুবই ব্যাপক। এখানে 'আইন' বলতে আইনের অন্তর্নিহিত নীতিগুলো ধরা হয়েছে।

জুরিসপ্রুডেন্সের অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। যেমন, একটি শাখায় রয়েছে আইন তৈরির বিভিন্ন দিক্, আইন যাঁরা প্রয়োগ করেন তাঁদের বিবরণ ও তাঁদের কাজের ধারাপ্রকৃতি, আইনের ব্যাখ্যা করার নিয়ম ইত্যাদি। অন্য একটি শাখার বিচার্য বিষয় আইনবিষয়ক নানা ধারণা। যেমন, 'অধিকার', 'উদেশ্য', 'অবহেলা', 'দখল', 'মালিকানা' প্রভৃতি।

রোমান আইন

প্রচলিত কাহিনী অনুসারে খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫৩-এ রোম প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমের প্রতিষ্ঠার ঐ সময় থেকে সুদীর্ঘ ২৭০০ বছর ধরে মানবজাতির ইতিহাসে রোমান আইন বা 'রোমান ল' তার বিস্ময়কর ও তুলনাহীন চমৎকারিত্ব রক্ষা করেছে। রোমান আইন তার অন্তর্নিহিত শক্তিসামর্থ্যের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সম্পূর্ণভাবে মেটায় মানুষের সামাজিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজন। জুরিসপ্রুডেন্সের কোন কোন ধারা রোমান আইনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

বিখ্যাত আমেরিকান্ আইনজীবী আব্রাহাম লিঙ্কন—যিনি পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

যে যুগে রাজারাই দেশ শাসন করতেন সে যুগে প্রথা-ই ছিল রোমান আইনের প্রধান উৎস। পরবর্তীকালে "টুয়েলভ্ টেবল্‌স্" (বারোটি তালিকা) প্রথাগত আইনকে পুরোপুরি গ্রহণ করে। প্রজাতন্ত্র বা রিপাবলিক যুগে তিনটি আইন-প্রণয়নকারী সংস্থা

বিদ্যমান ছিল। এদের নাম—কমিটিয়া সেঞ্চুরিয়াটা, কমিটিয়া ট্রিবুটা এবং কনসিলিয়াম প্লেবিস।

প্রাচীন রোমান আইনকে আমরা প্রধানত পাই টুয়েলভ্ টেব্‌ল্‌স বা বারোটি তালিকার মধ্যে। প্রাচীনতম রোমান আইন অবশ্য এর মধ্যে অনুপস্থিত। ১২টি তালিকার প্রথম ৩টি তালিকা দেওয়ানি কার্যবিধি বিষয়ক; চতুর্থটি পারিবারিক আইন সংক্রান্ত; পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তালিকা অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি বিষয়ক; অষ্টম, নবম ও দশম তালিকা যথাক্রমে অপরাধ, পাবলিক ল ও

এদেশের বিখ্যাত আইনজ্ঞ উকিল
স্যর রাসবিহারী ঘোষ

ধর্মগত আইন বিষয়ক; আর বাকি দু'টি আসলে পরিশিষ্ট। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫১-৪৫০ সালে এই বারোটি তালিকা সংকলিত হয়েছিল।

প্রায় হাজার বছর ধরে ঐ 'টুয়েলভ্ টেবল্‌স্'ই ছিল একমাত্র সম্পূর্ণ আইন। ৯৮৪ বছর পর, সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আমলে (৫২৭-৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) ঐ আইন পরিত্যক্ত হয়। জাস্টিনিয়ান অনেকগুলো নতুন আইন তৈরি করে পুরোনো আইনের দুর্বল ও অসংগতিপূর্ণ অংশগুলো পুরোপুরি বর্জন করেন ও আইনের সম্পূর্ণতা আনেন।

তুলনামূলক আইন

আধুনিক কালে তুলনামূলক আইন-সম্পর্কিত পর্যালোচনার আগ্রহ বেড়েছে। প্রাচীন কালে সোলোন এবং রোমান 'বারো তালিকা' আইনও তৈরি হয়েছিল সেকালের আইনধারাসমূহের তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রেক্ষাপটেই। ইংল্যাণ্ডের বিচারবিভাগীয় লোকেরা প্রায়ই ফ্রান্স ও জার্মানীর আইনধারাগুলোর উল্লেখ করে থাকেন। উনবিংশ শতকে ইয়োরোপ ও লাতিন আমেরিকার অনেক দেশ নেপোলিয়নের সংহিতা থেকে কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করে অথবা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। 'তুলনামূলক আইন' অধ্যয়নের জন্য ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে একটি সংস্থাও গঠিত হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে তুলনামূলক আইনের প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কংগ্রেসে আইনের বিভিন্ন ধারার খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞেরা উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রপক্ষীয় দেশগুলো ও তাদের সহযোগীরা তাদের আইনগুলো একই রকম করার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। এই কাজে উদ্যোগী হন জাতিসঙ্ঘ বা 'লীগ্ অব নেশন্‌স্'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশের আইনের মধ্যে ঐক্য বা সমন্বয় সাধনের জন্য আবার নতুন শক্তিতে ও নতুন উদ্দীপনায় কাজকর্ম শুরু হয়। এবার শুধু পাশ্চাত্য দেশগুলোর আইনই নয়, সারা পৃথিবীর যাবতীয় আইনের মধ্যে সমন্বয় সাধনই এখন এর লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

বিভিন্ন দেশে আইনকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। সোভিয়েত রাশিয়ার আইনবিদ্‌রা আইনকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করেন—বুর্জোয়া আইন ও সমাজতান্ত্রিক আইন।

দু'টি দেশের আইনের মধ্যে নানা সমতা দেখা গেলেও যদি ঐ আইনধারা দু'টি বিপরীতধর্মী দার্শনিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রণালীর ভিত্তিতে গঠিত হয়ে থাকে তবে তাদের একই গোষ্ঠী

কলকাতার আর একজন স্বনামধন্য আইনজ্ঞ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ (পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নামে পরিচিত)

বা পরিবারভুক্ত বলা চলে না। তবে গভীর অভিনিবেশ ও নিষ্ঠাসহকারে পরীক্ষা করলে বিভিন্ন আইনের মধ্যে অনেক ঐক্য ধরা পড়বে।

হিন্দু আইন

হিন্দু আইন বা 'হিন্দু ল' হিন্দু, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ এবং আরও কয়েকটি শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শাস্ত্রীয় হিন্দু আইনের উৎস তিনটি—শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচার।

'শ্রুতি' কথাটার মানে হ'ল যা শুনে শুনে শেখা হয়েছে এবং যাকে সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের বাণী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মুনিঋষিদের মাধ্যমে এই বাণী মানুষের কাছে এসেছে। শ্রুতির মধ্যে দৃশ্যত 'আইন' বিশেষ কিছু নেই, তবে এর মধ্যে এমন জিনিস আছে যা থেকে আইনের উৎপত্তি হয়েছে। শ্রুতি-র মধ্যে আছে চার 'বেদ' এবং 'ব্রাহ্মণ', ছয় 'বেদাঙ্গ' এবং 'উপনিষদ্'। ব্রাহ্মণের মধ্যে মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।

'স্মৃতি' কথাটার মানে 'যা মনে রাখা হয়েছিল' এবং মুনিঋষিদের কাছ থেকে যা আমরা পেয়েছি। যদিও তত্ত্বগতভাবে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র 'শ্রুতির' ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তবু 'স্মৃতি'ই প্রকৃতপক্ষে আইনের প্রধান উৎস। আসলে কিন্তু এই স্মৃতির মধ্যেও আইন বলতে আজ আমরা যা বুঝি তা খুব বেশি নেই।

স্মৃতি সম্ভবত অসংখ্য। তবে কেউ কেউ বলেন, স্মৃতির সংখ্যা ৩৬ ; এর মধ্যে আবার ৩টি মুখ্য—মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি এবং নারদস্মৃতি। ধর্মশাস্ত্রগুলোর মধ্যে আবার মনুস্মৃতি (মনুসংহিতা) সর্বপ্রধান। এই তিন স্মৃতির পরেই স্থান পেয়েছে বৃহস্পতিস্মৃতি ও কাত্যায়নস্মৃতি। স্মৃতিগুলো লেখা হয়ে যাওয়ার পর লেখা হয়েছিল বহুসংখ্যক টীকা বা মন্তব্য এবং আইন-সারসংগ্রহ। টীকাগুলোর মধ্যে প্রধান হ'ল—মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ। মিতাক্ষরা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকা; সম্ভবত একাদশ শতাব্দীতে এটি লেখেন বিজ্ঞানেশ্বর। জীমূতবাহনের দায়ভাগ কোন সংহিতা বা 'কোড্' নয়—একে বলা যেতে পারে সকল সংহিতার একটি সার-সংগ্রহ, —ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডাইজেস্ট'। শাস্ত্রীয় হিন্দু আইনের তৃতীয় উৎস 'সদাচার' বলতে বোঝায় প্রচলিত রীতিনীতি বা প্রথা। ভারতীয় পার্লামেন্টে

নানারকম নতুন আইন প্রণীত হওয়ার ফলে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রভিত্তিক হিন্দু আইন কতকটা পরিত্যক্ত হয়েছে।

মুস্‌লিম আইন

মুস্‌লিম আইনের উৎস চারটি। এগুলো হচ্ছে কোরান, হাদিস্‌, ইজ্‌মা ও কিয়া। মোয়া-কে শাসক হিসেবে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মোহম্মদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'কিসের ওপর ভিত্তি করে আপনি বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন?'

মোয়া বললেন,—'আল্লা অর্থাৎ ঈশ্বরের গ্রন্থের ভিত্তিতে আমি বিচার করব।'

'কিন্তু তার মধ্যে যদি দরকার মত জিনিস না পাওয়া যায়?'

'তা হলে ধর্মগুরু মোহম্মদ যে ভাবে বিভিন্ন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন আমিও সে-ভাবেই সিদ্ধান্ত নেব।'

'কিন্তু অদ্যাবধি আমি যে-সব সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা থেকে যদি আপনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ না পান?'

'তা হলে আমি আমার নিজস্ব বিচারশক্তি ও বিবেক অনুসারে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করব।'

ধর্মপ্রচারক মোহম্মদ তখন বললেন,—'আল্লা আপনাকে যথাযথ নির্দেশ দেবেন।'

মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র 'কোরান' মুসলমান আইনের প্রধানতম উৎস। এই গ্রন্থ কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং পদ্যে লেখা। এতে কয়েকটি ক্ষেত্রে সমকালীন কিছু সমস্যার মীমাংসা-সূত্রে কিছু সিদ্ধান্ত দেওয়া আছে; সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর কিছু প্রথার বিলোপসাধনের নির্দেশ আছে; সমাজ-সংস্কারক নীতিসমূহ বর্ণিত আছে।

মুস্‌লিম আইনের দ্বিতীয় উৎস হাদিসের মধ্যে আমরা পাই ধর্মপ্রচারক মোহম্মদের আদেশ-নির্দেশ ও বাণী যা তাঁর জীবন-কালে লেখা হয় নি কিন্তু আচার-আচরণের ভিতর দিয়ে রক্ষিত হয়েছে।

মুস্‌লিম আইনের তৃতীয় উৎস ইজ্‌মা-র গুরুত্ব শুধু আইনের জন্য নয়, ইসলাম ধর্ম ও প্রশাসনের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

চতুর্থ উৎস 'কিয়া' আসলে কোরান, হাদিস্‌ এবং এমন কি 'ইজ্‌মা' থেকেও সংগৃহীত নিয়মকানুন।

আন্তর্জাতিক আইন

এবারে আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে একটু বলি।

আন্তর্জাতিক আইনকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক ভাগের নাম—পাবলিক ইণ্টারন্যাশনাল ল, অন্য ভাগের নাম—প্রাইভেট ইণ্টারন্যাশনাল ল। প্রাইভেট ইণ্টারন্যাশনাল ল-এর আর একটি নাম—'কন্‌ফ্লিক্ট অব ল-জ্‌' অর্থাৎ 'আইনের দ্বন্দ্ব'। পাব্লিক ইণ্টারন্যাশনাল ল-এর অধিক্ষেত্র হ'ল বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং প্রাইভেট ইণ্টার-ন্যাশনাল ল দেশের ভিতরকার আইন এবং বিচার-ব্যবস্থার সঙ্গে বিদেশীদের সম্পর্ক বিষয়ক। শুধু 'আন্তর্জাতিক আইন' বললে 'পাবলিক ইণ্টারন্যাশনাল ল'কেই বোঝায়। এর বিভিন্ন শাখার মধ্যে আছে সমুদ্র আইন, আকাশ আইন, যুদ্ধ আইন, নিরপেক্ষতা আইন প্রভৃতি। বড় হয়ে, তোমরা, যারা 'আইন' অথবা 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' পড়বে, তারা এ বিষয়ে আরও অনেক কথা জানতে পারবে।

স্বাধীন ভারতের আইন

খণ্ডিত ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পায় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। বৃটিশরা ভারত ত্যাগ করে কিন্তু ইংরেজ শাসনের

সময়ে বিদেশী শাসক যে আইন, আইন-সংক্রান্ত নিয়ম এবং আইনবিষয়ক সংস্থা তৈরি করে গিয়েছিল স্বাধীন ভারতে তা প্রায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এর কারণ কি, এ প্রশ্ন উঠতে পারে। ইংল্যাণ্ড ও ভারতের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ, তাই এ-রকমটা হয়েছে, কেউ কেউ এমনও ভাবতে পারেন। আসল ব্যাপার কিন্তু অন্য। ইতিহাসের একটা নিয়ম হ'ল এই, যে, যখন কোন দেশের বা কোন মানবগোষ্ঠীর নিজেদের কোনও ভালো লিখিত আইন থাকে না, আইন-প্রয়োগের কোন আদালত থাকে না, নতুন আইন তৈরির সুব্যবস্থা থাকে না, তখন সেই দেশ বা মানব-গোষ্ঠী সহজেই এবং দ্রুত ওই বিদেশী আইনকেই গ্রহণ করে। এ ভাবেই একদা ইয়োরোপের মূল ভূখণ্ডে রোমান আইন প্রচলিত হয়েছিল। ভারতের ক্ষেত্রেও এ রকমটাই হয়েছে।

আমাদের সংবিধান

আমাদের দেশের প্রধানতম আইন হ'ল আমাদের সংবিধান। এ দেশের সব আইনকে ঐ সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়, না হলে ঐ আইন বাতিল বলে ঘোষিত হয়। অনেকে আশা করেছিলেন নতুন সংবিধানে হিন্দু আইন, মুস্‌লিম আইন ইত্যাদির ওপর জোর না দিয়ে সকলকার জন্য এক "ভারতীয় আইন" তৈরি হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় নি। তবে সব দেশেই আইন পরিবর্তন করা যেতে পারে, কারণ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হলেও আইনও পরিবর্তনশীল। সমাজ নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই পরিবর্তনশীল এই সমাজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আইনকে অটল হয়ে থাকলে চলে না, সমাজের অগ্রগমনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাকেও পরিবর্তিত ও সংশোধিত হতে হয়। এজন্য মাঝে মাঝে প্রচলিত আইন সংশোধন করা হয়।

মোট কথা, সমাজের মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই নানারকমের আইন তৈরি হয়েছে এবং সেই কথা মনে রেখেই এই সব আইন গড়ে উঠেছে, —ভবিষ্যতেও উঠবে। আর সেই ভাবেই আইনকে আমরা মোটামুটি ছয়টি ভাগে ভাগ করতে পারি—প্রশাসনিক আইন, আন্তর্জাতিক আইন, ব্যবসাবাণিজ্য ও শ্রম-সংক্রান্ত আইন, পারিবারিক আইন, সম্পত্তিবিষয়ক আইন ও অপরাধ আইন।

ভারতীয় সংবিধানের কথা যখন উঠল তখন ও-সম্পর্কে আর দু'-চারটে কথা এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে।

ভারতের সংবিধানই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় লিখিত দলিল। সংবিধানে ভারত রাষ্ট্রের নাম দেওয়া হয়েছে সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। নাম থেকেই এ রাষ্ট্রের আইনকানুন কি রকম হবে তার একটু আভাস পাওয়া যায়।

অনেকগুলি অঙ্গরাজ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে ভারত। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যেই নিজস্ব কিছু কিছু আইন করবার ক্ষমতা আছে যা সেই রাজ্য সরকার তার এক্তিয়ারের মধ্যে প্রয়োগ করতে পারে। আর সকলের ওপর আছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাদের তৈরি আইন সব রাজ্যকেই মানতে হয়।

সংবিধানে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিককে কতক-গুলি মৌলিক অধিকার—যাকে বলা হয় 'ফাণ্ডা-মেণ্টাল রাইটস্'—দেওয়া হয়েছে যা অস্বীকার করবার ক্ষমতা কারও নেই। এ অধিকার কখনও বাতিল করাও চলবে না। অন্য আইনগুলো বদলানো গেলেও তার জন্যও নানারকম বিধিনিষেধ আছে। অবশ্য তা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত প্রায় ৫২টি ক্ষেত্রে এইসব আইনকানুন সংশোধন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে হয়তো আরও হবে।
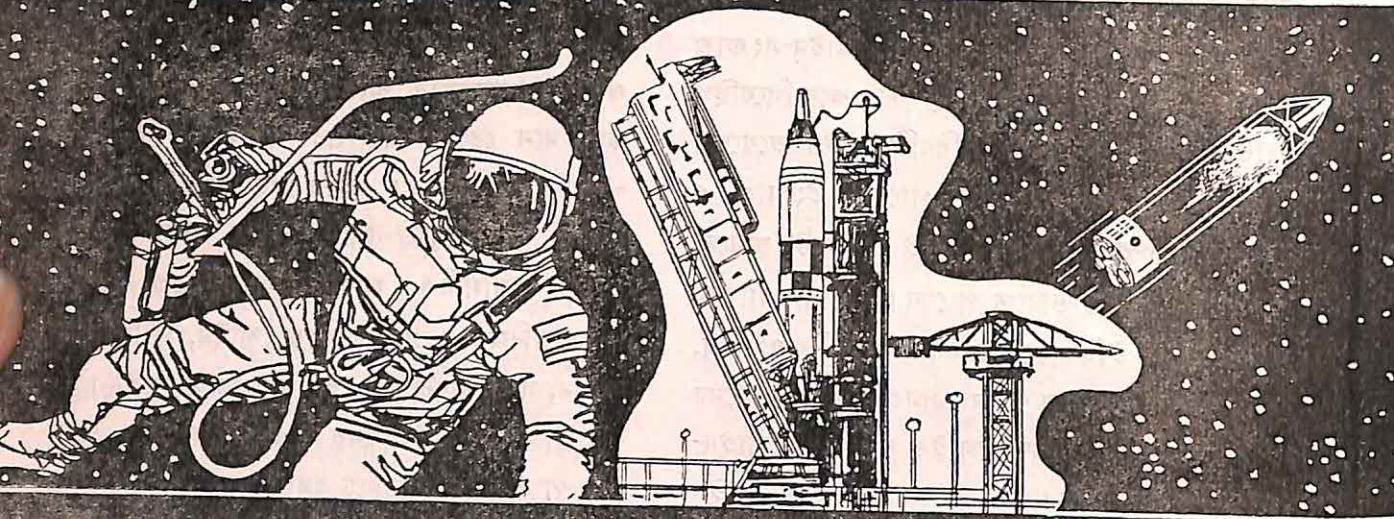
মহাশূন্যের পথে

মহাকাশ গবেষণায় এগিয়ে এল ভারত

মানুষের মহাকাশবিজয়ের নানা কাহিনী তোমরা ধারাবাহিক ভাবে ছোটদের বিশ্বকোষের প্রথম থেকে পঞ্চম—পাঁচটি খণ্ডেই পড়েছ। মহাকাশ অভিযানে প্রথম পথ দেখিয়েছিল রাশিয়া ১৯৫৭ সালে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৪)। তার কয়েক মাস পরেই আমেরিকাও শুরু করল সেই অভিযান। সেই থেকে এই দু'টি দেশই সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে একে অপরের সঙ্গে। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এই দু'টি দেশের বিজ্ঞানীরাই এ ব্যাপারে ছিলেন পথিকৃৎ। তাই আমরা বলতে পারি ঐ সময় পর্যন্ত 'স্পেস্ ক্লাব' অর্থাৎ 'মহাকাশ সমিতির' সদস্য বলতে এই দু'টি দেশকেই বোঝাত। তারপর ১৯৬৫ সালে তৃতীয় সদস্য পদ পেল ফ্রান্স। তারা আকাশে ওড়াল 'আস্তেরিকস'। জাপান, চীন ও বৃটেনও এ ব্যাপারে পিছিয়ে রইল না। জাপানের 'ওস্‌সি' আকাশে উড়ল ১৯৭০ সালে। চীনও ঐ বছরই আকাশে তাদের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে দিল। পরের বছর বৃটেন মহাকাশে তুলল তাদের 'প্রস্‌পেরো'। তবে এদিক্ দিয়ে সোভিয়েৎ রাশিয়া ও আমেরিকার কৃতিত্বই যে সবচেয়ে বেশি এ কথাও তোমরা আগেই পড়েছ ছোটদের বিশ্বকোষের বিভিন্ন খণ্ডে—'মহাশূন্যের পথে' এই বিভাগটিতে। আশা করি সে কথা মনে আছে।

তারপর প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেল। স্পেস্ ক্লাবের নতুন সদস্য হ'ল ভারত ১৯৭৫ সালে। সে বছরই ১৯শে এপ্রিল তারিখে ভারতীয় সময় দুপুর একটায় ভারতের প্রায় চল্লিশজন বিজ্ঞানী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে মহাকাশে উঠিয়ে দেওয়া হ'ল ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট'। আগে যে ক'টি উন্নত দেশের কথা বলা হয়েছে তাদেরই সঙ্গে যুক্ত হ'ল ভারতের নাম। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা আর একবার বিশ্ববাসীর সামনে প্রমাণ করলেন যে বৈজ্ঞানিক যোগ্যতায় তাঁরা পৃথিবীর

অন্য কোনও দেশের চেয়ে হীন ন'ন। তা ছাড়া,
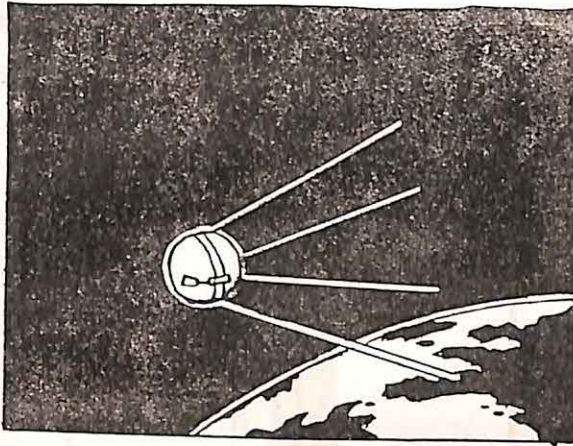
রাশিয়া থেকে মহাকাশে পাঠানো প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-১

অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় (নাসা) বেশ কিছু ভারতীয় বিজ্ঞানীও বেশ সুনাম ও সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে আসছিলেন দীর্ঘদিন ধরে।
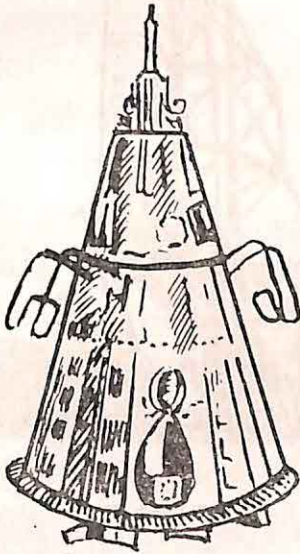
স্পুটনিক-৩—রাশিয়ার পাঠানো তৃতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরি আর্যভট্ট উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল রাশিয়ার কোনও একটি স্থান থেকে সোভিয়েৎ রকেটের সাহায্যে। কারণ, এত বড় উপগ্রহ মহাকাশে তুলে তাকে প্রয়োজনীয় গতিবেগ দিতে যে শক্তিশালী রকেটের প্রয়োজন সে রকম রকেট ভারতে তখনও তৈরি করা সম্ভব হয় নি। এ কথার মানে এই বলে ধরে নেবার কারণ নেই যে ভারত রকেট তৈরির ব্যাপারে খুব পিছিয়ে ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তার প্রায় বারো বছর আগে, অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে কেরলের থুম্বা নামক স্থান থেকে ভারতের প্রথম রকেট 'নাইক কাজন' আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। এ ব্যাপারে গবেষণার কাজও এগিয়ে চলছিল। তারপর এল সাফল্য। ১৯৮০ সালের ৮ই জুলাই ভারতের তৃতীয় উপগ্রহ
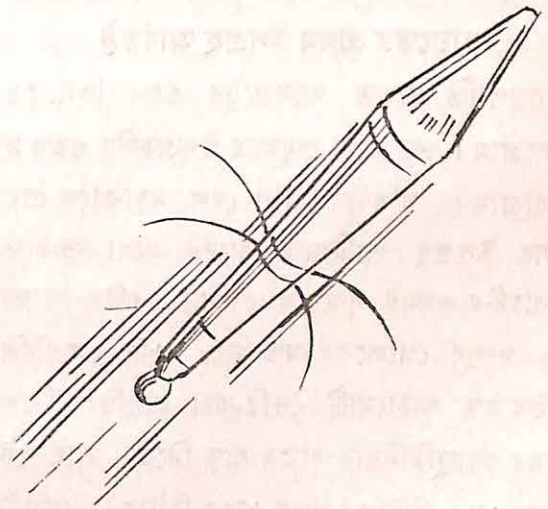
আমেরিকা থেকে মহাকাশে পাঠানো ১নং এক্সপ্লোরার

রোহিণী-১কে আকাশে ওড়াবার জন্যে আর বিদেশের সাহায্য নিতে হয় নি। ভারতে তৈরি চার-পর্যায়ের রকেট এস এল ভি-৩ এ-কাজটি সমাধান করেছে বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গেই। সে কথায় আমরা একটু পরে আসছি।

গ্রামগুলির কথা ভাবলে দুঃখ হয়। ওখানকার অনেক গ্রাম এখন ধীরে ধীরে ছোটখাট শহরের চেহারাও নিচ্ছে।
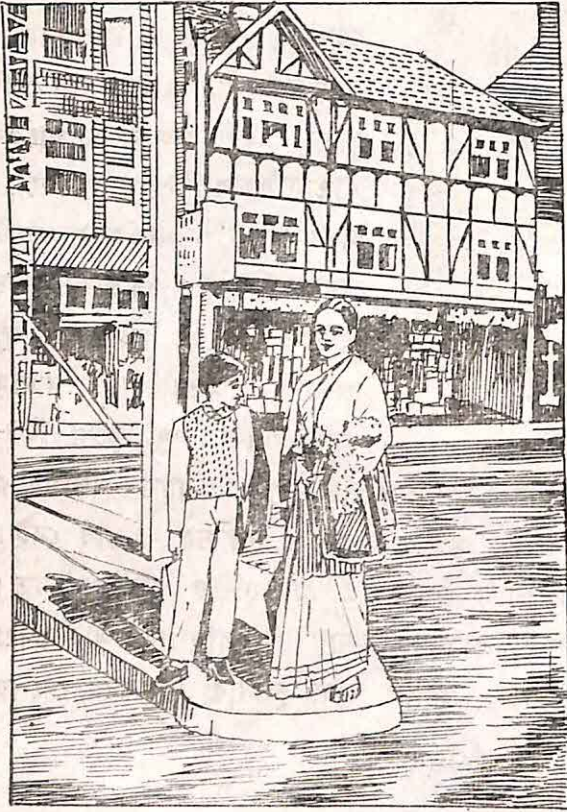
ইংল্যাণ্ডের একটি ছোট্ট শহর উইগানে
বাঙ্গালী মা ও তাঁর ছেলে

গ্রেট ব্রিটেনের পশ্চিমে এক ফালি সমুদ্রের ব্যবধানে রয়েছে আয়ারল্যাণ্ড দ্বীপ,—মালভূমি আর পাহাড়ে ভরা। আগে আয়ারল্যাণ্ড পুরোপুরি গ্রেট-ব্রিটেনেরই অধীন ছিল, কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামী আইরিশ জাত সে অধীনতা মানতে রাজী হয় নি। নানান্ ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি, যুদ্ধবিগ্রহের পর শেষে স্বাধীনতা আন্দোলনেরই জয় হ'ল। ১৯২৫ সালে সৃষ্টি হ'ল আইরিশ ফ্রী স্টেট এবং ১৯৩৭ সালে আয়ারল্যাণ্ডে প্রবর্তিত হ'ল পুরোপুরি স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র—যার এক নাম হ'ল আয়ার। এ ব্যাপারে আইরিশ নেতা ডি ভ্যালেরার অবদান স্বীকার করতেই হবে।

আয়ারল্যাণ্ড বা আয়ার যে স্বাধীন রাষ্ট্র তার পরিচয় মেলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। এই যুদ্ধে আয়ারল্যাণ্ড কোন দলের সঙ্গেই যোগ দেয় নি, ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

দেশটার আয়তন ২৭,১৩৬ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ৩০ লক্ষের মত। রাজধানী ডাবলিন। এদের চলতি ভাষা আইরিশ হলেও ইংরেজিই আসল ভাষা। বিখ্যাত নাট্যকার বার্নার্ড শ' এই আয়ারল্যাণ্ডেরই লোক।

আয়ারল্যাণ্ডে পৃথক্ পার্লামেণ্ট আছে, আছে প্রধানমন্ত্রী ও একজন প্রেসিডেণ্ট। পার্লামেণ্টে দু'টি সভা—পুরোপুরি নির্বাচিত ১৪৪ জনকে নিয়ে লোয়ার হাউস এবং সেনেট (আপার হাউস)—যার সদস্য-সংখ্যা ৬০।

আয়ারল্যাণ্ড প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ। যব, গম, আলু, বিট ইত্যাদির প্রচুর ফলন হয় এখানে। কিছু কিছু শিল্পবাণিজ্যও যে নেই তা নয়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

এবার আমরা ইয়োরোপ থেকে চলে আসছি আর একটি মহাদেশে—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়।

আমেরিকা বলতে অবশ্য উত্তর আমেরিকার খানিকটা অংশকেই মোটামুটি বোঝায়, যদিও সমস্ত দেশটা তা নয়; তবুও ঐ নামটাই চালু হয়ে গেছে।

পুরো নাম আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—ইউনাইটেড স্টেট্স্ অব আমেরিকা, সংক্ষেপে ইউ. এস. এ.।

আসলে কিন্তু ও-দেশটা ছিল ইংরেজদেরই একটা উপনিবেশ। ঐ বিরাট ভূখণ্ড আবিষ্কারের পর ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে একদল ইংরেজ গিয়ে ভার্জিনিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। তার পর ধীরে ধীরে বহু ভাগ্যান্বেষী ইংরেজ চলে আসতে থাকেন এই নতুন রাজ্যে। ১৮ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বহু ঔপনিবেশিক এইভাবে ঐখানে ছড়িয়ে পড়েন—নানা বাধাবিঘ্ন, বিপদ্-আপদ্ তুচ্ছ করে—নতুন রাজ্য গড়ার উৎসাহে।

বলা বাহুল্য ইংরেজ সরকারই তখন তাদের কর্তা। তারা দেখল, এই সমৃদ্ধিশালী দেশকে দোহন করে নিজেদের সম্পদ্ বাড়াবার এ তো একটা প্রকাণ্ড সুযোগ! বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে তখন নানা যুদ্ধ-বিগ্রহের পর অর্থের ভীষণ প্রয়োজন। নানাভাবে তারা ওদের পীড়ন করে ওদের সম্পত্তির ওপর ভাগ বসাতে শুরু করল। নানা রকম করভারে বিব্রত হয়ে পড়ল আমেরিকায় আসা ঔপনিবেশিকরা। শেষে যখন চায়ের ওপরও কর বসানো হ'ল এবং তা তুলে নিতে ইংরেজরা রাজী হ'ল না তখন ওরা গেল ক্ষেপে। ওরা বলল, ব্রিটীশ পার্লামেণ্টে আমাদের কোন জায়গা দেওয়া হয় নি, তবে কেন আমরা এসব উৎপাত সইব? একদল গরমপন্থী ঔপনিবেশিক একটি ব্রিটীশ জাহাজে চড়াও হয়ে সমস্ত চা-ভরা পেটি সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। ইংল্যাণ্ডও এর বদলা নেবার জন্য নতুন করে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করল আর সেই থেকেই শুরু হ'ল গণ্ডগোল।

ঔপনিবেশিকরা আর দেরী না করে নিজেদেরই একটা সৈন্যদল গঠন করে ফেলল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে জর্জ ওয়াশিংটন, জেফারসন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটনই হলেন প্রধান সেনাপতি। শুরু হ'ল ছোটখাট সংঘর্ষ। তারপর ১৩টি প্রাদেশিক ঔপনিবেশিক রাজ্য (স্টেট) একত্র হয়ে একদিন ঘোষণা করে বসল আমেরিকার পূর্ণ স্বাধীনতা। তারিখটা হচ্ছে ৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬। ঐ ১৩টি রাজ্য হচ্ছে ম্যাসাচুসেট্স্, নিউহ্যাম্পশায়ার, কানেক্‌টিকাট্, রোড্ আইল্যাণ্ড, নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, পেনসিলভ্যানিয়া, ডেলাওয়ার, মেরিল্যাণ্ড, ভার্জিনিয়া, ক্যারোলিনা, দক্ষিণ ক্যারোলিনা ও জর্জিয়া।

শুরু হ'ল আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম,—একেবারে সশস্ত্র লড়াই। ফরাসীরাও ওদের সাহায্য করতে লাগল। বেশ কিছুদিন হার-জিতের পর অবশেষে ব্রিটীশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি লর্ড কর্নওয়ালিস যুদ্ধে ইস্তফা দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন (১৯শে অক্টোবর, ১৭৮১)। ইংরেজ সৈন্যরা পাততাড়ি গোটাল। আমেরিকা পরিণত হ'ল পুরোপুরি স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। প্রথম রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্ট হলেন জর্জ ওয়াশিংটন।

এর পরই শুরু হ'ল ওর অগ্রগতি। নতুন নতুন রাজ্য এসে যোগ দিতে লাগল এই স্বাধীন রাষ্ট্রে। ১৯ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আকারে বেড়ে আটলাণ্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু এই সময় শুরু হ'ল একটা নতুন গণ্ডগোল। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে হ'ত প্রচুর তুলোর চাষ। এজন্য শ্রমিক হিসেবে এরা নিগ্রোদের ধরে এনে ক্রীতদাস করে রেখে তাদের দিয়ে চাষ চালাত। উত্তরের রাজ্যগুলিতে তুলোর চাষ হ'ত

ইতিমধ্যে ১৯৭৯ সালের ৭ই জুন ভারতীয় সময় বিকেল চারটেয় মহাকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতের দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ ভাস্কর-১। ভাস্করও আকাশে ওড়ানো হয়েছে রাশিয়ার একটি উৎক্ষেপণ স্টেশন থেকে রাশিয়ার একটি রকেটের সাহায্যে। কিন্তু তার পরেই ভারত দেখিয়ে দিয়েছে যে মহাকাশ অভিযানের ব্যাপারে ভারতের কৃতিত্ব কারো চেয়ে কম নয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন, তেমনি এ ক্ষেত্রেও ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের অন্যতম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে লিখেছিলেন, 'ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি!' এ যুগের ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তাঁরই উত্তরসাধক।

ভারতের প্রথম উপগ্রহ আর্যভট্ট

যন্ত্রপাতি সমেত আর্যভট্টের ওজন ছিল ৩৬০ কিলোগ্রাম। এর মধ্যে শুধুমাত্র উপগ্রহটির ওজন ৯০ কিলোগ্রাম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ মহাকাশে প্রথম যে-সব উপগ্রহ পাঠিয়েছে তাদের মধ্যে ভারতের উপগ্রহটির ওজনই সবচেয়ে বেশি। এটির আকার কিন্তু সম্পূর্ণ গোলকের মত নয়, ২৬টি তল-বিশিষ্ট বরফির মত কাঠামোটি তৈরি করা হয়েছিল বিশেষ ধরনের অ্যালুমিনিয়াম-সংকর ধাতু দিয়ে। আর্যভট্টের উচ্চতা ১·১৭ মিটার, ব্যাস ১·৫৫ মিটার। পৃথিবীর বিষুবতল থেকে ৫০·৪ ডিগ্রী হেলানো অবস্থায় এটি ঘুরতে শুরু করল পৃথিবীর চারিদিকে। এক একবার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসতে সময় লাগছিল ৯৬·৪১ মিনিট। তার মানে দৈনিক প্রায় ১৬ বার এটি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খেতে লাগল। পৃথিবীর কাছে যখন আসছিল তখন আর্যভট্টের দূরত্ব দাঁড়াচ্ছিল ৫৬৪ কিলোমিটার; আর যখন দূরে সরে যাচ্ছিল তখন দূরত্ব হচ্ছিল ৬২৩ কিলোমিটার। আকাশে উড়িয়ে দেওয়ার আগে হিসেব করা হয়েছিল যে এটি পৃথিবীর
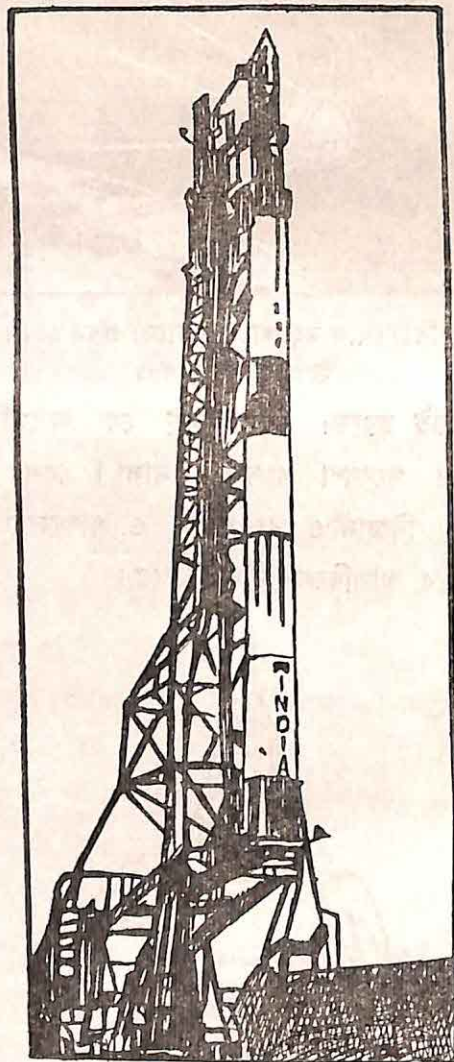
এস এল ভি-৩ রকেট

চারদিকে ঘুরতে থাকবে অন্তত দু'বছর ধরে। কিন্তু আর্যভট্ট যে ধ্বংস হয়ে গেছে সে খবর আমরা এখনও পাই নি। কে জানে, সে হয়তো এখনও, অর্থাৎ প্রায়

বছর দশেক পরেও, সমানে তার মহাকাশ পরিক্রমার কাজ করে চলেছে। (আর্যভট্টের ছবি ১৮১৬ পৃষ্ঠায়।)

এই উপগ্রহটির মধ্যে এমন সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে সেটি ৮০ মিনিট ধরে মহাকাশে যে-সব তথ্য সংগ্রহ করবে তা পৃথিবীর বুকে অবস্থিত গ্রাহক স্টেশনে ৮ মিনিটের মধ্যেই সরবরাহ করে দেবে। এর গ্রাহক স্টেশন ছিল দু'টি। তার একটি হ'ল দক্ষিণ ভারতে শ্রীহরিকোটায়, আর একটি মস্কোতে। শ্রীহরিকোটায় দৈনিক চারবার আর্যভট্টকে দেখা যাচ্ছিল—প্রতিবারে আট মিনিট সময় ধরে।

উপগ্রহটির মধ্যে কত বিচিত্র ধরনের যন্ত্রপাতিই না ছিল! কতকগুলোর কাজ মহাকাশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তা জমা করে রাখা, কতকগুলোর কাজ আবার যথাসময়ে সে-সব পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া। কোনও কোনও যন্ত্রের কাজ উপগ্রহটিকে ঠিক ঠিক পথে চালনা করা, কোনটার কাজ উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। সব কিছুই নিখুঁত ভাবে পরিচালিত হচ্ছিল ইলেকট্রোনিক ব্যবস্থার সাহায্যে। এত সব যন্ত্রপাতির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। উপগ্রহটির মধ্যে সৌর ব্যাটারী ছিল ১,৮০০ টি। এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে যতক্ষণ আর্যভট্ট সূর্যের আলোতে থাকবে ততক্ষণ এই সব ব্যাটারী আরো কতকগুলো ব্যাটারীকে কার্যক্ষম করে তুলতে পারবে। এর ফলে উপগ্রহটি যখন অন্ধকারে থাকবে তখনও সেখানে শক্তির কোনও ঘাটতি পড়তে পারবে না। এত সব যন্ত্রপাতির মধ্যে কিছু কিছু অবশ্য সরবরাহ করেছিল রাশিয়া। আর্যভট্ট তৈরি করতে সময় লেগেছিল আড়াই বছরেরও কম, খরচ পড়েছিল ৪.৩ কোটি টাকা।

আর্যভট্টের নামকরণ

ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে 'আর্যভট্ট'। কেন এই নামটি বেছে নেওয়া হ'ল? আর্যভট্ট ছিলেন প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ। বাংলায় আমরা আর্যভট্ট বললেও নামটি নাকি আসলে আর্যভাট। আর্যভট্টের জন্ম ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে পটালিপুত্রের কুসুমপুর নামক স্থানে, কর্মক্ষেত্র ছিল তাঁর আধুনিক পাটনায়।

আজ আমরা জানি, পৃথিবী ঘোরে সূর্যের চারদিকে বছরে একবার করে, আর আপন মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবী ঘুরপাক খায় প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার। ধারণাটার প্রবর্তন করেন নাকি গ্রীক জ্যোতির্বিদ্ অ্যারিসটারকাস (খৃঃ পূঃ ৩২০ থেকে ২৫০ সাল)। কিন্তু ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদির বিভিন্ন শ্লোকে বিষয়টার উল্লেখ আছে। তবে আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন আর্যভট্ট। তিনিই প্রথম বলেন, সূর্যই রয়েছে সৌর জগতের কেন্দ্রে, আর পৃথিবী সমেত অন্যান্য গ্রহরা ঘুরপাক খাচ্ছে সূর্যের চারদিকে।

আর্যভট্টের সময়ে ভারত

আর্যভট্ট যখন আবির্ভূত হ'ন তখন ভারতে চলছে সমুদ্রগুপ্তের শাসনকাল। সময়টা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি সর্ববিষয়ে ভারত তখন অতি উন্নত। সমুদ্রগুপ্ত নিজে ছিলেন কবি—কাব্যগ্রন্থ লিখে তিনি 'কবিরাজ' উপাধি পেয়েছিলেন। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হরিষেণের "এলাহাবাদ প্রশস্তি" থেকে জানা যায় যে বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধু সমুদ্রগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

ইতিহাসবিখ্যাত বিক্রমাদিত্য,—যাঁর রাজসভায় ছিলেন সর্বদেশের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি কালিদাস। তবে গণিতজ্ঞ আর্যভট্ট কোনও রাজপৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে ইতিহাসে কোনও খবর নেই।

আর্যভট্টের বয়স যখন ২৩ বছর তখন তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আর্যভট্টিয়। পৃথিবীর আবর্তন ছাড়া তিনি পৃথিবী, চাঁদ প্রভৃতির ব্যাস নির্ণয় করতে সমর্থ হন। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও তিনি দিয়ে গেছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া অঙ্কেও আর্যভট্টের দান নিতান্ত কম নয়। আধুনিক বীজগণিতের ভিত্তিও রচনা করেন আর্যভট্ট। তিনিই প্রথম দ্বিঘাত এবং অন্যান্য সমীকরণের সমাধান করেন। ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধেও তাঁর অবদান রয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রে শূন্যের গুরুত্ব অনেকখানি। শূন্য আবিষ্কার ভারতীয় গণিতজ্ঞদেরই অবদান। এ সম্বন্ধেও আর্যভট্টের নাম আছে। উঁচু পর্যায়ের অঙ্কে 'পাই' (π) নামে একটি স্থির সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। চার দশমিক স্থান পর্যন্ত পাই-এর মান বার করেন আর্যভট্ট। সবদিক্ দিয়ে বিচার করলে বলা যায়, প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে আর্যভট্টের স্থান অতি উঁচুতে।

নামকরণের কথা শুনতে শুনতে কৃত্রিম উপগ্রহ কি করে আকাশে পাঠানো হয় আর কেনই বা তা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খায় সে কথা তোমাদের মনে আছে কিনা একবার ঝালিয়ে নিও। ছোটদের বিশ্বকোষ ১ম খণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ২৯২-২৯৮)। আর একটা কথা, কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে তুলে তাকে প্রয়োজন মত গতি দিতে সাধারণত ধাপে ধাপে তিন পর্যায়ের রকেট ব্যবহার করা হয়। ভারত কিন্তু প্রথম যে উপগ্রহটিকে ভারতের বুক থেকে সরাসরি মহাকাশে পাঠিয়েছিল সেই রোহিণী-১এর বেলায় ব্যবহার করেছিল চার পর্যায়ের এস এল ভি-৩ রকেট।

মহাকাশে ভাস্কর-১

৭ই জুন, ১৯৭৯। ভারতীয় সময় বিকেল ৪টে। মহাকাশে উড়িয়ে দেওয়া হ'ল ভারতের দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ ভাস্কর-১। আর্যভট্টের মত ভাস্করও তৈরি হয়েছিল ভারতে, তৈরি করেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী, এঞ্জিনীয়ার এবং কারিগরেরা। তারপর সেটি নিয়ে যাওয়া হয় রাশিয়ায়। সেখানকার একটি কসমোড্রাম বা উৎক্ষেপণ স্টেশন থেকে রাশিয়ায় তৈরি রকেটের
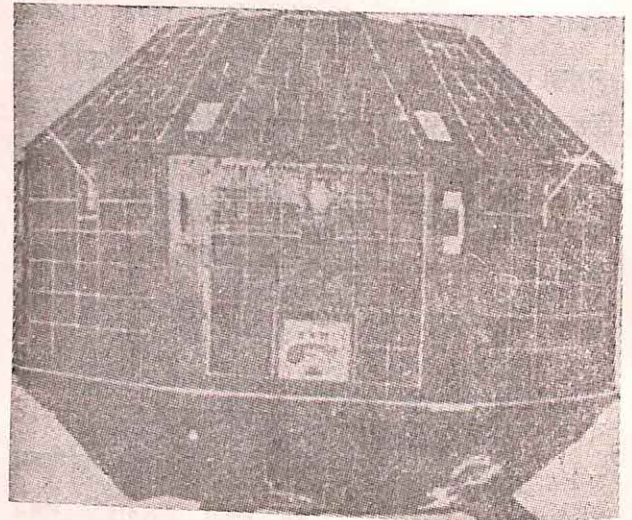
ভারতের তৈরি দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ ভাস্কর-১

সাহায্যে ভাস্করকে আকাশে তুলে, নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠিয়ে, নির্দিষ্ট গতিবেগ দিয়ে তাকে চালিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ভাস্কর প্রতি ৯৫'২ মিনিটে একবার করে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসতে থাকে। ভাস্করের

সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার কাজ করে ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র আমেদাবাদের শ্রীহরিকোটা। ভাস্করের যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক মত চালু রাখা, যথাযথ নির্দেশ দেওয়া, ভাস্কর যে-সব খবর ও ছবি পাঠাচ্ছে তা গ্রহণ করা—সব রকম কাজই করা হয় এখান থেকেই। তা ছাড়া আরও দু'টি স্টেশন,—ভারতের বাঙ্গালোর এবং রাশিয়ার বিয়ার্স লেকের মহাকাশ-কেন্দ্রেও ভাস্করের খবরাখবর রাখার ব্যবস্থা হয়।

শ্রীহরিকোটা থেকে ভাস্করের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য বিশেষ ধরনের অ্যান্টেনা

যন্ত্রপাতিসমেত ভাস্করের ওজন ৪৪৪ কিলোগ্রাম। পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসবার সময়ে পৃথিবী থেকে ভাস্করের দূরত্ব কখনো ৫৫৭ কিলোমিটার, কখনো বা ৫১২ কিলোমিটার। বিষুবরেখার সঙ্গে ৫০˙৭ ডিগ্রি কোণ করে এটি ঘুরতে থাকে। ভাস্করের মধ্যে নানা ধরনের আধুনিক সব যন্ত্রপাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু'টি টেলিভিশন ক্যামেরা আর তিনটি অতি শক্তিশালী রেডিও-ট্রান্সমিটার যন্ত্র। টেলিভিশন ক্যামেরা দু'টির কাজ পৃথিবীপৃষ্ঠের ৩২৫ কিলোমিটার পরিমিত জায়গার ছবি তুলে তা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। তা ভাস্কর এ কাজ ভালো ভাবেই করতে পেরেছে। এই লেখার সময় পর্যন্ত চারশ'রও বেশি চমৎকার আলোকচিত্র সে পাঠিয়েছে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের এক বিস্তৃত এলাকার। ছাড়ার পর এক বছরের মত চুপচাপ থাকার পর ভাস্করের অন্য একটি টেলিভিশন ক্যামেরাও ছবি পাঠাতে শুরু করেছে। সেও দৈনিক দশটি করে ছবি পাঠিয়ে যাচ্ছে।

কে এই ভাস্কর ?

ভারতের দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহের নাম ভাস্কর-১ কেন দেওয়া হ'ল? কোথা থেকে নেওয়া হ'ল এই নামটি ?

প্রাচীন ভারতে আমরা দু'জন ভাস্করাচার্যের সন্ধান পাই। এঁরা দু'জনেই খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ। প্রথম ভাস্করাচার্য ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক। অস্মক দেশে এঁর জন্ম। অস্মকদেশ সম্ভবত অন্ধ্র-প্রদেশের নিজামাবাদ জেলা। ইনি আচার্যের কাজ করতেন লল্লভীতে। প্রাচীন লল্লভী আজকের সৌ-রাষ্ট্রের কাথিয়াবাড় জেলায়। জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত সম্বন্ধে প্রথম ভাস্করাচার্যের কয়েকখানা গ্রন্থ রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের জন্ম ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটকের বিজাপুরে। এঁর বাবার নাম মহেশ দৈবজ্ঞ। ভারতীয় গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের নাম সবচেয়ে বেশি। ঘন জ্যামিতি, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যা, দ্বিঘাত সমীকরণ, শূন্য প্রভৃতি নিয়ে ইনি প্রচুর গবেষণার কাজ করেছেন। তা ছাড়া সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ, গ্রহদের গতিবিধি, এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের আরও বহু বিষয় নিয়ে মূল্যবান্ অবদান রেখে গেছেন ইনি। এঁর রচিত সব চেয়ে নামকরা গ্রন্থ হ'ল 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি'। গ্রন্থখানা চারভাগে বিভক্ত—লীলাবতী, বীজগণিত, গ্রন্থগণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায়।

লীলাবতী অধ্যায়টির নামকরণ করা হয়েছে ভাস্করাচার্যের বিদুষী কন্যা লীলাবতীর নাম অনুসারে। অকালে বিধবা হয়েছিলেন লীলাবতী; কন্যার প্রতি স্নেহবশত সিদ্ধান্ত শিরোমণির একটি অধ্যায়ের নাম রাখা হ'ল লীলাবতী। অনেকে বলেন, লীলাবতী নিজেই নাকি এ অধ্যায়টি রচনা করেছিলেন। লীলাবতীর বৈধব্য সম্বন্ধে যে কাহিনীটি প্রচলিত সেটি হয়তো অনেকেরই জানা।

আকাশপথে রোহিণী-১

১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই, শুক্রবার। সকাল আটটা বেজে পাঁচ মিনিটে মহাকাশে উড়িয়ে দেওয়া হ'ল ভারতের তৃতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ রোহিণী-১। সময় লাগল মাত্র আট মিনিট। মহাকাশে উঠে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খেতে লাগল রোহিণী-১।

আর্যভট্ট ও ভাস্কর-১ আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল রাশিয়ার একটি উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে। রোহিণী-১এর ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। এটি আকাশে পাঠানো হ'ল শ্রীহরি-কোটায় অবস্থিত ইণ্ডিয়ান স্পেস্ রিসার্চ অরগানিজেশনের উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে। মহাকাশ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের গবেষণার কাজ চালাবার জন্যে এই সংস্থাটির পত্তন হয় ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। ত্রিবান্দ্রামের কাছে থুম্বায় প্রথম স্থাপিত হয় উপগ্রহ-উৎক্ষেপণ কেন্দ্রটি। সেখান থেকে সেটি সরিয়ে নেওয়া হয় শ্রীহরিকোটায় ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে।
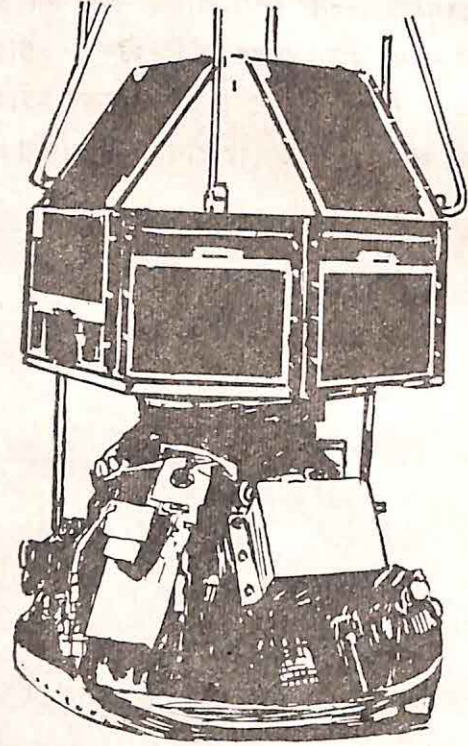
রোহিনী-১
এটিকে মহাকাশে তোলা হয়েছিল ভারতেরই শ্রীহরিকোটা থেকে।

রোহিণীকে মহাকাশে ওঠানো হয়েছে ভারতে তৈরি চার-পর্যায় রকেট এস এল ভি-৩-এর সাহায্যে, সে কথা তো আগেই বলেছি।

রোহিণী-১এর ওজন পঁয়ত্রিশ কিলোগ্রাম। এটিকে যান্ত্রিক পরীক্ষামূলক উপগ্রহ বলা যেতে পারে। রোহিণীর কার্যকলাপ ভবিষ্যতে মহাকাশে উপগ্রহ পাঠাবার সব কিছু সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করবে, প্রভাব বিস্তার করবে মহাকাশ গবেষণার

বিভিন্ন যান্ত্রিক পদ্ধতির উপর। রোহিণীর যাত্রাপথের উপর নজর রাখছেন শ্রীহরিকোটা, কার নিকোবর, ত্রিবান্দ্রাম এবং আমেদাবাদের বিজ্ঞানীরা।

রোহিণী-১ নিজের অক্ষের উপর পাক খাচ্ছে প্রতি মিনিটে ১৬৫ বার করে, পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে সময় নিচ্ছে ৯৭ মিনিট। পৃথিবীর চারদিকে তার ঘুরবার পথটি উপবৃত্তাকার। সে যখন পৃথিবীর কাছে এগিয়ে আসছে পৃথিবী থেকে তখন তার দূরত্ব দাঁড়াচ্ছে ৩২৫ কিলোমিটার, আর যখন দূরে সরে যাচ্ছে তখন তার দূরত্ব হচ্ছে ৯৫০ কিলোমিটার। রোহিণীর গড় গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে সাড়ে সাত কিলোমিটার।

রোহিণী কেমন করে মহাকাশে যাত্রা করল তার একটু বর্ণনা দিলে হয়তো তোমাদের ভালোই লাগবে।

রকেটের জ্বালানীতে অগ্নিসংযোগ করবার পর রকেটটিকে মিনিট খানেক খালি চোখেই দেখা যাচ্ছিল। তারপর শুধু ধোঁয়া ছেড়ে তীরবেগে এগিয়ে চলল সেই রকেট মহাকাশের পথে। ত্রিশ কিলোমিটার উঁচুতে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হ'ল, তারপর কাজ শুরু করল দ্বিতীয় পর্যায়। নাকের ডগায় রোহিণীকে নিয়ে রকেটের দ্বিতীয় পর্যায় পৌঁছে গেল ৭২ কিলোমিটার উঁচুতে, সময় লাগল ১১৮ সেকেণ্ড। খসে পড়ল রকেটের দ্বিতীয় পর্যায় তার কাজ শেষ করে। তৃতীয় পর্যায় রোহিণীকে পৌঁছে দিল প্রায় ২৭৬ কিলোমিটার উঁচুতে ১৬৫ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে। এখানে তারও কাজ শেষ হ'ল। এবারে চতুর্থ পর্যায়। এর কাজ হ'ল রোহিণীকে পাক খাইয়ে নির্দিষ্ট গতিবেগ দেওয়া পৃথিবীর সমান্তরালভাবে। নিখুঁত ভাবে সেও তার কর্তব্য পালন করে যথাসময়ে বিদায় নিল মহাকাশের আঙ্গিনা থেকে। এবার রোহিণী-১ একা মহাকাশ পরিক্রমার কাজ শুরু করে দিল। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বললেন, এ ভাবে রোহিণী-১ কাজ করে যাবে কম পক্ষে ৯০০ দিন।

রোহিণী নামটি কেন দেওয়া হ'ল ?

আমাদের পুরাণের গল্পে আছে চন্দ্রদেবের সাতাশটি স্ত্রী ছিলেন—সাতাশটি তারা। রোহিণী তাঁদেরই একজন। কৃত্তিকা, ভরণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা প্রভৃতি আমাদের পরিচিত তারাগুলি রোহিণীরই সতীন। এঁরা সকলেই দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। দক্ষেরই সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সতী—দেবাদিদেব মহাদেবের ঘরণী। পৃথিবীর লীলা সাঙ্গ করে চন্দ্রের স্ত্রীরা নাকি আকাশে নক্ষত্ররূপে অমর হয়ে রয়েছেন। এই ভাবে কল্পনা করে নিয়েই এই সব নক্ষত্রদের নামকরণ হয়েছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও জন্মগ্রহণ করেছেন রোহিণী নক্ষত্রে। তবে এ রোহিণী অন্য রোহিণী। ইনি বলরামের মা ন'ন, তিনি বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী।

মহাকাশে রোহিণী-২

প্রথম রোহিণী মহাকাশে ওড়াবার প্রায় দশ মাস পরে, ১৯৮১ সালের ৩১শে মে দ্বিতীয় রোহিণী উপগ্রহটি মহাকাশে পাঠানো হ'ল। এবারেও এ কাজে সাফল্য এনে দিল এস. এল. ভি.-৩ রকেট। সাততলা বাড়ির সমান উঁচু এই রকেটটি দৈর্ঘ্যে ত্রিশ মিটার। দ্বিতীয় রোহিণী ৯৫ মিনিটে একবার করে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে লাগল। শ্রীহরিকোটা, কার নিকোবর, থুম্বা এবং আমেদাবাদের মহাকাশ-কেন্দ্র থেকে রোহিণীর বেশ জোরালো সংকেত পাওয়া যাচ্ছিল। আশা করা গিয়েছিল এ রোহিণীর আয়ু

হবে নব্বই দিন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, মাত্র ন'দিনের মাথায়ই রোহিণী-২এর আয়ু শেষ হয়ে গেল। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে শেষের দিকে রোহিণীর নানা অংশের উষ্ণতা বেড়ে গিয়েছিল। কারণ সে সম্ভবত পৃথিবীর দিকেই এগিয়ে আসছিল। যে কারণেই হোক না কেন, দ্বিতীয় রোহিণীর অকালমৃত্যুই ঘটে গেল, সেই সঙ্গে যে-সব উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে পাঠানো হয়েছিল সে-সবেরও।

যোগাযোগ উপগ্রহ অ্যাপ্‌ল্‌

রোহিণী-২-এর অসাফল্যের পর মাস খানেক সময়ও কাটল না, মহাকাশে উড়ল ভারতের প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ অ্যাপ্‌ল্‌। ১৯৮১ সালের
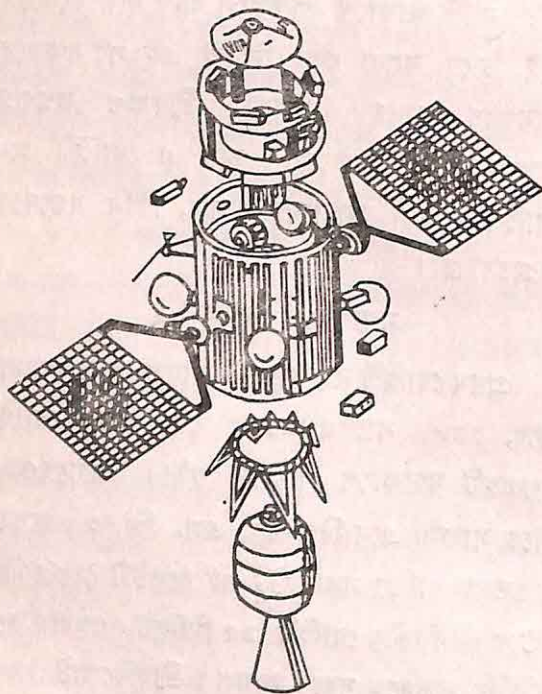
ভারতের প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ অ্যাপ্‌ল্‌

১৩ই অগাস্ট একটি চমৎকার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অ্যাপ্‌ল্‌কে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল একই সময়ে দিল্লী ও আমেদাবাদে। প্রধান মন্ত্রী সহ সে-সময়কার কয়েক-জন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন দিল্লীর অনুষ্ঠানে, আর মহাকাশ সংস্থার বিজ্ঞানীরা হাজির ছিলেন আমেদাবাদের অনুষ্ঠানে। এর সব কিছুই সরাসরি দেখানো হ'ল টেলিভিশনের পর্দায়—একই সঙ্গে দিল্লী, মাদ্রাজ, পুনে, বোম্বাই, কলকাতা, বাঙ্গালোর ও মুসৌরীর দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে। আর এর সব কিছুই করা হ'ল ঐ অ্যাপ্‌ল্‌-এরই মাধ্যমে।

অ্যাপ্‌ল্‌ নামটি কিন্তু আসলে একটা সংক্ষিপ্ত-করা নাম। অ্যাপ্‌ল্‌-এর পুরো নাম অ্যারিয়ান প্যাসেঞ্জার পে-লোড এক্সপেরিমেন্ট। ইংরেজি এক-একটি শব্দের প্রথম অক্ষর নিয়েই অ্যাপ্‌ল্‌ নামের সৃষ্টি। এর ওজন ৬৭৫ কিলোগ্রাম। প্রথমে অ্যাপ্‌ল্‌ উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছিল, সময় নিচ্ছিল প্রতিবারে দশ ঘণ্টা। তারপর এর গতিপথ বদলে বৃত্তাকার করা হয়। সে তখন পৃথিবী থেকে ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে থেকে এমন গতিতে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকে যাতে তাকে পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হবে স্থির।

অ্যাপ্‌ল্‌-এর পরিকল্পনা, কারিগরি খুঁটিনাটি, এর বৈজ্ঞানিক দক্ষতা—সব কিছুই আমাদের বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ্‌দের নৈপুণ্য ও দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। অ্যাপ্‌ল্‌কে মহাকাশে ওঠানো হয়েছিল ইয়োরোপীয় মহাকাশ সংস্থার অ্যারিয়ান রকেটের সাহায্যে দক্ষিণ আমেরিকার ফরাসী গায়নার কুরু দ্বীপ থেকে।

অ্যাপ্‌ল্‌কে মহাকাশে ওড়ানো হয়েছিল ১৯৮১ সালের ১৯শে জুন ভারতীয় সময় সন্ধ্যে ৬টা বেজে ৩ মিনিটের সময়।

ভাস্কর-২ ও ইনস্যাট-১এ

১৯৮১ সালের ২০শে নভেম্বর। রাশিয়ায় তৈরি ইনটার-কসমস্ রকেটে চড়ে ভারতের ভাস্কর-২ উপগ্রহটি মহাকাশে উড়ল এবং তার নির্ধারিত কাজকর্ম সমাধা করল। কিন্তু এরপর একই সঙ্গে চরম সাফল্য এবং কয়েক মাস পরে চরম ব্যর্থতা দেখা দিল ইনস্যাট-১এ উপগ্রহটিকে ঘিরে।
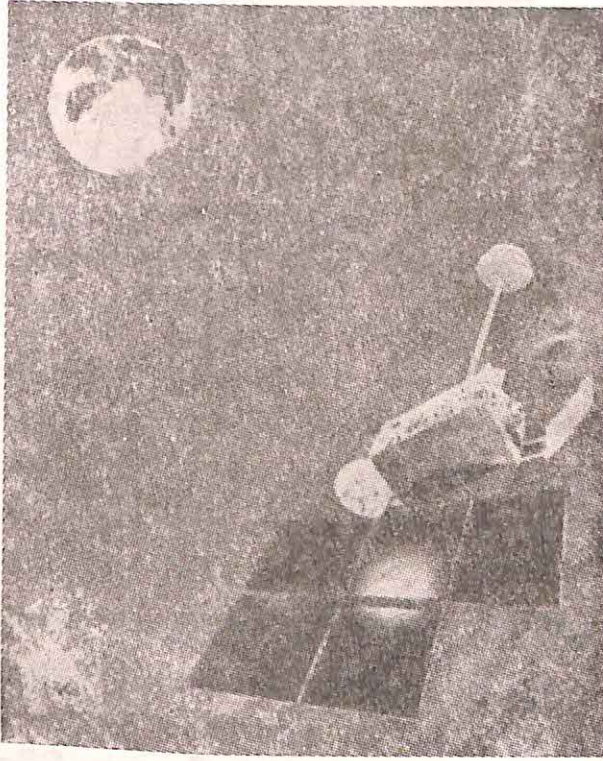
ভারতের ইনস্যাট-১এ

১৯৮২ সালের ১০ই এপ্রিল ইনস্যাট-১এ-কে মহাকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কাজটি করা হয়েছিল আমেরিকার সাহায্য নিয়ে কেপ ক্যানাভেয়াল থেকে। এর পরমায়ু থাকার কথা সাত বছর। কিন্তু ভাগ্য খারাপ! বিজ্ঞানীদের হাতে তৈরি এত সাধের ইনস্যাট-১এ মাত্র পাঁচ মাসেরও কম সময়ের মধ্যেই তার আয়ু শেষ করল। এ হেন দুর্ঘটনার জন্যে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না।

এত সাধের বলবার কারণ ছিল। বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খুব জটিল এবং নিখুঁত যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল ইনস্যাট-১এ। এটি দিয়ে তিন ধরনের কাজ করার কথা ছিল—দূরদর্শনের কর্মসূচী প্রচার, টেলি-যোগাযোগ এবং আবহাওয়া সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য প্রেরণ। বলে রাখা ভালো, উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতই সর্বপ্রথম এ কাজে হাত দিয়েছিল। আমেরিকার মহাকাশ সংস্থা নাসার ডেলটা রকেটের সাহায্যে এটিকে আকাশে ওড়ানো হয়েছিল। অনেক আশা ছিল ইনস্যাট-১এ সম্বন্ধে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব কিছুই ব্যর্থতায় পরিণত হ'ল। ৭০ কোটি টাকা গেল জলে। অবশ্য নিষ্প্রাণ, নীরব, নিথর ইনস্যাট-১এ মহাকাশে থাকবে কম করে আরও হাজার বছর।

মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এত বড় আঘাত এর আগে পান নি।

আমরা জানি, বিজ্ঞানসাধনার পথে গোলাপ ফুল বিছানো থাকে না। সে পথ কাঁটায় ভরা। আঘাত যত তীব্র হয় বিজ্ঞানীর মনের দৃঢ়তা ততই বেড়ে যায়, বাধা অতিক্রম করবার শক্তি বেড়ে যায় দশগুণ। এ কথার সার্থকতা আমরা দেখতে পাই ইনস্যাট-১বি-এর ক্ষেত্রে।

ইনস্যাট-১বি

ইনস্যাট-১এ-র ক্ষেত্রে যে সব দোষত্রুটি ছিল সে সব ভালোভাবে শুধরে নিয়ে ১৯৮৩ সালের অগাস্ট মাসে মহাকাশে উড়িয়ে দেওয়া হ'ল ইনস্যাট-১বি। এ উপগ্রহটিও অনেকগুলো উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠানো

হ'ল। মহাকাশে উঠিয়ে দেওয়ার কাজটি করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস-শাটল চ্যালেঞ্জার। আগের চেয়ে এতে খরচ পড়ল কম।

আশার কথা সেই ১৯৮৩ সালের ৩০শে অগাস্ট থেকে ইনস্যাট-১বি নির্ভুলভাবে তার কাজ করে চলেছে এখনও পর্যন্ত।

এর মধ্যে ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে আর একটা দামী কাজ করেছেন আমাদের বিজ্ঞানীরা। আটতলা বাড়ির সমান উচুঁ চারস্তরের এস এল ভি-৩ রকেট মহাকাশে উড়িয়ে দিয়েছে আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ, নাম রোহিণী-ডি-২। এটি একটি ছোট্ট উপগ্রহ, ওজন মাত্র ৪১.৫ কেজি।

মহাকাশে প্রথম ভারতীয়

১৯৮৪ সালের ৩রা এপ্রিল। রাশিয়ার মহাকাশ-জাহাজ সয়ুজ টি-১১ সেদিন পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশে পাড়ি দেয়। জাহাজটিতে ছিলেন তিনজন আরোহী —রাশিয়ার ম্যালিশেভ ও স্ট্রেকালভ, আর তৃতীয় জন একজন ভারতীয়,—স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা। হায়দারাবাদের ছেলে রাকেশ ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম মহাকাশ-ভ্রমণকারী হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করলেন।

রাশিয়ার আর একটি মহাকাশ গবেষণা-স্টেশন স্যালিউট-৭ ১৯৮২ সালের এপ্রিল মাস থেকে মহা-কাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার মধ্যে ছিলেন তিনজন মহাকাশচারী—লিওনিদ কিজিম, ভ্লাদিমির সালভিয়ভ ও ওলেভ আটকভ। গবেষণা-স্টেশনটি পৃথিবী থেকে ২৮০ কিলোমিটার দূরে থেকে ৯০ মিনিটে একবার করে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলছিল সেই ১৯শে এপ্রিল থেকে। মহাকাশে উঠেই সয়ুজ টি-১১ তার তিন যাত্রী নিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণের কাজ শুরু করে দেয়। ৪ঠা এপ্রিল রাত ৮টা ২ মিনিটে সয়ুজ গিয়ে মিলিত হয় স্যালিউটের সঙ্গে। সেদিন রাত বারোটায় দুই মহাকাশ-জাহাজের

প্রথম ভারতীয় মহাকাশযাত্রী রাকেশ শর্মা

যাত্রীরা স্যালিউটে বসে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেন।

কেটে গেল একে একে সাতটি দিন। এই সাত দিনে রাকেশ তাঁর রাশিয়ার সহকর্মীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বহু ধরনের গবেষণার কাজ করেলেন। তারপর তাঁরা স্যালিউটের তিন বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন তাঁদের নিজেদের মহাকাশ-জাহাজে। তারপর পৃথিবী প্রত্যাবর্তন। তারিখটা ১১ই এপ্রিল।

এখানে আর একটা কথা বলা দরকার। রাকেশ শর্মার সঙ্গে আরও একজন ভারতীয়,—রবীশ

মালহোত্রাও মহাকাশভ্রমণের উপযোগী সব রকম শিক্ষা শেষ করেছিলেন। কথা ছিল ঐ দু'জনের যে-কোনও একজনকে প্রথম ভারতীয় মহাকাশযাত্রী হিসেবে বেছে নেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত রাকেশের ভাগ্যেই জুটল সেই পরম সম্মান লাভের সুযোগ।

এস এল ভি-৩ রকেট

আগেই বলা হয়েছে রোহিণী-১কে আকাশে ওঠানো হয়েছে ভারতে তৈরি চার-পর্যায়যুক্ত এস এল ভি-৩ রকেটের সাহায্যে। এই বিশেষ ধরনের রকেট তৈরির কৃতিত্ব ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি-বিদ্‌দের। এই রকেটের প্রথম দুই পর্যায় তৈরি করা হয়েছে বিশেষ ধরনের ধাতুর পাত দিয়ে, আর তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায় তৈরি করা হয়েছে ফাইবার গ্লাস দিয়ে—যাকে আমরা বলি কাচতন্তু। বলা বাহুল্য, এটি তৈরি করতে অতি উঁচুস্তরের অঙ্কের হিসেব, নিখুঁত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং উঁচু পর্যায়ের যান্ত্রিক কলাকৌশলের দরকার। এই রকেটের চারটি পর্যায়ই একে অন্যের পরিপূরক।

চার পর্যায়ের এই রকেট তৈরি করতে সময় লেগেছে দশটি বছর। এই রকেটের হাজার হাজার যন্ত্রাংশ তৈরি এবং তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে ত্রিবান্দ্রামের বিক্রম সারাভাই স্পেস সেণ্টারে। সাত বছরের চেষ্টায় প্রথমে যে রকেটটি তৈরি করা হ'ল ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অগাস্ট তা আকাশে ওঠাবার চেষ্টা করা হ'ল, কিন্তু রকেটের দ্বিতীয় পর্যায় কাজ করল না। ছাড়ার কিছু সময়ের মধ্যেই সেটি ভেঙ্গে পড়ল সাগরের জলে। হাল ছাড়লেন না বিজ্ঞানীরা, ভেঙ্গে পড়লেন না প্রযুক্তিবিদ্‌রা। চলল নতুন উদ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ। তারপর এল সাফল্য। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই এস এল ভি-৩ রোহিণী-১কে আকাশে উড়িয়ে দিল।

এস এল ভি-৩ কত উঁচু? তা, একটা সাততলা বাড়ির সমান তো বটেই! ২২·৭ মিটার। এর

রবীশ মালহোত্রা

নীচের দিক্‌কার ব্যাস এক মিটার। এ রকেটে ব্যবহার করা হয়েছে কঠিন জ্বালানী। চার পর্যায়ের এস এল ভি-৩ রকেট ব্যবহারের আগে সাধারণত তিন পর্যায়ের রকেট ব্যবহার করা হ'ত কৃত্রিম উপগ্রহদের মহাকাশে ওড়াবার কাজে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে লণ্ডন শহরের উপর নিক্ষিপ্ত যে জার্মান ভি-২ বা 'ভি-টু' রকেট লণ্ডনবাসীদের ত্রাসের সঞ্চার করেছিল সেই ভি-২ রকেটের অনুকরণেই এ যুগের রকেট তৈরি করা হচ্ছে।

কত খরচ পড়ে এ সব কাজ করতে ?

আর্যভট্টের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরি করতে সময় লেগেছিল প্রায় আড়াই বছর, খরচ পড়েছিল ৪˙৩ কোটি টাকা। ভাস্কর-১ তৈরি করতে ব্যয় হয়েছে

তিন পর্যায়ের রকেট

৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। রকেট সমেত রোহিণী-১কে আকাশে ওঠানোর পেছনে খরচ কুড়ি কোটি টাকা। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের চতুর্থ উপগ্রহ অ্যাপ্‌ল্ আকাশে ওঠানোর তখন তোড়জোড় চলছিল। এতেও বেশ কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে, তা— প্রায় সাড়ে ষোল কোটি টাকার মত। ইনফরমেশন স্যাটেলাইট (ইনস্যাট) বানাতে আমাদের খরচ হয়েছে ৬৮ কোটি টাকা। একমাত্র চ্যালেঞ্জারের সাহায্যে ইনস্যাট-১বি আকাশে ওড়াতেই খরচ হয়েছে ১০ কোটি টাকা।

একক ভাবে বিচার করলে ভারতের মত গরীব দেশে এত টাকা খরচ করাটা যেন অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হচ্ছে। কিন্তু সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টা বিচার করতে হবে। জাতীয় আয়ের দিক্ দিয়ে বিচার করলে এ জাতীয় খরচকে সামান্যই মনে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে একখানা বোয়িং-৭০৭ বিমানের দাম সাড়ে তিন কোটি টাকা! তা ছাড়া জাতির পক্ষে কৃত্রিম উপগ্রহের হিতকর দিক্‌টার কথাও ভুললে চলবে না।

কি উপকার করবে কৃত্রিম উপগ্রহ ?

একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসে। এত টাকা খরচ করে কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উড়িয়ে কোন্ উপকার সাধিত হবে আমাদের দেশের? এক কথায় বলা চলে, এই সব পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দেশকে সব দিক্ দিয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়া। আজকের দিনে আমাদের দেশের অনেক সমস্যার সমাধানই খুঁজে বার করতে পারবে এই কৃত্রিম উপগ্রহ। কৃষি, খনিজ সম্পদ্, বেতার যোগাযোগ, শিক্ষা, আবহাওয়ার নানা খবরাখবর প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে কৃত্রিম উপগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি। আবহাওয়া সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করে সে-সব কৃষির উন্নতির ও নৌ এবং বিমান চলাচল

প্রভৃতির কাজে লাগানো যেতে পারে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা ট্রানসিট এবং টাইরস নামে ছ'টি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছিল। এর মধ্যে একা টাইরসই উচ্চাকাশের মেঘমণ্ডলের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েক হাজার ছবি পৃথিবীতে পাঠাতে সমর্থ হয়েছিল। এর ফলে বৃষ্টি, খরা প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যগুলির সাহায্যে কৃষি-কাজের প্রচুর উন্নতিলাভ সম্ভব হয়েছে। এ জাতীয় তথ্য থেকে এক বছর পরেও আবহাওয়ার অবস্থা কি রকম হবে তা জানা গেছে এবং তা থেকে যে কোনও অঞ্চলের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

আমেরিকায় 'এজেন্সী ফর ইনটারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট' নামে একটি সংস্থা আছে। পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলিতে উন্নত ধরনের কৃষিব্যবস্থায় সাহায্য করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুব্যবস্থা করে তা জনগণের হিতে কাজে লাগানোই এই সংস্থাটির কাজ। এ সব কাজে সংস্থাটিকে প্রধানত নির্ভর করতে হয় তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহের উপর। এ তিনটি উপগ্রহের নাম 'ল্যাণ্ডস্যাটস্'। এদের আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ১৯৭২, ১৯৭৫ এবং ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। এরা বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক সম্পদ্ সম্বন্ধে খবর এবং ছবি সংগ্রহ করে কখনও সে-সব সরাসরি পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়, কখনও বা উপগ্রহের ভেতরকার টেপ রেকর্ডারে জমা করে রাখে। তারপর উপগ্রহটি যখন পৃথিবী থেকে ২,৭০০ কিলোমিটার ব্যবধানের মধ্যে এসে হাজির হয় তখন সে-সব জমা-করা খবর পাঠিয়ে দেয় পৃথিবীর নির্দিষ্ট গ্রাহক স্টেশনে। গ্রাহক স্টেশনগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে তিনটি, ক্যানাডায় ছ'টি এবং ব্রেজিল, ইটালী, ইরান, ভারতবর্ষ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে একটি করে স্টেশন বর্তমান। এ-সব উপগ্রহ

থেকে পাওয়া খবর নানাভাবে কৃষির উন্নতির কাজে লাগছে। কৃষিকাজ ছাড়া ভূ-ত্বকের গঠন, মরুভূমির প্রসার রোধ, নদীর গঠন, পৃথিবীর বুকে লুকানো খনিজ সম্পদ্ খুঁজে বার করা প্রভৃতি হাজারো রকম কাজে ল্যাণ্ডস্যাটগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে।

আর এক ধরনের উপগ্রহ রয়েছে যাদের সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হয়ে থাকে। এদের এক কথায় বলা হয় কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট। এ ধরনের উপগ্রহের সাহায্যে উন্নত ধরনের টেলিফোন ও টেলিভিশন যোগাযোগ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। হিসেবে দেখা যায় যে ভূপৃষ্ঠ থেকে ২২,৫০০ মাইল উঁচুতে যদি একটি উপগ্রহ স্থাপন করা সম্ভব হয় তবে সেটিকে মহাকাশে দেখা যাবে স্থির অবস্থায়। কারণ অত দূরে উপগ্রহটির গতিবেগ এমন হবে যে সেটি প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার করে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসবে। পৃথিবীও আবার প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার করে আপন মেরু-দণ্ডের উপর ঘুরে আসছে। কাজেই উপগ্রহটি পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরবে অর্থাৎ সেটিকে পৃথিবীর যে কোনও স্থান থেকে স্থিরই দেখাবে। এখন, যদি এ রকম গোটা চারেক উপগ্রহ পৃথিবীর বিষুবরেখা বরাবর স্থাপন করা সম্ভব হয় তবে তাদের মারফৎ যে-কোনও দেশের টেলিভিশন প্রোগ্রাম পৃথিবীর অন্য কোনও দেশ থেকে ধরা যাবে। এ সব ছাড়া রয়েছে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা।

বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে মহাকাশের বিভিন্ন দিক্ থেকে নিঃসৃত এক্স্-রের পরিমাপ করা, ঊর্ধ্বাকাশের আবহমণ্ডল সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া, যেমন—তার ঘনত্ব, উষ্ণতা সৌর-বিকিরণ প্রভৃতির মাপজোঁক করা, এবং

সূর্য থেকে বেরিয়ে আসছে যে নিউট্রন ও গামা-রশ্মি,—তাদের অনুসন্ধান করা ইত্যাদি। এ সব বিষয় সম্বন্ধেই গবেষণার কাজ করা হয় কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে। তা ছাড়া যুদ্ধের কাজে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য নেওয়া একটি অতি মূল্যবান্ বিষয়। কিন্তু যুদ্ধ দিয়ে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না, তাই ভারত যুদ্ধে বিশ্বাসী নয়। কাজেই আমাদের কৃত্রিম উপগ্রহ এ জাতীয় কোনও কাজে ব্যবহার করা হবে না। বলা বাহুল্য আর্যভট্ট, ভাস্কর এবং রোহিণী ইতিমধ্যে যে-সব তথ্য পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছে বা পাঠাচ্ছে তা নানা দিক্ দিয়েই মূল্যবান্।

অতি সম্প্রতি আমেরিকার অর্থে রিসোর্স টেকনোলজি স্যাটেলাইট (ই আর টি এস) গঙ্গার অববাহিকার যে-সব ছবি পাঠিয়েছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ফারাক্কার কাছে গঙ্গানদী তার গতিপথ পালটাচ্ছে, ক্রমে সরে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে। তা ছাড়া ফারাক্কা বাঁধ যেখানে অবস্থিত সেখান থেকে দশ কিলোমিটার উজানে গঙ্গার গতিপথ পূবদিকে সরে যাচ্ছে। ভূতাত্ত্বিকদের অভিমত এই যে, গঙ্গার এই গতিপথ পরিবর্তন যদি অব্যাহত থাকে এবং তা বন্ধ করবার ব্যবস্থা যদি অবিলম্বে না করা হয় তবে অদূরভবিষ্যতে গঙ্গার ভাটিতে ভয়াবহ বন্যা রোধ করা যাবে না। তা ছাড়া ফারাক্কায়ও প্রয়োজনীয় জলের ঘাটতি পড়বে।

ভাস্কর ইতিমধ্যে যে-সব তথ্য পাঠিয়েছে তার মধ্যে বিজ্ঞানীরা অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন। এর মধ্যে আছে বায়ুমণ্ডলের নানা খবর, যার সাহায্যে আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব হবে। জলবিজ্ঞান এবং মহাসমুদ্রের জলপৃষ্ঠের বিভিন্ন খবরও দিয়েছে ভাস্কর। এর ফলে প্রাকৃতিক জলরাশিকে মানুষের নানা দরকারী কাজে লাগানো যাবে। ঝড়বাদল এবং আরও নানা কারণে অনবরত ভূমিক্ষয় হচ্ছে। এর ফলে কৃষির উপযোগী যে মাটির স্তর রয়েছে তাও ক্ষয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে আমাদের দেশের বনসম্পদ্। ভাস্কর এ ব্যাপারেও সঠিক তথ্য জানাবে। সে-সব তথ্যের উপর নির্ভর
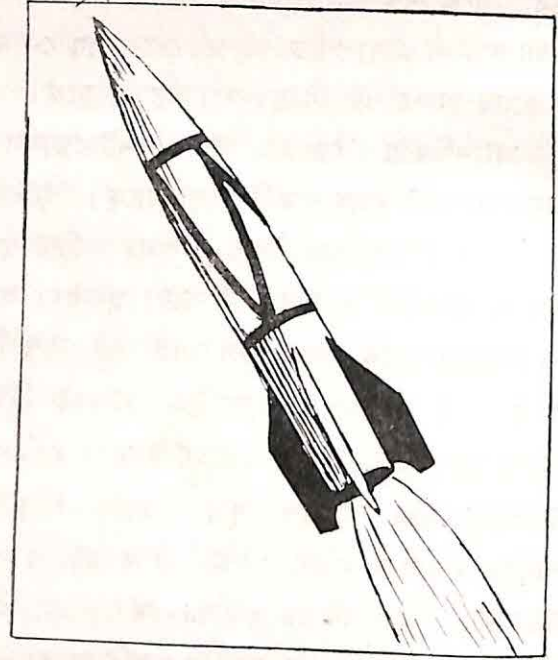
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে লণ্ডন শহরের ওপর নিক্ষিপ্ত জার্মান ভি-টু বা ভি-২ রকেট

করে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে ভূমিক্ষয় নিবারণ করা যাবে, রক্ষা করা যাবে আমাদের বনসম্পদ্। শুধু তাই নয়, এর সাহায্যে আমাদের বনভূমি আরও প্রসারিত হবে, কৃষির জন্যেও ব্যবহার করা যাবে নতুন নতুন জমি। পার্বত্য এবং মরুভূমি অঞ্চলের নানা অজানা কথাও আমরা জানতে পারব। এ সব জায়গাও অদূরভবিষ্যতে

হয়তো কৃষির উপযোগী করে তোলা সম্ভব হবে। এক কথায় বলা যায়, মরুভূমির বুকে ফলবে সোনার ফসল, রুক্ষ পার্বত্য জমি হবে শস্যশ্যামলা। ঠিকমত তথ্য এলে এবং তা কাজে লাগাতে পারলে আমাদের দেশের অগণিত মানুষের কল্যাণ ঘটবে।

ভারতের মহাকাশ-গবেষণার অনেক সম্ভাবনা

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে গঠিত হয়েছে ন্যাশনাল কমিটি অব স্পেস রিসার্চ। এর এক বছর পরে অর্থাৎ ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবান্দ্রামের কাছে থুম্বায় স্থাপিত হয় একটি রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র। এই কর্মসূচীর পেছনে এরই মধ্যে তিনশ' কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে। আগামী দশ বছরে খরচ হবে নাকি আরও আটশ' কোটি টাকা।

ন্যাশনাল স্পেস কমিটির চারটি কেন্দ্র। এগুলি হ'ল আমেদাবাদের স্যাটেলাইট অ্যাপ্লিকেশন সেণ্টার, মাদ্রাজের একশো কিলোমিটার উত্তরে শ্রীহরিকোটায় অবস্থিত গবেষণা-কেন্দ্র, বাঙ্গালোরের ইসরো স্যাটেলাইট সেণ্টার এবং ত্রিবান্দ্রামের কাছে বিক্রম সরাভাই স্পেস সেণ্টার। এ চারটি কেন্দ্রের মধ্যে শেষোক্তটিই সবচেয়ে বড়। বিজ্ঞানী, এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি নিয়ে এখানকার কর্মীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার।

উপরে যে চারটি কেন্দ্রের কথা বলা হ'ল তার এক একটিতে এক এক ধরনের গবেষণার কাজ চলছে। আমেদাবাদে রকেট এবং উপগ্রহের নানা ধরনের জটিল যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ চলছে। তা ছাড়া এখানে চলছে আর্থ স্টেশন রূপায়ণের কাজ। শ্রীহরিকোটায় কাজ চলছে বড় আকারের রকেট-উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের উপযোগী যন্ত্রপাতি নিয়ে। ত্রিবান্দ্রামে রকেট ও জ্বালানী নিয়ে চলছে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা। বাঙ্গালোরে তৈরি হচ্ছে বড় আকারের কৃত্রিম উপগ্রহ।

রকেট তৈরির কাজে এখনও খুব উঁচু ধরনের সাফল্য অর্জিত না হলেও কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরির ব্যাপারে ভারতের সাফল্য আশাতীত বলা যেতে পারে। যন্ত্রপাতি সমেত অ্যাপ্‌ল্‌ একটি জটিল উপগ্রহ। বিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম জিও-সিনক্রোনাস উপগ্রহ। তা ছাড়া উন্নত ধরনের রিমোট সেনসিং উপগ্রহ আই আর এস বাঙ্গালোরেই তৈরি হবে। আমেদাবাদের কেন্দ্র থেকে একটি বিদেশী উপগ্রহ মারফত শিক্ষামূলক একটি প্রকল্পও চালানো হয়। এর নাম স্যাটেলাইট ইনস্ট্রাকশন টেলিভিশন এক্সপেরিমেণ্ট। এর সাহায্যে কেরলের বিস্তীর্ণ এলাকায় শিক্ষামূলক নানা ধরনের টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। ভূমিকেন্দ্র বা গ্রাউণ্ড স্টেশন নির্মাণ ও পরিচালনার ব্যাপারে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা ভবিষ্যতে উপগ্রহকেন্দ্রিক টেলি-যোগাযোগের পক্ষে অমূল্য। ইনফরমেশন স্যাটেলাইট বা ইনস্যাট আমাদের দেশের আরও ব্যাপক অঞ্চলকে এই যোগাযোগের আওতায় নিয়ে আসবে। আবহাওয়ার খবরাখবরও সংগ্রহ করবে ইনস্যাট। এই কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করবে আমাদের ডাক ও তার বিভাগ, আবহাওয়া দপ্তর, কেন্দ্রীয় যোগাযোগ দপ্তর, বিমান দপ্তর এবং পর্যটন বিভাগ।

শক্তিশালী রকেট তৈরি এবং রিমোট সেনসিং উপগ্রহ নির্মাণ এবং যথাযথভাবে তা আকাশে ওড়ানোর উপরেই জোর দেওয়া হবে আগামী দশ বছর। এতে মহাকাশ গবেষণাকে জনকল্যাণের কাজে লাগানো সম্ভব হবে। রকেটের জ্বালানী

নিয়ে গবেষণার ফলে রেড়ির তেল থেকে পলিঅল নামে একটি পদার্থ তৈরি করা হয়েছে। এটি নিত্য প্রয়োজনীয় নানা কাজে লাগানো যাবে। কেরল ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন পলিঅল তৈরির একটি কারখানা বসাবে শীগ্‌গিরই। তা এটি উদ্ভাবন করেছেন রকেট-বিজ্ঞানীরা। এ ধরনের 'ড্রিল' খনি খোঁড়ার কাজেও স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যাবে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে এ রকম একটি ড্রিল দিয়ে মাত্র তিন মিনিট সময়ে দশ মিটার গভীর একটি গর্ত খোঁড়া সম্ভব। এটিও দেশের নানা কাজে
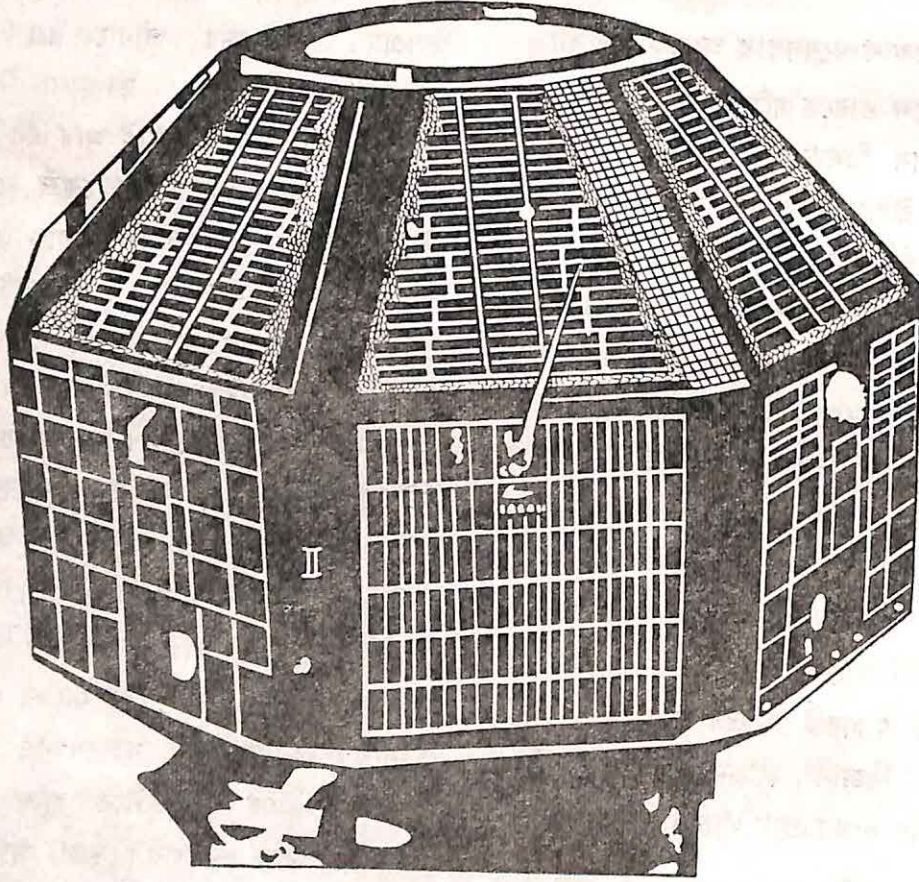
ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ—আর্যভট্ট

ছাড়া রকেটের খোল তৈরিতে ব্যবহৃত হয় কাচতন্তু। প্লাস্টিক-সমন্বিত এই কাচতন্তু খাদ্য সংরক্ষণের গুদাম, নলকূপের পাইপ প্রভৃতি নির্মাণের কাজেও লাগবে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে এ জিনিসটি ইস্পাতের তৈরি পাইপেরই মত টেকসই। রকেট তৈরি করতে রকেট ড্রিল নামে একটি যন্ত্র লাগে।

লাগবে। এক কথায় বলা যায় যে মহাকাশ গবেষণায় লব্ধ সুফল দেশের অন্য নানা কল্যাণকর কাজেও লাগানো সম্ভব হবে। আশা করা যাচ্ছে ১৯৯০ সালের মধ্যেই মহাকাশ গবেষণার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সুফল আমরা পেতে থাকব। আর তখনই দেখা যাবে সমস্ত খরচ পুষিয়ে যাচ্ছে।
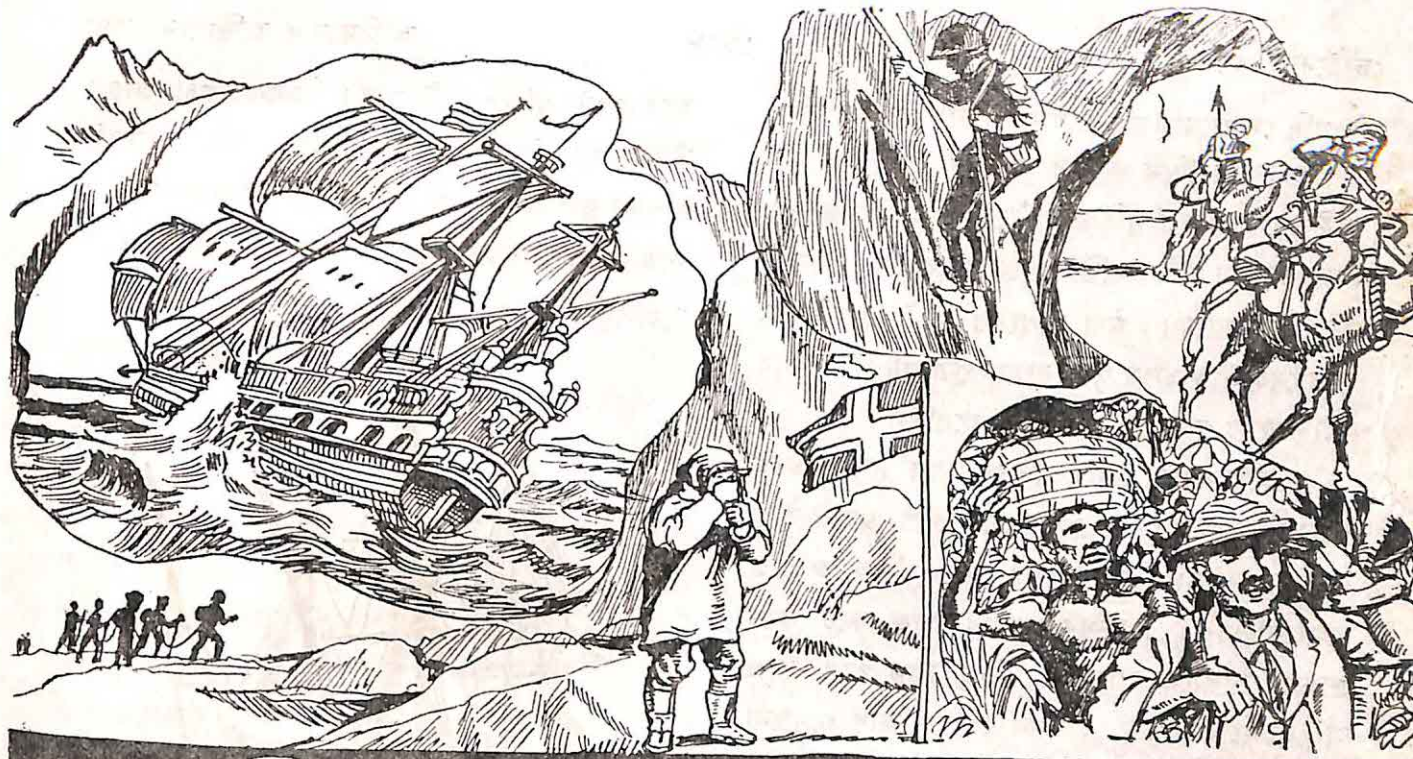
আবিষ্কার ও অভিযানের কথা

উত্তর সমুদ্রে অভিযান

আফ্রিকা আর মধ্য এশিয়ার ভয়াবহ আবিষ্কার আর অভিযানের কিছু কিছু কাহিনী তোমরা শুনেছ, শুনেছ আমেরিকা আবিষ্কারের কথাও; এবার আমরা অন্য দিকে চোখ ফেরাব। শুরু করা যাক হাডসনকে নিয়ে।

পুরো নাম হেনরী হাডসন, বাড়ি ইংল্যাণ্ডে। কত দিন আগের কথা ? তা প্রায় পাঁচশ' বছর হবে।

তখনকার দিনে মানুষের ভূগোলের জ্ঞান এতটা অগ্রসর হয় নি। পৃথিবীর বহু দেশ, বহু নদ-নদী, সমুদ্র তখনও মানুষের অজানা। ইয়োরোপ, এশিয়ার কথা লোকে জানে কিন্তু ইয়োরোপ থেকে কি করে সহজ পথে এশিয়ায় আসা যায় এ বিষয়ে কারো কোনও সঠিক ধারণা নেই। হাডসনের ছিল শিরায় শিরায় অভিযানের নেশা, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায় অনেক ভুল ধারণাও তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল, কোন রকমে উত্তর মেরুটা পার হতে পারলেই এশিয়ায় পৌঁছে যাওয়া যাবে।

তখনকার দিনে লোকের মনে নানারকম কুসংস্কার বাসা বেঁধে ছিল। তাদের অনেকেই মনে করত উত্তর মেরুর কাছাকাছি দেশগুলোতে মানুষ থাকে না —থাকে দৈত্যদানবের দল। আর সেখানকার জলে দলে দলে মৎস্যকুমারীরা ঘুরে বেড়ায়, তাদের খপ্পরে পড়লে আর রক্ষা নেই। হাডসনও যে এ সবের কিছু কিছু বিশ্বাস করতেন না তা নয়, কিন্তু তাঁর ছিল অদম্য কৌতূহল আর দুর্দান্ত সাহস। একবার তো প্রায় ঠাট্টা করে বলেই বসলেন, 'বেশ তো, মৎস্যকুমারীদের তো কোন দিন চাক্ষুষ দেখি

নি, যদি সে সুযোগ জুটেই যায় তা হলে ক্ষতিটা কি?'

তখনকার দিনে কলের জাহাজ দেখা দেয় নি। সেই পাল-তোলা পুরোনো ধাঁচের একখানা জাহাজ নিয়ে একদিন সত্যি সত্যি হাডসন বেরিয়ে পড়লেন তাঁর অভিযানে। জনা দশেকের ছোট্ট একটি দল, আর সেই সঙ্গে চলল তাঁর বালক পুত্র জন। বাপের আবিষ্কারের নেশা তাকেও পেয়ে বসেছিল।

জাহাজ যতই উত্তরের দিকে চলল ঠাণ্ডা ততই বাড়তে লাগল। তারপর শুরু হ'ল জমাট-বাঁধা বরফের রাজ্য। সে বরফের ওপর দিয়ে জাহাজ চালানো ভার। হাডসন প্রথমটা বরফ কেটে কেটে জাহাজ চালাতে লাগলেন, কিন্তু কিছু পরে তাও অসাধ্য হয়ে উঠল। হাডসন বুঝলেন আর এগোনো যাবে না, আর এও বুঝলেন যে মেরু পার হয়ে এশিয়ায় পৌছানো যেতে পারে এ ধারণাটাও তাঁর একেবারে ভুল। অগত্যা তাঁকে ফিরতে হ'ল।

হাফমুন আর হোপফুল

দেশে ফিরে তাঁর মনে হ'ল, সোজা উত্তর দিক্‌টা না হয় চিরতুষারের রাজ্য; কিন্তু একটু ঘুরে উত্তর-পূব বা উত্তর-পশ্চিম দিক্ দিয়ে গেলে কি এশিয়ায় পৌছানো যাবে না?

আবার চলল প্রস্তুতি পর্ব। সাত মাস পরে আবার নতুন করে শুরু হ'ল তাঁর অভিযান। এবার সঙ্গে চলল তেরো জন অনুচর।

দু'দিক্ দিয়েই যাবার চেষ্টা করলেন হাডসন। কিন্তু না, এবারেও সেই একই অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসতে হ'ল তাঁকে।

কিন্তু আবিষ্কারের নেশা যার ঘাড়ে একবার চেপেছে তাকে আটকে রাখা যায় কি? এবার আর একটা সুবিধে জুটে গেল। ওলন্দাজেরা (ডাচ্) তাঁকে খুব উৎসাহ দিতে লাগল, আর তাদেরই দু'খানা জাহাজ নিয়ে আবার সমুদ্রে ভাসলেন তিনি। জাহাজ দু'টোর নাম দেওয়া হ'ল "হাফমুন" আর "হোপফুল"।
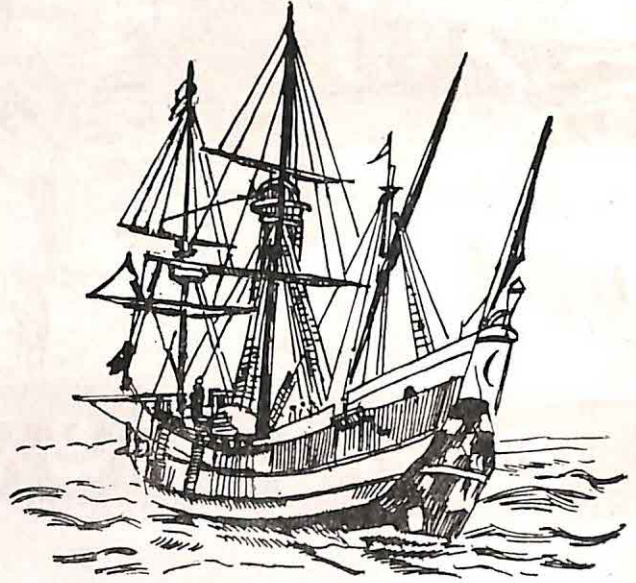
হাফমুন

আবার সেই আগেকার মতই গোলমাল। ব্যাপার দেখে সঙ্গীরাও বেঁকে বসল। হাডসন প্রথমে হোপফুলকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন, হাফমুনকে নিয়ে ঢুকলেন আটলান্টিক মহাসাগরে। কিন্তু তাতে বিশেষ কোন সুবিধে হ'ল না—শুধু কয়েকটা নতুন দ্বীপ আর নতুন নদী আবিষ্কার করা ছাড়া। হাডসনকে আবার ফিরে আসতে হ'ল।

হাডসন দমবার পাত্র ন'ন

সেই যে একটা কথা আছে—"ট্রাই ট্রাই এগেন", —একবার না পারিলে দেখ শতবার, হাডসনও সে কথা মানতেন। তাই আবার একদিন তাঁর জাহাজ ভাসল জলে। তবে এবারে বেশ ভালো করে তোড়-

জোড় করেই যাত্রা করলেন তিনি। সঙ্গে রইল কুড়ি জন লোক আর সকলকার ছ'মাসের মত খাবার। তাঁর বালক পুত্র জন্ এবারেও চলল সঙ্গে। যে-ভাবেই হোক এবার প্রশান্ত মহাসাগরে ঢুকতেই হবে।

প্রথমটা অভিযান বেশ ভালো ভাবেই চলতে লাগল। নানারকম নতুন নতুন দৃশ্য চোখে পড়তে লাগল তাঁদের। এমন কি কয়েকটি মৎস্যকুমারীরও নাকি দেখা পেয়ে গেলেন তাঁরা। আসলে ওগুলো ছিল সীল। ওঁরা তো আগে কখনও ও জীবটিকে চাক্ষুষ দেখেন নি, তাই ওদের চালচলন দেখে ওদেরকেই ভেবেছিলেন মৎস্যকুমারী। তবে ঐ তথাকথিত কন্যাদের মুখ দেখে হয়তো একটু হতাশও হয়েছিলেন।

নতুন আশার আলো

যাই হোক, এবার আর হাডসন সহজে ফিরলেন না। বরফ ভেঙ্গে, ঝড়বৃষ্টি মাথায় করেই চলতে লাগলেন তাঁরা। অবশেষে তাঁরা একটা নতুন সমুদ্রে এসে পড়লেন।

ঐ সমুদ্রের বিশাল জলরাশি দেখে হাডসনের মন আনন্দে নেচে উঠল। এতদিনে তবে বোধ হয় তাঁরা প্রশান্ত মহাসাগরে ঢুকবার পথ খুঁজে পেয়েছেন।

আসলে কিন্তু ওটা ছিল একটা উপসাগর। পরবর্তী যুগে হাডসনেরই নাম থেকে ওর নাম হয়েছে বে অব্ হাডসন বা হাডসন উপসাগর।

তিন মাস হাডসন ঐ উপসাগরে ঘুরে বেড়ালেন প্রশান্ত মহাসাগরে ঢুকবার পথ বার করার জন্য। কিন্তু সে পথ আর পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গীরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তারা আর এভাবে অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়াতে রাজী নয়। ঐ সঙ্গীদের মধ্যে ছিল গ্রীন নামে একটি দুষ্ট লোক। নাম কিনবার জন্য সে দলে ভিড়েছিল কিন্তু এ-সব ঝক্কি তার একেবারেই পছন্দ হচ্ছিল না। ইতিমধ্যে একটা দ্বীপ খুঁজে পাওয়া গেল। ওদিকে সামনে শীতকাল। গ্রীন তার বন্ধুদের নিয়ে প্রস্তাব করল, শীতকালটা এই দ্বীপেই নেমে কাটিয়ে দেওয়া যাক। কিন্তু হাডসন সময় নষ্ট করতে রাজী হলেন না। ওদের আপত্তি সত্ত্বেও দ্বীপে না নেমে সেই পথ খোঁজার চেষ্টাই চালিয়ে যেতে লাগলেন।

কিন্তু অদৃষ্টের দোষে সে চেষ্টা আর সফল হ'ল না। ক্রমে শীত এসে গেল, সমস্ত জল জমে বরফ হয়ে গেল। সারা শীতকালটা ঐখানেই আটকা পড়ে রইলেন তাঁরা কবে বরফ গলবে সেই আশায়। কাটতে লাগল দিনের পর দিন, অধৈর্য হয়ে উঠলেন হাডসন।

হাডসন আর ফিরলেন না

অবশেষে একদিন বরফ গলতে শুরু করল। বরফ গলা শুরু হতেই আবার ছাড়া হ'ল জাহাজ, কিন্তু ততদিনে সমস্ত খাবার শেষ হয়ে গেছে। শেষে একদিন দেখা গেল গোটা পাঁচেক চীজের টুকরো ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। হাডসন তাই সকলকে সমান ভাবে ভাগ করে দিলেন।

কিন্তু সেই যে দুষ্ট লোকটা গ্রীন, সে এতদিন নানা ছুতো খুঁজছিল হাডসনকে বিব্রত করার। সে নিজেদের মধ্যে একটা ছোট দল পাকিয়ে নিয়েছিল। হাডসন পক্ষপাতিত্ব করছেন এই বলে সে এবার তাঁকে আক্রমণ করে বসল। কিছু সঙ্গী, যারা হাডসনকে পছন্দ করত, তারা এগিয়ে এল বাধা দিতে। ফলে জাহাজের মধ্যেই বেধে গেল একটা

ছোটখাট লড়াই। গ্রীনের লোকেরাই ছিল সংখ্যায় বেশি, তারা অপর পক্ষের কয়েকজনকে সেখানেই খুন করে ফেলল।

ভাসতে হাডসন, তাঁর ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে, কোথায় যে হারিয়ে গেলেন কেউ জানতে পারল না। এই-ভাবেই এই সাহসী অভিযাত্রীর অভিযান শেষ হ'ল।

হাডসনের শেষ যাত্রা (একখানি বিখ্যাত ছবি থেকে)

এতেও গ্রীন দমল না। হাডসনকে সে দেখে নেবে। জাহাজ থেকে একটা ছোট ভাঙ্গা নৌকো বার করে সেই নৌকোয় হাডসন, তাঁর ছেলে আর তাঁর অনুগত কয়েকজনকে বেঁধে নামিয়ে দিল তারা, তারপর ভাসিয়ে দিল সেই সীমাহীন সমুদ্রের জলে।

তার পর গ্রীন তার দলবল-সহ জাহাজ নিয়ে সরে পড়ল। আর সেই ভাঙ্গা নৌকোয় ভাসতে

দক্ষিণ মেরুর খোঁজে

হাডসন মেরু পার হতে চেয়েছিলেন প্রায় ৫০০ বছর আগে। তখনও মেরু সম্বন্ধে লোকের সঠিক ধারণা ছিল না। শুধু জায়গাটা যে ভীষণ ঠাণ্ডা আর বরফে ঘেরা এইটুকুই জানা ছিল।

পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণ প্রান্তে এই দুই মেরুর দেশ। উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। সেখানে

যেতে হলে প্রথমে দুরন্ত সাগর পার হতে হয়, তার পর শুরু হয় বরফের রাজ্য। সে রাজ্যে লোক নেই, জন নেই, এমন কি একটি গাছও চোখে পড়ে না। শুধু আছে সীমাহীন বরফ আর অনন্ত নিস্তব্ধতা।

বরফের রাজ্য হলেও দুই মেরুর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। উত্তর মেরু হচ্ছে এক সৃষ্টিযোড়া বরফের সমুদ্র, কিন্তু দক্ষিণ মেরু আসলে একটি মাল-ভূমি। তার বরফের নীচে আছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব পাহাড় আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব আগ্নেয়গিরি। অবশ্য তাতে আর এখন আগুন নেই. সৃষ্টির কোন্ আদিম যুগে তা নিবে গেছে। কিন্তু তার বিরাট বিরাট গহ্বরগুলি পড়ে আছে বরফচাপা হয়ে। তা ছাড়া দক্ষিণ মেরুর চারধারে কয়েকশ' মাইল দূরে তাকে ঘিরে আছে বিশাল একটা ভাসমান বরফের প্রাচীর। ইংরেজিতে তাকে বলা হয় 'দি গ্রেট আইস্ বেরিয়ার',—অর্থাৎ 'বিরাট তুষার-প্রাচীর'।

হাডসনের অভিযানের অনেক দিন পরের ঘটনা। বিংশ শতাব্দীর তখন সবে শুরু। একদল তরুণ অভিযাত্রী ঠিক করলেন ঐ দক্ষিণ মেরু তাঁরা ঘুরে আসবেন।

ডিস্কভারি রওনা হ'ল

ঐ সময়ে ইংল্যাণ্ডের রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি থেকেও দক্ষিণ মেরু অভিযানের জন্য লোক খোঁজা হচ্ছিল। ক্যাপটেন স্কট্ নামে একটি তেত্রিশ বছরের যুবক এগিয়ে এলেন খবর পেয়ে।

স্কটের সমুদ্র সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। কয়েক পুরুষ ধরেই তাঁদের পরিবারের প্রায় সকলেই সমুদ্রে সমুদ্রে কাটিয়েছেন। স্কট্ নিজেও ছিলেন জাহাজের এক পদস্থ অফিসার। তাই স্কট্‌কেই বেছে নেওয়া হ'ল অভিযানের নেতা হিসেবে।

দুর্গম পথের অভিযান, কতদিন সময় লাগবে ঠিক নেই। তাই সঙ্গে প্রচুর খাবারদাবার আর সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি—এটা-ওটা-সেটা নিয়ে তোলা হ'ল শীতের দেশে যাবার উপযোগী করে তৈরি একটা কাঠের জাহাজে। আর জাহাজ-টার নামও দেওয়া হ'ল 'ডিস্কভারি' অর্থাৎ 'আবিষ্কার'। স্কট্ তাঁরই মত একদল অসমসাহসিক অভিযাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ডিস্কভারিতে উঠে সেটাকে ভাসিয়ে দিলেন নীল সমুদ্রে।

তুষার-প্রাচীরের বাধা

ডিস্কভারি ছুটে চলল জল কেটে কেটে এবং শেষে একদিন এসে দাঁড়াল সেই গ্রেট আইস্ বেরিয়ারের সামনে।

ততদিনে শীত এসে গেছে। বরফ জমে আরও দুর্লঙ্ঘ্য হয়েছে। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই যার ভিতর দিয়ে ওটা পার হওয়া যায়। অগত্যা স্কট্ জাহাজটাকে একটু পিছু হটিয়ে একটা দ্বীপে এনে নোঙ্গর করলেন। অজানা দ্বীপ, স্কট্ তার নাম দিলেন ইংল্যাণ্ডের তখনকার রাজার নামে—কিং এডওয়ার্ড দ্বীপ।

দেখতে দেখতে কয়েক মাস ঐ দ্বীপেই কেটে গেল, কিন্তু ডিস্কভারির পক্ষে সেই বরফ-প্রাচীর পার হওয়ার কোন আশা দেখা গেল না। এদিকে স্কট্ অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। তিনি ঠিক করলেন বেশির ভাগ সঙ্গীকে জাহাজে রেখে তিনি নিজে জনা দুই সঙ্গীকে নিয়ে চাকা-হীন স্লেজ-গাড়ি করেই রওনা হবেন—সঙ্গে কিছু খাবারদাবার নিয়ে। স্লেজ টেনে নিয়ে যাবে ওদেশেরই কয়েকটা বলিষ্ঠ কুকুর।

দুর্গম পথ। কোথাও বা রাস্তা যুড়ে পথ আটকে আছে বিরাট বরফের চাঁই—যা নাকি একবার ধ্বসে পড়লে তাঁদের গুঁড়ো করে ফেলবে; কোথাও পায়ের নীচে অদৃশ্য আগ্নেয়গিরির সুবিশাল গহ্বর বা ক্রেটার। বরফে ঢাকা রয়েছে, কিন্তু একটু যদি বরফ সরে যায় আর স্লেজটা সেইখানে এসে পড়ে তা হলে কোন্ অতলে যে তাঁরা তলিয়ে যাবেন কে জানে! এর ওপর প্রচণ্ড শীত আর তুষার-ঝড় তো লেগেই আছে। অতি সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে তাঁরা চলেছেন—একজনের সঙ্গে আর একজনের কোমরে দড়ি বেঁধে।

পথে পথে নিশান পুঁতে, তাঁবু গেড়ে, আর সেই তাঁবুর মধ্যে কিছুটা করে খাবারদাবার রেখে রেখে তাঁরা এগোতে লাগলেন, যাতে ফিরবার সময় সেগুলো দেখে পথ ঠিক করতে পারেন আর খাবারের অভাব না ঘটে।

কিন্তু এতেই কি নিস্তার আছে? যতই এগোচ্ছেন পথ ততই দুর্গম হয়ে আসছে, খাবারেও টান পড়ছে। শুধু নিজেদের খাবারই তো নয়, কুকুরগুলোকেও তো খাওয়াতে হবে। শেষে উপায়ান্তর না দেখে ঐ কুকুরগুলিরই কয়েকটাকে মেরে সেই মাংস দিয়ে তাঁরা বাকি কুকুরদের খিদে মেটাতে লাগলেন। কিন্তু এভাবে তো যাওয়া চলে না! তারপর আবার সঙ্গীদের একজন,—শ্যাকল্‌টন, অসুস্থ হয়ে পড়লেন। স্কট ফের ফিরে এলেন ডিস্‌কভারি জাহাজে।

তাই বলে জাহাজ তাঁরা ফিরিয়ে আনলেন না, কয়েক মাস সেখানেই অপেক্ষা করে এবং বিশ্রাম নিয়ে আবার স্কট রওনা হলেন। শ্যাকল্‌টনের তখনও চলবার মত অবস্থা হয় নি, তাঁর বদলে স্কটের সঙ্গী হলেন ইভান্‌স্ ল্যাস্‌লী। ইনিও ছিলেন শ্যাকল্‌টনের মতই দুঃসাহসী, আর তেমনি সব দিক্ দিয়েই তাঁরই মত নির্ভরযোগ্য।

আবার সেই রকম পদে পদে বিপদ্, পদে পদে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই। তবু ওঁরা মেরুর কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। আর ৪৬৩ মাইল এগুতে পারলেই খোদ মেরুর ওপর গিয়ে পৌঁছবেন। কিন্তু না, তা হ'ল না। ওখান থেকেই ফিরতে হ'ল তাঁদের।

শ্যাকল্‌টনের নতুন অভিযান

এদিকে শ্যাকল্‌টন কিন্তু বসে থাকবার পাত্র ন'ন। দেশে ফিরে সুস্থ হয়ে তিনি এবার নিজেই দক্ষিণ মেরু যাবার তোড়জোড় করতে লাগলেন এবং স্কট্ ফিরে আসার ঠিক সাত বছর পরে একদিন বেরিয়ে পড়লেন কিছু সঙ্গী নিয়ে। স্কট্ অবশ্য এবার তাঁদের সঙ্গী ছিলেন না, শ্যাকল্‌টনই দলের নেতৃত্বের ভার নিলেন।

আবার সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতা। পদে পদে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে তুষার-প্রাচীর পার হয়ে এগিয়ে চললেন শ্যাকল্‌টন। এবার হয়তো মেরু জয় হবেই। কিন্তু না,—চারশ' নয়, তিনশ' নয়, এমন কি দু'শও নয়, মেরু থেকে মাত্র একশ' মাইল দূরে পৌঁছেও তাঁরা আটকে গেলেন। আর এক পা এগোবারও উপায় নেই। এগোতে গেলে মৃত্যু অবধার্য। বিফল হয়ে ফিরে এলেন শ্যাকল্‌টন।

ফিরে এলেন বটে কিন্তু মেরুর আশপাশের দেশ সম্বন্ধে কত রকম তথ্য যে সংগ্রহ করে আনলেন তার ঠিক নেই। স্কটের অভিযানেও পৃথিবীর ঐ দক্ষিণ-প্রান্ত সম্বন্ধে কম খবরাখবর সংগৃহীত হয় নি। কারণ তাঁরা তো শুধু মেরুবিজয়ের জন্যই অভিযানে বেরোন নি, নানা রকম বৈজ্ঞানিক—নানা রকম ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করাও ছিল তাঁদের একটা

বড় উদ্দেশ্য। মেরু জয় করতে না পারলেও সেদিক্ দিয়ে তাঁরা বিফল হন নি।

আবার স্কট্

শ্যাকল্‌টন মেরু জয় করতে পারেন নি এ খবর শুনে স্কট্ খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। দক্ষিণ-সাগর যেন হাত বাড়িয়ে ডাকতে লাগল তাঁকে। তিনি আবার নতুন অভিযানের জন্য তৈরি হলেন। এবার সঙ্গীদের মধ্যে রইলেন বেশ কিছু বিজ্ঞানী;

ক্যাপটেন স্কট্

আর রইল উনিশটি সাইবেরিয়ান ঘোড়া, তিরিশটি ও-.দশী শিক্ষিত কুকুর আর তিনখানি মোটর স্লেজ। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর নিউজিল্যাণ্ডের পোর্ট চামারস থেকে তাঁর জাহাজ জলে ভাসল। এবার কিন্তু সেই পুরোনো ডিসকভারি নয়, এবার নতুন জাহাজ—'টেরা নোভা'।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতেই তাঁরা সেই তুষার-প্রাচীরের ধারে এসে পড়লেন। তখন ও-জায়গাটার উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের চাইতেও ৮২ ডিগ্রী নীচে।

তাড়াহুড়ো না করে তাঁরা সমস্ত গুছিয়েগাছিয়ে অক্টোবর নাগাদ ফের রওনা হলেন। কিন্তু বিধাতা যে এমন হবেন তা কে ভাবতে পেরেছিল? কিছুদূর গিয়েই মোটর স্লেজ ভেঙ্গে অচল হয়ে পড়ল, তেজী ঘোড়াগুলোও একটা একটা করে মরতে লাগল, সেই সঙ্গে চলতে লাগল অবিরাম তুষার-ঝড়।

কিন্তু স্কট্ এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মেরু থেকে ১৫০ মাইল দূরে পৌঁছে তিনি সঙ্গের লোকদের জাহাজে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন, বেছে নিলেন মাত্র চার জনকে। অত লোকের ঝুঁকি নেওয়া চলবে না তা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি।

যাঁরা ফিরে এলেন তাঁরা জাহাজে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন ওঁদের ফিরে আসার পথ চেয়ে।

কিন্তু স্কট্ কিংবা তাঁর চার সঙ্গী কারোই দেখা নেই। দেখতে দেখতে মাসের পর মাস কেটে গেল। তাঁরা বুঝলেন স্কট্ নিশ্চয়ই বন্ধুদের নিয়ে কোন বিপদে পড়েছেন। আর অপেক্ষা করা উচিত নয়, এখনও হয়তো ওঁদের খুঁজে বার করা যেতে পারে।

ওঁদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ছিলেন বোধ হয় অ্যাটকিনসন। তিনি বললেন 'আমি যাব ওঁদের খোঁজে, তোমরা কেউ যদি আসতে চাও তো সঙ্গে এস।'

বেশ কয়েকজন সঙ্গী বলে উঠল, 'আমরাও যাব।'

তুষার-ঝড়ের বলি

শুরু হ'ল যাত্রা। একটু যেতেই দেখা গেল যাত্রাপথের মাঝে মাঝে তাঁবু, নিশান ইত্যাদি চিহ্ন

পড়ে আছে। স্কট্ যে যাবার সময় নিশানা ঠিক রাখার জন্য এগুলি রেখে গেছেন তা বুঝতে অসুবিধে হ'ল না। সেই চিহ্ন ধরে ধরে ওঁরা এগুতে লাগলেন। তারপর খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে একদিন হঠাৎ চোখে পড়ল তিনটি নরকঙ্কাল জমাট বরফের মধ্যে থেকে উঁকি মারছে।

কাদের কঙ্কাল? এই জনহীন বরফের রাজ্যে মানুষের কঙ্কাল এল কি করে? তবে কি—তবে কি—?

কথা জানতে পারা গেল। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি প্রত্যহ তাঁর ডায়েরীতে সমস্ত বিবরণ লিখে রেখে গেছেন।

ডায়েরী থেকে জানা গেল ১৮ই জানুয়ারী (১৯১২) তারিখে তাঁরা সত্যিই দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছেছিলেন; কিন্তু গিয়ে দেখেন সেখানে ইতিমধ্যেই নরওয়ের জাতীয় পতাকা উড়ছে। তাঁদের যাওয়ার ঠিক এক মাস ছ'দিন আগেই মেরু আবিষ্কার করে গেছেন নরওয়ের আর এক অভিযাত্রী ক্যাপটেন আমুণ্ডসেন।

তুষার-ঝড়ে পথহারা ক্যাপটেন স্কট্ (একখানি বিখ্যাত ছবির অনুসরণে)

হ্যাঁ, যা আশঙ্কা করা হয়েছিল তাই ঘটেছে। কারণ ঐ কঙ্কালগুলির পাশেই পড়ে রয়েছে একটা চামড়ার ব্যাগ আর তার মধ্যে রয়েছে একখানা রোজনামচা অর্থাৎ ডায়েরী। ডায়েরীটি আর কারো নয়, স্বয়ং স্কটের। অর্থাৎ কঙ্কালগুলো আর কারও নয়, স্কট্ আর তাঁর দু'জন সঙ্গীর।

স্কটের সেই ডায়েরীর মধ্যে থেকেই কিন্তু যাবতীয়

স্কট্ অবশ্য নরওয়ের পতাকার পাশে ইংল্যাণ্ডের একটি পতাকাও বসিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু প্রথম দক্ষিণ মেরু জয়ের যে সম্মান তা তাঁর ভাগ্যে জোটে নি।

তা হয় নি, কি আর করা যাবে? স্কট্ ফিরবার আয়োজন করতে লাগলেন।

কিন্তু তুষার-ঝড়ের উৎপাত এবার যেন আরও

বেড়ে গেল। মুখের চামড়া ফেটে যাচ্ছিল, চোখের দৃষ্টি যাচ্ছিল হারিয়ে। সেই অবিরাম তুষারপাতে তাঁদের পথঘাট সব হারিয়ে গেল, আসবার সময় পথে পথে যে সব নিশানা রেখে এসেছিলেন তাও আর খুঁজে পেলেন না তাঁরা।

এরই মধ্যে দলের একজন,—ইভান্‌স্‌, প্রাণ হারালেন। ঐ প্রাকৃতিক দুর্যোগ তিনি সহ্য করতে পারলেন না। আর একজন,—ক্যাপটেন ওট্‌স্‌ও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি যখন দেখলেন তাঁকে নিয়ে সঙ্গীরা খুব বিপদে পড়েছেন তখন তিনি ঠিক করলেন ওঁদের আর বিব্রত করবেন না। নিজের তুচ্ছ প্রাণ তিনি স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেবেন। তাই এক সময়ে সকলের চোখ এড়িয়ে সেই মেরুঝড়ের মধ্যেই নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন তিনি। কোথায় গেলেন তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। সেদিন ছিল ১৭ই মার্চ।

দু'জন বন্ধুকে পথে বিসর্জন দিয়ে বাকি তিনজন কোন রকমে এগোতে লাগলেন—যদি কোন রকমে তাঁদের ফেলে-আসা পরিচিত কোনও তাঁবুতে পৌছতে পারেন। সেখানে পৌছতে পারলে হয়তো খাবার মিলবে, আগুনও মিলবে।

সে-রকম একটা তাঁবু মাত্র এগারো মাইল গেলেই পাওয়া যেত কিন্তু সেটুকু পথও আর তাঁরা পার হতে পারলেন না। হঠাৎ নতুন করে একটা মেরুঝঞ্ঝা এসে সব কিছু ওলটপালট করে দিল। বরফের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলেন তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য।

স্কট্‌-এর ডায়েরীতে এই পর্যন্তই লেখা ছিল। তারিখ দেওয়া ছিল ২৫শে মার্চ, ১৯১২। ব্যস্‌, এখানেই ডায়েরী শেষ।

ডায়েরীতে যা লেখা ছিল না তা জানা গেল সেই তিনজনের বরফচাপা-পড়া কঙ্কাল দেখে। আজ তা ইতিহাস হয়ে আছে।

প্রথম যিনি দক্ষিণ মেরু জয় করলেন

ক্যাপটেন স্কটের অসাধারণ মেরু-অভিযান এবং সেখানে তাঁর শোচনীয় জীবন বিসর্জনের কাহিনী আবিষ্কার ও অভিযানের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। কিন্তু স্কট্‌কে হারিয়ে দিয়ে আর একজন যে অসম-সাহসী মেরু-যাত্রী সর্বপ্রথম দক্ষিণ মেরু জয় করলেন তাঁর কথা এতক্ষণ বলা হয় নি।

ক্যাপটেন আমুণ্ডসেনের বাড়ি ছিল নরওয়ে, তাই তাঁর রক্তের মধ্যেই ছিল ভাইকিংদের দুঃসাহস। জন্মেছিলেন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আর ২৮ বছর বয়সেই তিনি নানা ভৌগোলিক আবিষ্কার করে খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর তাঁর ইচ্ছে হ'ল উত্তর মেরু আবিষ্কার করবেন। সে জন্য তিনি যাত্রাও শুরু করেছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে খবর পেলেন অ্যাডমিরাল পিয়েরি উত্তর মেরু জয় করে ফেলেছেন। অর্থাৎ উত্তর মেরুতে পৌছতে পারলেও প্রথম ঐ জায়গাটি আবিষ্কার করার সম্মান তিনি পাবেন না। তিনি তখন ঠিক করলেন, উত্তর মেরু যাবার চেষ্টা আর করবেন না। চুপি চুপি ফিরেও এলেন একদিন।

কিন্তু আবিষ্কারের নেশা যাকে একবার পেয়ে বসেছে সে কি ঘরে বসে থাকতে পারে? 'পিয়েরি উত্তর মেরু জয় করেছেন, ভালোই করেছেন, কিন্তু দক্ষিণ মেরু তো আজও কেউ জয় করতে পারে নি। আমিই চেষ্টা করব সে কাজ হাসিল করতে পারি কিনা।' মনে মনে ভাবলেন আমুণ্ডসেন।

এর আগে স্কট্‌ ও শ্যাকল্‌টন তাঁদের পর পর দু'টি অভিযানে বিফল হয়ে ফিরে এলেও দক্ষিণ মেরু অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁদের নানা অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ

করে গিয়েছিলেন। আমুণ্ডসেন সেই সব বিবরণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে নিলেন; কোথায় কোন্ বাধা, কোথায় কোন্ বিপত্তি ঘটতে পারে জেনে নিলেন সব। তার পর কোন্ পথ দিয়ে কোথায় যাবেন, কোন্ সময়ে কোথায় পৌঁছলে অভিযান অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হতে পারে তারই একটা ছক করে ফেললেন। তার পর শুরু হ'ল তাঁর প্রস্তুতি।

আমুণ্ডসেনের যাত্রা শুরু

শুভক্ষণে যাত্রা শুরু হ'ল। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর জাহাজ দি গ্রেট বেরিয়ারের অর্থাৎ সেই তুষার-প্রাচীরের সামনে এসে দাঁড়াল। ব্যস্, পথ বন্ধ। সামনে শীতকাল। অর্থাৎ আপাতত বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে এখন।

ক্যাপটেন আমুণ্ডসেন

সারা শীতকালটা আমুণ্ডসেন সেখানেই কাটিয়ে দিলেন। তবে চুপচাপ নয়, পরবর্তী কার্যসূচী ঠিক করে নিয়ে তার তোড়াজোড়ও শুরু করে দিলেন ঐ সময়টায়। বেছে বেছে তাঁরই মত কয়েকজন সাহসী সঙ্গী ঠিক করলেন; সঙ্গে নিলেন বরফের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায় এমন চাকাবিহীন স্লেজ গাড়ি আর প্রয়োজন মত রসদ। আর নিলেন বাহান্নটা শিক্ষিত ও-দেশী কুকুর যারা তাঁদেরকে এবং ঐ রসদবাহী স্লেজ-গুলোকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। তার পর শীত কমলে জাহাজ থেকে নেমে রওনা হলেন দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশে। সেদিন ছিল ২০শে অক্টোবর, ১৯১১।

অধ্যবসায়ের জয়

স্কটের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমুণ্ডসেনও তা থেকে রেহাই পেলেন না। সেই তুষার-ঝড়, সেই পদে পদে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই। একবার তো স্লেজ এমন ভাবে একটা খাদে পড়ে গেল যা কল্পনাই করা যায় না। স্লেজ-টানা কুকুরগুলো খাদের ওপারে চলে গেছে লাফিয়ে, সঙ্গীদের একজন স্লেজ সমেত শূন্যে ঝুলছেন। খাদ তেমন চওড়া না হলেও এত গভীর যে নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। ভাগ্যিস সঙ্গীদেরও একজন কুকুরগুলির সঙ্গে খাদের ওপারে চলে গিয়েছিলেন, তিনিই কোন রকমে দড়ি টেনে ঝুলন্ত বন্ধুকে ওপরে তুললেন।

এরপর শুধু চড়াই আর উৎরাই। কোন কোন উৎরাই দশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে আর তার পরই নেমে গেছে তিন হাজার ফুট নীচে। কিন্তু মেরুর দেশের শিক্ষিত কুকুর সেই চড়াই-উৎরাই ভেঙেই স্লেজ টেনে নিয়ে এল।

কিন্তু অমন বিশ্বস্ত কুকুরগুলোকেও সব টিকিয়ে রাখা গেল না। অত হিসেব করে আনা সত্ত্বেও সঙ্গের রসদ এক সময়ে গেল ফুরিয়ে। এখন কি করা? অগত্যা ওদেরই একটা একটা করে মেরে

তাদের মাংস দিয়ে ওঁদের খিদে মেটাতে হ'ল, মেটাতে হ'ল বাকি কুকুরদেরও খিদে। এইভাবে বাহান্নটি কুকুরের চব্বিশটিকেই একটা একটা করে কেটে ফেলা হ'ল। প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে মানুষ সব কিছুই করতে পারে, সব কিছুই খেতে পারে—কুকুরের মাংস তো ছার! কুকুররাও, দেখা গেল, স্বজাতির মাংস খেতে আপত্তি জানাচ্ছে না। খিদের জ্বালা এমনি জ্বালা!

বাহান্নটির মধ্যে চব্বিশটি এইভাবে শেষ হলে বাকি রইল আটাশ। সেই আটাশটি কুকুরই তখন স্লেজ টেনে নিয়ে চলল মেরুর দিকে। না, আমুণ্ডসেন ফিরতে রাজী ন'ন।

তারপর একদিন সত্যি সত্যি দেখা গেল আমুণ্ড-সেন পৃথিবীর দক্ষিণ সীমায় এসে পৌঁছে গেছেন। কী আনন্দ তখন ওঁদের! ওঁরাই সর্বপ্রথম জয় করেছেন দক্ষিণ মেরু। আমুণ্ডসেন নরওয়ের জাতীয় পতাকা পুঁতে দিলেন সেখানে। স্যালিউট জানালেন পতাকাকে। সেদিনটা ছিল ১২ই ডিসেম্বর ১৯১১; অর্থাৎ স্কটের দক্ষিণ মেরু পৌঁছবার এক মাস ছ'দিন আগেই আমুণ্ডসেন তাঁর গৌরব কেড়ে নিলেন।

দক্ষিণ মেরুর আগেই উত্তর মেরু আবিষ্কার

পৃথিবীর দুই প্রান্ত—উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। প্রথমটিকে বলা হয় সুমেরু, দ্বিতীয়টিকে কুমেরু। দু'টিই দুই প্রান্তবিন্দু এবং চিরতুষারের দেশ হলেও দু'টি জায়গা যে একই ধরনের নয় সে কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

মানুষ এই দুই মেরু আবিষ্কার করবার জন্য বহু দিন থেকেই চেষ্টা করে আসছিল, কিন্তু অতি দুর্গম, অতি বিপদসঙ্কুল ঐ জায়গায় পৌঁছতে পারে নি। বারে বারে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে, কখনও বা প্রাণও হারিয়েছে, কিন্তু তবু ঐ পাগল-করা অভি-যানের নেশা ছাড়তে পারে নি।

দক্ষিণ মেরু অভিযান এবং আবিষ্কারের কথা আগেই বলেছি, এবারে উত্তর মেরুর কথায় আসি, যদিও উত্তর মেরু অভিযানই হয়েছে বেশির ভাগ আগে এবং মানুষ সুমেরুবিজয়ও করেছে কুমেরু বিজয়ের প্রায় আড়াই বছর আগে। এ সব অভিযানে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দু'-একজনের কথাই শুধু বলব।

ন্যানসেন ও জোহানসেন

সবচেয়ে আগে মনে পড়ছে ডক্টর ন্যানসেনের কথা। তিনিও ছিলেন আমুণ্ডসেনের মতই নরওয়ের লোক। সুমেরু অর্থাৎ উত্তর মেরু আবিষ্কারের জন্য তিনি প্রায় মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন।

ডঃ ন্যানসেন ছিলেন বেশ পণ্ডিত লোক। মেরু অভিযানের আগে তিনি ওখানকার নানা ভৌগোলিক তথ্য, বিপদ্-আপদ্ সম্বন্ধে বেশ পড়াশোনা করে নিয়েছিলেন, খোঁজখবর নিতেও ছাড়েন নি। কি রকম জাহাজ ও-অঞ্চলে ঠিকমত চলতে পারবে, বরফের চাপে ভেঙ্গে পড়বে না ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে নিয়ে তিনি সেইভাবে একটি ছোট শক্ত জাহাজ তৈরি করিয়ে নিলেন আর জাহাজটির নাম রাখলেন 'ফ্রাম'। নরওয়েজিয়ান ভাষায় কথাটির মানে—যা এগিয়ে চলে।

এই ফ্রামে চেপে একদিন ন্যানসেন ভেসে পড়লেন সমুদ্রে, চলে এলেন উত্তর এশিয়ায়। নিউ সাইবেরিয়ান দ্বীপপুঞ্জে এসে দেখেন চার দিকেই বরফ। জলের ওপর একটা বিরাট পুরু বরফের চাঁই চাদরের মত ভাসছিল, ন্যানসেন তারই ওপর নোঙর

করলেন তাঁর ফ্রামকে। সেই ভাসমান বরফের চাদরের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে লাগল ফ্রাম—এঁকে-বেঁকে, উত্তরে—আরও উত্তরে।

এইভাবে চলল দীর্ঘ দিন। তারপর সেই বরফের চাদরটি আলাদা হয়ে গেল, ন্যানসেন আবার একটি ভাসমান বরফের চাঁই দেখতে পেয়ে এবার সেটার ওপর ফ্রামকে নোঙর করলেন। তার পর আবার নতুন করে ভেসে চললেন সেই বরফের চাঁইটিকে সঙ্গে করে।
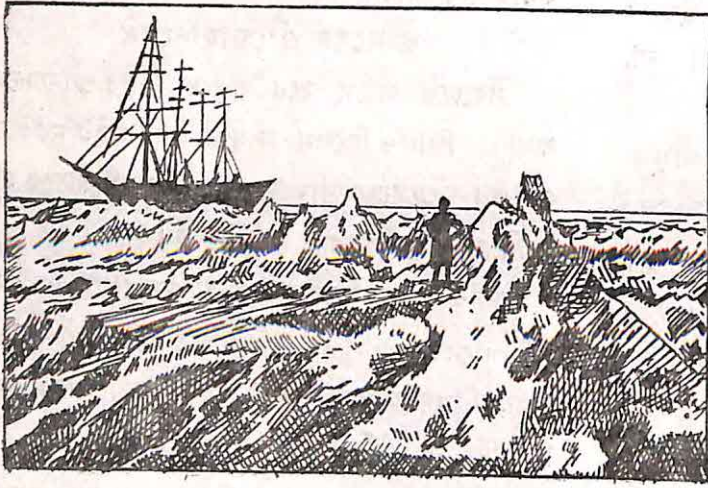
মেরুর দেশে বরফের মধ্যে আটকে গেছে ডঃ ন্যানসেনের জাহাজ ফ্রাম।

এইভাবে কেটে গেল। আরও দিনের পর দিন ন্যানসেন চিন্তা করতে লাগলেন, এ ভাবে ভেসে ভেসে সত্যি কোনও ফল পাওয়া যাবে কি? দেখা যাক আরও ২১ মাস। কিন্তু না, তাতেও কোন ফল হ'ল না। এদিকে তাঁর সঙ্গে আনা খাবার ক্রমেই কমে আসছে, এখন যা করার চট্‌পট্‌ করতে হবে। তিনি তাঁরই মত এক দুঃসাহসী বন্ধু জোহানসেনকে নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে পড়লেন সেই বরফের রাজ্যে। ঠিক করলেন, এবার আর জাহাজ নয়, কুকুর-টানা স্লেজ-গাড়িতে চেপে তাঁরা এগিয়ে যাবেন আরও উত্তরে।

চলেছেন তো চলেছেনই। চারদিক্‌ জনমানব-হীন। মানুষ বলতে মাত্র তাঁরা দু'জন। তবে মানুষ ছাড়া মাঝে মাঝে যে অন্য প্রাণীর দেখা মিল-ছিল না তা নয়। মাঝে মাঝে দু'-একটা শ্বেতভল্লুক তাঁদের পথ আটকাল, পথ আটকাল ওয়ালরাস্‌রাও, বাংলায় যাদের আমরা বলি সিন্ধুঘোটক। এই অতিকায় জলজীবটি অত্যন্ত বদ্‌রাগী। ন্যানসেনদের যাত্রাপথ শুধু যে বরফে ছাওয়া থাকত তা নয়, মাঝে মাঝে তারই মধ্যে দেখা যেত ঠাণ্ডা সমুদ্র। সেজন্য ওঁরা স্লেজ-গাড়ির সঙ্গে যুড়ে নিলেন গোটা কয়েক কায়াক। কায়াক হচ্ছে এক রকম হাল্কা নৌকো যা নাকি এস্কি-মোরা ব্যবহার করে—বিশেষ করে শিকার ধরার জন্য। কায়াক থাকাতে স্লেজকেও জলে ভাসিয়ে রাখা সহজ হ'ল। কিন্তু সিন্ধুঘোটকরা তাদের রাজ্যে নবাগতদের ঢুকতে দিতে চাইল না, ধারাল দাঁত দিয়ে কামড়ে গোটা দুই কায়াক ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিল। ন্যানসেন জোহানসেনকে নিয়ে কোন রকমে দু'টো বরফস্তূপের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সে যাত্রা রক্ষা পেলেন।

পদে পদে বিপদ্‌

বিপদ্‌ ক্রমে আরও বাড়তে লাগল। একবার ন্যানসেন একটা বরফের খাদে পড়ে গিয়ে এমন ভাবে আটকে গেলেন যে আর উঠতেই পারেন না। শেষে যখন উঠলেন, তখন মনে হ'ল ঠাণ্ডায় তাঁর শরীরের

একটা দিক্ জমে অবশ হয়ে গেছে। অনেকটা পক্ষাঘাতের রোগীর মত।

এর ওপর দেখা দিল খাদ্যাভাব। শেষে এমন অবস্থা হ'ল যে স্লেজ-টানা কুকুরগুলোর কয়েকটাকে মেরে তাদের রক্ত খেয়েই ওঁদেরকে প্রাণ বাঁচাতে হ'ল।

ডঃ ন্যানসেন

তা সত্ত্বেও ওঁরা পিছু হঠতে রাজী ন'ন,—ঐ ভাবেই আরও দেড়শ' মাইল পার হয়ে এলেন। কিন্তু এরপর আর এগুনো গেল না। প্রায় চারদিকেই দুর্ভেদ্য বরফের প্রাচীর। আরও বরফ জমলে হয়-তো আর ফেরাও যাবে না, ঐখানেই বন্দী হয়ে মরতে হবে। এবার পিছু হঠতেই হ'ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওঁরা পথ হারিয়ে ফেললেন। তখন সব খাবারই প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সাদা ভালুকের দল আর ওঁদের হাতে ছিল গুলি-ভরা বন্দুক। কিছুদিন ওঁরা ভালুক মেরে তারই মাংস খেয়ে কাটাতে লাগলেন। সে মাংস নাকি বেশ সুস্বাদু এবং পুষ্টিকরও।

এর পর বরফ গলতে লাগল। ওঁরা আবার রওনা হলেন। মনে হ'ল দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলে হয়-তো পথের খোঁজ মিলবে।

চলেছেন তো চলেছেনই। পথে বিপদ দেখা দিচ্ছে, আবার আশ্চর্য ভাবে কেটেও যাচ্ছে। হঠাৎ একদিন মনে হ'ল দূরে কতকগুলো কুকুর ডাকছে। বুনো কুকুর নয়, পোষা কুকুরের ডাক।

সাহস পেয়ে ন্যানসেন সেই ডাক লক্ষ করে এগিয়ে চললেন। গিয়ে দেখেন আর কেউ নয়, কুকুর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁদেরই দলের একজন সঙ্গী জ্যাকসন, যাঁকে তাঁরা কিছু দিন আগে জাহাজে রেখে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ দিন ন্যানসেনদের খবর না পেয়ে ওঁরা তাঁদের খোঁজে বেরিয়েছেন; তার পর অতর্কিতে এই দেখা।

মেরু আবিষ্কার করা হ'ল না, কিন্তু ন্যানসেন জোহানসেনকে নিয়ে নিরাপদে ফিরে এলেন ঐ অঞ্চল সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে।

শেষ পর্যন্ত সুমেরু জয় করলেন পিয়েরি

এর পর উত্তর মেরু অভিযানে এগিয়ে এলেন আর একটি মানুষ যাঁকে লোকে বলত লৌহমানব,—অর্থাৎ লোহা দিয়ে তৈরি মানুষ। সত্যি তো আর লোহা দিয়ে মানুষ গড়া যায় না, কিন্তু লোহার মত শক্ত শরীর ও মন থাকলেই আমরা তাঁকে বলি 'লৌহমানব'। কে এই লোকটি? নৌবাহিনীর লোক। নাম অ্যাডমিরাল পিয়েরি। বাড়ি পেনসিলভিনিয়া।

পিয়েরি নৌবাহিনীর লোক হলেও পৃথিবীর উত্তর অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে-

ছিলেন; বিশেষ করে এস্কিমোদের সঙ্গে মিশে, তাদের সঙ্গে ভাবসাব করে তিনি তাদের সম্বন্ধে এবং তাদের দেশের সম্বন্ধে নানা রকম তথ্য যোগাড় করে নিয়েছিলেন। বেশ কয়েক বার তিনি উত্তর মেরুতেও অভিযান চালিয়েছিলেন। মেরু পৌঁছতে না পারলেও

উত্তর মেরু-বিজয়ী অ্যাডমিরাল পিয়েরি মেরুজয়ের আগে বরফের রাজ্যে বসে ডায়েরী লিখে চলেছেন।

এ-সব অভিযান তাঁকে মেরু আবিষ্কারের পথ সুগম করে দিয়েছিল। শেষে ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে তিনি আর একবার রওনা হলেন ঐ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। তাঁর জাহাজটির নাম দিলেন 'রুজভেল্ট'। রুজভেল্ট ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

পিয়েরির দলে শ্বেতকায় আমেরিকান্ ছাড়াও বেশ কিছু নিগ্রো আমেরিকানও ছিল, আর ছিল সতেরো জন এস্কিমো। তা ছাড়া ওঁরা সঙ্গে নিলেন উনিশটি স্লেজগাড়ি আর একত্রিশটি কুকুর।

ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জাহাজ বেশ ভালো ভাবেই চলল কিন্তু তারপরই শুরু হ'ল বরফের রাজ্য। ওঁরা তখন জাহাজ থেকে নেমে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটা পথ ধরলেন।

মেরুর দেশে ছ'মাস দিন ছ'মাস রাত। ওঁরা যখন হাঁটছিলেন তখন ওখানে চলছে রাত্রি। তা চলুক, রাতের অন্ধকারেই ওঁরা চলতে লাগলেন, কারণ আর কিছুদিন পরেই ওখানে শুরু হবে দিন,—যা চলবে একটানা ছ'মাস।

দিনের আলো ফুটতেই পিয়েরি বললেন, 'এখন আর এত লোক গিয়ে কি হবে? আপনারা বরঞ্চ ফিরে গিয়ে পথের মাঝে মাঝে তাঁবু গেড়ে সেখানে রসদ রেখে রেখে চলে যান, যাতে ফিরবার পথে আমাদের পথ চিনতে কষ্ট না হয়, আশ্রয় এবং খাদ্যও মেলে।'

পিয়েরির নির্দেশ মত সকলেই ফিরে চললেন, এমন কি কুকুরগুলোকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত পিয়েরি একটি মাত্র নিগ্রো সঙ্গীকে নিয়ে চলতে লাগলেন। ঐ নিগ্রো লোকটির নাম হ্যানসন।

দুর্গম পথ। বিপদ্ পদে পদে। কিন্তু ওঁরা দু'জনেই অভিজ্ঞ, কাজেই সে সবের মুখোমুখি হতে ওঁদের আটকাল না।

তার পর একদিন সত্যি তাঁরা পৌঁছে গেলেন একেবারে মেরুর শেষপ্রান্তে। ধীরে ধীরে আকাশ

আলো হয়ে উঠল। পিয়েরি তাঁর বিজয়-পতাকা পুঁতে দিলেন সেই বরফ-ঘেরা মেরু-চূড়ায়। তারপর দু'জনে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে রইলেন পতাকাটিকে স্যলিউট জানাবার পর। সেদিন তারিখটা ছিল ৬ই এপ্রিল, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ।

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়

উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু হচ্ছে ঠাণ্ডার দেশ। যেমন শীত তেমনি দুর্গম ঐ দুই রাজ্য। মানুষ ঐ দু'টো মেরুই জয় করে প্রমাণ করেছে যে তার কাছে অসাধ্য প্রায় কিছুই নয়।

কিন্তু ঐ সুমেরু-কুমেরুই পৃথিবীর শীতলতম রাজ্য নয়। পৃথিবীর বুকে এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে বড় বড় পাহাড়-পর্বত। সুউচ্চ তাদের চূড়া, বারো মাস তা বরফে ঢাকা থাকে, আর তেমনি দুর্গম।

এমনি একটি পাহাড় হচ্ছে আমাদের ভারতের সারা উত্তর দিক্‌টা যুড়ে প্রসারিত হিমালয়। মহাকবি কালিদাস তাঁর "কুমারসম্ভবম্" কাব্যের গোড়ায় এই হিমালয় পর্বতের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন—"স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।" অর্থাৎ হিমালয় পাহাড়টা যেন একটি বিরাট মাপকাঠি (বা মাপবার ফিতে) যা নাকি পৃথিবীকে মাপবার জন্যই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

পৃথিবী অবশ্য অত ছোট নয় যে একটা পাহাড় দিয়েই ওটাকে মাপা যেতে পারে, কিন্তু কবির চোখে হিমালয়ের বিরাটত্বের আভাস পাওয়া যায় ঐ ছোট্ট বর্ণনাটুকুর মধ্যে।

হিমালয় শুধু ভারতের সারা উত্তর দিক্‌টা যুড়ে ছড়িয়ে আছে বললেই ওর বিরাটত্বের পুরো পরিচয় দেওয়া হয় না, কারণ অত উঁচু পাহাড়ও পৃথিবীর আর কোথাও নেই। হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু যে চূড়া,—যার নাম দেওয়া হয়েছে এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গ,—পৃথিবীর বুকেও ওটাই সবচেয়ে উঁচু জায়গা।

এভারেস্ট নাম হ'ল কেন? ঐ গিরিশৃঙ্গটির উচ্চতা অঙ্ক কষে বার করেছিলেন কিন্তু একজন বাঙ্গালী,—রাধানাথ শিকদার। তিনি ভারতীয় জরীপ বিভাগে কাজ করতেন। তিনি যখন ওর উচ্চতা। (২৯,০০২ ফুট) বার করে ফেললেন তখন স্বভাবতই চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। তখন ইংরেজরা ভারতের কর্তা আর ঐ জরীপ বিভাগের বড়কর্তা ছিলেন এভারেস্ট নামে এক ভদ্রলোক। তাঁর নাম দিয়েই তাই ঐ গিরিশৃঙ্গের নামকরণ হ'ল। অর্থাৎ আবিষ্কার করলেন এক বাঙ্গালী, কিন্তু নামটা হ'ল তাঁর ওপরওয়ালা সাহেবের। তা এ রকম তো আরো কতই হয়েছে!

এভারেস্ট বিজয়ে বাধা

এভারেস্ট চূড়ার অস্তিত্ব তো আবিষ্কার করা হ'ল কিন্তু ওখানে যে একদিন সশরীরে কেউ হাজির হতে পারবে এ কথা বোধ হয় কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। নানা কারণে ওটা প্রায় অসম্ভব বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। প্রথমত,—টিকটিকির মত ঐ খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠা কি কোন মানুষের কাজ? দ্বিতীয়ত,—অতি দুর্গম ঐ রাজ্য। বরফ—বরফ আর বরফ! সারা বছরই তুষার দিয়ে ঢাকা। তারই মধ্যে রয়েছে যোজন-যোড়া সব খাদ, গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে তীব্রস্রোতা বরফের নদী, এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বিরাট বরফের চাঁই—যখন তখন সেগুলিতে ধস নামছে; তার তলায় চাপা পড়লে কোথায় যে তলিয়ে যেতে হবে তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর ওপর আছে থেকে থেকে প্রচণ্ড তুষারের ঝড়! এমনিধারা আরও কত কি

না, তাই তাদের ক্রীতদাস নিয়েও মাথাব্যথা ছিল না।

এই সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। এই মানবদরদী নেতা ছিলেন দাসত্ব প্রথার তীব্র বিরোধী। পৃথিবী থেকে তখন ক্রীতদাস প্রথা তুলে দেবার জন্য প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়েছে। আব্রাহাম লিঙ্কন বললেন, আমেরিকা থেকেও এই জঘন্য ক্রীতদাস প্রথা সমূলে তুলে ফেলতে হবে।

দক্ষিণের রাজ্যগুলি বলল, তা হবে না; আমরা তা হলে পৃথক্ রাষ্ট্র গড়ছি, ইউ. এস. এ-র মধ্যে আর থাকছি না আমরা। লিঙ্কন বললেন, তা হয় না। দেশকে ভাগ করতে দেব না। ফলে বাধল গৃহযুদ্ধ।

১৮৬৫ পর্যন্ত চলল এই নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিঙ্কনেরই হ'ল জয়। দক্ষিণের রাজ্যগুলি পরাজয় মেনে নিল, লিঙ্কনও দেশ থেকে কুৎসিৎ দাসত্ব প্রথা চিরদিনের জন্য উচ্ছেদ করে দিলেন। নিগ্রোরাও তখন হ'ল স্বাধীন আমেরিকার স্বাধীন নাগরিক।

এত বড় একট কাজ করেও লিঙ্কন কিন্তু রক্ষা পেলেন না। হঠাৎ একদিন গুপ্ত ঘাতকের গুলিতে তাঁকে প্রাণ দিতে হ'ল। তা এ রকম তো অনেক মহা-মানবকেই দিতে হয়েছে।

লিঙ্কন বেঁচে না থাকলেও তাঁর আরব্ধ কাজ কিন্তু চলতে লাগল। আমেরিকা এগিয়ে চলল সর্বদিকে। আলাস্কাকে কিনে নেওয়া হ'ল রুশদের কাছ থেকে।
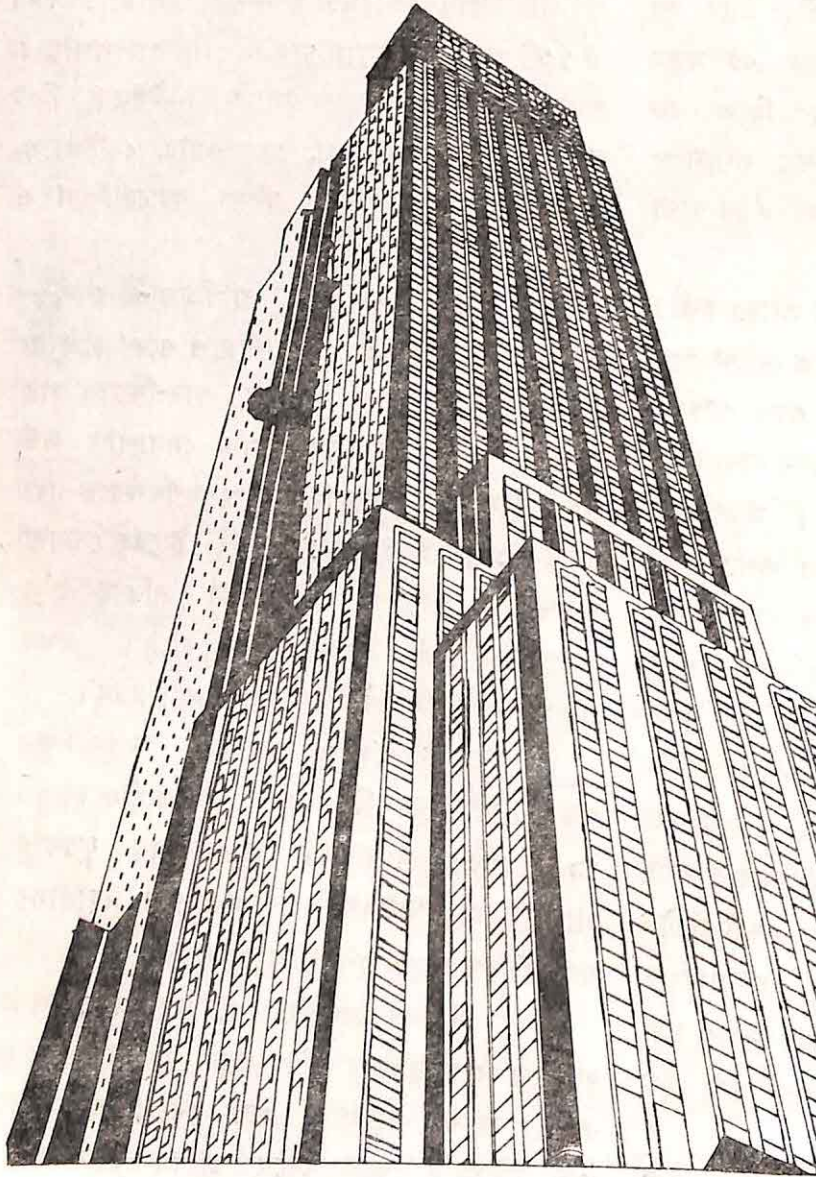
আমেরিকার একটি বহুতল বাড়ি
এ রকম উঁচু বাড়ি প্রথম তৈরি হয় নিউইয়র্কে

স্প্যানিশদের যুদ্ধে পরাজিত করে পোর্টো রিকো, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং শেষে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জও চলে এল আমেরিকার দখলে।

বিরাট দেশ। প্রচুর তার সম্পদ্। দিকে দিকে তার অগ্রগতি চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ৫০টি রাজ্য (স্টেট) এসে যোগ দিল এই যুক্তরাষ্ট্রে।

দেশটা তো আয়তনে কম নয়, ৩,৬১৫,১২৩ বর্গ-মাইল যুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। লোকসংখ্যা বাড়ছে ক্রমাগত। বাড়ছে তো বাড়ছেই—২৫ কোটির কাছে চলে গেছে। শিক্ষায় দীক্ষায়, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিল্পে বাণিজ্যে, কৃষিকাজে দেখতে দেখতে ইউ. এস. এ. হয়ে উঠল একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র।

উনিশ শতকেই বাংলার কবি হেমচন্দ্র এই দেশটি সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"হেথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়, পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়, হয়েছে অধৈর্য নিজ বীর্যবলে, ছাড়ে হুহুঙ্কার ভূমণ্ডল টলে, যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে নূতন করিয়া গড়িতে চায়।" তারপর শতাধিক বর্ষ পার হয়ে গেছে, আমেরিকার অগ্রগতি ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। দু' দু'টি মহাযুদ্ধে জয়লাভ করে সে এখন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির একটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন দেশই নেই। যে ইংল্যাণ্ডের অধীনতা থেকে সে দাসত্বশৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল সেই ইংল্যাণ্ডই এখন সমস্ত ব্যাপারে তার মুখ চেয়ে রয়েছে।

আমেরিকার এই অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়—প্রতি বছরই বিজ্ঞানে সে কোন-না-কোন বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছে, পাচ্ছে মাঝে মাঝে সাহিত্যেও। সে সাহিত্য ইংরেজি ভাষায় রচিত হলেও তা পুরোপুরি আমেরিকান্। আর মহাকাশ-বিজয়ে তার ভূমিকার কথা কে না জানে? রাশিয়া প্রথম শুরু করলেও আমেরিকাও চলেছে তার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে। মানুষকে প্রথম চাঁদে নিয়ে গিয়ে নামানোর কৃতিত্বও তো আমেরিকারই।

সারা দেশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য বড় বড় শহর। রাজধানী ওয়াশিংটন, যেখানে রয়েছে ক্যাপিটল। দেশের শাসনকার্য এখান থেকেই পরিচালিত হয়। নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেল্স্, শিকাগো, ওহাইও, ফিলাডেলফিয়া, ডেট্রয়েট, সানফ্রানসিস্কো, বোস্টন ইত্যাদি অসংখ্য বড় বড় শহর ছড়িয়ে রয়েছে আমেরিকার এদিক্ থেকে ওদিকে। প্রাকৃতিক শোভাও অতুলনীয়। তবে আধুনিকতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন আর পার পাচ্ছে না ওরা। বিজ্ঞানকে নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলছে। প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান এমন ভাবে ঢুকে গেছে যে আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না। তবু দেখবার জিনিসও রয়েছে প্রচুর—সারা রাজ্য ছড়িয়ে। প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানের আশ্চর্য মিলন!

রাষ্ট্রের প্রধান হচ্ছেন প্রেসিডেণ্ট। দেশের হাল
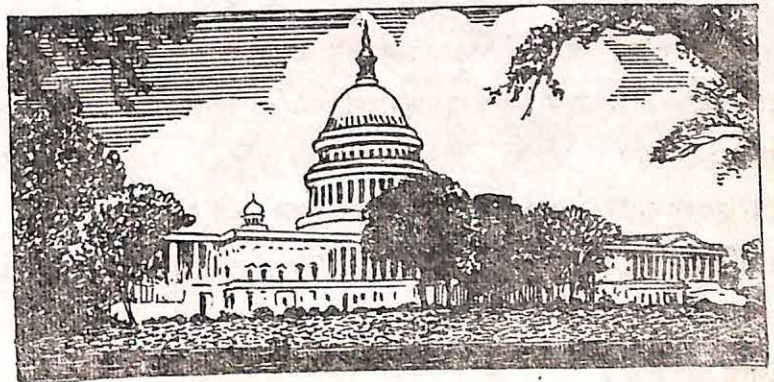
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল

বিপদ্! সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের। অত উঁচুতে বাতাস অসম্ভব রকম হাল্কা। ডাঙ্গার বাতাসে যে পরিমাণ অক্সিজেন থাকে তাই দিয়েই আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস নিই। কিন্তু যতই ওপরে উঠবে ততই বাতাসে অক্সিজনের ভাগ কমতে থাকবে এবং খানিকটা উঠলেই শ্বাস গ্রহণ করা হয়ে উঠবে অসাধ্য। কাজেই এখানে উঠতে গেলে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সঙ্গে করেই নিয়ে যেতে হবে।

এ হেন দুর্গম, দুরারোহ যে হিমালয়,—তার চূড়ায় উঠবার জন্য কিন্তু মানুষ চেষ্টা করে আসছে সেই উনিশ শতকের গোড়ার দিক্ থেকে। কিন্তু পাহাড়ে ওঠার যে সব আধুনিক উপকরণ আজকাল বেরিয়েছে সে আমলে তার প্রায় কিছুই ছিল না। ফলে এভারেস্টে ওঠা তো দূরের কথা, তার কাছাকাছি পৌছনোয় কারও পক্ষে সম্ভব হয় নি। যত দূর জানা যায়, ওরই মধ্যে, প্রায় দেড়শ'বছরেরও আগে (১৮২৮ সালে) ক্যাপ্টেন জিরার্ড ১৯ হাজার ফুট ওপরে উঠতে পেরেছিলেন।

কিন্তু মানুষের অদম্য অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তাকে কোন কাজ থেকেই বিরত করতে পারে নি। এই অ্যাডভেঞ্চারের নেশা আমরা দেখেছি উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের চেষ্টায়। কাজেই এভারেস্ট জয়ের চেষ্টাও যে মানুষ বার বার করবে এ আর বিচিত্র কি? এরপর তাই ধাপে ধাপে আমরা দেখি মানুষ উচুঁ থেকে উঁচুতে উঠে চলেছে। এই শতাব্দীর গোড়ায় (১৯০৩) একটি মহিলাও এই রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারে যোগ দেন। তিনি তাঁর স্বামী মিঃ বুলকের সঙ্গে ২২,০০০ ফুট ওপরে উঠে যান। অবশ্য তাঁর আগেই দু'জন অষ্ট্রিয়ান্ পর্বতারোহী,—কনওয়ে ও একেনস্টাইন,—আরও উঁচুতে, ২৬,০০০ ফুট পর্যন্ত উঠে গিয়েছিলেন। এঁরা অনেকেই আল্প্স্ পর্বতের চূড়ায় ওঠার মহড়া দিয়ে নিয়েছিলেন। আল্প্স্ হচ্ছে ইয়োরোপের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় এবং বেশ দুর্গম। ওর ওপরে ওঠাও বেশ কষ্টকর, কারণ গোটা ইয়োরোপটাই তো আমাদের দেশের তুলনায় বেশ ঠাণ্ডা জায়গা। কিন্তু আল্প্স্-এর সর্বোচ্চ চূড়া মাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক বা মঁ ব্লাঁ মাত্র ১৫,৭৮১ ফুট উঁচু। হিমালয়ের তুলনায় ওকে শিশু বললেও চলে। তিব্বতের কোন কোন জায়গাই তো প্রায় ঐ রকম উঁচু।

এভারেস্ট অভিযান : প্রথম চেষ্টা

হিমালয়ের বিভিন্ন চূড়ায় উঠবার চেষ্টা অনেক দিন থেকে শুরু হলেও খোদ এভারেস্টের ওপর উঠবার চেষ্টা বোধ হয় প্রথম মহাযুদ্ধের (অর্থাৎ হিটলারের নয়, কাইজারের যুদ্ধের) আগে শুরু হয় নি। এর কারণ, ঐ চূড়ায় ওঠা অতি কঠিন বলেই শুধু নয়, ওর জন্য দরকার ছিল নেপাল সরকার আর তিব্বত সরকারের অনুমতি পাওয়া। তিব্বতের শাসনের ভার যে তখন ওখানকার ধর্মগুরু দালাই লামার ওপর ছিল তা নিশ্চয়ই জান।

তাই বলে এভারেস্ট জয়ের চেষ্টা কি বানচাল হয়ে যাবে? না, তা হতে পারে না। ইংরেজ সরকারই শেষ পর্যন্ত কথাবার্তা চালিয়ে সে ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রথম অভিযান শুরু হ'ল ১৯২১ সালে। কিন্তু কথা উঠল, কোন্ পথ দিয়ে গেলে অভিযান সহজ হবে? প্রথম বারের অভিযাত্রীরা সেই পথেরই খোঁজ নিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত একটা সহজ পথ আবিষ্কারও হ'ল, কিন্তু তখন আর আবহাওয়ার অবস্থা অভিযান চালাবার মত ছিল না।

পথ ঠিক হলে পরের বছরই আবার শুরু হ'ল এভারেস্ট অভিযান। দলের নেতা হলেন জেনারেল ব্রুস। এই দলে ছিলেন ১৩ জন ইংরেজ আর ৬০ জন শেরপা। শেরপারা ঐ অঞ্চলেরই লোক, ওখানকার হালচাল তাদের ভালো ভাবেই জানা। পথ দেখানো এবং নানা ভাবে অভিযাত্রীদের সাহায্য করার জন্য তাদের দলে নিতেই হবে। জেনারেল ব্রুস নেতৃত্ব নিলেও এই দলের যিনি ছিলেন প্রাণপুরুষ তাঁর নাম ম্যালরী। প্রথম অভিযানেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন।

২৭ হাজার ফুটেরও খানিকটা ওপরে উঠে এবারের অভিযান শেষ করতে হ'ল। সাতজন শেরপা এই অভিযানে বরফের মধ্যে হারিয়ে যান। ম্যালরী তাঁর আর এক সঙ্গী সামারভেলকে নিয়ে তাঁদের তিন জনকে খুঁজেপেতে উদ্ধার করেন, কিন্তু বাকি চারজনকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হিমালয়ের চিরতুষার রাজ্যে কোথায় যে তাঁরা হারিয়ে গেলেন আজও তার সন্ধান মেলে নি।

১৯২৪ সালে আবার চেষ্টা হ'ল। এবারেও দলের অধিনায়ক ব্রুস। ম্যালরী তো থাকবেনই। নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়ে এগোতে লাগলেন তাঁরা। উঠছেন—উঠছেন—উঠছেন। আর হাজার দুই ফুট উঠতে পারলেই এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় হবে। ব্রুস আর ম্যালরী শেষ পর্যন্ত সব কিছু তুচ্ছ করে ২৮,২০০ ফুট পর্যন্ত উঠে গেলেন। কিন্তু না, এরপর আর এক পাও এগোনো সম্ভব হ'ল না। দু'জনেই ফিরে এলেন অপেক্ষাকৃত নীচেকার তাঁবুতে।

ম্যালরী কিন্তু মানতে চাইলেন না কোন নিষেধ। শীতের দিন ঘনিয়ে আসছে। এবারকার এ-সুযোগ নষ্ট করলে আর হয়তো কোন দিনই তা পাওয়া যাবে না। তিনি বললেন, 'আমি শেষ চেষ্টা করবই।' দলের মধ্যে আর একজন অভিযাত্রী ছিলেন আর্ভিন। তিনি বললেন, 'আমিও আছি তোমার সঙ্গে।' আর একজন, তাঁর নাম ওডেল, পেশায় ভূতত্ত্ববিদ্,—বললেন, 'আমিও।'

প্রচণ্ড দুর্যোগ মাথায় নিয়ে তিনজন চলতে লাগলেন। ওডেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারলেন না। আরও খানিকটা গিয়ে তাঁবু গাড়া হলে বললেন, 'আমি এখানে রইলাম, তোমরা ইচ্ছে করলে এগোতে পার।'

ম্যালরী আর আর্ভিন বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা চূড়োয় উঠবই।'

ওঁরা উঠতে লাগলেন। ওডেল একটা দূরবীন চোখে লাগিয়ে ওঁদের ওপর নজর রাখতে লাগলেন। দূর থেকে ওঁদের খুব ছোট্ট ছোট্ট মনে হচ্ছিল। আর মাত্র ৮০০ ফুট উঠতে পারলেই বিজয়লক্ষ্মী ওঁদের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেবেন।

ওডেল দূরবীনে চোখ লাগিয়ে দেখছেন—দেখছেন—দেখছেন। হঠাৎ মনে হ'ল একটা বিরাট বরফের চাঁই ওঁদের দিকেই গড়িয়ে আসছে। ওঁরা পাশ কাটিয়ে সেটা এড়াবার জন্য আড়ালে চলে গেলেন। বরফের চাঁই গড়িয়ে নেমে এল, কিন্তু ওঁদের আর দেখা গেল না। না, আর কোন দিনই না। সেই তুষারস্তূপের আড়ালে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেলেন দুঃসাহসী দুই বন্ধু—ম্যালরী আর আর্ভিন।

এভারেস্ট বিজয়ের চেষ্টা কিন্তু বন্ধ হ'ল না। ১৯৩৩, ১৯৩৬, তারপর ১৯৫১ পর্যন্ত বারে বারে চেষ্টা হতে লাগল। রাটলেজ, শিপটন, স্মাইথ, টিলম্যান প্রভৃতি অসমসাহসী অভিযাত্রীরা বারে বারে—কখনও কাছাকাছি গিয়ে, কখনও অর্দ্ধপথেই ফিরে এলেন। তবে ১৯৫১ সালে শিপটন আর একটি নতুন পথের সন্ধান পেয়ে গেলেন।

অবশেষে এভারেস্টও পরাস্ত হ'ল

তারপর এল ১৯৫৩। এবার দলের অধিনায়ক কর্নেল হাণ্ট। সঙ্গে রয়েছেন নিউজিল্যাণ্ডের এডমাণ্ড হিলারী, আমাদের তেনজিং এবং আরও কয়েকজন।

তেনজিংএর পুরো নাম তেনজিং নোরকে (বা নোরগে)। নেপালে জন্ম হলেও অল্প বয়সেই তিনি চলে আসেন পশ্চিম বাংলার দার্জিলিং-এ, বেছে নেন শেরপার কাজ। এর আগেকার প্রায় প্রত্যেকটি অভিযানেই (১৯৩৫ থেকে) তেনজিং শেরপা হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন,—যার ফলে পাহাড়ে চড়ার ব্যাপারে তাঁর ছিল দারুণ অভিজ্ঞতা।

২৮শে মে, ১৯৫৩। ২৭,৮০০ ফুট উঁচুতে অভিযাত্রীদের তাঁবু পড়েছে। প্রচণ্ড শীত, সারা জায়গাটা গুঁড়ো গুঁড়ো বরফের কুচিতে ভর্তি। গামবুট-পরা পাও কখনও কখনও প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যেতে চাইছে তার মধ্যে। ওঁরা পরস্পরের কোমরে দড়ি বেঁধে উঠতে লাগলেন। খুব সাবধানে, কারণ একটু পা হড়কে গেলেই অনন্ত গভীর খাদের মধ্যে তলিয়ে যেতে হবে। এভারেস্ট চূড়া থেকে ৮৮০ গজ দূরে যখন পৌঁছলেন তখন আবার একটা তাঁবু গাড়া হ'ল। এখান থেকেই শুরু হবে শেষ অভিযান। আর সবাই এখানেই রয়ে গেলেন, চললেন শুধু তেনজিং আর হিলারী। সঙ্গে অক্সিজেনের সিলিণ্ডার পিঠে বাঁধা, মুখে গ্যাস মুখোস। কিন্তু তবু তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে, অক্সিজেন না ফুরিয়ে যায়। দেখা যাক এভারেস্ট মানুষের কাছে মাথা নত করে কিনা।

অবশেষে সেই স্মরণীয় ক্ষণ সত্যিই এল। ২৯শে মে বেলা সাড়ে এগারোটায় এভারেস্টের চূড়ায় মানুষের প্রথম পদচিহ্ন পড়ল। প্রথম পা রাখলেন তেনজিং। তিনি ধর্মে বৌদ্ধ। তথাগত বুদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে এভারেস্টের চূড়ায় পুঁতে দিলেন

এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গের ওপর ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে তেনজিং নোরকে

দু'টি জাতীয় পতাকা—ভারতের আর নেপালের। তার পর টেনে আনলেন হিলারীকে। তিনিও তাঁদের পতাকা পুঁতে দিলেন এভারেস্টের চূড়ায়। পৃথিবীর সব চাইতে উঁচু জায়গাটিও মানুষের অধ্যবসায়ের কাছে পরাস্ত হ'ল।

তেনজিং নোরকে ছিলেন দার্জিলিংয়েরই স্থায়ী বাসিন্দা। ১৯৫৪ সালে এদেশের ছেলেমেয়েদের পাহাড়ে উঠতে শেখাবার জন্য ঐ দার্জিলিংয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় একটি শিক্ষালয়—হিমালয় মাউন্টেনীয়ারিং ইন্‌স্‌টিটিউট। তেনজিং হন তার প্রথম ডিরেক্টর। এর পর তাঁর কাজ হয় এ-দেশের তরুণ-তরুণীদের দুরারোহ পাহাড়ে কি ভাবে উঠতে হয় তাই শেখানো। প্রথম এভারেস্টবিজয়ী এবং ভারতীয় হিসেবে তিনি শুধু ভারতীয়দের কাছেই নয়, সারা বিশ্ববাসীর কাছে সম্মান পেয়ে এসেছেন, আর পেয়ে এসেছেন সকলের ভালোবাসা তাঁর অমায়িক ব্যবহারের জন্য। সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় তাঁর এভারেস্টবিজয়ের সঙ্গী হিলারীও ছুটে এসেছিলেন সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে।

এর পরেও

তেনজিং ও হিলারী হলেন এভারেস্ট বিজয়ের পথিকৃৎ। তাঁদের পরে একে একে আরও বহু দুঃসাহসী এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছেন। পৃথিবীর নানা দেশের নানা দলের অভিযাত্রী। ১৯৭৫ সালে একদল জাপানী মহিলাও এগিয়ে আসেন এই অ্যাডভেঞ্চারে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের একজন,—মিসেস্ তাবেই এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে সক্ষম হন। তাঁর সঙ্গে একজন শেরপাও উঠেছিলেন ওখানে—তাঁর নাম আং ৎসেরিং। মিসেস্ তাবেই-ই হচ্ছেন প্রথম মহিলা যিনি এই দুঃসাধ্য অভিযানে সাফল্য লাভ করেন।

পরবর্তী কালে একজন ভারতীয় মহিলাও এই অসাধ্য সাধন করেছেন। এঁর নাম বাচেন্দ্রী পাল। ইনি পাহাড়েরই মেয়ে—বাড়ি গঙ্গোত্রীর কাছে একটি গ্রামে। কিন্তু সেখানেই বসে থাকেন নি,

এডমাণ্ড হিলারী: তেনজিং নোরকের সঙ্গে প্রথম এভারেস্ট জয় করেন

সমতলভূমিতে নেমে এসে দস্তুরমত লেখাপড়া শিখেছেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে এম্. এ পাশ করে বারাণসীতে অধ্যাপিকার কাজও নিয়েছেন। এঁরা আমাদের দেশের গৌরব সন্দেহ নেই।

অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার ও আবিষ্কারকের নিরুৎসাহ

হিমালয় থেকে এবার আমরা চোখ ফেরাব সুদূর দক্ষিণে—ম্যাপ খুললে ভারত মহাসাগরের নীচের দিকে যে মস্ত দেশটিকে দেখা যায় সেই দিকে। না, ঠিক দেশ বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে। এটি একটি মহাদেশ, যদিও পৃথিবীর মধ্যে এটিই সবচেয়ে ছোট মহাদেশ। বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই কোন্ মহাদেশের কথা বলছি? বলছি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের কথা।

অথচ এই মহাদেশটির সম্বন্ধে সভ্য জগতের

লোকেরা বহুদিন প্রায় কিছুই জানতেন না। "প্রায়" কথাটি বলছি এইজন্য যে অস্ট্রেলিয়ার কথা যে একেবারেই অজানা ছিল তা নয়, কিন্তু তার পরিচয়টুকু মোটেই লোভনীয় ছিল না। কারণ প্রথম দিকে অস্ট্রেলিয়ায় যাঁরা যাঁরা নেমেছিলেন তাঁরা সকলেই নেমেছিলেন তার পশ্চিম উপকূলে। ও-দিক্‌টা হচ্ছে একেবারে অনুর্বর, পাথুরে দেশ। পাহাড় আর মরুভূমি ছাড়া বিশেষ কিছুই নেই সেখানে। যে সব লোক ক্বচিৎ দেখা যেত ও-সব অঞ্চলে তারাও ছিল একেবারে আদিম জংলী জাতের লোক। আবহাওয়াও ওদিক্‌কার ছিল ভারি বিশ্রী।

তা সত্ত্বেও প্রায় চারশ' বছর আগেও কয়েকবার ইয়োরোপীয় নাবিকদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার পরিচয় ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে স্প্যানিশ, ডাচ্ এবং পোর্তুগীজ নাবিকদের কথাই শোনা যায়। কিন্তু কেউই ও জায়গাটা সম্বন্ধে আগ্রহ দেখানো দূরে থাক, কোন রকমে পালিয়ে আসতে পারলেই যেন বাঁচেন এই রকম ভাব দেখিয়েছিলেন। তারপর ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে ড্যাম্পিয়ার নামে এক ইংরেজ নাবিক অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে গিয়ে হাজির হন। ওদিক্‌টাও ঠিক পশ্চিম উপকূলের মতই মরু-অঞ্চল, কাজেই ড্যাম্পিয়ারের এই আবিষ্কারও সভ্য জগতে কোনও সাড়া জাগাতে পারে নি। ড্যাম্পিয়ার অবশ্য তাঁর ভ্রমণকাহিনীর পুরো বিবরণ দিয়ে একটা বই লিখে গিয়েছিলেন। তাতে ঐ অঞ্চলের কিছু কিছু দ্বীপের ভৌগোলিক বিবরণও ছিল।

শুক্রগ্রহের ভূমিকা

এর অনেক দিন পরের কথা। সেটা ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে ভীষণ সাড়া পড়ে গেছে। কি, না শীগ্‌গিরই, সামনের বছরেই পৃথিবী থেকে শুক্রগ্রহকে ঠিক সূর্যের ওপর দিয়ে যেতে দেখা যাবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এটি একটি বড় ব্যাপার, কারণ এ সব কাণ্ড যখন তখন ঘটে না, আর এই রকম এক একটা সময়ে গ্রহ-তারা সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই এ ব্যাপারটি ভালো করে দেখা যায় না, সব চাইতে ভালো দেখা যায় কয়েকটি বিশেষ জায়গা থেকে। পণ্ডিতেরা হিসেবটিসেব করে বললেন, এবারে প্রশান্ত মহা-সাগরের একটা বিশেষ জায়গায় গেলে এ ব্যাপারটি সবচেয়ে ভালো করে দেখা যাবে।

ইংল্যাণ্ডের রয়াল জিওগ্র্যাফিকাল সোসাইটি এ নিয়ে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। ওখানকার রাজা তৃতীয় জর্জ্‌ও এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাতে লাগলেন। ঠিক হ'ল এজন্য একটি বিশেষ জাহাজে করে কয়েকজন বিজ্ঞানীকে পাঠাতে হবে ঐ অঞ্চলে। কিন্তু দলের নেতা হয়ে যেতে পারেন এমন কে আছেন ?

রয়াল সোসাইটি, যেটা নাকি ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীদের একটা খুব নামকরা সমিতি,—তারা বলল, 'কেন, জেম্‌স্ কুক্‌কে পাঠাও না !'

কুক্-এর নাবিক হিসেবে যেমন খ্যাতি ছিল, নৌযুদ্ধেও তিনি ছিলেন তেমনি ওস্তাদ্। এর আগে ক্যানাডায় তিনি একবার ফরাসীদের সঙ্গে নৌযুদ্ধে খুব বাহাদুরী দেখিয়েছিলেন। তা ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁর ছিল খুব আগ্রহ। ঐ সময়কার বছর দুই আগে একবার সূর্যের পূর্ণগ্রহণের সময় কুক্ অনেক নতুন নতুন তথ্য যোগাড় করে দিয়েছিলেন বিজ্ঞানীদের। একাধারে নাবিক, নৌযোদ্ধা এবং

জ্যোতির্বিজ্ঞানী—এ-রকম বিভিন্ন গুণের সমাবেশ আর কার মধ্যে পাওয়া যাবে? তা ছাড়া, এখানে ভুললে চলবে না যে সেই প্রায় দু'শ' বছর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান এমন নিখুঁত ছিল না। প্রশান্ত মহাসাগর সম্বন্ধেও সে কথা বলা চলে।

সমস্ত সাজসরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে কুক্ একদিন জাহাজ ভাসিয়ে দিলেন। সঙ্গে চললেন আরও দু'জন নামকরা বিজ্ঞানী। সেকালের সেই পাল-তোলা জাহাজ নীল সমুদ্রে ভেসে চলল তর্ তর্ করে। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তাহিতি দ্বীপ, সেইখানে গেলে শুক্রগ্রহটিকে বেশ ভালো করে দেখা যাবে। কুকের গন্তব্যস্থলও তাই এই তাহিতি দ্বীপ।

পুরো আট মাস লাগল তাহিতিতে পৌঁছতে। পথে ঝড়ঝাপ্টা এবং আরও কত যে বিপদ্ ঘটেছিল তার ফর্দ আর নাই বা দিলাম। ১৭৬৯ সালের এপ্রিলে কুক্ গিয়ে তাহিতি দ্বীপে জাহাজ নোঙর করলেন।

দ্বীপের লোকেরা সভ্য জাতের মানুষের সঙ্গে তেমন পরিচিত ছিল না। কুক্ তা জানতেন এবং আসার সময় সে ব্যবস্থাও করে এসেছিলেন। তাই তাঁর সঙ্গে ছিল নানান্ বিচিত্র উপহার।

খবর পেয়ে, এবং এরা যে শত্রুতা করতে আসে নি তা জানতে পেরে, দ্বীপের রাণী স্বয়ং এলেন কুকের কাছে উপহার নিয়ে। কী সে উপহার? পুরো এক কাঁদি কলা আর আস্ত একটা শূয়োর। কুক্ও তাঁকে বঞ্চিত করলেন না, রাণীকে উপহার দিলেন একটা মস্ত বড় পুতুল।

পুতুল পেয়ে রাণী তো মহাখুশি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুতুলের আর একটি দাবীদার এসে জুটল। সে হচ্ছে ওখানকার আর একজন সর্দার। রাণীর পুতুলটি সে কেড়ে নেবেই। ব্যস্, বেধে গেল রাণীতে সর্দারে দারুণ ঝগড়া। কুকের সঙ্গে অবশ্য ও-রকম পুতুল আরও ছিল, কাজেই তারই আর একটা বার করে সর্দারের হাতে দিয়ে তিনিই তাকে শান্ত করলেন।

যথা সময়ে শুক্রগ্রহ তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে দেখা দিল। কুক্ আর তাঁর সঙ্গী বিজ্ঞানীরা যতটা সম্ভব ভালো করে ওর গতিবিধি লক্ষ করতে লাগলেন এবং তা থেকে অনেক মূল্যবান্ তথ্যও আবিষ্কার করলেন।

কুকের অভিযান বন্ধ হ'ল না

এর পর কুক্ ঠিক করলেন যে এখনই তাঁরা দেশে ফিরবেন না, ঐ জায়গাটার কাছাকাছি অন্যান্য অঞ্চল সম্বন্ধেও নানা খবর সংগ্রহ করবেন, জরিপও করবেন ও জায়গাটা। ও বিদ্যেটিও ওঁর বেশ জানা ছিল।

বিপদ্ কিন্তু তাই বলে কাটে নি, আর সে যুগে ও সব মোকাবিলা করবার জন্য সর্বদা তৈরি থাকতেই হ'ত। একবার তো তাঁরা এমন একটা দ্বীপে পৌঁছলেন যেখানকার লোকেরা যুদ্ধে জিতলে পরাজিত সৈন্যদের মেরে কেটে খেয়ে ফেলে। সৌভাগ্যের বিষয় ঐ রকম নরখাদকদের হাতে তাঁদের পড়তে হয় নি।

ঘুরতে ঘুরতে কুক্ এসে পৌঁছলেন নিউজিল্যাণ্ডে। এ জায়গাটির কথাও সভ্য জগতের লোকদের জানা ছিল না। সেই কবে নাকি আর কোন্ এক নাবিক একবার এখানে এসেছিলেন কিন্তু তিনি দ্বীপটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবর লিখে রেখে যান নি। কাজেই ওটির সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য সবই যোগাড় করলেন কুক্।

এর পরেই কুকের জীবনে এল একটা বিরাট আবিষ্কারের গৌরব—যে জন্য তাঁর নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ঘুরতে ঘুরতে তিনি চলে এলেন

অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে, অর্থাৎ আগে যাঁরা যাঁরা এ দেশে এসেছেন তাঁদের ঠিক উল্টো দিকে। এখানে এসে দেখেন কোথায় মরুভূমি, কোথায় পাহাড় ? এ যে ফলেফুলে ভরা এক আশ্চর্য উর্বর দেশ! তিনি জায়গাটির নাম দিলেন নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌।

ক্যাপটেন কুক্ আবিষ্কার করলেন নতুন দেশ নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্

কত রকম নতুন ধরনের জানোয়ার, নতুন ধরনের গাছপালা এখানে দাঁড়িয়ে আছে—যা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। যেমন ক্যাঙ্গারু, কোয়েলা প্রভৃতি অদ্ভুত সব জন্তু, ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ গাছ, আরও কত কি! বিরাট সেই মহাদেশের বাসযোগ্য জায়গাগুলো একটার পর একটা আবিষ্কার করে কুক্ দেশে ফিরে এলেন। তাঁর নাম হ'ল ক্যাপটেন কুক্‌। ঐ নামেই তিনি ইতিহাসে পরিচিত হয়ে আছেন।

কিন্তু এখানেই কুকের অভিযান শেষ হ'ল না। কিছুদিন দেশে কাটিয়ে আবার তিনি রওনা হলেন দক্ষিণ সাগরে। এবার সঙ্গে রইল পুরো তিন বছরের মত খাবারদাবার আর তা ছাড়া প্রচুর গরু-ছাগল-ভেড়া। এগুলো সঙ্গে নেবার উদ্দেশ্য—যে সব দ্বীপে যাবেন সেখানে এগুলো ছেড়ে দিয়ে আসবেন—যাতে ভবিষ্যতে কেউ সেখানে গেলে না খেতে পেয়ে দুর্ভোগে না পড়ে।

ক্যাপটেন কুকের শেষ অভিযান

১৭৭৬ সালে আর একবার। এটাই ক্যাপটেন কুকের শেষ অভিযান। এবারেও কুক্ অনেক নতুন নতুন দ্বীপ আবিষ্কার করলেন—যার মধ্যে হাওয়াই একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। আর একটা মস্ত কাজ করলেন কুক্। একবার দেখা গেল জাহাজের নাবিকেরা সব স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে। কেবল মাত্র জাহাজে জমানো শুকনো খাবার ক্রমাগত খেলে ঐ রোগ হয়। টাটকা শাকসব্জী (যার মধ্যে প্রচুর ভিটামিন থাকে বলে পরবর্তীকালে জানা গেছে) আর লেবুর রস খেলে এ রোগ সেরে যায় এ তথ্য আবিষ্কার করে তিনি বহু নাবিকের প্রাণ রক্ষা করলেন।

কিন্তু নিজের প্রাণ তিনি বাঁচাতে পারলেন না।

না, স্কার্ভি রোগে নয়, তাঁর মৃত্যু হ'ল ঐ হাওয়াই দ্বীপেই। দ্বীপের কিছু লোক তাঁদের জাহাজ থেকে একটা নৌকো চুরি করতে এল। নাবিকেরা বাধা

ক্যাপটেন কুকের শেষ অভিযান

জাহাজের নাবিকেরা স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

দিতে গেল, ফলে বেধে গেল দু'দলে লড়াই। আর, সেই সময়েই, অতর্কিতে শত্রুপক্ষের একটা বল্লম এসে কুকের শরীর প্রায় এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিল। তাঁর অভিযান আর শেষ করতে পারলেন না কুক্।

ভাস্কো-ডা-গামার ভারত আবিষ্কার

'ভারত আবিষ্কার' কথাটা শুনলে হয়তো অনেকেই অবাক্ হবে এবং মুখ টিপে হাসবেও হয়তো কেউ কেউ। কারণ কয়েক হাজার বছর আগেও যখন ইয়োরোপের অনেক অংশ (খোদ এখনকার সুসভ্য ইংল্যাণ্ডও তার ব্যতিক্রম নয়) প্রায় বুনো জাতের পর্যায়ে পড়ত তখন ভারতের সভ্যতা ছিল অকল্পনীয়—যা আজও সমস্ত বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়।

আসলে 'ভারত আবিষ্কার' বলতে পশ্চিম ইয়োরোপ থেকে কি করে জলপথে ভারতে পৌঁছনো যায় সেই চেষ্টার কথাই বোঝায়, কারণ এর আগে ভারত ও পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য প্রধানত আরব ব্যবসায়ীরাই চালাত আর চালাত ইটালির ভেনিসের ব্যবসায়ীরা। পোর্তুগীজ, স্পেন, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলি এ ব্যাপারে কোনই সুযোগ পেত না। অথচ ঐ সময়ে স্পেন, পোর্তুগাল প্রভৃতি দেশের নাবিকেরা পালের জাহাজে চেপেই পৃথিবীর নতুন নতুন অঞ্চল খুঁজে বার করে যাচ্ছে।

এই অবস্থায় পোর্তুগালের লোকেরাই এগিয়ে এল প্রথমে। ডায়াস নামে এক পোর্তুগীজের নেতৃত্বে জলপথে আফ্রিকা মহাদেশ পেরিয়ে ভারতে আসা যায় কিনা তার চেষ্টা হ'ল। ডায়াসের জাহাজ আফ্রিকার একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে এসে ভিড়ল। কিন্তু ঐ সময় সমুদ্র এমন উত্তাল হয়ে উঠল আর ক্রমাগত ঝড়ঝঞ্ঝায় তাঁরা এমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে তাঁর সঙ্গীরা আর এক পা-ও অগ্রসর হতে রাজী হ'ল না। ডায়াস অগত্যা ওখান থেকেই ফিরে গেলেন আর ঐ জায়গাটার—যেটা আসলে একটা অন্তরীপ,—নামকরণ করলেন 'ঝঞ্ঝা-অন্তরীপ'—ইংরেজি

করে বলতে হলে বলতে হয় 'কেপ্ অব্ স্টর্ম্ স্'।

কিন্তু পোর্তুগালের রাজা যখন খবরটা পেলেন তখন তিনি বললেন, 'ও নাম দিয়েছ কেন? ঐ অন্তরীপ তো আমাদের মনে আশা জাগিয়ে দিচ্ছে জলপথে ভারত আবিষ্কারের। ওর নাম রাখ ভালো আশার অন্তরীপ।' ভালো বাংলায় তাই ওটাকে এখনও বলা হয় উত্তমাশা (উত্তম + আশা) অন্তরীপ, আর ইংরেজিতে বলা হয় 'কেপ্ অব্ গুড্ হোপ্।' এ দু'টি নামই আমাদের খুব পরিচিত।

কয়েক বছর পরে আবার ঐ একই পথে অভিযান শুরু হ'ল ভারতের সন্ধানে। ডায়াস্ও দলে রইলেন, কিন্তু দলের নেতৃত্ব নিলেন আর একজন পোর্তুগীজ। এই দুঃসাহাসী নাবিকের নাম ভাস্কো-ডা-গামা।

ভাস্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে উপকূল ধরে ধরে এক সময়ে ভারত মহাসাগরে ঢুকে পড়লেন। পথে অবশ্য এবারেও কম প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে নি। ঝড় যেমন উঠল বাইরে তেমনি সঙ্গীদের মধ্যেও উঠল বিদ্রোহের ঝড়। কিন্তু লৌহ-মানব ভাস্কো-ডা-গামাকে নড়ানো গেল না। তাঁর জাহাজ ভারত মহাসাগরে ভাসতে ভাসতে শেষে একদিন ভারতের মাটিতে এসে নোঙর করল। জায়গাটির নাম কালিকট।

যাই হোক, ভাস্কো-ডা-গামার আশা সফল হ'ল। কালিকটের রাজাকে বলা হ'ত জামেরিন। তাঁকে নানা উপহার দিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন।

কিন্তু ফিরলেন বললে ঠিক বলা হবে না। সেই থেকে পোর্তুগীজরা ক্রমাগত ঐ অঞ্চলে আসতে লাগল। উপহার পেয়ে জামেরিন খুশি হয়েছিলেন কিন্তু এর পরিণাম ভাবতে পারেন নি। এর পর ধীরে ধীরে পোর্তুগীজরা গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি জায়গাগুলো দখল করে সেখানকার কর্তা হয়ে বসল। জলপথে সারা ভারতেই তারা ছড়িয়ে পড়ল—আমাদের বাংলাও রেহাই পেল না তাদের অত্যাচার থেকে। কারণ বাণিজ্য করতে এলেও ওরা সকলেই ছিল জলদস্যু। ওদের অত্যাচারের কাহিনী আমাদের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। এমন কি ভারত স্বাধীন হবার পরেও, যখন ফরাসী প্রভৃতি অন্য ইয়োরোপীয়রা তাদের অধিকার-করা জায়গা-গুলো—যেমন চন্দননগর, পণ্ডিচেরী ইত্যাদি ছেড়ে

ভাস্কো-ডা-গামা

চলে গেল, তখনও পোর্তুগীজ সরকার গোয়া প্রভৃতি অঞ্চলকে পোর্তুগালেরই অংশ বলে দাবী করে সেখানেই গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবার চেষ্টার কসুর করল না। কিন্তু পোর্তুগালের তো এখন আর সে প্রতাপ নেই! অতি সামান্য একটু যুদ্ধের পর ২।৩ দিনেই হার স্বীকার করে তাদেরকে পাততাড়ি গোটাতে হ'ল। গোয়া প্রভৃতি অঞ্চল এখন আবার অখণ্ড ভারতেরই অংশ হয়ে গেছে।

পাঁচটি মহাদেশ

পৃথিবীতে মহাদেশ বলতে আমরা পাঁচটি মহাদেশের কথা জানি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এশিয়া, তার পর উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা—মাঝখানে যেন একটু জোড়া লাগানো, তার পর আফ্রিকা, ইয়োরোপ আর সবচেয়ে ছোট অস্ট্রেলিয়া।

বহু দেশ—বহু রাজ্য মিলে এক একটি মহাদেশ তৈরি হয়েছে। সব দেশ—সব রাজ্যের কথা বলতে গেলে সে তো এক অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত,—নিদেন পক্ষে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই ওদের মধ্যে বেছে বেছে কয়েকটি দেশের কথাই বলব। এর আগে তোমাদের এশিয়ার কয়েকটি দেশের কথা বলেছি। তিব্বত থেকে শুরু করে চীন, জাপান আর আমাদের নিজেদের দেশ ভারতবর্ষের কথা। বলেছি আমাদের বাংলার কথাও। এবারে আস্তে আস্তে অন্য মহাদেশে চলে আসব।

এশিয়ার প্রতিবেশী হচ্ছে আফ্রিকা। ইয়োরোপ-কেও প্রতিবেশী বলতে বাধা নেই। কিন্তু আফ্রিকা আকারে অনেক বড়। তাই আগে তার কথাই একটু বলে নিই।

আফ্রিকা

আফ্রিকার একটা ম্যাপ ১৮৪৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে। এখনকার আফ্রিকা। কত দেশ ছড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে! উত্তরে ভূমধ্যসাগরের গা ঘেঁষে আলজিরিয়া, লিবিয়া, তার পাশে মিশর—যার অন্য নাম ইজিপ্ট। এরপর দক্ষিণে নামতে নামতে সুদান, ইথিওপিয়া (যার আর এক নাম আবিসিনিয়া), নাইজেরিয়া, কঙ্গো, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া, আঙ্গোলা, জাম্বিয়া। তার

পর আরো নীচের দিকে, অর্থাৎ একেবারে দক্ষিণ ঘেঁষে নামিবিয়া আর দক্ষিণ অর্থাৎ সাউথ আফ্রিকা রাষ্ট্র। আর এদের ফাঁকে ফাঁকে আরও ছোটবড় কত রাজ্য !

কিছু বাদসাদ দিয়েও এই এতগুলি রাজ্য নিয়েই এখনকার আফ্রিকার পরিচয়। কিন্তু অল্প কিছুদিন আগেও এরকম ছিল না। তখন আফ্রিকার বেশির ভাগ জায়গাই ছিল বনজঙ্গল, বুনো জানোয়ার আর সেই রকম বুনো জংলী মানুষদেরই দেশ। অবশ্য ওরই মধ্যে কিছু কিছু সভ্য দেশ যে ছিল না তা নয়, কিন্তু গোটা মহাদেশটার তুলনায় তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাই ওকে বলা হ'ত "অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ"। অন্ধকারাচ্ছন্ন বলতে ওখানে সূর্যের আলো পৌঁছয় না ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। বরঞ্চ সূর্যের আলো একটু বেশি করেই পড়ে ওখানে—যার জন্য ওখানকার মানুষগুলো ভীষণ কালো। প্রকৃতির নিয়মেই কালো। চামড়ার নীচে কালো রঙের দানা না থাকলে সূর্যের আলোয় চামড়া বাঁচানোই দায় হ'ত। ঐ কালো রঙই তো চামড়াকে রক্ষা করে। ঠাণ্ডার দেশে ঠিক উল্টো। সেখানে চামড়ার নীচে ও-রকম কালো রঙের দানা না থাকায় সবাই ফরসা,—আমরা তাদেরকে বলি সাদা চামড়ার মানুষ, ভালো বাংলায় শ্বেতকায়। অর্থাৎ গায়ের রঙ ফরসা বা সাদা হওয়াটা কিছু নিজস্ব গুণের ব্যাপার নয়, ওটা প্রকৃতির নিয়মেই হয়ে থাকে।

যাক ও কথা। যা বলছিলাম তাই বলি। আফ্রিকাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলা হ'ত এই কারণে যে আধুনিক সভ্যতা, আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার আলো একেবারেই ওখানে পৌঁছয় নি। ওখানকার লোকেদের চালচলন, জীবনযাত্রা, খাওয়া-পরা ভূতপ্রেতে বিশ্বাস, চিকিৎসার জন্য ওঝার ওপর নির্ভরশীলতা—সবই ছিল প্রায় আদ্যিকালের মানুষের মত।

এর আগে আবিষ্কার ও অভিযানের কথায় (ছোটদের বিশ্বকোষ ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫৯০-১৬০২) বলা হয়েছে কেমন করে বিদেশীরা—বিশেষ করে ইয়োরোপের নানা অঞ্চলের অভিযানকারীরা আফ্রিকার নানা জায়গার সঙ্গে সভ্য জগতের পরিচয় ঘটিয়ে দেন—যাকে আমরা বলি ভৌগোলিক আবিষ্কার। এতে অবশ্য সভ্য দেশগুলির সঙ্গে আফ্রিকার পরিচয় ঘটলেও সুবিধাটা হয়েছিল ঐ সভ্য দেশগুলিরই বেশি। সভ্য করার নাম করে তারা আফ্রিকার নানা অঞ্চল ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিজেরাই দখল করে বসেছিল। ওদেশের লোকদের,—যাদের বলা হয় নিগ্রো,—প্রায় ক্রীতদাস করে ফেলে তাদের দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ্ লুটেপুটে নিচ্ছিল ওরা। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান্, ওলন্দাজ, বেলজিয়ান কেউই বাদ ছিল না। আরও ছিল অনেকে।

দিন বদলে যাচ্ছে

কিন্তু দিন-কাল কখনও একরকম থাকে না। নিপীড়িত, নিঃষ্পেষিত আফ্রিকানরাও এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। লেখাপড়া শিখে তারা আধুনিক সভ্য পৃথিবীকে চিনতে শিখেছে, সেই সঙ্গে বুঝতেও পেরেছে কি ভাবে নিজেদের দেশেই তাদের পরবাসীর মত করে রাখা হয়েছিল। কিছু কিছু জংলী বুনো মানুষ যে এখনও ওখানে নেই তা বলা চলে না, কিন্তু যারা লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পেয়েছে তারা নিজেদের দেশের কর্তৃত্ব অধিকার করতে ছাড়ে নি। পর পর দু' দু'টো বিশ্বযুদ্ধ এ বিষয়ে তাদের সাহায্য করেছে এবং এখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বলা যায় আফ্রিকায় এখন স্বাধীন দেশের সংখ্যা বড় কম নয়। বিদেশীরা অনেকেই তাদের দখল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। যারা আজও ছাড়তে নারাজ তাদের ওপর

এশিয়া মহাদেশ
উত্তর মহাসাগর
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র
সাইবেরিয়া
বেকালহ্রদ
কামস্কাটকা
মঙ্গোলিয়া
বলখাসহ্রদ
কাস্পিয়ান সাগর
কৃষ্ণ সাগর
পিকিং
হোয়াংহো
চীন সাধারণতন্ত্র
ইয়াংসিকিয়াং
পায়ংয়ং
কোরিয়া
টোকিও
তাইওয়ান
হংকং
ফিলিপাইনস
ইরাক
বাগদাদ
তেহরাণ
ইরাণ
কাবুল
আফগানিস্তান
তিব্বত
দিল্লী
সৌদি আরব
দক্ষিণ ইয়েমেন
করাচী
ভারত
কলিকাতা
বোম্বাই
আরব সাগর
বঙ্গোপ সাগর
মাদ্রাজ
কলম্বো
শ্রীলঙ্কা
ব্রহ্মদেশ
রেঙ্গুন
থাইল্যাণ্ড
ব্যাঙ্কক
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
কুয়ালালামপুর
সিঙ্গাপুর
ভারত মহাসাগর

এশিয়া মহাদেশ
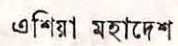
অন্য সব দেশ চাপ দিচ্ছে। যেমন ধরা যাক সাউথ আফ্রিকার কথা। মুষ্টিমেয় কিছু ইংরেজি-ভাষাভাষী সাদা চামড়ার লোক, যারা দেশের জনসংখ্যার অতি সামান্য ভগ্নাংশ—তারা এখনও দেশটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে যাদের আসল দেশ তাদের ওপর চালিয়ে যাচ্ছে শাসন আর অকথ্য অত্যাচার। কিন্তু তাদেরও একদিন নিশ্চয় পাততাড়ি গোটাতে হবে। পৃথিবীতে কোন সাম্রাজ্যই চিরদিন টিকে থাকে নি—থাকতে পারে নি। শিক্ষিত আফ্রিকানরাও এখন শুধু নিজেদের দেশেই নয়, বিদেশে—ইয়োরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে সে সব দেশের লোকেদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে। আফ্রিকার এই নবজাগরণ মানুষেরই জয় বলা যেতে পারে। সেই যে আমাদের দেশের কবি চণ্ডীদাস লিখে গিয়েছিলেন—"শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"—কথাটা যে কত খাঁটি তা এই লেখা লিখবার সময়েই টের পেলাম। হঠাৎ রেডিওতে খবর এল—এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন একজন আফ্রিকান সাহিত্যিক—সোয়েঙ্কা। ইনি নাইজেরিয়ার অধিবাসী। প্রতিভাকে কি কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে?

মিশর দেশ

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে একটা খুব বড় দরের সুসভ্য দেশই রয়েছে কিন্তু আফ্রিকায়। এ দেশটি হচ্ছে মিশর বা ইজিপ্ট। প্রাচীন মিশরের সভ্যতার কাহিনী ছোটদের বিশ্বকোষ ইতিহাসের কথায় বিশদ-ভাবে বলা হয়েছে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম ও ২য় খণ্ড)।

মিশরকে বলা হয় নীলনদের দান। এই নদীর উপত্যকা ঘিরেই গড়ে ওঠে এর সভ্যতা—যীশুখৃষ্টের জন্মেরও প্রায় সওয়া তিন হাজার বছর আগে। কত রাজবংশ যে এখানে পর পর রাজত্ব করে গেছেন তার কথা ভাবলে অবাক্ লাগে।

প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে মানুষের ২টি

সম্রাট্ তুতেন খামেনের (তুৎ-ইন্‌খ্-আমেন) ম্যমী

আত্মা। একটি আত্মা মৃত্যুর পরেও দেহ ছেড়ে যায় না, সেজন্য তারা মৃতদেহ না পুড়িয়ে বা কবর না দিয়ে অদ্ভুত উপায়ে সংরক্ষিত করে রাখত—যা নাকি হাজার হাজার পরেও পচে নষ্ট হ'ত না। আর সঙ্গে দিয়ে দিত তার প্রিয় জিনিসপত্রও। এই সব সংরক্ষিত

মৃতদেহকে বলা হ'ত ম্যমী। কলকাতার যাদুঘরে এরকম প্রায় চার হাজার বছর আগেকার একটি মিশরীয় ম্যমী হয়তো অনেকেই দেখে থাকবে। মিশরের রাজাদের বলা হ'ত ফ্যারাও। ফ্যারাওরা তাঁদের ম্যমী রাখবার জন্য বিরাট বিরাট পাথরের পিরামিড তৈরি করে রাখতেন। পাহাড়ের মত উঁচু এই রকম অনেক পিরামিড এখনও মিশরের কোন কোন জায়গায়
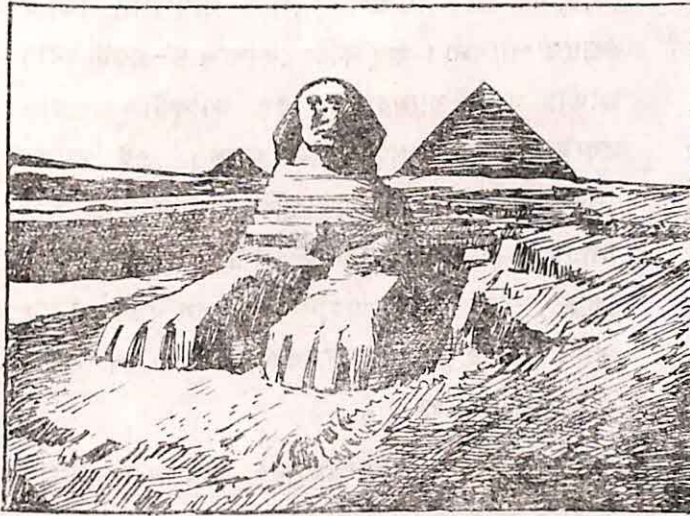
পিরামিডের পাশে স্ফিংস

দেখা যায়। তার কোন কোনটা চার হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো। রাজাদের ম্যমী, তাঁদের ব্যবহারের জিনিসপত্র এই সব পিরামিড থেকে উদ্ধার করে এখন নানা মিউজিয়ামে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সেকালের মিশরীরা প্যাপারাস্ গাছের পাতায় ছবির অক্ষরে যে সব কাহিনী লিখে গেছে তারও নমুনা এখনও ওখানে দেখতে পাওয়া যায়। পিরামিডের আমলে সে-যুগে তৈরি মানুষের মাথা আর সিংহীর শরীরওয়ালা স্ফিংস্ এখনও দাঁড়িয়ে আছে তার বিরাট মূর্তি নিয়ে।

চিরকালই কেউ শক্তিশালী থাকে না। মিশরের রাজারা শক্তি হারালে পারস্যের রাজা মিশর জয় করে নেন। তারপর আসেন ম্যাসিডোনিয়ার দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার। আলেকজাণ্ডার শুধু মিশরই জয় করেন না, জয় করে নেন পারস্যও। উত্তর মিশরে তিনি পত্তন করেন আলেকজেন্দ্রিয়া শহর। আলেক-জাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতি টলেমি মিশর শাসন করতে থাকেন। তাঁরই বংশের শেষ শাসক ছিলেন বিখ্যাত রাণী ক্লিওপেট্রা। মিশরের রাণী হলেও আসলে তিনি গ্রীক। ক্লিওপেট্রার পর মিশর চলে যায় রোমানদের হাতে। তারপর আরবরা ও দেশ জয় করে এবং ওদেশের লোকেরা ধীরে ধীরে সবাই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে মিশর হয়ে যায় একটি পুরোপুরি মুসলিম রাজ্য। আজও মিশর তাই আছে। এরপর তুরস্ক, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি নানা দেশের অধীনতা মানতে মানতে ১৯৫৩ সালে, অর্থাৎ ২য় মহাযুদ্ধের বেশ কিছুদিন পরে মিশর পুরোপুরি প্রজাতান্ত্রিক দেশ হয়ে যায়। ওখানকার রাজা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। পরে সীরিয়ার সঙ্গে একত্রে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক নামে নতুন রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

নীল নদের দাক্ষিণ্যে উর্বর এবং সমৃদ্ধ দেশ হয়ে উঠলেও মিশরে কিন্তু মরুভূমিরও অভাব নেই। সাহারা তো কাছেই রয়েছে, তবে নীল নদের কল্যাণে মিশর-বাসীরা মোটামুটি সুখেই আছে। ওখানে যে তুলোর চাষ হয় গোটা পৃথিবীতে তার জুড়ি মেলা ভার। তা ছাড়া নিম্ন মিশরে প্রচুর ভুট্টার চাষ হয়। এই ভুট্টা গ্রামের লোকদের শুধু খাবারই যোগায় না, ও থেকে বাড়ি তৈরির মালমশলা পাওয়া যায়, পাওয়া যায়

জ্বালানী, আর পাওয়া যায় গৃহপালিত পশুদের খাদ্য। তা ছাড়া মিশরে যে খেজুর জন্মায় তারও তুলনা নেই। কম করে তিরিশ জাতের খেজুর জন্মায় ওখানে যা নাকি দেশবিদেশে চালান যায়। মিশরীয় খেজুর খুবই সুস্বাদু।

সারা বছর ধরে মিশরে ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া বয়—মিশরীয়দের কাছে সেটা ভগবানের আশীর্বাদ বলা চলে।

রাজধানীর নাম কায়রো। মস্ত জমজমাট আধুনিক শহর। আজকাল নানা দেশের লোক এসে এখানে ভিড় জমিয়েছে। যাযাবর আরব, বেদুইন যেমন আছে তেমনি আছে প্রচুর বিদেশী। ইংরেজ, ফরাসী, গ্রীক, ইটালিয়ান্, বেলজিয়ান প্রভৃতি তো আছেই, ভারতীয়ও দেখা যাবে অনেক। এক কায়রোর প্রথম ফাউদ বিশ্ববিদ্যালয়েই তো কম করে দশ হাজারের ওপর ছাত্র পড়ে। এ ছাড়া আর একটা খুব পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয় আছে এখানে—আল্-আজাহার বিশ্ব-বিদ্যালয়। হাজার বছরেরও পুরোনো এটি। এটিকে ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলা চলে। মুসলিম আদর্শ অনুসরণ করে এখানে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে কোরান ও মুসলিম আইনের ওপর খুব জোর দেওয়া হয়।

মুসলমান মেয়েদের মধ্যে পর্দা প্রথা আছে অনেক দেশেই। কিন্তু এ যুগের মুসলিম মেয়েরা আর পর্দার আড়ালে থাকতে রাজী নয়। মিশরেও এই ধরনের মেয়ের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে।

সাহারা মরুভূমি

আফ্রিকার কথা বলতে গেলে সাহারা মরুভূমির কথা কিছুটা না বললে ঐ মহাদেশ সম্বন্ধে সম্যক্ বলা হয় না। এত বড় মরুভূমি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। নামটা শুনলেই মনে হয় সাহারা তো নয়, যেন হাহাকার!

সত্যি সাহারা একটি আতঙ্কের রাজ্য। সমুদ্রের মত দেখতে, কিন্তু সে সমুদ্রে জল নেই,—রয়েছে শুধু রুক্ষ বালি আর বালি আর বালি। কতটা জায়গা জুড়ে? তা আমাদের ভারতবর্ষের চাইতেও অনেকটা বেশি। রুক্ষ বলে রুক্ষ! বছরের পর বছর এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে না, জল না পেয়ে গাছপালা কিছুই জন্মাতে পারে না। শুধু ক্বচিৎ কোথাও দু'-একটা মনসা জাতীয় গাছ—যাদের বলা হয় ক্যাক্টাস্—কোন রকমে মাথা তুলে খাড়া হয়ে আছে। এই গাছের শিকড় খুব লম্বা আর পাতাগুলি তেমনি পুরু আর চ্যাটালো। বালির অনেক নীচে নেমে গিয়ে সে শিকড় ভূগর্ভ থেকে একটু-আধটু রস টেনে নিতে পারে আর ঐ বিশেষ গড়নের পাতাগুলি তা সহজে বেরিয়ে যেতে দেয় না।

যেখানে জল নেই, গাছ নেই, সেখানে জনপ্রাণীও থাকতে পারে না। ক্বচিৎ দু'-একটা পোকামাকড়, সাপ, বিছে বা গিরগিটি জাতের প্রাণী হয়তো ধারে ধারে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু ভিতরে গেলে একেবারে চিরনিস্তব্ধতার দেশ। আবহাওয়াও তেমনি অদ্ভুত। দিনের বেলা মাটি যেমন চট্‌পট্ তেতে ওঠে, রাত্রে তেমনি ঠাণ্ডাও পড়ে খুব তাড়াতাড়ি। দিনের বেলা উত্তাপ কখনও ১১০ ডিগ্রীর নীচে নামতে চায় না, আবার রাত্রে এমন শীত পড়ে যে গায়ে চাপা না দিলে চলে না। তবু মানুষকে প্রয়োজনের খাতিরে এই মরুভূমি পার হতে হয়। পার হবার একমাত্র বাহন উট—যার অপর নাম মরুভূমির জাহাজ। সাহারা দিয়ে চলতে গেলে সব সময়ে দল বেঁধে চলতে হয়, কারণ ওরই

উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর
ভূমধ্যসাগর
আলজিয়ার্স
টিউনিস
রাবাত
মরক্কো
ত্রিপোলি
কায়রো
পোর্টসৈয়দ
এল আইউন
আলজিরিয়া
লিবিয়া
মিশর
স্পেনীয় সাহারা
সাহারা মরুভূমি
মাউরিটানিয়া
নাইজার (সাধারণতন্ত্র)
চাদ (সাধাঃ)
সুদান
মালি
নিয়ামি
বামাকো
ডাকার
সেনেগাল
বিসাউ
কোনাক্রি
ফ্রিটাউন
লাইবেরিয়া
আইভরি কোস্ট (সাধাঃ)
ঘানা (সাধাঃ)
নাইজেরিয়া
লাগোস
আবিদজান
ফোর্টলামি
মধ্য আফ্রিকা
বাঙ্গুই
এডেন
জিবুতি
আদিস আবাবা
ইথিওপিয়া
সোমালিয়া
মোগাডিশু
কেনিয়া
নাইরোবি
গিনি উপসাগর
লিব্রেভিল
গাবোন (সাধাঃ)
কঙ্গো
জাইরে
ব্রাজাভিল
কিনসাসা
তাঞ্জানিয়া
দারএসসালাম
লোয়াণ্ডা
আঙ্গোলা
জাম্বিয়া
লুসাকা
দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর
সলিসবারি
রোডেসিয়া
নামিবিয়া
বতসোয়ানা
মাদাগাস্কার
টানানারিভ
গাবেরোনস
ট্রান্সভাল
প্রিটোরিয়া
দক্ষিণ আফ্রিকা সাধারণতন্ত্র
কেপটাউন
ভারত মহাসাগর
আফ্রিকা মহাদেশ

আফ্রিকা মহাদেশ

মধ্যে যখন তখন দস্যুরা এসে উপদ্রব করে, সর্বস্ব কেড়েকুড়ে নিয়ে যায়। তাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য বন্দুক-টন্দুক নিয়ে চলতে হয়। রাতেও পালা করে ঘুমুতে হয়। যারা জেগে থাকে তাদের জাগিয়ে রাখার জন্য অনেক সময় পেশাদার কিস্‌সা-কহনে-

সাহারা মরুভূমি পার হচ্ছে দল বেঁধে যাত্রীদল

ওয়ালা অর্থাৎ যারা বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে পারে তাদের সঙ্গে নিতে হয়। এই সব গল্প বলনেওয়ালা লোকদের মুখের গল্প নিয়েই নাকি "আরব্য রজনী" বা আরব্যোপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছিল।

বালির সমুদ্র হলেও সাহারা কিন্তু সবটা একরকম নয়। কোথাও বালি জমাট বেঁধে পাথর হয়ে গেছে —যাকে বলে বেলে পাথর। সেই বেলে পাথর জমে তৈরি হয়েছে বড় বড় ঢিবি—রুক্ষ পাহাড়। মাঝে মাঝে অবার গভীর খাদ। আছে চোরবালি, আছে মরুঝঞ্ঝা ঘূর্ণিবায়ু। বালুরাশি পাক খেয়ে খেয়ে থামের মত উঁচু হয়ে ওঠে। তারপর বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে ভীমবেগে ছুটতে থাকে, ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে। তার ভিতর একবার পড়লে বাঁচার আশা খুবই কম। উড়ন্ত বালির ঘষায় শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তাই বলছিলাম বড় ভীষণ জায়গা এই সাহারা মরুভূমি।

তবে একটু স্বস্তির কথা এই যে ঐ বালির সমুদ্রের মধ্যেও জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট মরূদ্যান দেখতে পাওয়া যায়। ইংরেজিতে ওগুলিকেই বলা হয় ওয়েসিস্। সেখানে জল পাওয়া যায়, খেজুর গাছ গজায়, পাওয়া যায় তাদের ফল, তাদের ছায়া। লোকও বাস করে সেখানে।

কি করে এটা সম্ভব? বালির নীচে আগাগোড়াই বালির স্তর থাকতে পারে না। অনেক নীচে, তা সে যত নীচেই হোক না কেন, কিছুটা জলের স্তর থাকবেই। কখনও তা দেখা দেবে ঝরণা হয়ে এবং উঠে আসবে বালির স্তর ভেদ করেও। সেই জল জমা হয়ে ছোট ছোট জলাশয় তৈরি করবে এবং তাকেই ঘিরে তৈরি হবে এই সব ছোট ছোট গ্রাম বা মরূদ্যান।
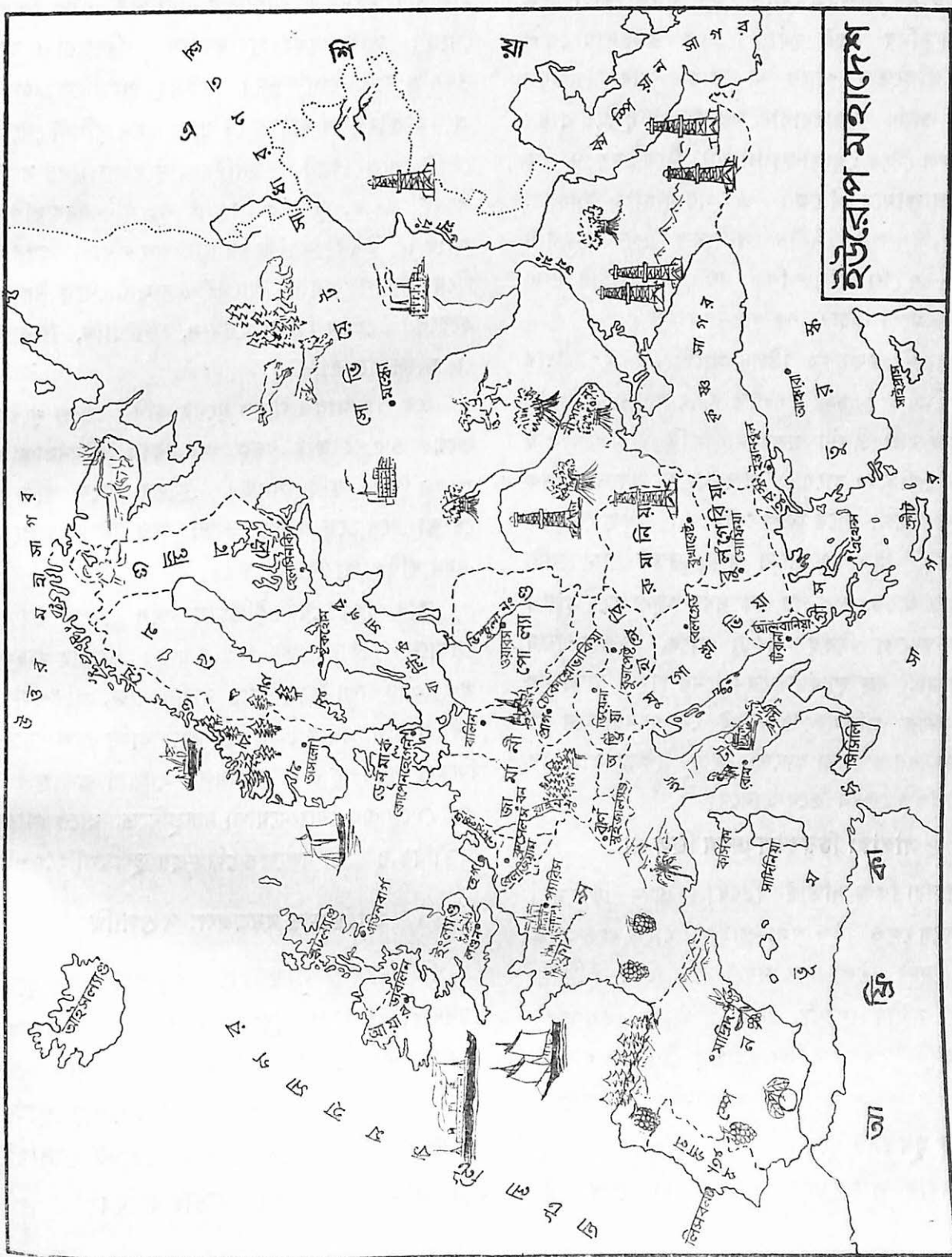
ইয়োরোপ মহাদেশ

এই সব মরূদ্যানে যারা ডেরা বাঁধে তারা কিন্তু ঐ মরুভূমির মতই দুর্দান্ত। এক জায়গায় বেশি দিন থাকতেও পারে না তারা—থাকা সম্ভবও নয়। কারণ খাবারদাবার অল্প সময়েই ফুরিয়ে যায়। তখন দল বেঁধে ঘোড়া-ছাগল-উট নিয়ে বেরুতে হয় নতুন আস্তানার খোঁজে। এই সব যাযাবর লোকেরা সুযোগ পেলেই নিরীহ পথিকের ওপর লুটপাট করবে—এ তো অস্বাভাবিক নয়। সাহারার নানা বিপদের মধ্যে এরাও এক ধরনের বিপদ।

আরও একরকম বিপদ আছে ওখানে। তার নাম মরীচিকা। চলতে চলতে হঠাৎ হয়তো মনে হ'ল সামনেই বুঝি একটা মরূদ্যান, খানিকটা এগোলেই ওখানে পৌঁছনো যাবে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত পথিক আশার আলো পেয়ে ছুটল সেদিকে। কিন্তু কোথায় মরূদ্যান? যত এগোনো যায় ততই যেন সেটা পিছোতে থাকে, তার পর এক সময় অদৃশ্য হয়ে যায়। মরূদ্যান হয়তো ঠিকই একটা আছে, কিন্তু ও-রকম সামনে নয়, বহু দূরদূরান্তরে। মরুভূমির বাতাসের বিভিন্ন স্তরে প্রতিসরণের ফলেই যে এমনটা মনে হয় তা বিজ্ঞানের ছাত্রেরা হয়তো জানে কিন্তু সাহারার শ্রান্ত পথিক কেমন করে জানবে?

সাহারা চিরকাল এমন ছিল না

সাহারা কিন্তু সত্যিই চিরকাল এমন ছিল না। এক সময়ে সেও ছিল শস্য-শ্যামলা যাকে বলে সবুজ দেশ। নদী ছিল, মানুষের বসতি ছিল, পৃথিবীর অন্যান্য সজীব দেশের মতই সাহারাও ছিল তখন প্রাণচঞ্চল। সে কত দিন আগে? ঠিক কত হাজার বছর আগে বলা কঠিন। যাকে আমরা বলি প্রাগৈতিহাসিক যুগ সেই যুগে।

সাহারার পাহাড়ের গুহায় আদ্যিকালের সেই মানুষেরা তাদের জীবনযাত্রার নানা ছবি এঁকে রেখে গেছে। তাই দেখেই পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এ সব তথ্য জানতে পেরেছেন। এইসব গুহাচিত্রে এমন অনেক জীবজন্তুর ছবি আছে যারা এখন পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। আদিম মানুষেরা তাদের সঙ্গে লড়াই করছে, তাদের শিকার করছে—এসব ছবিও আছে। এমন সব জন্তুর ছবি আছে যারা এখনও টিকে থাকলেও বহুদিন আগেই ও-তল্লাট থেকে উধাও হয়েছে। যেমন হিপ্পোপটেমাস, উটপাখি, জিরাফ জেব্রা, গণ্ডার, হাতি।

এর পর আরও পরের যুগের ছবি। যীশু খৃষ্টের জন্মের ৪।৫ হাজার বছর আগেকার জীবনযাত্রা। তারও পরের ছবি আছে। যুদ্ধের সাজে সজ্জিত যোদ্ধা রথে চড়ে শত্রুকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে এমন ছবিও পাওয়া গেছে।

তার পরই যেন ইতিহাস এসে থেমে গেছে সেখানে। কারণ তো বোঝাই যায়। এসেছে প্রচণ্ড খরা, গাছপালা মিশে গেছে মাটির সঙ্গে, খাল-বিল, নদী শুকিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে বালি এসে ঢেকে দিয়েছে সব কিছু। শস্যশ্যামলা সাহারা রূপান্তরিত হয়ে গেছে এক যোজনযোড়া মরুভূমিতে, যাকে আজ বিভীষিকার রাজ্য বললেও বোধ হয় ভুল বলা হবে না।

আফ্রিকার বনজঙ্গল, পশুপাখি

বিচিত্র দেশ আফ্রিকা। এর বিরাট ভূখণ্ড যুড়ে যেমন ছড়িয়ে আছে ধূধূ-করা মরুভূমি, তেমনি এখনও বিরাট অঞ্চল যুড়ে পড়ে আছে দুর্ভেদ্য অরণ্য। সে অরণ্য এতই গভীর যে তার অনেক জায়গায় সূর্যের আলোও সহজে পৌঁছতে পারে না, দিনের বেলায়ই মনে হয় যেন ঘনিয়ে এসেছে গভীর রাত্রি।

কত বিচিত্র বনস্পতি ছেয়ে রেখেছে এই সব অরণ্য। পৃথিবীর অন্যত্র তার নমুনা খুঁজে পাওয়াও দুঃসাধ্য। এমন সব প্রাণী এসব অরণ্যে বাস করে যা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। হিংস্র সিংহ,
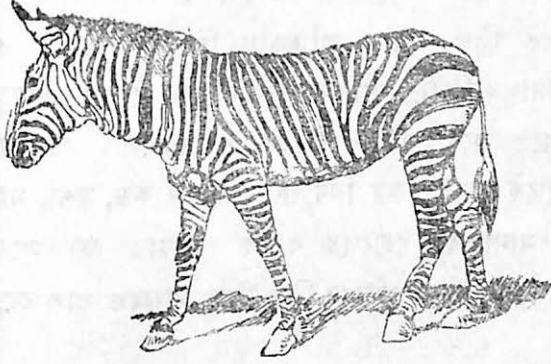
জেব্রা একমাত্র আফ্রিকায় পাওয়া যায়

লম্বা কানওয়ালা অতিকায় হাতি, বিরাট বীভৎস-মুখো হিপ্পোপটেমাস—যাকে বাংলায় অনেকে বলেন জলহস্তী, অতিকায় গণ্ডার এ সব তো আছেই, আর আছে নানা জাতের বানর ও বনমানুষ যাদের বলা হয় এপ্। এই সব অতিকায় এপ্‌এর মধ্যে মানুষের সঙ্গে যাদের সবচেয়ে মিল সেই গরিলা একমাত্র
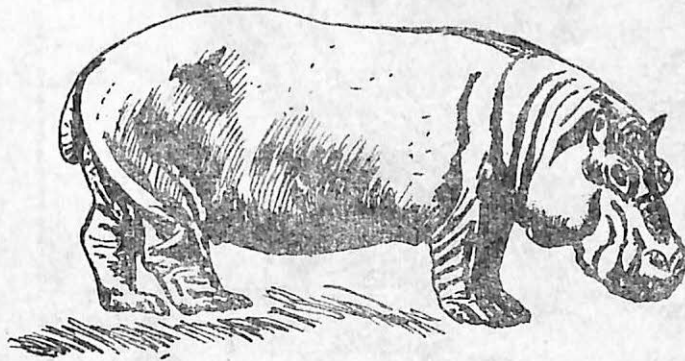
আফ্রিকার আর একটি নিজস্ব প্রাণী : হিপ্পোপটেমাস

আফ্রিকায়ই দেখতে পাওয়া যায়। কঙ্গো দেশের জঙ্গলেই বেশির ভাগ গরিলার বাস; কিছু অন্য জাতের পাহাড়ী গরিলা থাকে কিভু উপত্যকায়। এই অতিকায় দানবাকৃতি মানুষের জাতভাইটি কিন্তু সংখ্যায় ক্রমেই

লম্বা কানওয়ালা আফ্রিকার হাতি

কমে যাচ্ছে। প্রাণিবিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীতে গরিলার সংখ্যা এখন মাত্র কয়েক হাজারে এসে ঠেকেছে এবং ঠিকমত ব্যবস্থা না নিলে এরা হয়তো ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে।

গরিলা ছাড়া অপেক্ষাকৃত ছোট জাতের, কিন্তু প্রচণ্ড বুদ্ধিওয়ালা বনমানুষ বা এপ্ হচ্ছে শিম্পাঞ্জী। মানুষের অনুকরণ করতে ওদের যুড়ি নেই। এই শিম্পাঞ্জীও কেবল আফ্রিকার জঙ্গলেই দেখতে পাওয়া যায়। বেবুন হচ্ছে আর এক জাতের বড় আকারের প্রাণী, যারা

এপ্ না হলেও চালচলনে প্রায় তাদেরই সমকক্ষ। অসম্ভব হিংস্র এই বানর একমাত্র আফ্রিকাতেই
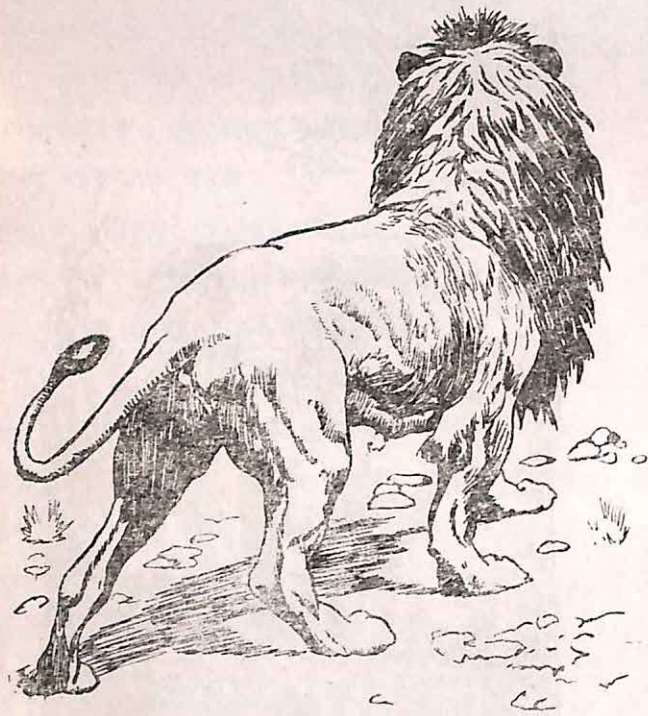
আফ্রিকার দুরন্ত পশু সিংহ

এখন পর্যন্ত টিকে আছে।

অন্যান্য পশুপাখির মধ্যে লম্বা-গলা জিরাফ, সারা গায়ে ডোরা কাটা, দেখতে ঠিক ঘোড়ার মত, —জেব্রা, বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় আকারের পাখি অস্ট্রীচ্—বাংলায় যাকে আমরা বলি উটপাখি —এরাও একমাত্র আফ্রিকার জঙ্গলেই বাস করে। উটপাখি উড়তে পারে না। অব্যবহারের ফলে তার পাখা থেকেও তা কোন কাজে আসে না। কিন্তু উটপাখি ছুটতে পারে দুরন্ত বেগে। ঘণ্টায় ৫০।৬০ মাইল, অর্থাৎ মোটর গাড়ির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারে সে। গায়েও তার অসম্ভব জোর। ওদের এক একটা ডিম দিয়ে ৩০।৪০ জন লোককে ওম্‌লেট ভেজে খাইয়ে দেওয়া যায়। এ থেকেই বোঝা যায় পাখিটার আকৃতি কত বড়।

এ ছাড়া ছোট বড় নানা হিংস্র ও অহিংস্র প্রাণী আজও লোকচক্ষুর আড়ালে বাস করছে আফ্রিকার জঙ্গলে। ওখানকার নদীনালা, ঝিল-বিলগুলোও থিক্ থিক্ করছে অতিকায় হিংস্র কুমিরে। এক কথায় পৃথিবীর আদিম জীবন দেখতে গেলে তোমাকে যেতে হবে আফ্রিকার এই সব জঙ্গলে। তা ছাড়া আছে নানা রকম বিষাক্ত পোকামাকড়, মশা, মাছি —নানারকম রোগের বাহক যারা। তা সত্ত্বেও এসব জঙ্গলে আবার কিছু কিছু মানুষও বাস করে।

আফ্রিকার জংলী সর্দার সিংহের সঙ্গে লড়াই করছে

বেরিং প্রণালী
আ লা স্কা
বেফিন উপসাগর
বেফিন দ্বীপ
হাডসন প্রণালী
হাডসন উপসাগর
লা ব্রা ডর
লাব্রাডর সাগর
ক্যা না ডা
উইনিপেগ হ্রদ
ভ্যাঙ্কুবর
মন্ট্রিল
নিউ ইয়র্ক
ওয়াশিংটন
মিসৌরী নং
যু ক্ত রা
মে ক্সি কো উ প সা গ র
হাভানা
কি উ বা
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ
মেক্সিকো সিটি
ক্যা রি বি য়া ন সা গর
পানামা
উত্তর আমেরিকা
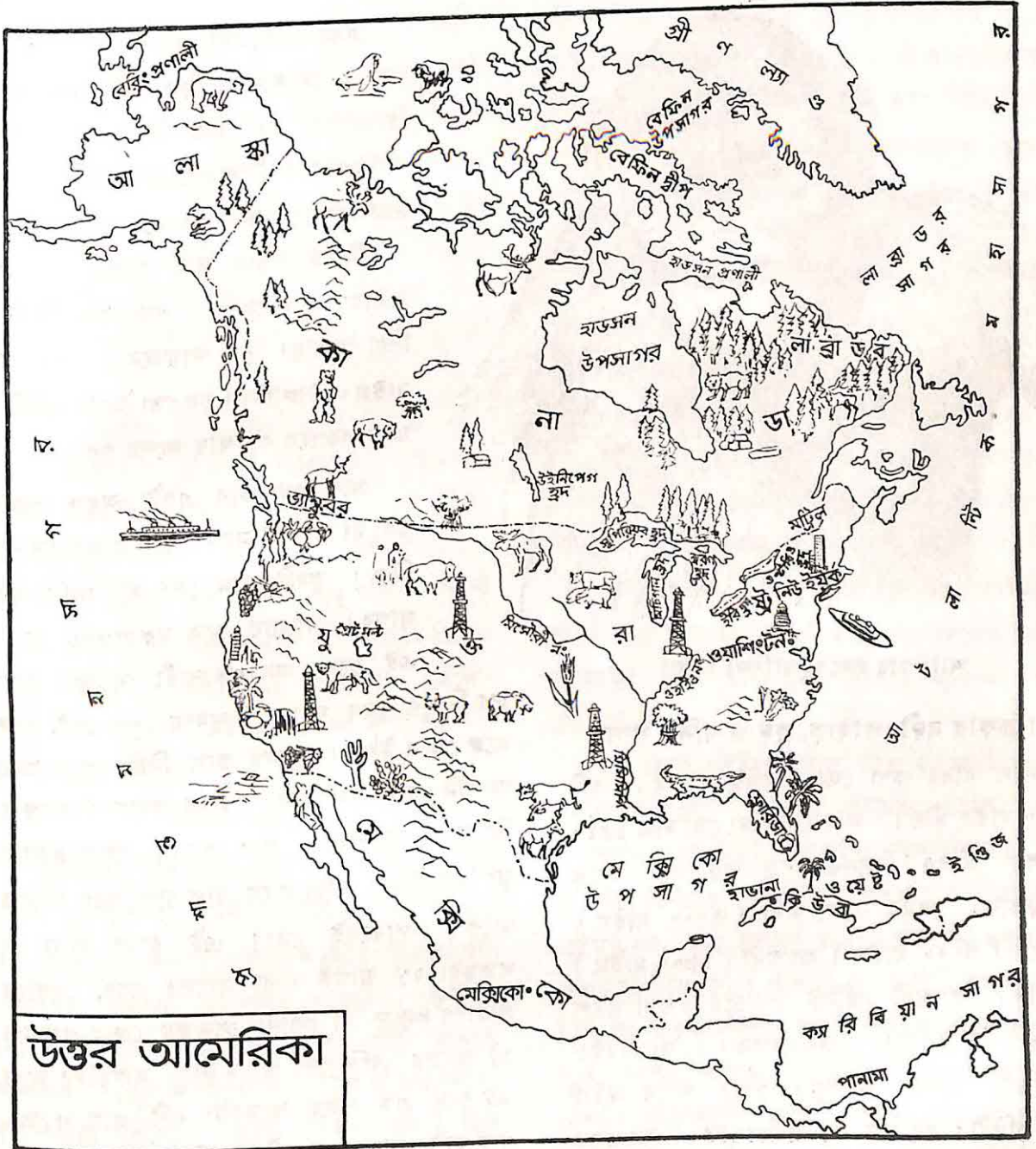
উত্তর আমেরিকা

বলা বাহুল্য তাদেরও জীবন সভ্য জাতের মানুষের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা।

আফ্রিকার জঙ্গলের বাসিন্দা গরিলা

আফ্রিকার নদী, পাহাড়, হ্রদ ও খনিজ সম্পদ্

নীল নদের কথা তো আগেই বলেছি। এটি ৩৬০০ মাইল দীর্ঘ। আমাদের গঙ্গা তো মাত্র ১৫৫৭ মাইল। আরও অনেক বড় বড় নদী আছে আফ্রিকায়। যেমন কঙ্গো নদী (৩০০০ মাইল), নাইগার (৩০০০ মাইল), জাম্বেসী (১৬০০ মাইল) ইত্যাদি। জাম্বেসী নদীরই সবচেয়ে চওড়া অংশে রয়েছে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। আমেরিকা-ক্যানাডার নায়গ্রা আবিষ্কৃত হবার আগে এটাই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত। অনেকের মতে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত কোন কোন দিক্ থেকে নায়গ্রার চাইতেও বেশি আকর্ষণীয়। কারণ এটি চওড়ায় অত বড় না হলেও, এর গভীরতা খুব বেশি।

যেমন অরণ্য, নদী, জলপ্রপাত,—তেমনি পাহাড়-পর্বতেও আফ্রিকা কম যায় না। হিমালয়ের মত অত উঁচু না হলেও আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারোর সবচেয়ে উঁচু চূড়া কিবোর উচ্চতা ১৯,৭১০ ফুট।

বিরাট বিরাট স্বাদু জলের হ্রদেরও অভাব নেই ও-দেশে। ওখানকার ভিক্টো-রিয়া নায়াঞ্জা হ্রদ আয়তনে ২৬০০০ বর্গ মাইল। টাঙ্গানিকা হ্রদ তো দৈর্ঘ্যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় স্বাদু জলের হ্রদ।

তবে ওখানকার একটা অদ্ভুত হ্রদের কথা না বললেই নয়। স্বাদু জলের হ্রদ নয় কিন্তু! হ্রদটির নাম ডেড্ সী অর্থাৎ মৃত সাগর। বাংলায় ওকে মরুসাগরও বলে। এই হ্রদের জল এত ভারী যে তার মধ্যে ডুব দিলেও ডুবে যাবার বিন্দুমাত্র ভয় নেই, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠবে। হ্রদের জলে দিব্যি শুয়ে শুয়ে আপনি ভেসে চলা যায়। ইচ্ছে করলে ঐ অবস্থায় চিৎ হয়ে বই পড়াও যেতে পারে। জলে একবার ডুব দিয়ে উঠলে সারা গায়ে চাপ চাপ লবণ আটকে থাকে। থাকবেই তো! এই হ্রদের মধ্যে যে শতকরা ২১ ভাগই নানা জাতের লবণ, যেখানে সাধারণ সমুদ্রে বা লোনা হ্রদে বড় জোর শতকরা ৩২ ভাগের বেশি লবণ থাকে না। মরুভূমির মধ্যে এই হ্রদে এক সময়ে কয়েকটা নদী এসে পড়ত। সেই নদীর জল এসে ওটিকে ভরিয়ে রাখত। কিন্তু প্রচণ্ড খরায় সে নদী কোন্ কালে শুকিয়ে গেছে, নতুন করে আর জল আসছে না হ্রদে। কিন্তু

মরুভূমির উত্তাপে হ্রদের জলের তো রেহাই নেই! সে জল ক্রমাগত বাষ্প হয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশে। বৃষ্টিরও নামগন্ধ নেই ও অঞ্চলে। ফলে হ্রদের জলীয় অংশ ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। কিন্তু ওর মধ্যে গুলে আছে নানা জাতের লবণ। সেগুলো তো আর উঠে যেতে পারে না। সেগুলির অনুপাত তাই হ্রদের জলের তুলনায় ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে এখন এই অবস্থা। এখন অবশ্য মরুসাগরের চারপাশে কল-কারখানা বসিয়ে ওর ভিতরকার মূল্যবান্ খনিজ সম্পদ্ অর্থাৎ ঐ সব লবণ তুলে নেবার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা।

খনিজ সম্পদ্ কিন্তু আফ্রিকায় আরও নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে প্রচুর পরিমাণে। বিদেশীরা এতদিন সেগুলি লুটেপুটে নিয়েছে। এখন দেশের লোকেরা শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে তা নিজেরাই উদ্ধার করবে এই আশা করা যায়। শুধু খনিজ সম্পদ্ই নয়,—নানারকম মূল্যবান্ জহরৎ—বিশেষ করে হীরেও আছে আফ্রিকার কোন কোন জায়গায়। সোনা-রূপো তো আছেই। তা ছাড়া বনজ সম্পদের কথা তো আগেই বলেছি।

ইথিওপিয়া

আফ্রিকার আর একটি পুরোনো স্বাধীন রাজ্যের কথাও এই সঙ্গে বলে নিই। এটির নাম ইথিওপিয়া, আবিসিনিয়া নামেও একে অনেকে চেনে। এখানকার লোকদের আমরা বলতাম হাবসী। মুসলিম রাজত্বের সময় আমাদের দেশে ওরা অনেকে এসেছিল। কেউ ক্রীতদাস হয়ে, কেউ চাকরি নিয়ে। পাহারাদার হিসেবে ওদের কিছুটা সুনাম ছিল এদেশে। আফ্রিকার ম্যাপে দেখ—দেশটি একেবারে আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় পূব দিক্ ঘেঁষে রয়েছে।

খুবই পুরোনো দেশ এই ইথিওপিয়া। বাইবেলেও ওর কথা আছে। তবে তখন ওর নাম ছিল কুশ্। সেই বিখ্যাত শেবার রাণীর গল্প হয়তো অনেকের জানা আছে। ইথিওপিয়ার রাজারা বলতেন তাঁদের পূর্বপুরুষ মেনেলাক হচ্ছেন এই শেবার রাণী আর বাইবেলের বিখ্যাত রাজা সলোমনের ছেলে। শেবার রাণী নাকি ছিলেন এই ইথিওপিয়া দেশেরই মেয়ে। হবেও বা।

ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে ইথিওপিয়ার পরিচয় দেড় হাজার বছরেরও বেশি। আজ থেকে প্রায় সাড়ে ষোলশ' বছর আগে ইয়োরোপের এক খৃষ্টান পাদ্রি ওদেশে প্রথম যান এবং, খৃষ্টান পাদ্রিদের যা নিয়ম,—গিয়েই ওখানে খৃষ্টধর্ম প্রচারে লেগে যান। তাঁর প্রভাবে পড়ে অনেক ইথিওপিয়ান্ খৃষ্টধর্ম গ্রহণও করে। পাদ্রিটির নাম ছিল ফ্রমেন্টিয়াস্।

পরবর্তীকালে কিন্তু ইথিওপিয়া মুসলমানদের হাতে এসে পড়ে। তারাই হয়ে যায় দেশের কর্তা। আমাদের দেশে হাবসীদের আসার কারণও বোধ হয় এই।

যাই হোক, ইথিওপিয়ায় কিন্তু খৃষ্টানদের সংখ্যা কমানো যায় নি। কিছুদিন আগেও ওদেশে খৃষ্টান ও মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় সমান সমান।

ইথিওপিয়ার রাজাকে বলা হ'ত নেগাস। একজন নয়, চার চারজন নেগাস থাকতেন এখানে। দেশটাকে সেইভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষমতার লড়াই প্রায় লেগেই থাকত। অন্য দেশের সঙ্গেও যে বিবাদ বাধত না তা নয়। একবার ইংরেজদের হাতেই তাঁদের একজন নেগাস্ নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন; তাতে অন্য নেগাস্দের পক্ষে সুবিধাই হয়েছিল।

মুসোলিনী যখন ইটালির কর্তা তখন আবার বাধল ইটালির সঙ্গে ইথিওপিয়ার ঝগড়া। ইটালি আক্রমণ করল ইথিওপিয়াকে। আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত ইটালির সঙ্গে স্বল্পশিক্ষিত ইথিওপিয়ানরা পারবে কেন? তাদের সৈন্যরা তখনও খালি পায়ে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত। তবে বন্দুক-টন্দুকও ছিল বৈকি! আর তাই নিয়েই তারা প্রায় মাস ছয়েক ইটালিকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। তারপর মুসোলিনী ইথিওপিয়া দখল করে নেন।

কিন্তু তার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হতে মুসোলিনীর সে ক্ষমতা আর রইল না। অল্পদিনের মধ্যেই ইটালি যুদ্ধে হেরে যাওয়ায় ইথিওপিয়া আবার স্বাধীন হয়ে গেল। ওদের যে সবচেয়ে বড় রাজা—সম্রাট্ হাইলে সেলাসী, যিনি মুসোলিনীর আক্রমণের সময় ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি আবার এসে রাজা হয়ে বসলেন। এখন অবশ্য তিনি আর বেঁচে নেই, তবে অনেকদিন রাজত্ব করে গেছেন। তিনিও ছিলেন খৃষ্টান।

ইথিওপিয়ার লোকেরা হালে লেখাপড়ার দিকে নজর দিলেও এখনও তেমন একটা শিক্ষিত হতে পারে নি—যা অত দিনের পুরোনো একটা সভ্য দেশের পক্ষে সুখ্যাতির কথা নয়। বেশির ভাগ লোকই চাষবাস করে। কল-কারখানাও খুব যে একটা হয়েছে তা নয়। সে কারণ ব্যবসাবাণিজ্যও খুব একটা বাড়তে পারে নি। অল্পদিন আগেও ওখানে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে।

তবে এখন তো সব দেশই বড় হবার চেষ্টা করছে। হালে-স্বাধীনতা-পাওয়া অনেক আফ্রিকান রাষ্ট্র যদি জাতে উঠবার চেষ্টা করতে পারে তবে ইথিওপিয়ার মত একটা প্রাচীন স্বাধীন রাষ্ট্রের লোকেরাই বা কেন তা করবে না?

গ্রীস

আফ্রিকা ছেড়ে এবার আমরা ইয়োরোপ মহাদেশে চলে আসছি। প্রথমেই মনে আসছে গ্রীসের কথা, কেন না শৌর্যেবীর্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এই ছোট্ট দেশটি এক সময়ে ছিল পৃথিবীর সেরা দেশ। গ্রীসের সেই গৌরবময় দিনগুলির কথা তোমরা ইতিহাসের কথায় (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৬-৫৮১) পড়েছ। যীশুখৃষ্টের জন্মেরও প্রায় দু'হাজার বছর আগে ইজিয়ান সাগর অঞ্চলে ক্রীট্ দ্বীপকে ঘিরে যে মিনোয়ান সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার অপূর্ব ধ্বংসাবশেষ পণ্ডিতেরা খুঁজে বার করেছেন, খুঁজে বার করেছেন তার পরবর্তী মাইসিনিয়ান সভ্যতারও নানা নিদর্শন—যেটাকে নাকি বলা চলে তাম্রযুগ।

তারপর একে একে এল আরও কত সভ্যতা! ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র, অলিম্পাস্ পাহাড়ের নীচে অলিম্পিক উৎসব, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের আবির্ভাব—কত কথাই না মনে পড়বে এই গ্রীসে এসে দাঁড়ালে! সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হেরোডোটাস, সাফো—আরো কত অজস্র নাম—যা সভ্যতার ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

কিন্তু কোন সভ্যতাই পৃথিবীতে স্থায়ী হয় না, গ্রীক সভ্যতাও হয় নি। এক সময়ে রোমান্‌রা এসে গ্রীস দেশ দখল করে নেয়। তারও পরে গ্রীস আসে তুর্কীদের দখলে। দীর্ঘ দিন পরাধীন থেকে আবার জেগে ওঠে গ্রীস, স্বাধীনতা লাভ করে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে।

পানামা খাল
ত্রিনিদাদ
ওরিনোকো নদী
জর্জটাউন
ভেনিজুয়েলা
কোলাম্বিয়া
কুইটো
ইকোয়েডর
আমাজন নদী
পেরু
লিমা
বলিভিয়া
প্যারাগুয়ে
সানফ্রান্সিসকো নদী
রিওডি জেনেইরো
প্রশান্ত মহাসাগর
উরুগুয়ে
বুয়েনাস আয়ার্স
আটলান্টিক মহাসাগর
ম্যাগেলন প্রনালী
কেপ হর্ন
দক্ষিণ আমেরিকা

দক্ষিণ আমেরিকা
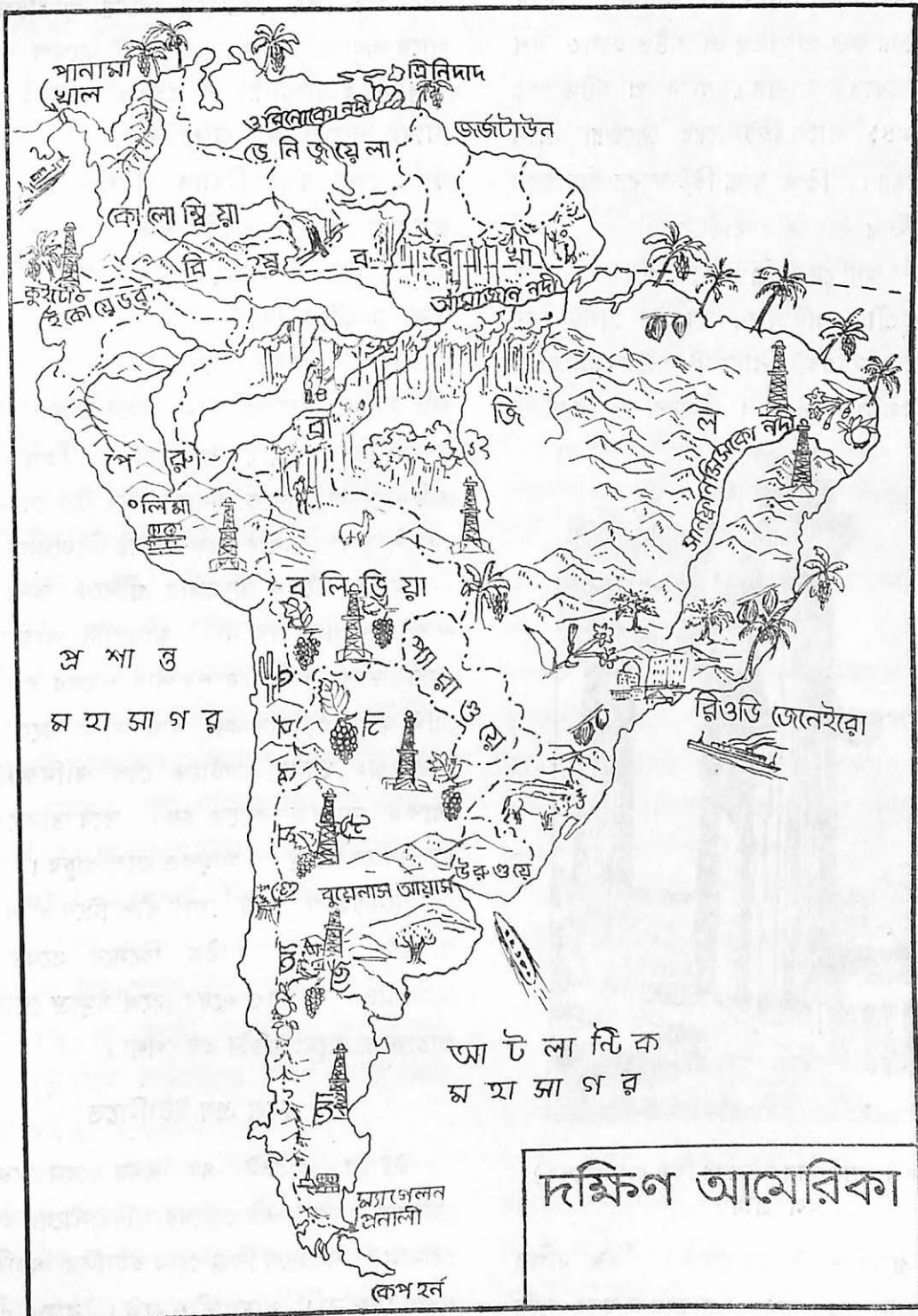
কিন্তু তখনও গ্রীস ছিল রাজার অধীন। ১৯২৫ সালে কিছুদিনের জন্য প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও দশ বছর যেতে না যেতেই আবার সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজতন্ত্র। ১৯৪১ সালে হিটলারের সৈন্যেরা গ্রীস দখল করে নেয়। কিন্তু যুদ্ধে হিটলারের হার হলে আবার গ্রীস ফিরে পায় তার স্বাধীনতা।

ইতিহাসের কথা ছেড়ে এখনকার গ্রীসের কথাই বলি। উত্তর গ্রীসে যদি যাও, মনে হবে দেশটা যেন আধুনিক যুগ থেকে একটু পিছিয়েই আছে। পাহাড়ী জায়গা, গ্রামগুলিও সেকেলে ধরনের, লোকগুলির
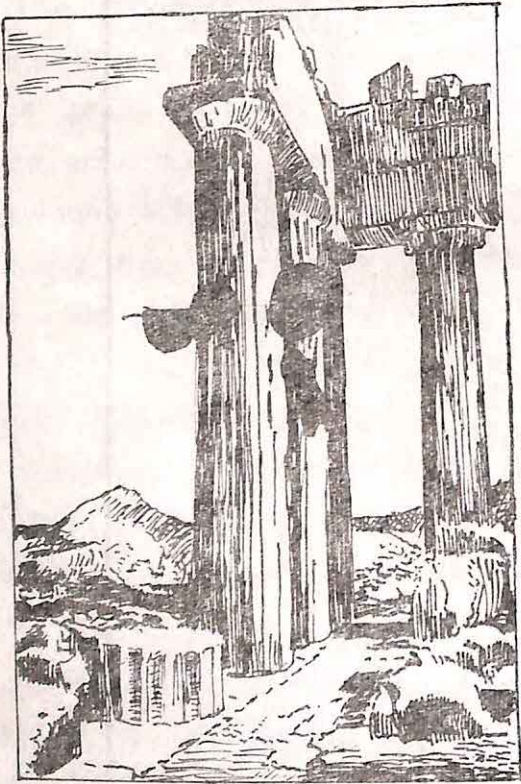
পার্থেনন (দেবী অ্যাথেনার মন্দিরের কিছু ধ্বংসাবশেষ), এথেন্স, গ্রীস

চালচলনেও গ্রাম্য ভাবই রয়ে গেছে। কিন্তু দক্ষিণ গ্রীসের চেহারাটা অন্য রকম। হাজার হাজার বছর আগেকার সেই গৌরবময় দিনের স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। রাজধানী এথেন্স মোটামুটি আধুনিক ইয়োরোপীয় বড় শহরগুলির মতই। শহর ঘেঁষেই রয়েছে অ্যাক্রোপলিস পাহাড়—যার মাথার ওপর দেখা যাবে বিখ্যাত পার্থেনন হল্। সুদৃশ্য স্তম্ভগুলি কালের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকের মতে প্রাচীন শিল্পকলার এমন চমৎকার নিদর্শন খুব কম জায়গায়ই দেখতে পাওয়া যায়। তেমনি পার্থেননছাড়াও অ্যাথেনা দেবীর অন্য মন্দির দেখলেও তাক লেগে যায়। মন্দিরটি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল, কিন্তু এ যুগের এঞ্জিনীয়াররা সেটিকে মেরামত করে ঠিক যেমনটি ছিল তেমনি ভাবে আবার দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

স্বাধীন হলেও এখনকার গ্রীসকে তেমন সমৃদ্ধিশালী দেশ বলা যায় না। জায়গাটা পাহাড় দিয়ে এমন ভাবে ভর্তি যে ওর পাঁচ ভাগের এক ভাগের বেশি অংশে চাষবাস করা যায় না। ফলে দেশের খাদ্যশস্যের চাহিদা মেটাতে বেশ খানিকটা বাইরে থেকেই যোগাড় করতে হয়। তবে তামাকের চাষ হয় এখানে যথেষ্ট। আঙ্গুরও ফলে প্রচুর।

অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে গ্রীস রাজ্য। কাজেই গ্রীকরা নাবিক হিসেবে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এখনও ওদের দেশে সমুদ্রে ছোট ছোট জাহাজ চালানো একটা বড় পেশা।

চলে এস ইটালিতে

ইটালি বলতেই এক সময় যেন রোমকেই বোঝাত। আর এই রোমের অধিবাসীদের বলা হ'ত রোমান্। আসলে কিন্তু রোম ইটালির একটি শহর ছাড়া কিছু না। রাজধানীও বটে। রাজধানীর নাম

থেকে ইটালির লোকদেরও পরিচয় ছিল রোমান্ বলে। গল্প আছে রোমিউলাস আর রোমাস্ নামে দুই ভাই রোম শহরের পত্তন করেন—যীশুখৃষ্টের জন্মেরও প্রায় সাড়ে সাতশ' বছর আগে। তাঁরা নাকি নেকড়ে-মা'র দুধ খেয়ে মানুষ হন। দু'টি উলঙ্গ শিশু একটি নেকড়ের বাঁট থেকে দুধ টেনে টেনে খাচ্ছে এ রকম মূর্তির ছবিও হয়তো অনেকে দেখে থাকবে।

যাই হোক, এই রোম যে এক সময়ে পৃথিবীর,—বিশেষ করে ইয়োরোপের,—সবচেয়ে শক্তিমান্ দেশ হয়ে উঠেছিল এ কথা অস্বীকার করার যো নেই। সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে শুরু করে ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ইত্যাদি প্রায় সারা ইয়োরোপই জয় করে নিয়েছিল ওরা। জয় করে নিয়েছিল গ্রীসও। গ্রীকদের পরে এত বড় শক্তিশালী দেশের কথা ইতিহাসে কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহেই নয়, জ্ঞানেবিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে, প্রযুক্তি-বিদ্যায়, রাজনীতিতে রোমান্ সভ্যতার দান অবিস্মরণীয় বলা যেতে পারে। ওর শক্তির কথা বলতে গিয়ে বাংলার কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন,—"কাঁপিত যাহার তেজে মহী সিন্ধু ব্যোম্"। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু সে রোমান্ সাম্রাজ্য কবে লোপ পেয়ে গেছে। নানা উপজাতির আক্রমণে তছ্‌নছ্ হয়ে যায় এত বড় একটা সভ্যতা। এর বিবরণ ছোটদের বিশ্বকোষে ইতিহাসের কথায় ভালো করে বলা হয়েছে। (২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮১-৫৮৪)

রোম ছাড়াও ইটালিতে বড় বড় শহরের অভাব নেই। আছে নেপল্‌স্, আছে ভেনিস, আছে মিলান, আছে পিসা ইত্যাদি। রোমান্ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেলে ইটালি ছত্রছান হয়ে যায়। প্রভাবশালী জমিদাররা ছোট ছোট রাজ্য গড়ে নিজেরাই সেগুলির কর্তা হয়ে বসেন এবং এর ফলে যা হয়—পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়ে দাঁড়ায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। দুর্বল ইটালিকে আবার এক করার কাজে উনিশ শতকে যে ক'জন নেতা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের কথাও নিশ্চয়ই পড়েছ। এঁরা হলেন মাৎসিনি, গ্যারিবল্ডী আর কাভুর। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে আর এক নতুন নেতার আবির্ভাব হয়—বেনিতো মুসোলিনী। ইটালিকে তিনি আবার একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তাঁর দলের নামই ছিল ফ্যাসিস্ট দল। মুসোলিনীই হলেন প্রধান মন্ত্রী। তখনকার বাঙ্গালীরা বলত মুসো-লিনী তো নয়, মুষল ইনি। অর্থাৎ মুষলের মত এঁর প্রতাপ। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধতেই মুসোলিনী যোগ দিলেন হিটলারের দলে। ফলে ইংরেজরা আক্রমণ করল ইটালি। তাদের ঠেকাতে পারলেন না মুসোলিনী, চাপে পড়ে পদত্যাগ করলেন ; তার পর ইটালি সরকারও আত্মসমর্পণ করল। মুসোলিনী দেশ ছেড়ে পালাতে গেলে তাঁর নিজের দেশের লোকেরাই তাঁকে হত্যা করল।

এখন যুদ্ধের পরে ইটালিতে আবার এসেছে শান্তি, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতন্ত্র।

এখনকার ইটালি

কিন্তু এ সবও তো গেল ইতিহাসের কথা। এখনকার ইটালির কথা একটু বলি। ইয়োরোপের ম্যাপ খুললে দেখতে পাবে ওর নীচের দিকে মাঝখানটায় দক্ষিণ বরাবর একটি রাজ্য ভূমধ্যসাগরে নেমে এসেছে। দেখলে মনে হবে বুটজুতো-পরা একটা মানুষের পা যেন ফুটবলে কিক্ করছে। ঐ বুটজুতোর আকৃতির দেশটিই হচ্ছে ইটালি আর

ফুটবলটি (যদিও গোল নয়, বরঞ্চ তিনকোণা) হচ্ছে সিসিলি দ্বীপ। এই সিসিলিতেই আছে বিখ্যাত সাইরাকিউজ, যেখানে সেকালকার বিরাট পণ্ডিত বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস বাস করতেন। কত কাল আগেকার কথা কিন্তু আর্কিমিডিস আজও অমর হয়ে আছেন।

ইটালির রাজধানী এখনও রোম। ওদের ভাষায় রোমা। অতি প্রাচীন শহর। যদি কখনও ওখানে বেড়াতে যাও দেখবে প্রাচীন রোমান্ যুগের সেই বিখ্যাত 'ফোরাম্',—যেটা ছিল বেচাকেনার বাজার,—তার সারি সারি অর্ধভগ্ন থামগুলি নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। গাইড্ তোমাকে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে কলোসিয়াম্ দেখাতে। এটিরও আজ ভগ্নদশা। তবু চারদিক্-ঘেরা, কয়েকতলা-উঁচু দর্শকের আসন-গুলো এখনও রয়েছে। মাঝখানে বিরাট প্রাঙ্গণ। কত ক্রীতদাস, কত বুনো জানোয়ারের রক্তে রঞ্জিত সেই প্রাঙ্গণ। এইখানেই ক্রীতদাসদের ধরে এনে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে বাধ্য করা হ'ত। একজনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে লড়াই থামতে দেওয়া হ'ত না। হাজার হাজার লোক,—মেয়ে-পুরুষ পরম উল্লাসে দেখত সেই মৃত্যুদৃশ্য। যারা লড়ত তাদের বলা হ'ত গ্ল্যাডিয়েটর। শুধু মানুষে মানুষে লড়াই নয়, হিংস্র সিংহ, বুনো হাতি, বুনো মোষ, বাইসন—এদের সঙ্গেও লড়াই করতে হ'ত গ্ল্যাডিয়েটরদের। উৎকট আনন্দে আসনে বসে রোমান্‌রা দেখত কি করে সিংহেরা যুদ্ধে পরাজিত হতভাগ্যদের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, হাতিরা পায়ের তলায় পিষে মারছে তাদেরকে, বুনো মোষরা, বাইসনরা মারছে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে। আবার তেমন বীর গ্ল্যাডিয়েটরদের হাতে সিংহ, হাতি বা বাইসনের জীবনাবসানও ঘটতে দেখত তারা। যে সব খাঁচায় ঐ সব হিংস্র জন্তুদের আটকে রেখে পরে যুদ্ধপ্রাঙ্গণে ছেড়ে দেওয়া হ'ত, যেখান দিয়ে গ্ল্যাডিয়েটররা প্রবেশ করত রণক্ষেত্রে—তাও দেখাবে গাইডরা ঘুরে ঘুরে।

বিখ্যাত সেন্টপিটার্স্ গীর্জা আর একটি দ্রষ্টব্য জিনিস রোমের। এটি অবশ্য এখনও সুন্দরভাবে সুরক্ষিত আছে। কত বড় বড় শিল্পী—র‍্যাফেল, মিকেল এঞ্জেলো, টিশিয়ান প্রভৃতির আঁকা বিরাট বিরাট দেয়াল-চিত্র বা ফ্রেস্কো আজও দেখতে পাবে ওখানে আঁকা রয়েছে, দেখতে পাবে সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্যের কাজ।

রোমের এক অংশে রয়েছে ভ্যাটিকান্ সিটি। এটি রোমেরই একটি অংশ হলেও এখানে ইটালিয়ান্ সরকারের কোন কর্তৃত্ব নেই। এটির কর্তা হচ্ছেন পোপ—রোমান্ ক্যাথলিক মতালম্বী খৃষ্টানদের ধর্মগুরু। রোমের মধ্যেই এটি একটি স্বশাসিত অঞ্চল। ভ্যাটিকান সিটিও একটি দর্শনীয় স্থান সন্দেহ নেই।

ইটালির অন্যান্য শহরগুলির মধ্যে ভেনিসের নাম অবশ্যই করতে হবে। এ এক অদ্ভুত শহর। আড্রিয়াটিক সাগরের মধ্যে কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপের ওপর এই শহর তৈরি। এত নীচু যে সমুদ্রে তেমন জলোচ্ছ্বাস হলে দ্বীপগুলো ভেসে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। অন্যান্য শহরে যেমন চলাচলের জন্য থাকে রাস্তা এখানে তেমনি আছে খাল। অসংখ্য খাল। ঐ খালগুলিই ওখানকার রাস্তার কাজ করে। এখানে ওখানে যেতে হলে গাড়ি বা ট্যাক্সির বদলে নিতে হবে নৌকো। লম্বা-গলা সে নৌকোর চেহারায়ও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। এই নৌকোগুলোকে বলা হয় গণ্ডোলা। দ্রুত চলাচলের জন্য আজকাল

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ
ভারত মহাসাগর
টিমর সাগর
পোর্ট ডারউইন
গালফ অব কার্পেন্টারিয়া
প্রশান্ত মহাসাগর
কোরাল (প্রবাল) সাগর
উত্তর টেরিটোরি (রাজ্য)
কুইন্সল্যাণ্ড
গ্রেট স্যাণ্ডি মরুঅঞ্চল
পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া
অ্যাশবার্টন নদী
গিবসন মরুভূমি
গ্রেট ভিক্টোরিয়া মরুভূমি
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া
ব্রিসবেন
নিউ সাউথ ওয়েলস
পার্থ
অ্যাডিলেড
ক্যানবেরা
ভিক্টোরিয়া
গ্রেট অস্ট্রেলীয়ান বাইট (উপসাগর)
বাস প্রণালী
তাসমানিয়া
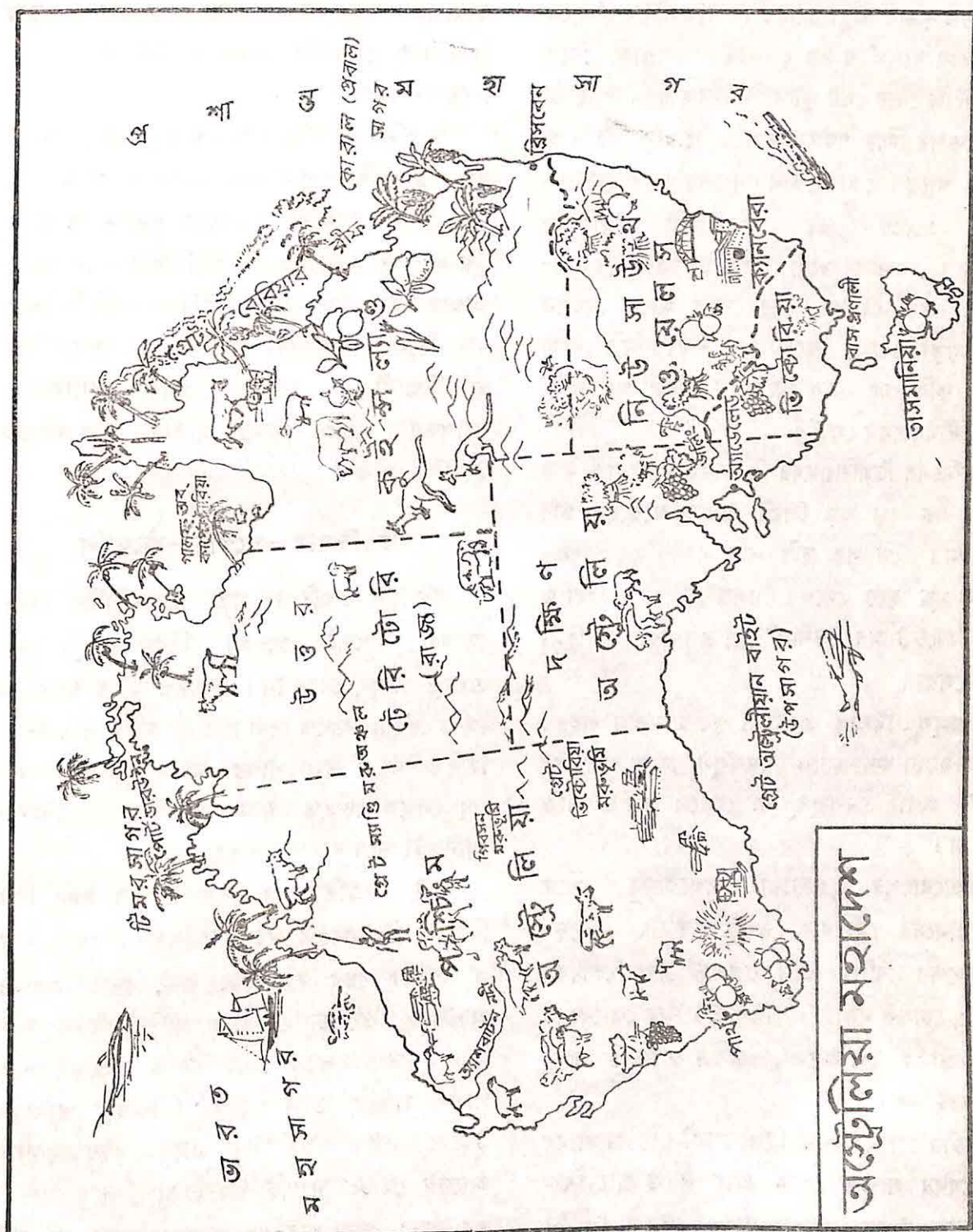
অস্ট্রেলিয়া

যন্ত্রচালিত লঞ্চও প্রচুর হয়েছে। খালগুলির তু'পাশে বাড়ি, তার গা ঘেঁষে সরু ফুটপাথ। গণ্ডোলা থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে সেই ফুটপাথে উঠতে হয়। তা ছাড়া খালের ওপর দিয়ে এখানে ওখানে পারাপারের জন্য পোলও আছে। কোন কোন পোলের ওপর ছাউনিও দেওয়া হয়েছে। এর অনেকগুলি বহুদিনের পুরোনো। এগুলির মধ্যে রিয়াল্টো ব্রিজ্ খুব নাম-করা। একটা এই রকম ঘেরা পোল আছে যেখানে আগে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের বন্দী করে রাখা হ'ত। কবি এর নাম দিয়েছেন 'ব্রিজ অব্ সাই' অর্থাৎ 'দীর্ঘশ্বাসের সেতু'।

ভেনিসের চিত্রশিল্পীদের একসময় জগৎযোড়া নাম ছিল। বহু বড় বড় শিল্পী এখানে জন্মেছেন, ছবি এঁকেছেন। সে সব ছবি এত সজীব যে এখনও লোকে মুগ্ধ হয়ে দেখে। শেক্সপীয়ারের বিখ্যাত নাটক "মার্চেন্ট অব্ ভেনিস" তো এখানকার কাহিনী নিয়েই লেখা।

নেপল্স্, মিলান এগুলিও খুব নামকরা শহর। ওদেশে একটা কথা আছে 'নেপল্স্ দেখো, তারপর মরো।' অর্থাৎ নেপল্স্ না দেখলে মরেও শান্তি পাবে না।

ইয়োরোপের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে ইটালিয়ানদের চেহারার একটু তফাৎ আছে। ইয়োরোপের বেশির ভাগ দেশেই দেখবে লোকের চুল কটা, চোখও নীলচে! কিন্তু ইটালির লোকেদের বেশির ভাগই চুল কালো, চোখও কালো। প্রায় আমাদেরই মত।

প্রাচীন রোমের ভাষা ছিল ল্যাটিন। আমাদের দেশে যেমন সংস্কৃত থেকে প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক ভাষা গড়ে উঠেছে, ইয়োরোপেও তেমনি ল্যাটিন ভাষা থেকেই গড়ে উঠেছে প্রায় সমস্ত ভাষা। তাই দেখা যায় বৈজ্ঞানিক নামগুলি সবই ল্যাটিন শব্দ দিয়ে তৈরি।

আধুনিক ইটালিয়ান ভাষাও খুব সমৃদ্ধ। অনেক বড় বড় কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রবন্ধকারের দেখা মেলে এখানে যাঁদের লেখার অনুবাদ আমাদের মুগ্ধ করে। তা ছাড়া কত বড় বড় বিজ্ঞানীও যে এখানে জন্মেছেন তার ঠিক নেই। সিসিলির আর্কিমিডিসকে বাদ দিলেও লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (একাধারে শিল্পী ও বিজ্ঞানী), টাইকো ব্রাহি, গ্যালিলিও, গ্যালভানি, ওহ্ম্, ভোল্টা, মার্কনি—এঁরা সকলেই ইটালির লোক।

ভিসুভিয়াস—পম্পেই—স্ট্রম্বোলি

ইটালির একটি বিখ্যাত আগ্নেয়গিরির নামও তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। ভিসুভিয়াস্। এটি এখনও সম্পূর্ণ নেভে নি। এখনও মাঝে মাঝে ও থেকে ধোঁয়া বেরুতে দেখা যায়। আগুনও বেরোয়, ছিটকে আসে গলা পাথর—যাকে বলা হয় লাভা। তবু লোকে দেখতে যায় ভিসুভিয়াস্, ভিতরে খানিকটা নেমে যাবারও ব্যবস্থা আছে।

এই ভিসুভিয়াসের পাশেই এক সময় ছিল বিখ্যাত বিলাসবহুল শহর পম্পেই। সে প্রায় তু' হাজার বছর আগেকার কথা, হঠাৎ একদিন অতর্কিতে ভিসুভিয়াস্ প্রচণ্ড অগ্নি-উদ্গীরণ শুরু করল। তার ভেতর থেকে ঝলকে ঝলকে বেরুতে লাগল আগুন, তরল পাথর বা লাভা, পাথরের টুকরো, ছাই। কেউ কিছু ভালো করে বুঝবার আগেই গোটা পম্পেই শহরটা চাপা পড়ে গেল ঐ সব লাভা আর ছাই-এর গাদার নীচে। পাশেই

সমুদ্র। কিন্তু সেই সমুদ্রে ছুটে গিয়ে জাহাজে চড়ে পালাবারও সময় পাওয়া গেল না। ধ্বংস হয়ে গেল সমস্ত ঘরবাড়ি-লোকজন সহ পম্পেই শহর।

এর প্রায় দু'হাজার পরে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের নজর পড়ল এই চাপা-পড়া শহরের দিকে। বিপুল পরিশ্রমে তাঁরা গোটা শহরটাকে মাটি খুঁড়ে বার করলেন। দেখা গেল দালানকোঠা, মন্দির-বাগান সমেত সমস্ত শহরটা মাটির নীচে প্রায় অক্ষত অবস্থাতেই রয়ে গেছে। মানুষজনও পাওয়া গেল, তারাও সব পাথর হয়ে গেছে। এখন এটি ভ্রমণকারীদের একটি দর্শনীয় স্থান। ওখানকার মিউজিয়মে মাটিচাপা হাজারো রকম অক্ষত জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়েছে—মায় পাথরে মোড়া নরদেহ, কুকুর ও অন্যান্য প্রাণীগুলোকেও।

ইটালির আর একটি আগুনে পাহাড় স্ট্রম্বোলি। এটিও এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ নেভে নি, এখনও ভিতরের দিকে ধিকি ধিকি জ্বলছে। ভ্রমণকারীদের দেখাবার জন্য এই পাহাড়ের জ্বালামুখ দিয়ে শ্যাফ্‌টে চাপিয়ে বেশ খানিকটা নীচে নামিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা আছে। অবশ্য যে নামে তার কৌতূহল মিটলেও কাজটা যে খুব সাহসের তাতে সন্দেহ কি?

ইউ. এস্. এস্. আর.

পুরো নাম ইউনিয়ন অব সোশ্যালিস্ট সোভিয়েত রিপাবলিক, সংক্ষেপে ইউ. এস্. এস. আর। এটি নতুন নাম, দেশটাকে আগে রাশিয়াই বলা হ'ত, এখনও অনেকেই তাই বলি। বিরাট দেশ। কতকটা রয়েছে গোটা উত্তর এশিয়া যুড়ে—তার নাম সাইবেরিয়া। বাকিটা ইয়োরোপে। তবে রাশিয়া বলতে আমাদের মোটামুটি ইয়োরোপের রাশিয়ার কথাই মনে পড়ে। কারণ সাইবেরিয়া এত ঠাণ্ডা দেশ যে সেখানে জনবসতি খুব কম। তা ছাড়া ওর নানা জায়গায় গভীর অরণ্যানী ছড়িয়ে রয়েছে। তবে সম্প্রতি সাইবেরিয়াকেও নানা দিক্ দিয়ে উন্নত করার চেষ্টা হচ্ছে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়া ছিল জারের শাসনে। রাশিয়ার সম্রাট্‌কে বলা হ'ত জার। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে রাজবংশ উচ্ছেদ করে দেশটির কর্তৃত্বভার চলে আসে পুরোপুরি সাধারণ মানুষের হাতে,—গড়ে ওঠে রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র, আর তারই নাম দেওয়া হয় ইউ. এস্. এস্. আর। সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আবার আছে ১১টি পৃথক্ ইউনিয়ন। এগুলি হচ্ছে রাশিয়ান্ সোভিয়েত রিপাবলিক, ইউক্রেন, শ্বেত রাশিয়া, উজবেক, তুর্কমেন, তাজাক, কাজাক, কিরঘিজ, আজেরবাইজান, জর্জিয়া আর আরমেনিয়ান রিপাবলিক। এখন সোভিয়েত রাশিয়া বলতে এর সবগুলিকেই বোঝায়। তবে এর সবগুলি কিন্তু একসঙ্গে যোগ দেয় নি। কাজাক এবং কিরঘিজ এসেছে ১৯৩৬ সালে।

জারের আমলে রুশ সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল ৮,৩৩৬,৮৬৪ বর্গ মাইল। এখনকার সোভিয়েত রাষ্ট্রের আয়তন ৮,৬৬০,০০০ বর্গ মাইল। আরও বড় না হবার কারণ জারের আমলের কিছু কিছু রাজ্য এখন রাশিয়া থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হয়েছে। কিছু নতুন রাষ্ট্রও তৈরি হয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে ফিনল্যাণ্ড, এস্‌টোনিয়া, লাটাভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং পোল্যাণ্ড। কিছুটা তুরস্ক ও রুমানিয়াতেও চলে গেছে। যাই হোক, তা সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়াই এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভূখণ্ড। পৃথিবীর ডাঙ্গা জমির সাত ভাগের এক ভাগ এখন তাদেরই হাতে।

সাইবেরিয়াকে ঠাণ্ডার দেশ বলেছি। ওর একেবারে উত্তর দিক্‌টা বছরের মধ্যে দশ মাস বরফে ঢাকা থাকে। অনেক জায়গার উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রীর চাইতেও ৯০ ডিগ্রী নীচে নেমে যায়। খোদ রাশিয়ায় সমুদ্র বলতে বালটিক সাগর আর ভিতরকার কৃষ্ণসাগর আর সীমানা বরাবর ক্যাস্‌পিয়ান সাগর। শেষের দু'টো সমুদ্রের মত বড় হলেও ভূগোলের ভাষায় হ্রদ—লোনা জলের হ্রদ।

এত বড় একটা ভূখণ্ড, এর আবহাওয়াও এক এক জায়গায় এক এক রকম। উত্তরের অনেকটা জায়গা যুড়ে রয়েছে আবার তুন্দ্রা অঞ্চল। তুন্দ্রা কথাটার মানে বৃক্ষহীন রাজ্য। তবে গোটা দেশটাকেই শীতের দেশ বলতে বাধা নেই।

অত বড় একটা দেশ, তাতে নানা রকম খনিজ সম্পদ্ থাকবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। রাশিয়া এদিক্ দিয়েও ভাগ্যবান্! তা ছাড়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাস করে সেদিক্ দিয়েও তারা খুব এগিয়ে গেছে।

এরকম কিন্তু বরাবর ছিল না। রাজতন্ত্রের সময় রাশিয়ায় সাধারণ লোকের অবস্থা ছিল বেশ কষ্টের। বড়লোকেরা—জমিদারেরা বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিতেন, কিন্তু দরিদ্র কৃষকরা, শ্রমিকরা দিবারাত্র পরিশ্রম করেও ভদ্রভাবে থাকবার সুযোগ পেত না। তার ওপর ছিল রাজার আর রাজসৈন্যবাহিনীর অত্যাচার।

অবশ্য রাশিয়ার ইতিহাসে অনেক বিখ্যাত রাজার কথাও আমরা পাই। পিটার দি গ্রেট ছিলেন বিরাট শক্তিশালী রাজা। রাণী ২য় ক্যাথেরিনেরও নামও কম নয়। এঁদের কথা তোমরা ছোটদের বিশ্বকোষে ইতিহাসের কথায়' পড়েছ।

১৯০৪ সালে পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে ছোট্ট জাপানের কাছে রাশিয়ানদের পরাজয় একটা স্মরণীয় ঘটনা। আমাদের দেশে তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হচ্ছে। সে যুগে এশিয়ার লোকদের ইয়োরোপের লোকেরা বেশ একটু খাটো করেই দেখত। জাপানের এই জয় যেন এশিয়ারই জয় বলে আমাদের দেশের লোকেরা ধরে নিয়েছিল এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এই ঘটনা তাদের বেশ খানিকটা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল বলেও শুনেছি।

রাশিয়ার নবজাগরণ

যাই হোক, জারের ইচ্ছাতন্ত্রেই কিন্তু রাজ্য চলছিল। উপযুক্ত একজন নেতার অভাবে জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারছিল না। সেই নেতৃত্ব দিলেন লেনিন। তাঁর সঙ্গে আর যে সব সহকারী ছিলেন তাঁদের মধ্যে স্ট্যালিন ও ট্রটস্কির নামও করতে হয়। জারকে সবংশে উচ্ছেদ করে বিদ্রোহীরা দেশের শাসনভার গ্রহণ করল। এই রুশ বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে ইদানীং কালের একটি খুব বড় ঘটনা। জার দ্বিতীয় নিকোলাস থেকে শুরু করে রাজবংশের একটি লোককেও তারা বেঁচে থাকতে দিল না, অনেককে নৃশংস ভাবে হত্যা করল। শুরু হ'ল রাশিয়ার আর এক ইতিহাস। তখনও প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয় নি।

এর পরের ইতিহাস কেবল এগিয়ে যাবার ইতিহাস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের আক্রমণ ঠেকিয়ে ঘরে ঘরে, রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ করে রাশিয়ানরা যে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিল তার তুলনা নেই। আজ রাশিয়া পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী দেশগুলির একটি। এক আমেরিকা ছাড়া কেউ তার সমকক্ষ নেই। শিক্ষাদীক্ষায়, জ্ঞানেবিজ্ঞানে, শিল্পেবাণিজ্যে
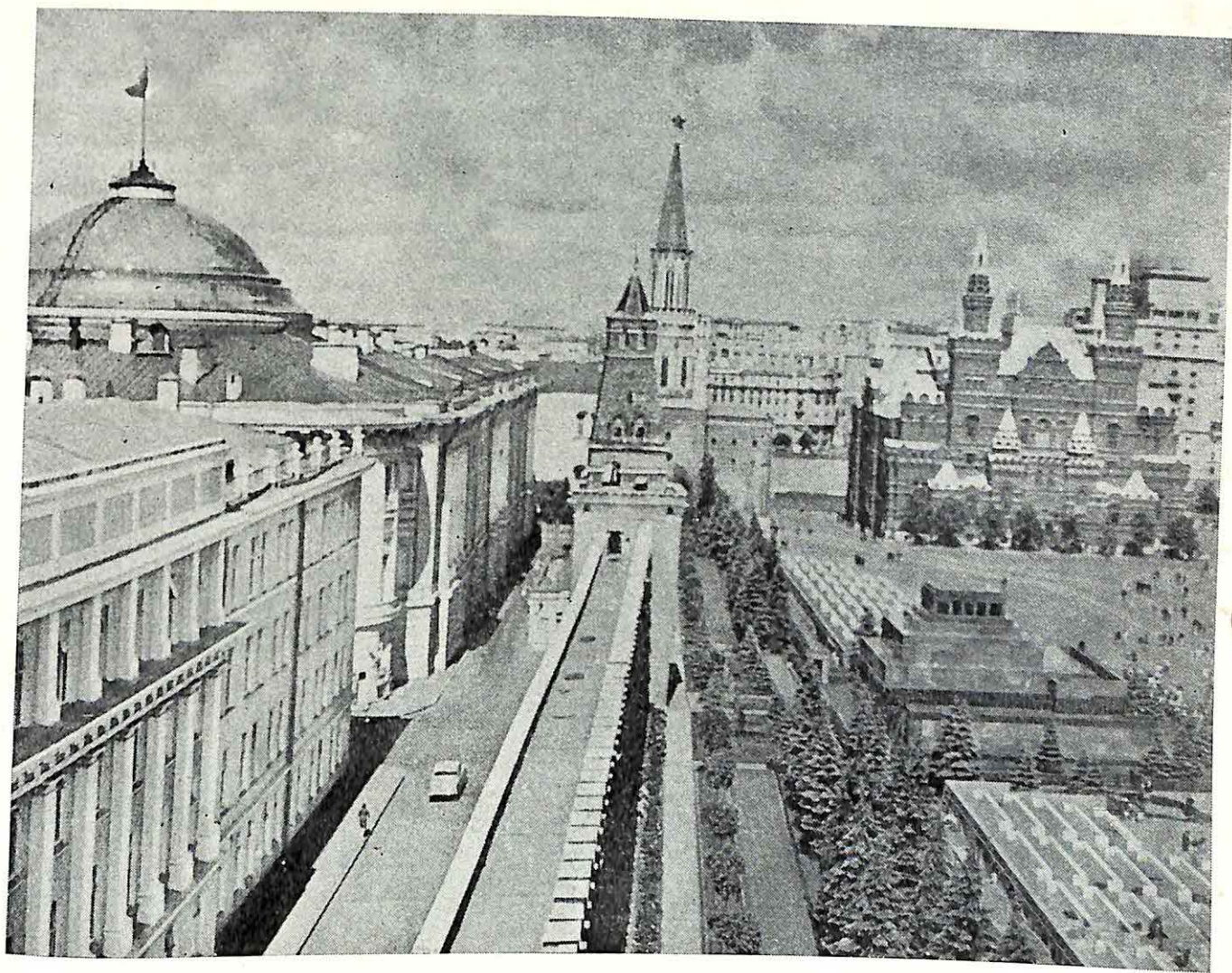
বিখ্যাত রেড স্কোয়ার, মস্কো
(দেশবিদেশের কথা—রাশিয়া ঃ পৃঃ ১৮৬৪)

তার অসম্ভব অগ্রগতি পৃথিবীকে বিস্মিত করেছে। প্রথম মহাকাশ বিজয়ের পথিকৃৎ তারাই। খেলাধূলায় ও শারীরিক শক্তিতে তাদের সমকক্ষ লোক গোটা পৃথিবীতে কমই আছে। মেয়েরাও চলেছে ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে পাশাপাশি। দেশে নিরক্ষরতা বলে সুন্দর। ব্যক্তিগত সম্পত্তি করার প্রবণতা চলে গেছে। সব কিছুই রাষ্ট্রের। শিশু জন্মাবামাত্র তার দায়িত্ব তুলে নিচ্ছে রাষ্ট্র। তার পরিচর্যা, চিকিৎসা, শিক্ষাদীক্ষা, কর্মজীবন —সমস্ত দায়িত্বই রাষ্ট্রের। এ যদি শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা যায় তা হলে তো কারো আর কোনও

সোভিয়েত শিশুদের নাচ

কিছু নেই, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান প্রায় ঘুচে গেছে। সাধারণ একজন চাষী, কারখানার একজন শ্রমিক— সেও জানে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে তারও আছে যথেষ্ট ভূমিকা। প্রত্যেকেরই জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছে ভাবনাই থাকবার কথা নয়। তবে হ্যাঁ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে নিশ্চয়ই। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কারও কিছু সত্যি কথা বলবার থাকলে তা প্রকাশ করার উপায় নেই। করলেই প্রচণ্ড শাস্তি। ফলে কারও

পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর অসীম ক্ষমতা। সমস্ত রাষ্ট্রটিকে বলা যায় ফেডারেল প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ওর পঞ্চাশটি রাজ্যের বা স্টেটের রয়েছে নিজেদের মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসন ক্ষমতা। তবে কতকগুলি ব্যাপারে রাষ্ট্রের হাতেই পুরোপুরি দায়িত্ব। যেমন, বৈদেশিক নীতি, সৈন্যবাহিনী, ডাক বিভাগ, বাণিজ্য ইত্যাদি। রাষ্ট্রপতি প্রতি চার বছর পর পর নির্বাচিত হন। নির্বাচন হয় স্টেট বা রাজ্যগুলির ভোটের ওপরই। এ ছাড়াও আছে কংগ্রেস, যার মধ্যে রয়েছে সেনেট এবং নির্বাচিত সদস্য-সভা। এদের সকলেরই কতকগুলি ব্যাপারে পৃথক্ পৃথক্ ক্ষমতা রয়েছে। তবে আইন-বলে প্রেসিডেন্টই স্থল-বাহিনী, নৌবাহিনী ও আকাশবাহিনীর সর্বেসর্বা। আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন রেগন।

আমেরিকা এখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী দেশ। সামান্য কিছু জিনিস তাকে বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়, বাকি সবগুলিতেই তারা স্বয়ম্ভর। অর্থের জোরে তারা প্রায় গোটা পৃথিবীকেই নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে প্রধান বাধা বোধ হয় রাশিয়া। এই ক্ষমতাপ্রিয়তার ফলে আমেরিকা এমন অনেক ব্যাপারেই নাক গলাচ্ছে যাতে পৃথিবীর শান্তি সম্বন্ধে অনেকেই আশঙ্কান্বিত।

এখনকার আমেরিকার সকলেই যে ইংরেজ বংশোদ্ভূত তা মনে করলে ভুল হবে। পৃথিবীর নানা দেশের লোক,—ইয়োরোপের, এশিয়ার, আফ্রিকার নানা প্রান্ত থেকে গিয়ে এখন এখানে নাগরিকত্ব নিয়ে আমেরিকান্ হয়ে গেছে, এখনও হচ্ছে। বহু ভারতীয়ও রয়েছে তার মধ্যে। এ বিষয়ে আমেরিকান্‌রা বেশ উদার। তবে সকলেরই ভাষা ওখানে ইংরেজি। অবশ্য ওরা বলে, ইংরেজি নয়—আমেরিকান্। কারণ উচ্চারণে, বানানে ইংরেজি থেকে একটু আলাদা হয়ে যাচ্ছে সেই ভাষা। তবে লিখবার ভাষায় ইংরেজির সঙ্গে বিশেষ কিছু তফাৎ নেই।

দেশের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ এখন নিগ্রো। ক্রীতদাস বংশ থেকে এলেও এরা এখন নানা দিকে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাচ্ছে—বিশেষ করে খেলাধূলায় তো কথাই নেই! এই খেলাধূলায়ও এখন আমেরিকা পৃথিবীর শীর্ষে। চার বছর পর পর খেলাধূলা নিয়ে যে অলিম্পিক বিশ্বপ্রতিযোগিতা হয় তার ফল দেখলেই তা বোঝা যায়। এখানে নিগ্রোদের অবদান খুব বেশি। নিগ্রোদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার প্রসারও দ্রুত বাড়ছে। তবু সাদা চামড়ার মানুষেরা এখনও নিগ্রোদের তেমন পাত্তা দিতে চায় না। এজন্য গোলমালও যে হয় না তা নয়। তা ছাড়া মারামারি, গুণ্ডামিতেও নিগ্রোরা নেহাৎ কম যায় না। গায়ের জোর তো আছেই, স্বভাবও অনেকেরই একটু উগ্র।

তবু বলব আজকের আমেরিকার তুলনা নেই।

ক্যানাডা

উত্তর আমেরিকায় ইউ. এস্. এর ঠিক উত্তরে রয়েছে ক্যানাডা। আলাস্কাটুকু বাদ দিয়ে উত্তরের বাকি প্রায় সবটাই এর মধ্যে পড়ে। গোটা পৃথিবীর মধ্যে আয়তনে এটির স্থান দ্বিতীয় (৩,৮৫১,৮০৯ বর্গ মাইল)। জনসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটির কাছাকাছি। রাজধানীর নাম অটোয়া। দেশের মধ্য-অঞ্চলটি বেশ উর্বর, কিন্তু পশ্চিমে রয়েছে রকি পর্বতমালা। উত্তর দিক্‌টা অত্যন্ত ঠাণ্ডা। প্রায় জনহীন, তৃণহীন স্টে্প্ স্ ছড়িয়ে আছে ঐখানে।

ক্যানাডার নামকরণ সম্বন্ধে একটা মজার গল্প চলিত আছে। আগে ওখানে ছিল রেড ইণ্ডিয়ানদের বাস। তাদের গায়ের রঙ তামাটে হওয়ায় ওদের ঐ 'রেড' নামটি দেওয়া হয়েছে। মাথায় পালক-গোঁজা, তীরধনুক ছুঁড়তে ওস্তাদ এই আদিবাসীদের ছবি আমাদের খুবই পরিচিত। অবশ্য এখন ওদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসছে। ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে ধীরে ধীরে ওরা মিশে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক!
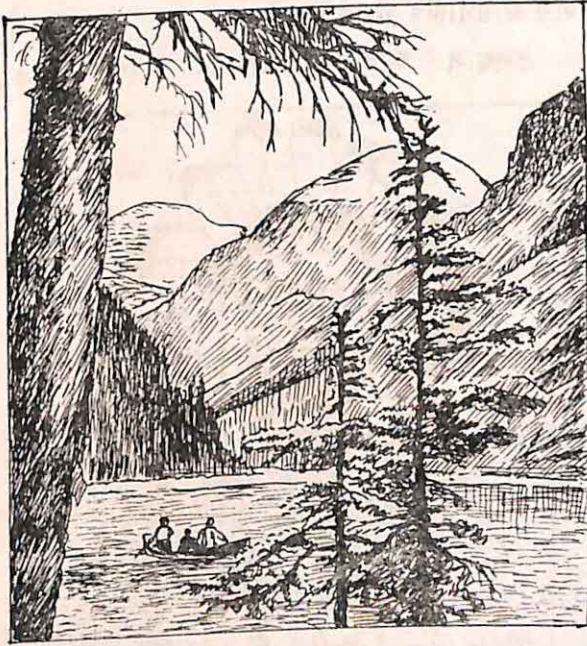
ক্যানাডার একটি মনোরম হ্রদ

যাই হোক, স্প্যানিশরা যখন ক্যানাডা অঞ্চলে এসে ঢুকতে লাগল তখন স্বভাবতই ওদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শুরু হ'ল। আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত স্প্যানিশদের সঙ্গে তীরধনুক নিয়ে লড়াই করা তো সহজ নয়! কাজেই স্প্যানিশদের জাহাজ দেখলেই ওরা চীৎকার করে বলত—কা-না-ডা। অর্থাৎ এখানে কিছুই নেই। তার মানে তোমরা চলে যাও। তাই শুনে স্প্যানিশরা ধরে নিল ঐ দেশটার নামই বুঝি কানাডা। সেই থেকে সত্যিই দেশটার নাম হয়ে গেল কানাডা বা ক্যানাডা।

কিন্তু ওখানে সত্যিকার উপনিবেশ গড়ে তোলে প্রথমে ইংরেজরা ১৫ শতকে, এবং তারা ওটাকে ইংরেজ উপনিবেশ বলে দাবী করে। এর অল্প পরে ফরাসীরাও এসে নামে—আরো দক্ষিণে, এবং দেশটাকে নিজেদের বলে দাবী করে। এইভাবে ইংরেজ আর ফরাসীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং লড়াইও বাধে। যুদ্ধে ফরাসীরা হেরে গেলে ইংরেজরাই হয় ওখানকার অধিকর্তা। কিছুদিন দেশটা দু'দলের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত একত্র হয়ে এক ক্যানাডা রাষ্ট্র হয়ে যায়। স্বাধীন রাষ্ট্র, তবে কমনওয়েল্থের সঙ্গে এক বাঁধনে বাঁধা।

ক্যানাডার বাসিন্দাদের মধ্যে এখনও শতকরা ৩০ জন ফরাসী ভাষাতেই কথাবার্তা বলে, তবে বাকিটাতে ইংরেজিই প্রধান ভাষা। গত ১৫ বছরের আগেকার লোকগণনায় দেখা যায় তখনও সেখানে ২ লক্ষের ওপর রেড ইণ্ডিয়ান এবং ১৫,০০০ মত এস্কিমো বাস করত। এখনও তাদের সংখ্যা তেমন বদলেছে বলে মনে হয় না।

বিরাট দেশ ক্যানাডা। অত্যন্ত সমৃদ্ধও বলা যেতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে এখনও ক্যানাডাতেই পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি অ্যাস্‌বেস্‌টাস, নিকেল, দস্তা। তা ছাড়া ওখানে আছে প্রচুর লোহা, তামা, কোবাল্ট, সীসে সোনা, রূপো, প্ল্যাটিনাম্, এমন কি দুষ্প্রাপ্য ইউরেনিয়াম্‌ও। পেট্রোলিয়াম্‌ও কম নেই। এ ছাড়াও নানরকম কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়ে থাকে এখানে। প্রচুর কাঠ এবং কাগজ তৈরির কাঠের মণ্ড, পশুলোম ইত্যাদি দেশবিদেশে চালান দিয়ে ক্যানাডা শিল্প-বাণিজ্যেও খুব উন্নত দেশ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া

কোন দিকে বিশেষ প্রতিভা থাকলে সব সময় তা প্রকাশের সুযোগও নেই—রাষ্ট্রের কর্তাদের যদি মর্জি না হয়।

তা সত্ত্বেও রাশিয়া এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে তার জয়যাত্রা। পুশকিন, গোগোল, ডস্টয়েভস্কি, টুরগেনিভ, টলস্টয়, চেকভ, গোর্কি, সোলোকভ প্রভৃতি অপরাজেয় সাহিত্যিকরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন এখনকার সাহিত্যিকরা তার সুযোগ পাচ্ছেন কিনা এ বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলেও এ যুগের রুশ সাহিত্যিকরাও নোবেল পুরস্কার লাভের গৌরব লাভ করেছেন। তবে রাষ্ট্র তা নিতে বাধাও দিয়েছে। আর বিজ্ঞানে তাদের অগ্রগতির তো কথাই নেই। এ তো আমরা নিত্যই চোখে দেখছি।

রাশিয়ার রাজধানী এখন মস্কো। আরও অনেক বড় শহর আছে সারা দেশ যুড়ে। লেনিনগ্রেড, স্ট্যালিনগ্রেড,—এই রকম আরও অনেক। আছে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য পায়োনিয়ার ক্যাম্প। ওদের ছেলেমেয়েদের দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলির দিকে তাকালে এই তফাৎ সহজেই চোখে পড়ে। চাষবাসের জন্য যৌথ খামারের ব্যবস্থা কৃষিক্ষেত্রে যেন এক নতুন বিপ্লব এনেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার এই পরিবর্তন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে "রাশিয়ার চিঠি" নামে যে

সোভিয়েত রাশিয়ার একটি সিনেমার একটি বিখ্যাত দৃশ্য

লেনিন হিলের ওপর মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়

(দেশবিদেশের কথা—রাশিয়া : পৃঃ ১৮৬৬)

বই তিনি লিখেছিলেন তাতে বলেছিলেন, তিনি যেন নতুন যুগের তীর্থ দর্শন করে এসেছেন। বাস্তবিক এত অল্পদিনের মধ্যে এই বিরাট পরিবর্তন মনের

রাশিয়ার সিনেমার আর একটি বিখ্যাত ছবির একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্য

মধ্যে একটা দাগ না রেখে পারে না। সে দাগ সবটাই সুষমায় মণ্ডিত।

কিন্তু তার পরেও তো অনেক দিন চলে গেল! রাশিয়ার এই ক্রমোন্নতি দেখলে তিনি না জানি আরও কি বলতেন!

সোভিয়েত সরকার কোন ধর্ম মানে না। এক সময়ে দেশে খৃষ্টধর্মের প্রচলন থাকলেও এখন আর রাষ্ট্র তাকে কোনও স্বীকৃতি দেয় না। ফলে অনেক পুরোনো গীর্জা এখন মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হয়েছে। ধর্ম এখানে নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুদূর গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু গীর্জা অবশ্য এখনও আছে, তবে সেখানে সাধারণত বুড়োবুড়িদেরই দেখতে পাওয়া যায়। তরুণতরুণীরা তো বটেই, অনেক বয়স্ক লোকও আর ও নিয়ে মাথা ঘামায় না ওখানে।

তবে ইউ, এস. এস. আর-এর কোন কোন অঞ্চল মুসলিমপ্রধান। সে জন্য সে সব জায়গায় ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সরকার খানিকটা উদার। প্রকাশ্যে মসজিদে গিয়ে নিজের ইচ্ছেমত উপাসনা করতে কোন বাধা নেই সেখানে।

এই বিরাট দেশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে সব কথা বলা তো সম্ভব নয়! তবে একটা আনন্দের কথা নিশ্চয়ই বলতে হবে যে সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের স্বাধীন ভারতের পরম বন্ধু। যখনই ভারত কোনও বিপদের মুখে এসে পড়ে ওরা জানিয়ে দেয় আমরা তোমাদের সঙ্গে—তোমাদের পাশে আছি।

খেলাধূলাতেও সোভিয়েত রাশিয়া আজ পৃথিবীর অন্যতম সেরা দেশ

ফ্রান্স

ফ্রান্সকে আমরা বলি ফরাসী দেশ। ওখানকার লোকদেরকেও বলি ফরাসী, যদিও ইংরেজিতে ওরা ফ্রেঞ্চ বলেই পরিচিত। ইয়োরোপের কথা বলতে গেলে এই ফ্রান্সের কথা না বললেই নয়। কারণ এ দেশটি যেমন সুন্দর, ওখানকার লোকেরাও তেমনি নানা গুণের অধিকারী। ফ্রান্সের তিনদিকেই ধরতে গেলে সমুদ্র। পশ্চিমে বে অব্ বিস্কে আর আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরসাগরের একটুখানি, আর সারা উত্তর-পশ্চিম যুড়ে রয়েছে ইংলিশ চ্যানেল। দক্ষিণে—বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্বেও আছে ভূমধ্যসাগর।
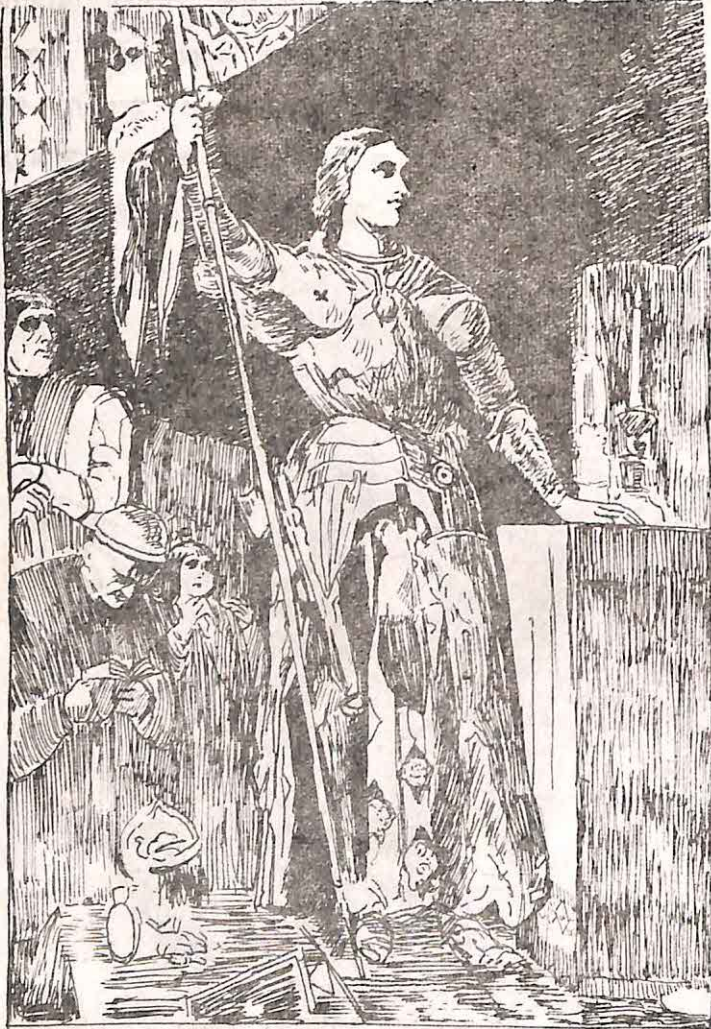
আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৬০০ সাল থেকে ফ্রান্সের সত্যিকার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। তার পর কত ঘটনার পর ঘটনা ফ্রান্সের ইতিহাসকে কখনো ম্লান, কখনো উজ্জ্বল করে রেখেছে। শার্লম্যান থেকে শুরু করে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট পর্যন্ত কত সম্রাট্ ফ্রান্সকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরে গেছেন। জোয়ান অব আর্কের কাহিনী, ফরাসী বিপ্লবের কাহিনী—বলতে গেলে কত কথাই না বলতে হয়! যুদ্ধও কি কম করেছে ফরাসীরা? ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তো হয়েছে একশ' বছরের লড়াই। লড়াই হয়েছে জার্মেনীর সঙ্গে বারে বারে, হয়েছে রাশিয়ার সঙ্গেও। আমাদের চোখের সামনেই তো দেখলাম প্রথম মহাযুদ্ধে জিতলেও ২য় মহাযুদ্ধের প্রায় গোড়ার দিকেই হিটলারের বাহিনী কেমন সহজে ফ্রান্স দখল করে নিয়েছিল। রাজধানী প্যারিস শহর যাতে শত্রুরা ধ্বংস না করে দেয় সেজন্য সেটাকে "মুক্ত নগর" ঘোষণা করে ফরাসী বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল। আমরা খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা দেখেছিলাম "ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্যারিস নগরীর পতন"। ফরাসী সেনাপতি দ্য গল্ দেশ ছেড়ে চলে গেলেন, পরে মিত্র পক্ষের জয় হলে আবার ফিরে এসে দেশের কর্তা হলেন। আবার জেগে উঠল স্বাধীন ফ্রান্স, পৃথিবীর একটি শক্তিশালী দেশ হয়ে।

জোয়ান অব্ আর্ক

কিন্তু এসবও হ'ল ইতিহাসের কথা, এখানে আমরা ও আলোচনা করব না। তার চেয়ে বরঞ্চ এখনকার ফ্রান্স সম্বন্ধে একটু বলা যাক।

ভারি সুন্দর দেশ এই ফ্রান্স। রাজধানী প্যারিসের তো তুলনাই নেই। এক সময়ে প্যারিসকেই বলা হ'ত পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শহর। এখনও, ওর ওপর দিয়ে নানা ঝড়ঝাপ্টা বয়ে গেলেও, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শহরগুলির মধ্যে প্যারিস নিশ্চয়ই একটি। সুন্দর সুন্দর রাস্তা, সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগান, সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ প্যারিসকে বিদেশীদের কাছে আজও মোহময় করে রেখেছে। প্রায় হাজার ফুট উঁচু ইস্পাতের তৈরি ঈফেল টাওয়ার, ল্যুভর মিউজিয়াম, বিবলিওথিক ন্যাশনেল নামে বিরাট গ্রন্থাগার এখনও প্যারিসের গৌরব। ল্যুভর মিউজিয়ামের চিত্রশালা তো জগদ্বিখ্যাত। ওখানেই আছে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা সেই বিখ্যাত 'মোনালিসার' মূল ছবি। বিবলিওথিক ন্যাশনেলের মত বড় লাইব্রেরীও পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

ফ্যাশনের দেশ বলে প্যারিসের বিশ্বযোড়া নাম। ওখানকার মেয়েরা এক সময়ে পোশাক-আশাকে অন্য দেশের মেয়েদের আদর্শ ছিল বলা চলে, এখনও যে নেই তা নয়। এ বিষয়ে ওখানকার পুরুষেরাও কম যায় না। বিলাসবাহুল্যের জন্যও প্যারিসের নাম ছিল জগৎযোড়া। তাই বলে প্যারিসের সবটাই যে পরীর দেশ তা ভাবলে ভুল হবে। গরীবদের নোংরা বস্তি এখনও আছে। সেকেলে এবড়োখেবড়ো পাথরে বাঁধানো রাস্তা, সরু সরু গলিরও অভাব নেই। তবে এখন তা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। ফরাসী ভাষায় প্যারিসের উচ্চারণ কিন্তু 'পারি'।

প্যারিস ছাড়াও ফ্রান্সে অনেক নামকরা শহর আছে। সমুদ্রের ধারে আছে বিখ্যাত মার্সাই বন্দর, ক্যালে। আছে টুলো প্রভৃতি সুন্দর শহর। ভূমধ্যসাগরের কোলে রিভিএরা তো ভ্রমণকারীদের একটা স্বর্গরাজ্য বলেই ধরা হয়। নীল স্বচ্ছ জলের ধারে বিস্তৃত বেলাভূমি। পাহাড়, ফুল আর পাম গাছ মিলে তার রূপ যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

ফ্রান্স আর স্পেনের সীমানা বেঁধে দিয়েছে পিরেনীজ পর্বত। কিন্তু ইয়োরোপের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় আল্প্স্ও গেছে ফ্রান্সেরই গা ঘেঁষে। আল্প্স্এর সর্বোচ্চ চূড়ার নাম মাউণ্ট ব্ল্যাঙ্ক (ম ব্লাঁ)। এই গিরিশৃঙ্গ কোন্ দেশে? সুইট্জারল্যাণ্ডের লোকেরা বলে তাদের দেশে, ইটালিয়ানরাও দাবী করে ওকে। কিন্তু আসলে চূড়াটি ফ্রান্সেরই এক্তিয়ারে। মাউণ্ট ব্ল্যাঙ্ক ইয়োরোপের সবচেয়ে উঁচু চূড়া কিনা এ নিয়ে অবশ্য ভৌগোলিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাঁদের অনেকেই বলেন আল্পসের মাউণ্ট ব্ল্যাঙ্ক নয়, ককেশাসের মাউণ্ট এলব্রুজ্ চূড়াই ইয়োরোপের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ। আবার অনেকের মতে এলব্রুজ ইয়োরোপের নয়—ওটা গিয়ে পড়েছে এশিয়ার ভাগে।

সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ফরাসীরা পৃথিবীর প্রথম সারির লোক। ফরাসী ভাষায় অতি উঁচু দরের সব সাহিত্য লেখা হয়েছে। ভিক্তর হুগো, আলেকজান্দার হ্যুমা, জুল ভার্নে, আনাতোল ফ্রাঁস, মোপাসাঁ, রোমাঁ রোলাঁ, সার্তে প্রভৃতি অনেক বিশ্ববিখ্যাত লেখক জন্মেছেন এদেশে। তেমনি জন্মেছেন ল্যাভয়সিয়েরে মত বিশ্ববিখ্যাত অনেক বিজ্ঞানীও। বেকরেল, পিয়েরি কুরী এদেশেরই লোক; আর সেই সূত্রে মাদাম কুরীকেও নিশ্চয়ই ফরাসী বলতে হবে॥
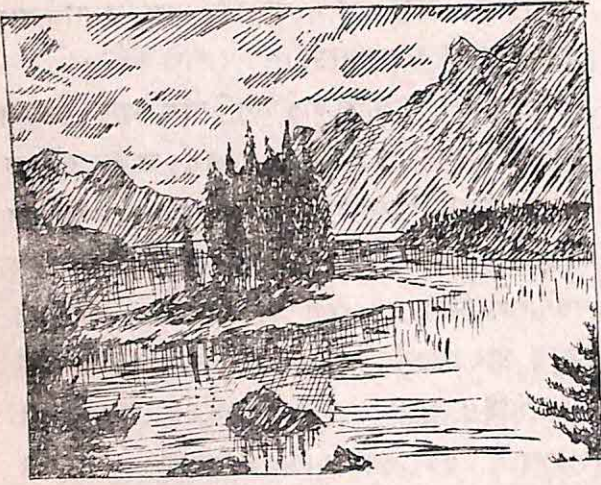
ক্যানাডার একটি অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য : হ্রদের মধ্যে ভাসমান দ্বীপ

যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, মোটর গাড়ির অংশ ইত্যাদি তৈরি করেও প্রচুর সম্পদ্ উপার্জন করে যাচ্ছে। তবে ইউ. এস. এ-র ব্যবসায়ীরাও এখানে প্রচুর টাকা ঢেলে যাচ্ছেন। ক্যানাডার বড় বড় কারখানার শতকরা ৫০ ভাগই নাকি তাদের।

এত বড় একটা দেশে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যও কম হবে না। তা ছাড়া বড় বড় শহরেরও অভাব নেই ওখানে। আর, ক্যানাডা এবং ইড. এস্. এর ঠিক সঙ্গমস্থলে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত—নায়গ্রা। উঁচুতে না হলেও চওড়ায় বিরাট। ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করার জন্য তু'দেশই ওখানে এমন সব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা করেছে যে যারা ওখানে বেড়াতে যায় তারা শুধু রামধনুর রাজ্যেই ঢোকে না—যেন এক কল্পলোকের ভিতর গিয়ে পৌঁছয়।

মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি

ইউ. এস. এ থেকে নীচের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে নামতে থাকলে আমরা প্রথমেই পাব মেক্সিকো রাষ্ট্র (আয়তন ১,৯৭২,৫৪৭ বর্গ কিলোমিটার)। প্রায় ৫ কোটি লোকের বাস এখানে। পূব পশ্চিম তু' দিক্ই সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। আরও দক্ষিণে গেলে সেণ্ট্রাল বা মধ্য আমেরিকা। তারপর পানামা যোজক পার হলেই শুরু হবে দক্ষিণ আমেরিকা। পানামা যোজক অবশ্য এখন আর যোজক নেই, ওখানে খাল কেটে এদিক্ ওদিক্ যাবার রাস্তা করে নেওয়া হয়েছে। তাই ওকে বলা যায় পানামা প্রণালী। নানা দিক্ দিয়ে জায়গাটির গুরুত্ব যথেষ্ট।

কলম্বাস আসবার অনেক আগে থেকেই

মাথায় পালক গুঁজে, নিজেদের পোশাক প'রে দাঁড়িয়ে আছেন একজন রেড ইণ্ডিয়ান সর্দার।

মেক্সিকোতে একটি খুব উঁচুদরের সভ্যতা প্রচলিত ছিল—যাকে বলা হয় ইণ্ডিয়ান সাম্রাজ্য। ইণ্ডিয়ান বলতে অবশ্য রেড ইণ্ডিয়ান বুঝতে হবে। এই সভ্যতার বহু চিহ্ন আজও ওখানে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। এর পর স্প্যানিশরা এসে দেশটি দখল করে এবং ১৫২১ থেকে ১৮১০ পর্যন্ত ওখানে রাজত্ব করে। কিন্তু স্প্যানিশরাও শেষ পর্যন্ত ও রাজ্যটি দখলে রাখতে পারে নি। ১৯১১-১৯২১ সালের মধ্যে বিপ্লবীরা ওখানে একটি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলে। এখন ওটি অনেকটা আমেরিকার ধাঁচে গড়া প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

রাজধানীর নাম মেক্সিকো সিটি। ৩০ লক্ষের ওপর লোক বাস করে এই শহরে। নানা দিক্ দিয়ে রাষ্ট্রটি এগিয়ে চলেছে। অল্প দিন আগে এখানে অলিম্পিক খেলা হওয়া থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানকার কৃষিসম্পদ্—ভুট্টা, ধান, গম এবং চিনি ইত্যাদি। প্রচুর রূপো পাওয়া যায় এখানে। আর পাওয়া যায় গন্ধক, দস্তা, সীসে, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতির খনিজ। পেট্রোলিয়াম্‌ও আছে।

পানামা প্রণালী পার হলেই দক্ষিণে পাওয়া যাবে সুবিশাল দক্ষিণ আমেরিকা। এক সময়ে এখানকারও বিভিন্ন অংশে অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা বর্তমান ছিল। য়ুকেটানের মায়া সভ্যতার তো তুলনা নেই। ওর ধ্বংসাবশেষ দেখলে বিস্মিত হতে হয়। পেরুতে ছিল ইন্‌কা সভ্যতা। সোনার রাজ্য বলা যায় এটিকে। রাশি রাশি সোনা সঞ্চিত ছিল এখানে। ১৫-১৬ শতকে স্প্যানিশ, পোর্তুগীজ প্রভৃতি বিদেশীরা এসে হানা দিলে এই সব প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। দেখতে দেখতে স্পেন প্রায় সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলে। শুধু ব্রেজিল চলে যায় পোর্তুগীজদের হাতে।

কিন্তু আমরা তো সকলেই জানি, ইতিহাস কখনও এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। দক্ষিণ আমেরিকায়ও থাকে নি। ১৯ শতকে ওখানকার নানা জায়গায় শুরু হয় বিদ্রোহ। নেতৃত্ব দেন সাইমন বলিভার। এই বিদ্রোহের ফলে বিভিন্ন রাজ্য একে একে স্পেনের অধীনতা থেকে মুক্তিলাভ করে। তৈরি হয় কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র—ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, পেরু, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর ইত্যাদি। বাকি রাজ্যগুলিও দেখাদেখি এক এক করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রেজিলও পোর্তুগীজ অধীনতা থেকে নিজেদের মুক্ত করে

তাঁবুর ভিতর একটি রেড ইণ্ডিয়ান পরিবার : দক্ষিণ আমেরিকা
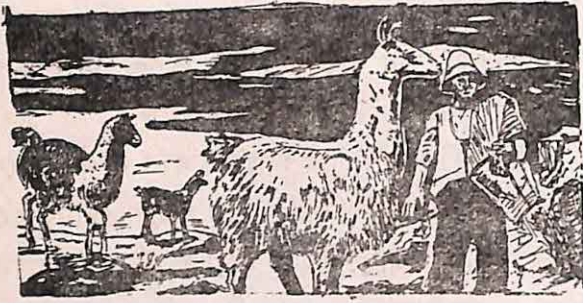
টিটিকাকা হ্রদের ধারে আলপাকা

ফেলে। তারপর উনিশ শতকেই আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, চিলি, গুয়াটেমালা প্রভৃতি রাষ্ট্র স্পেনের অধীনতামুক্ত হয়ে একে একে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যায়।

এগুলির মধ্যে আয়তনে ব্রেজিলই সবচেয়ে বড়, ৮,৫১১,৯৬৫ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যাও ছিল ১৯৭০ সালেই ৯ কোটি ৩২ লক্ষের ওপর, এখন আরও বেড়েছে। রাজধানীর নাম রিও ডি জেনেরিও। অতি সুন্দর সাজানোগোছানো শহর। লোকসংখ্যা ঐ ১৯৭০ সালেই ছিল ৪৩ লক্ষের ওপর। ২১টি ষ্টেট বা রাজ্য নিয়ে গঠিত এই রাষ্ট্রের পুরো নাম (ইংরেজিতে) ফেডারেটিভ রিপাব্লিক অব্ ব্রেজিল।

এই বিরাট রাষ্ট্রে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যও যে উল্লেখ-যোগ্য হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? পৃথিবীর সবচেয়ে চওড়া নদী আমাজন এর ওপর দিয়েই সমুদ্রে পড়েছে। দৈর্ঘ্যেও নদীটি কম নয়, ২ হাজার মাইলেরও বেশি। ব্রেজিলের ইগুয়াস্যুর মত আশ্চর্য জলপ্রপাতও পৃথিবীতে কমই আছে।

দক্ষিণ আমেরিকার স্কুইরেল-মাংকি বা কাঠবিড়াল-বাঁদর

এখন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় ছোটবড় বহু রাষ্ট্র। গিনি, পানামা, কোষ্টারিকা—এগুলিও স্বাধীন রাষ্ট্র। তবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে এরা অনেকেই বেশ সাহায্য পায়। সম্ভবত কমিউনিজ্‌ম্ "জুজু"র হাত থেকে এদের বাঁচানোর জন্যই আমেরিকার এই বদান্যতা।

ব্রেজিলের খনিজ সম্পদ্ বিরাট বলা যেতে পারে। সোনা, হীরে, নিকেল, লোহা, অভ্র, টাংষ্টেন, ট্যাণ্টালাইট, কয়লা—সবই আছে। আছে পেট্রো-লিয়াম্ এবং মোনাজাইটও। বস্ত্রশিল্পও এখানকার একটা উল্লেখযোগ্য শিল্প। প্রচুর তুলো উৎপন্ন হয় এখানে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কফিও

পাওয়া যায় এখানেই। পাওয়া যায় কোকো ও চা। আরও পাওয়া যায় কলা, কমলালেবু, আনারস ইত্যাদি ফল। ব্রেজিলে এখনও পোর্তুগীজ ভাষাতেই লোকে কথাবার্তা বলে।

অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশের নাম তো ইদানীং ওদের ফুটবল খেলার
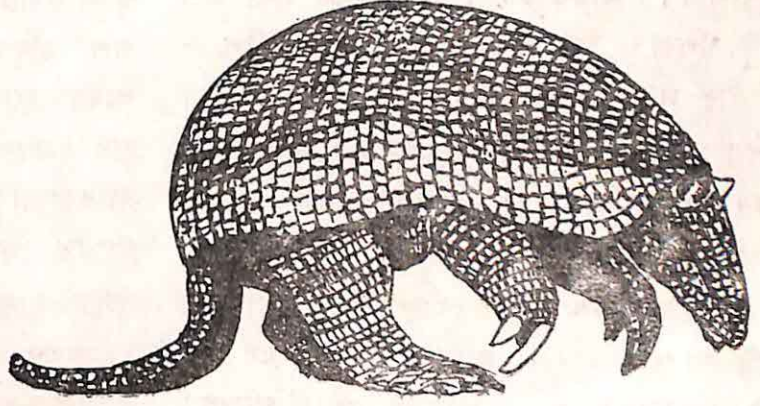
বর্ম-আঁটা অতিকায় আর্মিডেলো
দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দা

কৃতিত্বের জন্য আমাদের মুখে মুখে ঘুরছে। ব্রেজিলও এই খেলায় খুব উন্নত।

দক্ষিণ আমেরিকার নানা জায়গায় অনেক নতুন ধরনের প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। আলপাকার জামা আমাদের খুব পরিচিত। এগুলি তৈরি হয় আলপাকা নামে একরকম জন্তুর লোম থেকে। পেরু ও বলিভিয়ার মধ্যে টিটিকাকা হ্রদের কাছে এই আলপাকা দেখা যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৮০৯ মিটার উঁচুতে এই হ্রদ অবস্থিত। হ্রদটি যেমন দীর্ঘ তেমনি গভীর।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যে স্কুইরেল-মাংকি (কাঠবিড়াল-বাঁদর), বর্ম-আঁটা অতিকায় আর্মিডেলো, লাল বা হলদে রঙের অতিকায় টিয়াজাতীয় পাখি ম্যাকাও প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের ওপর দাবী নিয়ে ইংরেজদের সাম্প্রতিক অভিযানের কথাও হয়তো অনেকের মনে আছে।

লাল বা হলদে রঙের অতিকায় টিয়া জাতীয় পাখি ম্যাকাও

অস্ট্রেলিয়া

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এবার আমরা আসছি পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট্ট মহাদেশে, যার নাম

অস্ট্রেলিয়া। আরও ভালো করে বললে বলা যায় অস্ট্রেলেশিয়া। আসলে অস্ট্রেলিয়া একটি দ্বীপ,—পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দ্বীপ বলা চলে এটিকে। এশিয়ার দক্ষিণ-পূব দিকে এই বিরাট দ্বীপটির উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকেই রয়েছে ভারত মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর।

ক্যাপটেন কুক কি ভাবে অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেছিলেন তা তোমরা ছোটদের বিশ্বকোষের এই খণ্ডেই 'আবিষ্কার ও অভিযানের কথায়' পড়েছ। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৮৩৬)। সেটা হ'ল ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ। কুক ঐ মহাদেশটি আবিষ্কার করে সেটাকে নিজেদের দেশ গ্রেট ব্রিটেনের অধীন বলে দাবী করলেন। তখন অস্ট্রেলিয়ায় যে সব লোক বাস করত তারা হচ্ছে পৃথিবীর আদিমতম জাতির একটি,—যাদেরকে আমরা বলি নিতান্তই "জংলী", যদিও এরাই "ব্যুমেরাং" নামে সেই অদ্ভুত অস্ত্রটি আবিষ্কার করেছিল যা নাকি ঠিকমত ছুঁড়তে পারলে শিকার বা শত্রুকে আঘাত করে ফের হাতে ফিরে আসে। এখন অবশ্য এরা আস্তে আস্তে অবলুপ্তির পথে চলেছে। এখন বোধ হয় এদের সংখ্যা হাজার কুড়িও হবে কিনা সন্দেহ।

যাই হোক, অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের বছর পঞ্চাশের মধ্যেই ইংরেজরা পুরোপুরি ও-জয়গাটা দখল করে নিল। জায়গাটা ওরা কয়েদীদের নির্বাসন দেবার জন্য বেছে নিল এবং এইভাবে অস্ট্রেলিয়া ছেয়ে গেল নির্বাসিত ইংরেজ কয়েদীদের দ্বারা—যদিও সংখ্যায় তারা খুব যে একটা বেশি এমন মনে করার কারণ নেই। পরবর্তী কালে তাদেরই বংশধররা হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ান। ইতিমধ্যে ওখানে পাওয়া গেল সোনার সন্ধান। তখন দলে দলে ভাগ্যান্বেষী ইংরেজও গিয়ে জুটল ওখানে। চার্লি চ্যাপলিনের বিখ্যাত "গোল্ড রাশ্" ছবিতে এর ভারি মজার কাহিনী ও দৃশ্যও আমরা দেখেছি। যাই হোক, এরই ফলে অস্ট্রেলিয়া হয়ে দাঁড়াল পুরোপুরি একটা ব্রিটীশ উপনিবেশ। লোকসংখ্যা কিন্তু তখন খুবই কম। বছর ৫০/৬০ আগেও গোটা মহাদেশটার জনসংখ্যা ছিল মাত্র পঁচাত্তর হাজারের মত।

অবশ্য দিনকাল এখন বদলেছে। এখনকার অস্ট্রেলিয়ানদের আর কয়েদীদের বংশধর বলা চলে না। লোকসংখ্যাও এখন অনেক বেড়েছে। ১৯৭০ সালের লোকগণনায় দেখা গেছে তখনই ওখানে জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ২৮ লক্ষের মত। এখন আরও বেশি।

অস্ট্রেলিয়ার আয়তন ২,৯৬৭,৯০৯ বর্গ মাইল। আগে ওটা পুরোপুরি ব্রিটীশ ডোমিনিয়ন হয়ে ছিল। এখন পৃথক্ রাষ্ট্র হলেও কমন্‌ওয়েল্‌থের বাঁধনে তাদের সঙ্গে বাঁধা আছে। কয়েকটা পৃথক্ রাজ্য বা স্টেট নিয়ে ফেডারেল পদ্ধতিতে ওর শাসন চলছে। ফেডারেল রাজধানী হচ্ছে ক্যানবেরা। বিভিন্ন স্টেট বা রাজ্যের রাজধানী হচ্ছে সিডনী, মেলবোর্ন, ব্রিসবেন, অ্যাডেলেইড, পার্থ ইত্যাদি। ফেডারেল পার্লামেণ্টে একজন প্রধান মন্ত্রী আছেন, আছে ২টি সভা বা হাউস। অস্ট্রেলিয়ায় চারপাশে যে সব ছোট ছোট দ্বীপ আছে সেগুলিও অস্ট্রেলিয়া সরকারের মধ্যে চলে এসেছে। সব মিলে তাই কখনও কখনও বলা হয় অস্ট্রেলেশিয়া।

অস্ট্রেলিয়ার উত্তর দিক্‌টা পাহাড় আর মরুভূমিতে ভরা, লোকজন বেশির ভাগই থাকে দক্ষিণ অঞ্চলে। পূব দিকেও আছে পাহাড়, কয়েকটা নদীও আছে সেদিকে ; কিন্তু বাকি দেশটায় নদী নেই বললেই হয়। তবু দেশটা বেশ উর্বরা। গম, যব, আলু, আখ

এ সবের চাষ তো হয়ই, তা ছাড়া নানান্ রকম ফলফলারিও ফলে ওখানে। পশুচারণের জন্য ঘাস-জমিও আছে প্রচুর। ফলে ভেড়ার চাষ ওখানকার একটা বড় সম্পদ্। পৃথিবীর নানা জায়গায় ঐ সব ভেড়ার পশমই শুধু চালান যায় না, চালান যায় ভেড়ার মাংসও,—যাকে আমরা বলি মাটন্। ফলফলারিও টিনে করে চালান যায়, চালান যায় টিনে-ভরা মাছ, মাখন, বোতলে মধু। পৃথিবীর অনেক দেশই এই সব খাবারের ওপর নির্ভর করে থাকে। এ ছাড়া সোনা, রূপো, সীসে, দস্তা, তামা, নিকেল,
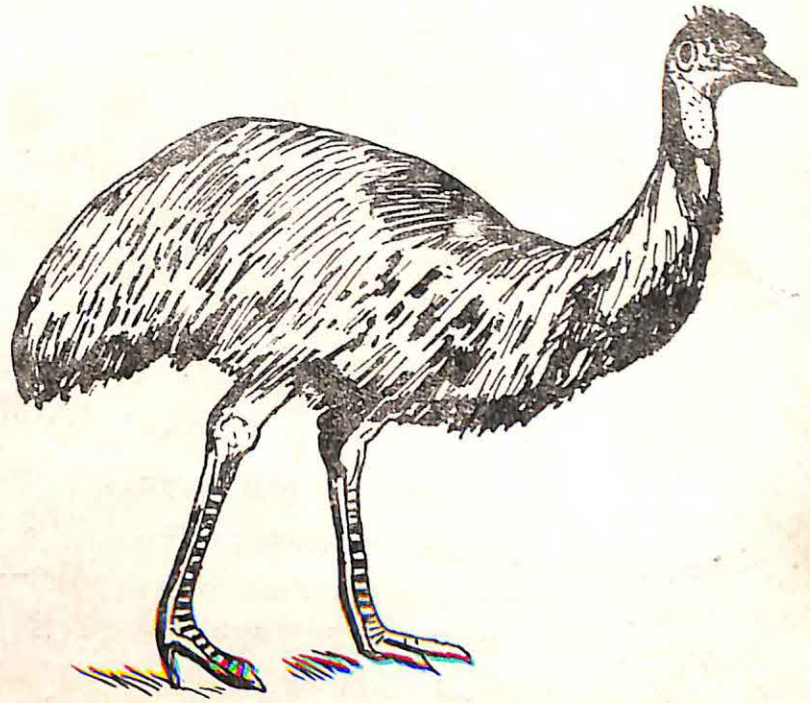
অস্ট্রেলিয়ার এমু পাখি, এরা উড়তে পারে না।
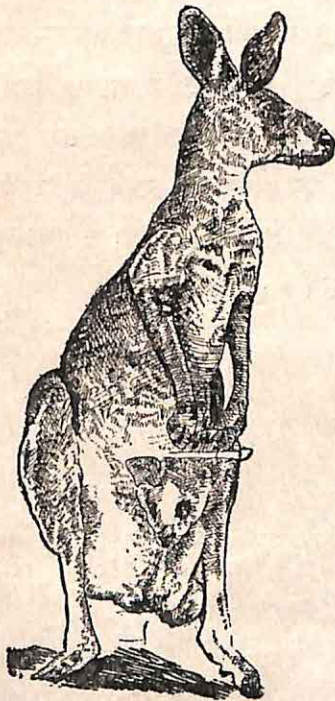
লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের খনিজও রয়েছে। কিছু কিছু পেট্রোলিয়ামেরও সন্ধান পাওয়া গেছে এখানে।

এখানে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত সব গাছপালা জন্মায়, এমন কতকগুলি জন্তু দেখা যায় যা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। যেমন ধরা যাক ইউক্যালিপ্-টাস গাছ। বিরাট লম্বা, গায়ের ছাল সাদা, পাতা ঘষলেই ইউক্যালিপ্টাস অয়েলের তীব্র গন্ধ পাওয়া যাবে। ক্যাঙ্গারু হচ্ছে একটি অদ্ভুত প্রাণী—যা অস্ট্রেলিয়ার একেবারে নিজস্ব। তাই অনেকে ওকে বলেন ক্যাঙ্গারুর দেশ। তা ছাড়াও আছে মস্ত বড় পাখি এমু,—যারা উড়তে পারে না, আছে কোয়েলা নামে ছোট ছোট ভালুক জাতীয় জীব, আছে প্ল্যাটিপাস বা হাঁসঠুঁটো নামে অদ্ভুত প্রাণী—যারা স্তন্যপায়ী হয়েও ডিম পাড়ে, আছে নানান্ জাতের

অস্ট্রেলিয়ার নিজস্ব প্রাণী ক্যাঙ্গারু।

প্ল্যাটিপাস বা হাঁসঠুঁটো

টেস্ট ম্যাচের প্রচলন ছিল না। এখন অবশ্য আরও কয়েকটা দেশ ক্রিকেট টেস্ট খেলছে, কিন্তু এদিক্ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার গৌরব এখনও কমে নি। বহু বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় জন্মেছেন এখানে। তাঁদের মধ্যে ডন্ ব্র্যাডম্যানের নাম সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত।
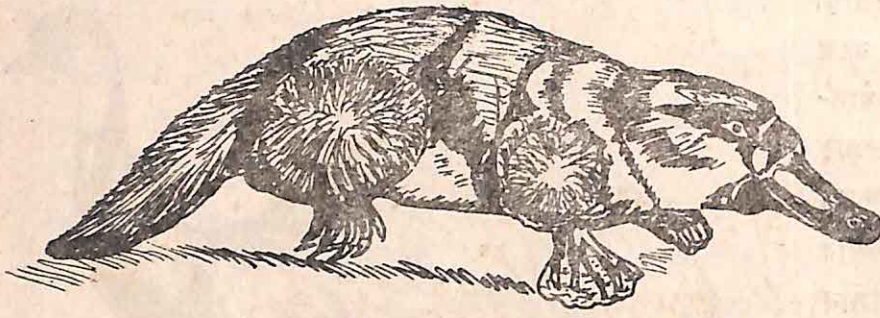
ছোট বড় কাকাতুয়া, যারা শেখালে মানুষের স্বর চমৎকার নকল করতে পারে। এক সময় ওখানে 'মোয়া' নামে হাতির মত অতিকায় এক রকম পাখিও দেখা যেত। অল্প কয়েকশ' বছর আগে সেগুলি লোপ পেয়ে গেছে। মানুষেরাই শিকার করে করে শেষ করে দিয়েছে তাদেরকে।

ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ভীষণ নাম। এক সময়ে ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়া ছাড়া আর কোথাও

অস্ট্রেলিয়ার কিছু পূবে খানিকটা সমুদ্র পার হলেই আছে আরও ছোট ছোট ঘেঁষাঘেঁষি-করা তু'টি দ্বীপ,—নিউজিল্যাণ্ড। ১৯৪৭ থেকে এটিও হয়েছে একটি পৃথক্ রাষ্ট্র—কমন্ওয়েল্থের মধ্যে। রাজধানী অক্ল্যাণ্ড। আয়তনে নিউজিল্যাণ্ড ১০৩,৭৪০ বর্গ-মাইল, লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষের মত। এখান থেকেও পশম এবং মাংস নানা জায়গায় চালান যায়। গম, যবের চাষ হয়। খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা ও সোনা উল্লেখযোগ্য। কাগজের জন্য কাঠের মণ্ড প্রচুর তৈরি হয় এখানে, তাই কাগজ-শিল্পও বেশ গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম্ও পাওয়া যাচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ার অতিকায় কাকাতুয়া

খেলাধূলায়—বিশেষ করে ক্রিকেট খেলাতেও এখন নিউজিল্যাণ্ড বেশ এগিয়ে গেছে। তারাও এখন টেস্ট ম্যাচ খেলছে।

কুমেরু বা অ্যান্টার্কটিকা

পাঁচটি মহাদেশের কথা বলেছি, কিন্তু আরও একটি মহাদেশ আছে পৃথিবীতে—যেটাকে বলা যায় ষষ্ঠ মহাদেশ। তবে অন্যান্য মহাদেশের সঙ্গে এর তফাৎ, এখানে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই বলা যেতে পারে। ধূ-ধূ করছে শুধু বরফ আর বরফ আর বরফ।

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণে রয়েছে দুই মেরু। উত্তরে উত্তর মেরু বা সুমেরু আর দক্ষিণে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু। এই খণ্ডে 'আবিষ্কার ও অভিযানের কথায়' (পৃঃ ১৮২১) বলেছি যে দুই মেরুর মধ্যে রয়েছে বেশ একটু পার্থক্য। সুমেরুকে বলা যায় এক বিরাট সমুদ্রের রাজ্য। কিন্তু কুমেরু হচ্ছে একটি মহাদেশ—প্রকাণ্ড এক মালভূমি, আগাগোড়া বরফ দিয়ে ঢাকা। সেই বরফের নীচে আছে বড় বড় পাহাড়, এমন কি ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিও। তার ক্রেটার বা জ্বালামুখগুলো রয়েছে বরফের নীচে চাপা পড়ে। তা ছাড়া তার চারদিকে রয়েছে বিরাট একটা ভেসে-থাকা বরফের প্রাচীর—যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'দি গ্রেট্ আইস বেরিয়ার'। এইজন্যই কুমেরুকে সুমেরুর মত সমুদ্র না বলে মহাদেশ বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

ইংরেজিতে কুমেরু বা দক্ষিণ মেরুকে বলা হয় "দি অ্যান্টার্ক্‌টিক রিজিয়ন্", আর সুমেরুকে বলা হয় "দি আর্ক্‌টিক রিজিয়ান্"। নামটা কি করে হ'ল শোন। অ্যান্টি মানে হচ্ছে বিপরীত আর আর্ক মানে হচ্ছে ভালুক। এখন, আমরা আকাশের যে তারাপুঞ্জকে বলি সপ্তর্ষিমণ্ডল ইংরেজিতে তাকেই বলা হয় দি গ্রেট্ বেয়ার বা বড় ভালুক। তা হলে অ্যান্টার্ক্‌টিক কথাটার মানে হচ্ছে ভালুক বা সপ্তর্ষি-মণ্ডলের উল্টো দিক্, অর্থাৎ যেখান থেকে সপ্তর্ষি-মণ্ডলকে দেখা যাবে না। আর যে দিক্ থেকে ঐ ভালুক বা সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দেখা যাবে সেটাই তা হলে হবে আর্ক্‌টিক। এইভাবেই এই মজার নামকরণ দু'টো করা হয়েছে।

অ্যান্টার্ক্‌টিক বা কুমেরু সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ হবার কারণও আছে। এখন এরোপ্লেন, হেলিকপ্টারের যুগে সমস্তটা পথ আর জাহাজে চেপে বরফ কেটে কেটে ওখানে যেতে হয় না। বিশেষভাবে তৈরি, বরফের রাজ্যে চলবার মত জাহাজ ব্যবহার করা হয় ঠিকই, এবং বরফও কেটে কেটে চলতে হয় এটাও সত্যি, কিন্তু একবার সুবিধামত বরফের আস্তরণ পেলে সেখানে তাঁবু খাটিয়ে থাকার ব্যবস্থা যেমন করা যায়, তেমনি সেখান থেকে হেলিকপ্টার বা ছোট এরোপ্লেন চালিয়ে আরও ভিতর দিকে চলেও যাওয়া যায়, যা আগে সম্ভব ছিল না। বলা বাহুল্য ঐ হেলিকপ্টার বা এরোপ্লেন জাহাজে করেই নিয়ে আসা যায়।

সম্প্রতি পৃথিবীর কোন কোন দেশের বিজ্ঞানীরা এইভাবে কুমেরুতে গিয়ে সেখানকার আবহাওয়া, প্রাকৃতিক অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করছেন এবং সেই সব উৎসাহী বিজ্ঞানীদের মধ্যে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরাও রয়েছেন। অন্য দেশের সঙ্গে একত্র হয়ে নয়, পুরোপুরি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নিয়ে এরকম একাধিক অভিযান হয়েও গেছে, আরও হবে। প্রথম দল গিয়ে ওখানে তাঁবু
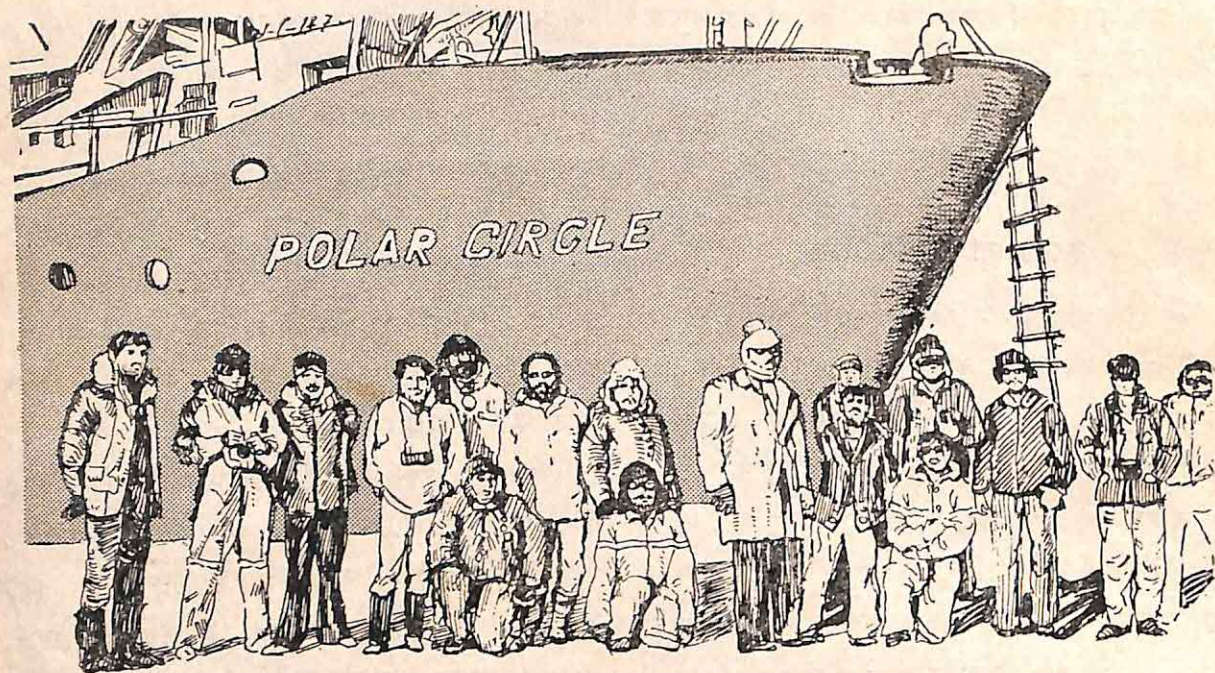
কুমেরু-অভিযাত্রী প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানীর দল

গেড়ে যন্ত্রপাতি বসিয়ে রেখে এসেছেন, একটা নামও দিয়ে এসেছেন জায়গাটার,—খাঁটি ভারতীয় নাম। তার পর দ্বিতীয় দল গিয়ে আরও কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। তারও পরে গেছেন আর একদল বিজ্ঞানী। আর, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আর গৌরবের কথা, একটি বাঙ্গালী মহিলা (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপিকা) শ্রীমতী সুদীপ্তা সেনগুপ্তাও পর পর দু'বার এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা তিনি প্রকাশ করেছেন তা পড়লে গা শিউরে ওঠে। প্রচণ্ড হাড়-কাঁপানো শীত, কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই, যেদিকে তাকানো যায় কেবল ধূ-ধূ করছে বরফ, বরফ আর বরফ। কোথাও তা পাহাড়ের মত খাড়া হয়ে আছে, কোথাও গলে ক্ষীণ জলরেখার সৃষ্টি করেছে, আবার কোথাও বা বিরাট সাদা চাদরের মত বিছিয়ে আছে দিগন্ত যুড়ে। ওরই মধ্যে ওঁরা দেখা পেয়েছেন পেঙ্গুইন পাখির—যা ঐ অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। এ পাখি উড়তে পারে না, মানুষের মত খাড়া হয়ে হাঁটে। ঐ শীতের রাজ্যে কেমন করে যে ওরা টিকে থাকে তাও ভাবলে অবাক্ লাগে।

কুমেরুতে ভারতীয়দের এইসব বৈজ্ঞানিক অভিযান থেকে আমরা অনেক নতুন কথা জানতে পেরেছি, সেই সঙ্গে পৃথিবীর বিজ্ঞানী-সমাজে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়েছি তাও নিশ্চয়ই আমাদের গর্বের বিষয়।